# গল্পসমগ্র

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

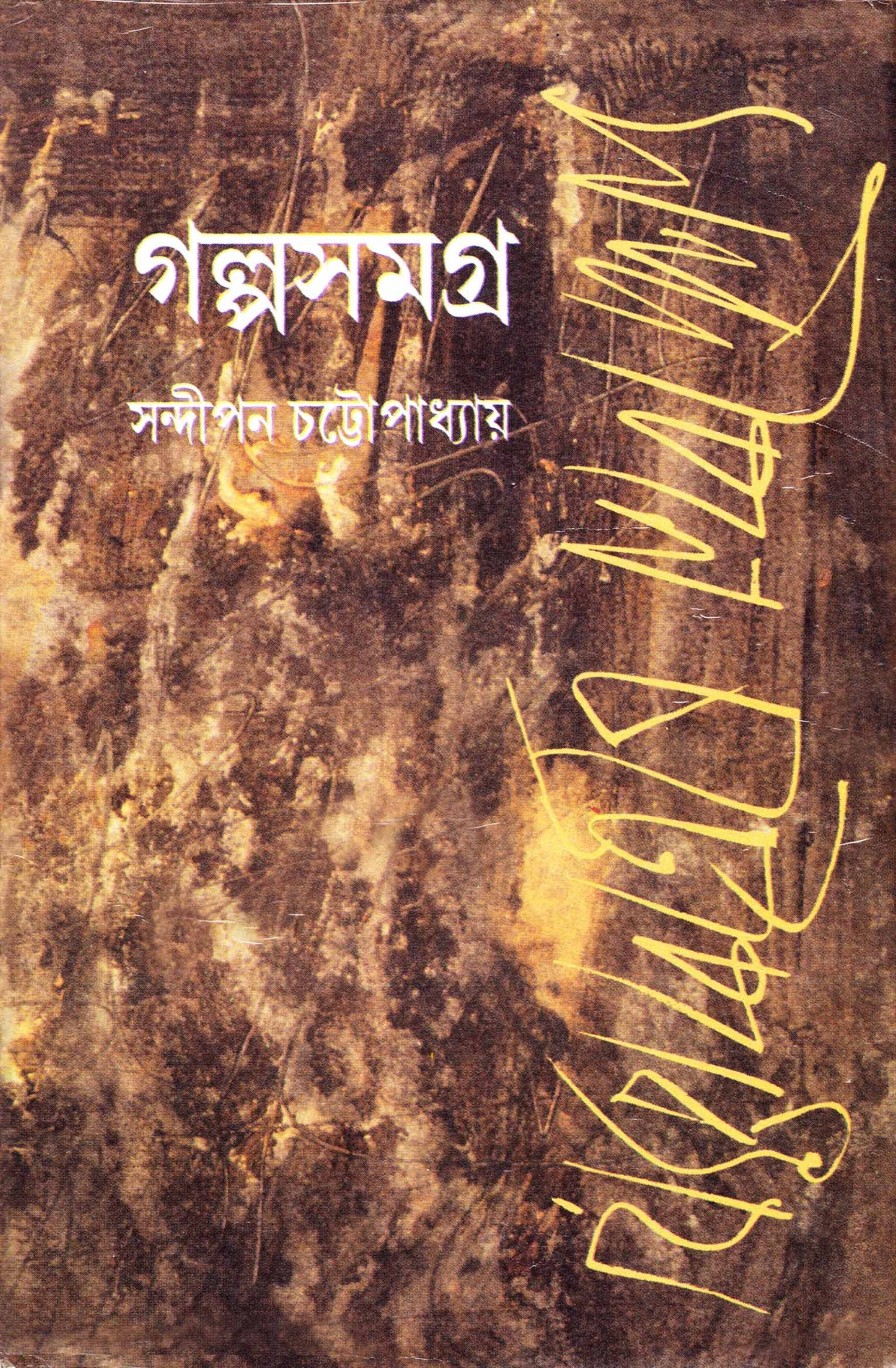

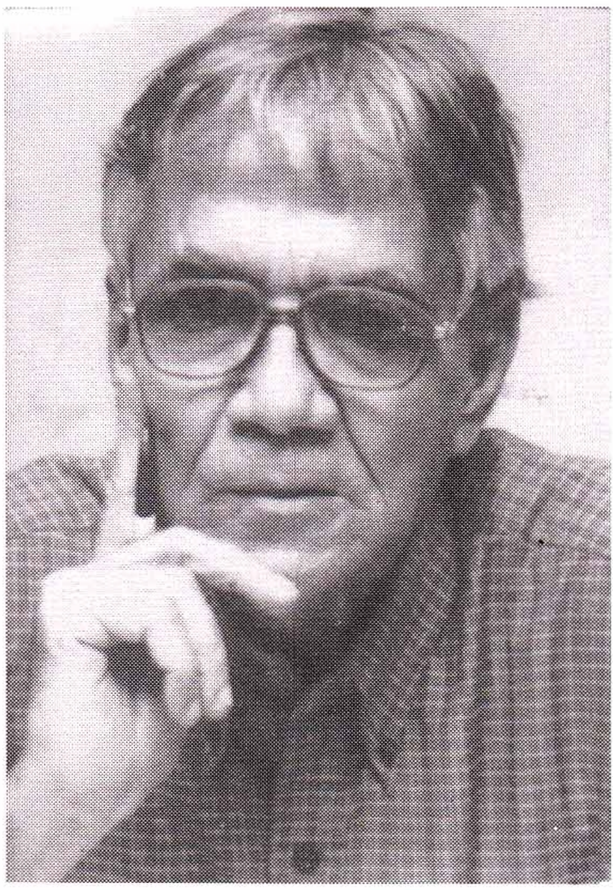

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২৫ অক্টোবর ১৯৩৩

বঙ্কিম পুরস্কার ঃ ১৯৯৫

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ঃ ২০০২

*

'আমি প্রায় সবকিছুকেই মিথ্যে ও ভুল বলে ধরে নিয়েছি। সবচেয়ে বড় ভুল ও বেশি সন্দেহজনক মনে করেছি আমার আন্তরিকতাকে। কোনো ভোর ভালো লাগলে, কোথাও বা গড়ের পিছনে সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হলে কোনোদিন, কাঁধে হাত রেখেছি নিজের, 'সত্যি তো, নাকি বই পড়ে শিখেছ?' জানতে চেয়েছি, 'বা, এইরকম প্রচলিত বলে ভালো লাগছে!'

*ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী (১৯৬১)*

মিত্র ও ঘোষ

পাড়ার একটি ছেলে, কী যেন নাম ছেলেটার, বেশ ভাল লাগে ছেলেটিকে। কী যেন করে। বাড়িতে ডেকে এনে অনেকক্ষণ গল্প করে, তারপর এগিয়ে দিতে রাস্তায় নেমে অধিক রাতে তাকে বলি,'তোমাকে না ডেকে আনলে আজ হয়ত লিখতুম।'

'আপনার লেখা হল না!' দুঃখ করে সে বলে।

'কিন্তু আমি যে এতক্ষণ নদীতীরে বসে রইলুম?'

'নদীতীরে?'

'নদীতীরে। একটা পাল-তোলা নৌকো ছিল।'

আমি বলি, 'ওপার ছিল।'

'?'

'হ্যাঁ; তুমিই তো আমার নদী। আমি যে নদীর ধারে বসেছিলুম।'

'কিন্তু আমি তো বঞ্চিত হলুম আপনার লেখা থেকে।'

'তাতে আমার ক্ষতি হল না।'

'কিন্তু আপনার একটা দায়িত্ব তো আছে পাঠকের প্রতি?'

'আর আমার নিজের প্রতি বুঝি কোনও দায়িত্ব নেই?'

'আপনি খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে।' সে হঠাৎ বলে।

'হ্যাঁ।' হেসে তাকে আমি এবার জানাই, 'সুন্দর ব্যবহার আমার যে সবচেয়ে প্রিয় তার সঙ্গে করব না কেন বল? আমার আত্মা যা চায় আমি তাই করেছি। আমি লিখিনি। আমি লিখতে চাইনি। আমার আত্মা আজ চায়নি। আমি তাই আজ লিখিনি। যে তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে সে তার আত্মার সঙ্গে তা করতে পারে না কেন বলো? আসলে তোমার চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করেছি আমি আমার সঙ্গে। না লিখে।'

ঠিক এই সময়েই আকাশ থেকে আমার মাথার ওপর, শুধু আমাকে ঘিরে, পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। ছেলেটা অবাক হয়ে কী যেন বলল, আমি শুনতে পাইনি। পুষ্পপাতের শব্দ বৃষ্টির তুলনায় কিছু বেশিই।

মনে হয় সে বলেছিল 'লিখতে খুব কষ্ট হয়, না?' অন্তত, সে-রকম মনে করেই আমি তার দিকে চেয়ে সম্মতিসূচক হাসি।

নদীতীরে। পুজো সুভেনিয়ের
পুরনো লেখা, সময় জানা যায়নি

# গল্পসমগ্র

## প্রথম খন্ড

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

অদ্রীশ বিশ্বাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উ ৎ স র্গ

ডা. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
তোমাকে কি ডা. হুবিনাল উরবিনোর* সঙ্গে
তুলনা করতে পারি?

* গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের
'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম' উপন্যাসের
নায়ক। —সম্পাদক

# সম্পাদকের নিবেদন

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এযাবৎ গ্রন্থভুক্ত গল্পের সংখ্যা ৬২। তিনি মনে করেন যে কোনও লেখককে চিনে নেওয়ার জন্য এই সংখ্যাটাই যথেষ্ট। তবু এই গল্পসমগ্রর প্রথম খন্ড তৈরি করতে গিয়ে তাঁর নানা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সামনে ও পিছনে বহু গল্প, সংযোজিত হয়েছে। তিনটি পর্বে বিন্যস্ত এই গল্পগুলির মধ্যে প্রথম পর্বে রয়েছে ইদানিংকালের দশটি গল্প। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি আর তৃতীয় পর্বে রয়েছে অগ্রন্থিত পুরনো গল্প, অবশ্যই যা খুঁজে পাওয়া গেছে।

তৃতীয় পর্বের গল্প সংখ্যা অল্প হলেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সেই আমলের পত্রিকা জাতীয় গ্রন্থাগার ও নানা পুরনো গ্রন্থাগারেও যথাযথভাবে সংরক্ষিত নয়। ফলে, বহু চেষ্টাতে যা খুঁজে বের করা গেছে, হয়তো তার চেয়ে বেশি লুকিয়ে রয়েছে খ্যাত-অখ্যাত বিভিন্ন পত্রিকায়।

দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি গ্রন্থ-নির্ভর। প্রথম দুটি গল্পগ্রন্থ—'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' এবং 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য'-র প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ হয়নি। দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে কাজ করতে হয়েছে। 'আট বছর পরে একদিন' গল্পটি 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'-র দ্বিতীয় সংস্করণে 'দশ বছর পরে একদিন' ছাপা হয়েছিল। 'কাউন্টার পয়েন্ট' গল্পটি 'পঞ্চাশটি গল্প'-এ 'একটি বিদেহী গল্প' নামে ছাপা হয়। এই সংগ্রহে 'আট বছর পরে একদিন' এবং 'কাউন্টার পয়েন্ট' নাম দুটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সূচিপত্রে গল্পগুলি গ্রন্থ রূপে প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে ছাপা হয়েছে। একই গল্প যখন পরবর্তী গল্পগ্রন্থগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তখন সেগুলো আর উল্লেখ করা হয়নি। যদিও এই সমস্ত তথ্য গ্রন্থ-পরিচিতিতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

গল্পের প্রকাশকালের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই নানা ধরনের সেকেন্ডারি সোর্সের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, সবসময় মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যেখানে পত্রিকায় নাম ও প্রকাশকাল ছাপা হয়েছে, সেগুলি নির্ভরযোগ্য।

গ্রন্থ-পরিচিতিতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সন্দীপনের গল্পগ্রন্থ ও গল্প সম্পর্কে নানা ধরনের মূল্যায়নের একটা নমুনা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। কয়েকটি সাক্ষাৎকারের অংশ অন্তর্ভুক্ত করার কারণও একই। সমস্ত মতামত প্রধানত গল্প-কেন্দ্রিক। তাই, সামগ্রিকভাবে সন্দীপনকে চেনবার জন্য কারো কাছে হয়তো প্রয়োজনীয় মনে না-ও হতে পারে। আবার কারো কাছে হয়তো এগুলিই সামগ্রিক পরিচয়ের ইশারা।

এই গল্পসমগ্র প্রস্তুতিতে যাঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই:

সন্দীপ দত্ত, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত ঘোষ, সৌম্যেন পাল, মউ ভট্টাচার্য, প্রবীর চক্রবর্তী, জাতীয় গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র।

অদ্রীশ বিশ্বাস

# চেতনা আর অস্তিত্ব

শঙ্খ ঘোষ

'একক প্রদর্শনী' যখন বইয়ের চেহারায় বেরোল, ১৯৭১ সালে, উপন্যাসের শেষ লাইনটাকে সন্দীপন ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর বইয়ের শুরুতেও, ক্ষীণ একটা ভূমিকার মতো। লাইনটা ছিল: 'আপনাদের যাঁদের গল্পটা ভাল লাগল তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে আমাকেও ভালবাসুন, কেননা, আমি ও আমার গল্প একই। নমস্কার।' 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' আর 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী'র পর সে ছিল বোধ হয় সন্দীপনের তৃতীয় বই, অনেকে যখন নাকি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে তিনি একেবারে ফুরিয়ে গেছেন।

প্রত্যেকটি শব্দে, প্রত্যেকটি যতিচিহ্নে, কোনও গদ্যলেখকের এত অন্তর্লীন মমতা খুব কমই দেখা যায়, সন্দীপনের যেমন। সেইজন্য, বইটির মধ্যে 'আপনাদের' আর 'ভালো লাগল' কথাদুটোর পরেও যে বাড়তি দুটো কমা ছিল, তাঁর কথার মধ্যে প্রত্যাশিত থমক-লাগা ছন্দটা যে তাতে খুলছিল ভাল, ভূমিকায় সেটা মুছে দিলেন কেন, এ নিয়ে মনে মনে ভেবেছিলাম কিছুদিন। তারও চেয়ে বেশি ভাবনা হয়েছিল আরেকটা কারণে। ওই বই সেদিন আমাদের উপহার দেবার সময়ে (১৮/৬/৭১) তাঁর স্পষ্ট এবং খরতাময় অক্ষরের হাতের লেখায় বাড়তি একটা শব্দ সন্দীপন জুড়ে দিয়ে-ছিলেন মুদ্রিত ওই ভূমিকাটুকুতে। 'আমি ও আমার গল্প একই' বাক্যাংশে 'একই' শব্দের আগে লিখেছিলেন 'কতকটা'। অর্থাৎ 'আমি ও আমার গল্প কতকটা একই'। শব্দটা হঠাৎ জুড়তে হল কেন? এই নিয়ে একটু ভাবনায় পড়েছিলাম আমি। এটা কি এ-রকম কোনও ভয়ে যে, যাকে আমরা খবরের কাগজের সত্য বলি, তার সঙ্গে এটাকে আমরা সম্পূর্ণ মিলিয়ে ফেলতে পারি হয়তো-বা, এই 'কতকটা'র প্রহরা না থাকলে? 'আচ্ছা, লাহিড়ীকে কবে আপনি ঘুষি মারলেন?' এ-রকম একটা অবোধ প্রশ্ন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারি কোনওদিন, এমন কোনও ভয় থেকেই কি? না কি ওই 'কতকটা' তাঁর 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী'র ভূমিকার মতো বলতে চায় যে 'বদ্যিবাটিকে শ্রীরামপুর ও শকুন্তলাকে মণিমালা করার অপরাধে ওটা যদি গল্প হয়ে গিয়ে থাকে, মনে করি কিছুটা হয়েছেও, তাহলে ওরকম আর কখনো করব না'?

কারণ যাই হোক, এতদিনে সবাই জেনে গেছেন যে 'কতকটা'র ওই প্রহরার আর দরকার হয় না এই লেখকের, অলজ্জভাবে তিনি নিজের কথাই লেখেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে, 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' বা 'কলকাতার দিনরাত্রি'তেই শুধু নয়, অন্যত্রও। একই তিনি বার বার ফিরে আসেন তাঁর লেখায়, নামটা কখন অরুণ হবে কখন নিখিল হবে কখন অংশু হবে, সে আলাদা কথা। তাঁদের এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোথায় তাঁরা পুরোনো লেখকদের থেকে ভিন্ন। গিন্‌স্‌বার্গ বলেছিলেন, সাহিত্যকে কীরকম হতে হবে এ নিয়ে একটা অগ্রিম ধারণা তৈরি করে নিয়ে লিখতে বসেন অনেকে; কিন্তু তাঁরা লেখেন, তিনি যেমনভাবে আছেন ঠিক তেমন। যে-রকম ভাবে বেঁচে আছি সেইটাকে দেখানোই হল আমার লেখা, আমিই আমার লেখা: এইখান থেকেই শুরু করেন সন্দীপনও। কিন্তু এই আমি তো দৈনন্দিনের আমি হয়েও ঠিক দৈনন্দিনের আমিই নয়। যাপনের সঙ্গে চেতনার একটা

মেলামেশায় সব সময়েই সে আলাদা একটা চেহারা ধরতে থাকে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সাহচর্য বা তাঁর সান্নিধ্য, তাই, হয়ে ওঠে বিশেষ একটা অভিজ্ঞতার মতন। একটা সময়ে, ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ সালের পর্বটা প্রধানত, এই অভিজ্ঞতা ছিল আমার একটা গর্বের বিষয়।

২

শ্যামবাজারে পাঁচ রাস্তার কাটাকুটির একেবারে কাছেই তখন থাকতাম। সন্দীপন তখন বরানগরে। খুব নিয়মিতই এসে পৌঁছোতেন অনেক রাতে, কখনো-বা সকালেও; একাই বেশির ভাগ, কখনো-বা তরুণ দু-একজন সঙ্গী নিয়েও। আসতেন, বলতেন তাঁর কথা, আর সবিস্ময়ে ভাবতাম (এখনও ভাবি) কীভাবে এ সম্ভব যে একজন মানুষ প্রত্যেকটি বাক্যই বলছেন যা সচেতন আর সুশৃঙ্খল? সুন্দর কথা বলতে যা বোঝায়, তা এ নয়। সাধারণ অর্থে শিল্পায়িত কথা বলতে যা বোঝায়, তাও এ নয়। কিন্তু, গলার স্বরে, শব্দের মোচড়ে, আর দেখার নিজস্বতায় কারও দৈনন্দিনের প্রত্যেকটি উচ্চারণ হয়ে থাকছে যেন সংরক্ষণযোগ্য, সাহিত্যসমাজে এ-রকম অভিজ্ঞতা বেশ বিরল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, এই একজন মানুষ, যিনি প্রত্যেক মুহূর্তটাই বেঁচে আছেন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁর নিজের মতো করে সেই বাঁচাটাকে, অর্থাৎ সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁর লেখাটাকে। ওই 'একক প্রদর্শনী'র মধ্যেই যেমন ছিল: 'সত্যি, বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে জীবনের কোনও তুলনা হয় না কি? জীবন মানে অবশ্য শুধু, জাস্ট, বেঁচে-থাকার কথা বলছি, কোনও দর্শনটর্শন নয়।....লোকে এটা ভুলে যায় কী ক'রে, আশ্চর্য যে, সে বেঁচে-থাকা অতি সার্বভৌম ও যার-পর-নেই স্বাধীনভাবে স্বয়ং পছন্দ করেছে বলেই বেঁচে রয়েছে।' দর্শনটর্শনকে, ওই ফুটকি-দেওয়া অংশে, যদিও ফেরেব্বাজি বলে ঘোষণা করেছেন অরুণ চক্রবর্তী (তথা সন্দীপন), বলতে চেয়েছেন 'আরে-বাবা, বেঁচেছিলিস তো আজ সারাটা দিন', তবুও, এঁরা অবশ্যই জানেন স্বাধীন-পছন্দে-বেঁচে থাকার এই কথাটাও ঘোর এক দর্শন, আর সেই দর্শনেই এঁদের ভাবনা (অর্থাৎ এসব জীবন) আদ্যন্ত আছে জড়ানো। প্রশ্নটা শুধু এই যে স্বাধীন সেই পছন্দ থেকে বেঁচে থাকাটাকে কোন্ মূর্তি দিতে চাইছেন এই লেখক।

তাঁর প্রতিমুহূর্তের বেঁচে-থাকা আর রচনাশীলতার অনেকটা অংশ লক্ষ করবার একটা সুযোগ আমার ঘটেছিল সেই সময়ে। একদিন যেমন এসে জানালেন পথে-ঘটে-যাওয়া এক হতে-পারত বিপদের কথা। ট্রামের মধ্যে বিব্রতকারী একজনকে বলে ফেলেছিলেন 'দাদা কি হাইকোর্ট দেখেছেন?' সে তখন ভয়াবহ গলায় বলে 'নেমে আসুন'। 'কেন বলুন তো?' 'কারণ আপনার দাঁতগুলো আমি খুলে নোব।' তার উত্তরে 'কেন, দাদা কি দাঁতের ডাক্তার' বলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির রোল উঠল ট্রামে। জানতাম যে এই গল্প আমি শুনবার আগেও শুনেছেন নিশ্চয় আরও কেউ কেউ, এবং অবশ্যই শুনবেন আরও অনেকে, আর এও জানতাম যে বলাটার মধ্যে পুরো একটা গড়ন এসে গেলে অচিরেই তাকে দেখতে পাব কোনও লেখায়, কেননা জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাকেই তো ছেড়ে দেন না তিনি। হ্যাঁ, মিলেও গেল কিছুদিনের মধ্যে, তাঁর 'একক প্রদর্শনী'তে।

মনে আছে, নিয়মিত তাঁর প্রীতিপ্রদ আবির্ভাব হঠাৎ থমকে গেল একবার বেশ কদিনের জন্য। এর-তার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে গুণ্ডাদের হাতে আহত হয়ে আছেন, স্ফারিত মুখচোখ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা, আসতে পারছেন না তাই। শুনে, তাঁকে দেখতে যাব বলে ভাবছি যখন, ঠিক তখনই, স্বল্পব্যাণ্ডেজে চিহ্নভরাট মুখে এসে

পৌঁছোলেন এক সকালে। 'কী কাণ্ড, কী করে হলো এ-রকম?' জিজ্ঞেস করতেই সন্দীপন সবিস্তারে বললেন গভীর রাতে কটি যুবকের হাতে তাঁর আক্রান্ত হবার বিবরণ। অল্প পরেই আমার স্ত্রী ঢুকলেন ঘরে। অতিথির মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে জানতে চাইলেন তিনি: 'এ কী? কী হলো আপনার?' 'আর বলবেন না প্রতিমাদি! সেদিন রাত্রে....', আবারও বললেন ওই গল্প। কথা শেষ হতে-না-হতেই আমাদের বড়ো মেয়ে ঘরে ঢুকে বলল: 'আরে, সন্দীপনকাকু, এ কী করেছ? কী হলো তোমার?' সন্দীপন তখন আর একবার বললেন গল্পটা।

প্রায় এক নিঃশ্বাসে, পরপর তিনবার, একই ঘটনার কথা বিরক্তিহীন বলছিলেন যখন তিনি, তিনটে আশ্চর্য প্রবণতা আমি লক্ষ করছিলাম তখন। বলতেও তো পারতেন, সে এক কাণ্ড, শুনে নিস তোর বাবার কাছে (বা মায়ের কাছে)? কিন্তু না, তেমনভাবে এড়াতে চাইছেন না মোটেই। বলতেই যেন চাইছেন, আর বলে একটা আনন্দও যেন পাচ্ছেন কোথাও। দ্বিতীয় কথাটা হল, একই বৈঠকে একই ঘটনার এই তিনটে বিবরণ, এরা যে একেবারে সম-সূত্রেই চলছিল তা নয়। এক-একজনের কাছে গল্পটা কেঁপে যাচ্ছিল এক-একভাবে, বেঁকে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম গ্রহণবর্জনের ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে। তাই অনেক পরে, 'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' বইটির মধ্যে এ-ঘটনার দুবার দু-রকম বিন্যাস দেখে আর অবাক লাগেনি। রাত একটার পর দমদমগামী শেয়ারট্যাক্সিতে ইন্দিরা গান্ধির মিটিংফেরত কয়েকটি যুবা তুলে নেয় রানাকে, কিন্তু 'কেন যে তারা শেষাবধি তার নাক-মুখ অমন করে ভেঙে দিয়েছিল, সে বলতে পারে না'—উনিশ পৃষ্ঠায় একথা লিখবার পরই উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় লিখতে পারবেন তিনি: 'ঐ মন্তব্যের কারণেই নাক-মুখ ভেঙে দিয়ে তারা রানাকে এস্টেটের গেটের সামনে ফেলে রেখে যায়।' 'কেন-যে খামোকা দুমদাম এ-সব আলফাল কথা বলে বসে রানা!'

আসল কথা, কারণটা এখানে সন্দীপনের কাছে অলংকরণের চেয়ে বেশি কিছু নয়; থাকলেও হয় না-থাকলেও ক্ষতি নেই, মূল কথাটা হল ওই 'নাকমুখ ভেঙে'-যাওয়া অবস্থান। নিজের সেই অবস্থানটাকেই দেখছেন তিনি বিশেষ করে, আর তা দেখছেন তাঁর আর আমাদের সকলেরই দৈনন্দিনের একটা চিহ্ন হিসেবে। আর সেইজন্যেই দেখা দিচ্ছিল তাঁর সেদিনকার ওই গল্প বলবার তৃতীয় প্রবণতাটা। সেটা এই যে, তিনি নিজের কথাই বলছেন, কিন্তু বলছেন না ঠিক নিজের কথা। নিজের থেকে কোথাও আলগা করে নিয়েছেন নিজেকে। ঘটনার মধ্যে নির্যাতিত ওই সন্দীপনকে যেন দেখে নিতে চাইছেন সচেতন প্রতিবেদক সন্দীপন, কখনো তাঁদের মধ্যে চকিত যাওয়া-আসাও চলছে, চলছে ঈষৎ স্থানবিনিময়ও, আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভব হচ্ছে লেখক সন্দীপনের। আরব গেরিলাদের তখন সমর্থন করছেন তিনি।

'আমি তো দেখি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আর একজন কে আমার মধ্যে ঢুকে পড়ে' এইরকম একবার লিখেছিলেন তিনি 'রুবি কখন আসবে' বইটিতে। আমি, আবার আমার মধ্যে আরেকজন, সেও আমি: এদের ভিতরকার পারস্পরিক চলাচলের আলতে অথচ চমকপ্রদ একটা ছবি আছে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'অংশু সম্পর্কে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি'র মধ্যে। অস্তিত্ব আর চেতনার কথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, সেই গল্পে, 'আমার ও অংশুর জন্ম হয়েছিল ২১ নভেম্বর, ১৯৩৪ সালে, ৪টে ৩৫ মিনিটে বলবার পরেই এই কথাটা চলে আসে যে 'শুরুতেই কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারেন আমার জন্ম হয় আরও কবছর পরে।'

কিন্তু এ নিয়ে কোনও তর্কাতর্কির মধ্যে তিনি যেতে চাননি। তাঁর সেই যাওয়া-না-যাওয়াটা বড়ো কথা নয়, এখানে বড়ো কথা হল এ-দুয়ের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা, গোটা গল্পের বাক্যব্যবহারে এ-দুয়ের ছায়া-আবছায়াকে একত্র জড়িয়ে নেবার পদ্ধতিটা লক্ষ করা, আর এও লক্ষ করা যে চেতনা কীভাবে দেখছে অস্তিত্বকে। আর সেটা লক্ষ করতে পারলে, সন্দীপনের সান্নিধ্যে, তাঁর প্রতি-মুহূর্তের সৃষ্টিশীলতাকে খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

৩

একটু আগে বলেছি, তাঁর সান্নিধ্য ছিল প্রীতিপ্রদ। কিন্তু বলিনি তখন যে সেই একইসঙ্গে তাঁর সাহচর্য—অন্তত আমার পক্ষে ছিল অনেকখানি ভীতিপ্রদও। কেননা নিজেকে উদ্‌ঘাটন করতে করতে যখন তিনি কথা বলেন, অত্যন্ত দীনতার ত্রস্ততার বা এমনকী উপহাস্যতার একটা ভঙ্গি যখন আরোপ করে নেন নিজের চাল-চলনের ওপর, তখন, সেই একইসঙ্গে তাঁকে তো লক্ষ করতে হয় তাঁর নিকটতম প্রতিবেশ, সেই প্রতিবেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বা সম্পর্কহীনতা। ফলে, নিজেই তিনি তাঁর লেখার বিষয় হলেও তিনি তো লক্ষ করে যাচ্ছেন আমাকেই, অর্থাৎ আমাদের সবাইকেই, বিশেষ একটা ক্ষয়ে-যাওয়ার গণ্ডির মধ্যে যারা কোনওরকমে বেঁচেবর্তে আছি, নানারকম মুখোশ পরে। তখন ভয় হয় যে আমি, আমার আচরণের খুঁটিনাটি, মুখোশহীন তার অন্তঃসারশূন্যতা এবং হাস্যকরতা, এগুলিকে তিনি তুলে নিচ্ছেন তাঁর খরচোখে, আর এর সবটাই কোনও-না-কোনও অছিলায় উঠে আসবে তাঁর গল্পে, তখন আমি বা আমরাই হয়ে যাব সেই গল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয়। 'ছাল ছাড়নো মাংস, সে তো হুক থেকে সামনেই ঝুলছে। আমার জীবন। কাজেম মিঞার সঙ্গে লেখক হিসেবে আমার একটুও গরমিল নেই।' তাঁর 'রুবি কখন আসবে'র এসব লাইন মনে পড়ে যায় বলেই, তাঁর সামনে কিছুক্ষণ থাকলে, নিজেকেও হঠাৎ হুক থেকে দোদুল্যমান দেখতে পাবার একটা ভয় হতে থাকে সবসময়।

কেবল যে 'রুবি কখন আসবে' উপন্যাসের মধ্যে তা নয়, সন্দীপনের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই—কখনো তার ভূমিকায়, কখনো লেখারই শরীরে—ফিরে ফিরে আসে তাঁর লেখার বা তাঁর দেখার এই প্রকৃতির কথা, বা অন্যভাষায় বলা যায়, তাঁর দর্শনের কথা। বস্তুত, আমাদের সমকালীন (বা আগে-পরেও) আর কোনও লেখককেই জানি না, যিনি এত প্রত্যক্ষভাবে নিজস্ব ভাবনার মূল-বিন্দুটাকে এত বারবার ধরে দিয়ে যান লেখারই মধ্যে, সন্দীপন যতটা করেন। দুয়েকবার হয়তো সরাসরি তিনি ব্যবহার করেন গদার-এর মতো অন্য কারও কথা, 'Perhaps reality has not yet appeared before anybody as yet' কথাটা দিয়ে যেমন শুরু করেছিলেন 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা'। আমাদের যাদের জ্ঞান নেই বলে প্রেম নেই ('জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই': জীবনানন্দ), বন্ধুতা নেই, শ্রদ্ধাভক্তি বিশ্বাস কিছু নেই, যারা মৃত্যু ছাড়া কোনও কিছুকেই অধীশ্বর বলে মানি না, আমরা যারা তবু বেঁচে থাকতে চাই, আমরা নরনারী যারা পরস্পরকে যৌন প্রহার করে বেঁচে থাকতে চাই তবু, জন্মমুহূর্তের সেই শৃঙ্খলিত করজোড়ের এক ছবি দিয়ে সন্দীপন শুরু করেছিলেন তাঁর কথা বলা, 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'র ভূমিকায়, এবং আজও পর্যন্ত সেইটেই তিনি করে চলেছেন আবর্তনময় এক তীব্রতায়। 'the life is but a perennial seasaw' এই উদ্ধৃতি ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে, আর, কিছুমাত্র ইতস্তত না করে সমস্ত জীবনভাবনাটাকে তিনি ধরে দেন একটা প্যারেব্‌ল্‌-এর মধ্যে: 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন'। ছোটো ওই লেখাটা পড়বার পর হয়তো কাফ্‌কার কোনও কোনও তুলনীয় প্যারেব্‌ল্‌ মনে পড়তে পারে কারও। এ-লেখাতে সন্দীপন খুব সংগতভাবেই ঘোষণা করে দেন যে তাঁর 'গল্প একটাই। আর সেটা নিয়েই আমি সব গল্প

লিখি, যদিও সেই মূল গল্পটি নেহাতই শিশুপাঠ্য।' কী সেই গল্প? বেড়ালের হাঁমুখের মধ্যে ঢুকেপড়া একটা ইঁদুর। এমন নয় যে বেড়াল নিজের ইচ্ছেয় খেতে পারবে ওই ইঁদুরকে, ছুটির ঘণ্টা বাজলে অন্ধস্কুলের ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসবে যখন, অজ্ঞাতে যদি তাদের মধ্যে কেউ কখনো ল্যাজ মাড়িয়ে দেয় বেড়ালের, কেবল তখনই সে ইঁদুরটাকে খেতে পারবে আচমকা, তা নইলে নিজের উদ্‌যোগে খেতেও তার আলস্য। এই হচ্ছে অসাড় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় হতচকিত জীবন তথা শৃঙ্খলিত করজোড়ের ছবি। এই হচ্ছে ১৯৬১-তে ছাপা 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' থেকে শুরু করে ১৯৯০ সালে লেখা 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন' পর্যন্ত ভাবনার বিস্তার। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'র ভূমিকায় ছিল একদিন সুস্থ শরীরে ঘুম থেকে উঠে আয়নায় দেখা 'ঠোঁটের কোণে একবিন্দু শ্বেতি যা মৃত্যু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত, ছড়িয়ে পড়বে আমাদের শরীরময় সমস্ত জীবনে', আর উত্তরোত্তর সেই শ্বেতিই ভয়াবহ কুষ্ঠের চেহারায় ফিরে আসবে তাঁর এই শেষ কয়েক বছরের একাধিক গল্পে: 'এখানেই একটু একটু করে আমরা পচে, গলে, খসে পড়ব। আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর সীমারেখা ক্রমে মুছে যাবে।' এখানে, এই নিরর্থ জীবনের সামনে তাই আহ্বান শুধু 'এসো মরো; মরে, একই কবরের মধ্যে পাশাপাশি শুয়ে দু'জনে বাঁচি এস। এস কাগজ পড়ি; এস রেডিও শুনি; চা খাই আর ক্যালেণ্ডার ছিঁড়ি, জামাকাপড় খুলি আর জামাকাপড় পরি; এস দাঁত মাজি আর কুলকুচো করি—'। আর তাই, অনপনেয় এক শূন্যতাবাদ; তাই 'সমাজ, জীবন এবং প্রকৃতিকে লক্ষ্য, পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করার বদলে সে ক্রমেই হয়ে উঠতে থাকে আত্মসর্বস্ব নার্সিসাস'। লেখার মধ্যে 'দেশ, জাতি, সময়, ইতিহাস' ঢুকে পড়াটাকে তাই মনে হয় নিছক পরিহাসের বিষয়। এই হল তাঁর একটাই সেই গল্প।

৪

শুধু সন্দীপন কেন, সব লেখকই তো মূলত একটাই গল্প লেখেন। কিন্তু সেই 'একটাই গল্প'র চারদিকে নানারকম অবস্থান, নানারকম সম্পর্ক, এবং সেই অর্থে নানারকম রং ফুটতে থাকে 'একটা'কে এক কেন্দ্রের মধ্যে রেখে, বাইরের দিক থেকে অনেক রকমফের হতে থাকে লেখার। কিন্তু সন্দীপন, অত্যাশ্চর্য অভিনিবেশে, এই 'নানারকম'-এর কাছ থেকেও দূরবর্তী রাখতে পারেন নিজেকে, শুধু কেন্দ্রটাকেই নিয়ে অবিরাম খেলা করতে পারেন তিনি অবিচল দক্ষতায়। একটা লেখায় তিনি বলেছিলেন বটে যে ব্ল্যাকবোর্ড মুছতে মুছতে তিনি লিখেছেন: 'আমার এক হাতে খড়ি, অন্য হাতে ডাস্টার। আমার কোনটা সত্যি? খড়ি না ডাস্টার?' কিন্তু একদিক থেকে ভাবতে গেলে, এই ডাস্টারটা সত্যিই তাঁর কাজে তত আসে না, আর সেইজন্যেই একই চরিত্র একই অবস্থান একই বাক্য একই শব্দবন্ধ থেকে-থেকে ঘুরে আসতে থাকে তাঁর লেখায়, আর এরই কিছু কিছু হয়ে ওঠে পরবর্তীদের উপর তাঁর প্রভাবমুদ্রার কয়েকটা সহজলভ্য উপাদান। 'তো' দিয়ে বাক্য শুরু করা, 'ভাবা যায়'-এর বিস্ময় প্রকাশ, 'হেসে তাকে বলার, এটা ভুল' কিংবা 'ঠিক বলা হয় না, বেশ ভুলই বলা হয়ে যায়' 'মিথ্যে না বলতে কী' 'মানুষের কী যে মনে পড়ে আর কী যে মনে পড়ে না' -জাতীয় বাক্যবন্ধ, 'উত্তর কলকাতা ভাবাবেগে ভরা' বা 'পিকদানিতে সিগারেটের অগ্নিমুণ্ড চেপে ধরা' এসব একবার শুরু করলে সন্দীপন আর ছাড়তেই চান না তাকে, ফিরিয়ে আনেন বারে বারেই। তাঁর প্রেমিকাদের গলা সব সময়েই 'হাস্কি' আর ঠোঁটে থাকে 'পাউটিং'—কেননা সেটাই তাঁর বিবেচনায় পাগলকরা এবং যৌন আবেদনময়—বউ-এরা প্রায়ই বাঁজা কিংবা যন্ত্র, অল্পবয়সী মেয়েরা অনেক সময়েই শুয়ে থাকে 'বহুভর্ৎসিত ভঙ্গিমায়'। কোনও কোনও বইকে তিনি ভুলতে পারেন না কখনোই বা

ভুলতে দেন না তাঁর পাঠককে, কাম্যুর 'আউটসাইডার' বা উনামুনোর 'দি ট্রাজিক সেন্স অব লাইফ', 'ডন কিহোটে'ও কখনো কখনো (কুইকজোট লিখলেই বা ক্ষতি কী, ঠিক আগেই যখন আছে সার্ভেন্টিস), বা ডস্টয়েভস্কি বা ড্যুরেনমাটের নাম। এবং এসব উল্লেখ, তিনি বুঝতেই দেন আমাদের, নিছক অলংকরণ হিসেবে আসে না, আসে তাঁর বিষয়ের সঙ্গে বেশ একটা অন্তঃসংগতি রেখেই। এসব নামের ইশারা যদি নাও রাখতেন, বুঝতে কোনও অসুবিধে হতো না যে সন্দীপন হলেন আমাদের সময়ের একমাত্র ইওরোপ-মনস্ক লেখক। এ নিশ্চয় কোনও আচমকা কাণ্ড নয় যে ১৯৬২ সালে লেখা এক প্রবন্ধকে সন্দীপন তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্প'র (১৯৯৩) ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করেন, যে ভূমিকায় ঘোষিত থাকে এই আলংকারিক জিজ্ঞাসা: 'বাংলাদেশের অতি আধুনিক সাহিত্যও কি ইউরোপের ঐতিহ্য থেকে জন্মাতে পারে না....?' জীবনানন্দের কাব্যভাষা, তাঁর মতে, এদেশের ছিল না। আর 'বাংলাদেশের কোন্ ঐতিহ্য থেকেই বা পুতুলনাচের ইতি-কথার মতো অস্তিত্ববাদী উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল?' এই হল তাঁর প্রশ্ন।

বস্তুত, স্বদেশনিরপেক্ষভাবেই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ঢুকে পড়তে চায় আধুনিক এক সময়ের মধ্যে—সেই সময়ের মধ্যে, যেখানে সূচনায় হয়তো 'কিছুটা দুঃখ ও কিছু বেদনাবোধ অবশিষ্ট ছিল', কিন্তু তাঁর গল্পের সাধনবাবুর মতোই যেখানে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঠেলে দেয় 'সব মূল্যবোধের বাইরে' 'বেঁচে-থাকার এক বড় দীন চরিতার্থতায়', তাঁকে করে দেয় একেবারে 'আউটসাইডার'। সেই ভূমি থেকে তিনি দেখেন শুধু 'আমি শুয়ে আছি একটা উঁচু বিছানায়। অদূরে নিশ্চিত মৃত্যু। এর বাইরে, এতদ্ব্যতীত, এ-ছাড়া আমার আর কোনও সত্যতা নেই।' এবং সেইজন্য, একাধিক রচনায়, কয়েক অনুচ্ছেদ পর পর, তিনি ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনেন এই ধুয়ো 'ওহো, ক্লান্তিকর' 'ওহো, বিরক্তিকর'। তাঁর কোনও অপেক্ষা নেই, কেননা অপেক্ষা থাকে শুধু ততদিন যতদিন কোনও আদর্শ থাকে, আশা থাকে। তাঁর 'আদর্শ বলতে শুধু জাস্ট বেঁচে থাকা, এই আর কী। আশা বলতেও তাই। এছাড়া কারই-বা কী থাকে। বাকিটা সিনেমা।'

৫

জীবনকে দেখবার এ একটা পদ্ধতি, সন্দেহ নেই। আধুনিক সময়ে অনেকেই ভেবেছেন এভাবে। যে-পৃথিবীতে কোনও মায়া নেই, আলো নেই ('কোনও কান্তিময় আলো/চোখের সমুখে নেই যাত্রিকের': জীবনানন্দ), মানুষ সেখানে নিজেকে দেখে এক অপরিচিত আগন্তুক হিসেবে, বলেছিলেন কাম্যু। অনিবারণীয় এক নির্বাসনে সে আছে, হারিয়ে-যাওয়া দেশেরও কোনও স্মৃতি নেই তার, তার সামনে নেই কোনও আশা, মনে হয়েছিল তাঁর। মানুষ আর তার জীবনের মধ্যে এই বিচ্ছেদ, অভিনেতা আর তার মঞ্চপরিবেশের এই বিচ্ছেদ, এর থেকেই তৈরি হয়ে ওঠে নিরর্থকতার জগৎ, জীবন পৌঁছোয় শূন্যতায়। কাম্যুর মতো তখন সন্দীপনও তাঁর 'মাতৃস্তোত্র' লিখতে চান এই-ভাবে: 'মহীন এখনো জানে না, তার মা মারা গেছেন, না মরণাপন্ন। এই মুহূর্তে লেকটাউনে তার মা নারায়ণী দেবীর মৃতদেহ পড়ে আছে—তথ্য হলেও এটা কিছুতেই সত্য হতে পারে না, কেননা, এখনো তো কেউ তাকে বলেনি যে তোমার মা মারা গেছেন।' আর তারপর মহীন চলে যায় তার প্রেমিকার আহ্বানে প্রেস ক্লাবে, হুইস্কি-হাতে চলতে থাকে তাদের প্রণয়কথার রোমন্থন এবং 'মা সম্পর্কে সেই দুপুর থেকে কোনও-কিছুই মনে পড়েনি, কোনও ঘটনা বা দার্শনিকপ্রতীতি কিছু।' বিস্ময়ের নয় যে ও-গল্পের শেষে মহীনের মনে পড়বে 'দি স্ট্রেঞ্জার' (বা 'দি আউটসাইডার')-এর সূচনাটুকু: 'টু-ডে মাদার ডায়েড। অর্, ইট মাইট

বী ইয়েস-টারডে। আই ডোন্ট নো হোয়েন।'[১]

কিন্তু ১৯৪২ সালে ও-বই ছাপা হবার বছরদশেক পরে (১৯৫৩) এই কাম্যুই জানিয়েছিলেন যে মানুষ আর তার ইতিহাসের সাধারণ অস্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি তাঁর লেখায়, নিজেদের আর অন্যদের সামূহিক পচনের বিরুদ্ধে দাঁতে-দাঁত চাপা লড়াইটার কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। শিল্পসাহিত্যের বিষয়ে মার্কসবাদের সরল বিভাজনের সমর্থন করতে পারেননি বটে, কিন্তু তিনিও চেয়েছিলেন জীবনব্যাপারে দুই বিপরীতের সংর্ঘষ ('টেনশন') দেখাতে, 'I measure the greatness of an artist (Moliere, Tolstoy, Melville) by the balance he managed to maintain between the two' বলেছিলেন কাম্যু।

জীবনকে দেখবার এই ভারসাম্যটিকে কিন্তু ছুঁতে চান না সন্দীপন, তাঁর দৃষ্টি একেবারে অটলভাবে একাগ্রতাময়। একটি লেখায় তাঁর নায়ক ভাবছিলেন যে কিছুই আর আগেকার মতো সরল নেই এখন, এখন 'কামের গর্তে ঢুকে পড়েছে শোক, শোকের গর্তে ক্রোধ (বোলতার চাক যেন)—মৌলিক অনুভূতিগুলি এ-ওর গর্তে ঢুকছে আর বেরচ্ছে।' এই নিবিড় আর সত্য পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে আমাদের কখনো মনে হয় যে নিরাশার মধ্যে আশা, আশারও মধ্যে নিরাশা কি ও-রকমই প্রবিষ্ট নেই পরস্পরে, শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতা আর পূর্ণতার মধ্যে শূন্যতা যেমন? 'না-এলেই ভাল হতো' আর 'এসে যে গভীরতর লাভ হলো' এ-দুয়ের ওতপ্রোত আর অবিচ্ছেদ্য বুননে যেমন জীবনানন্দের কবিতা? সেই সংঘর্ষ-সমন্বয়- সংঘর্ষের অবিরলতায় জীবনকে দেখতে না চাইলে অনেকটা একপেশে হয়ে পড়ে না কি দেখা? আর তখন, কাম্যুর কাছাকাছি এসেও কাম্যুর প্রত্যাশিত ওই 'balance' থেকে সরে যেতে পারেন কেউ দূরে।

অথচ এরই মধ্যে, অনেক সময়ে আমি ভেবেছি, এমন আদ্যন্ত এবং ঐকান্তিক নষ্ট হয়ে থাকবার শ্বাসরোধী ক্ষতগুলি দেখাতে দেখাতেও সন্দীপন তার মধ্যে একটা খোলা হাওয়া খেলিয়ে দেন কী কৌশলে? এই একটা জগৎ, যা নোংরা করে দিচ্ছে রাষ্ট্রকে, মানুষকে, ভালোবাসাকে, এমনকী মৃত্যুকেও, চূড়ান্তরকমের অর্থহারা করে দিচ্ছে সব—তার কথা বলতে গিয়ে, হ্যাঁ, তারও কথা বলতে গিয়ে এমন-একটা অন্তঃশীল হাসির আবেগ জাগিয়ে রাখেন সন্দীপন, যা একেবারে তাঁর নিজস্ব। তাঁর একটা গল্পে ('দোলনা') ছিল 'হাসির হেমারেজে' কারও মাথা ভরে যাবার কথা। সন্দীপনের ক্রূরতম লেখার মধ্যেও কখনো-না-কখনো এই 'হাসির হেমারেজে' ভরে যায় পাঠকেরও মাথা, কোনও-একটা সময়ে হাসির দমক না চেপে তাঁর লেখা পড়ে ওঠাই শক্ত, যখন, সেই হাসিরই সঙ্গে বুকে জমতে থাকে একটা লাঞ্ছনা বা ভয় বা অসহায়তা। আর এটা তিনি করেন অবলীলায়, তাঁর চরিত্রগুলিতে নানাসময়ে নানা অষ্টাবক্র দশায় ফেলে দিয়ে একটু মজা দেখবার কায়দায়, হীন ভীতু আত্মসর্বস্ব চরিত্রগুলিকে কখনো কখনো ভাঁড়ের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে। 'রিক্তের যাত্রায় জাগো' উপন্যাসে যেমন একবার, স্ত্রীর হাঠাৎ আবির্ভাবে বিপন্ন গৌরব তার উলঙ্গ প্রেমিকাকে বাথরুমে সরিয়ে রেখে প্রায় সবটাই সামলে এনেছে যখন, স্ত্রী সুজাতা তখন বলে বসে হঠাৎ 'দাঁড়াও, একটু পরে। আমি একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।' এর পরে লেখকের বর্ণনাটা এইরকম: 'ওগো মা! মাথায় অ্যান্টেনা, মুহূর্তে একটা বরফের মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেল গৌরব। তার সারা গা দিয়ে হৈ হৈ করে

---

১ এটা লেখকের উদ্ধৃতি। স্টুয়ার্ট গিলবার্টের পরিচিত অনুবাদে লাইনগুলি একটু ভিন্ন: 'মাদার ডায়েড টুডে। অর্, মে-বি, ইয়েস্টারডে; আই কান্ট বি শিওর।'

ঠাণ্ডা বাষ্প বেরুতে লাগল। পায়ের পাতা দিয়ে গড়িয়ে জল ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেয়। মাথার অ্যান্টেনা থেকে "আমাকে বাঁচাও" এই শব্দ-বার্তা, আলো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। ব্রহ্মাণ্ডে।' গোটা এই বর্ণনার সূচনায় ওই 'ওগো মা' শব্দ- দুটি পালটে দিচ্ছে এর সমস্ত চরিত্র, আর এ-ব্যাপারে সন্দীপন একেবারে অদ্বিতীয়। কখনো কখনো আবার, তাঁর রচনায় যে ডন কুইকজোটের উল্লেখ আসে, বিশেষ একটা অর্থে তারও একটা চিলতে আভাস লেগে থাকে তাঁর লেখায়, কাল্পনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর কোনও কোনও উদ্ভট যুদ্ধে, গভীর রাতে গুণ্ডাদের সঙ্গে ডুয়েলের বৃত্তান্তে, কিংবা এমনকী তাঁর হাতির পিঠে বাড়ি ফিরবার ছবিতে। আমাদের মনেও পড়ে যে 'দি ট্রাজিক সেন্স অব লাইফ'-এরও একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে ওই কুইকজোটেরই আধুনিকীকরণের গুরুত্বের কথা, যেখানে উনামুনো লেখেন: 'It is necessary to know how to make ourselves ridiculous, and not only to others but to ourselves'।

আর শেষ পর্যন্ত, এসব পরিহাসভঙ্গিমার সঙ্গে যখন মিলে যায় সন্দীপনের কবিতা, তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই আমরা। তাঁর যে-কোনও রচনারই শেষ লাইনকটা আমাদের এক ঝাঁপে হঠাৎ তুলে নিয়ে যায় অনেকদূরে, স্তরে স্তরে তাৎপর্য খুলেও যার শেষ পাওয়া যায় না কখনো, যেখানে, 'মাথার ওপর এখন রাতের আকাশ। নক্ষত্রহারা, গ্রহহীন, চন্দ্রলুপ্ত আকাশের নীচে কেউটের ফোঁস-ফোঁসানির দুদিকে দুপা রেখে "তা-তা-থেই থেই" "তা-তা-থেই-থেই" বোলের ছন্দে নলিনী নেচে চলে' কিংবা যেখানে চাঁদ ডুবে যায়, আর 'জেগে-ওঠা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর ঝুঁকে, অন্ধকারে, হাওয়ায়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে, দুই ঋতুর মাঝখান থেকে তার মা-র প্রেমিকের ছেলে অংশু, বিমাতার সন্তানকে আবার ডাকে, তড়িৎ! তড়িৎ!' চেতনা আর অস্তিত্ব সব মিলিয়ে তখন কেউ ঝুঁকে পড়ে আমোঘ আর অতর্কিত কোনও মৃত্যুর উপর।

প্রথম প্রকাশ: সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমরা জানি, ভূমিকা, ১৯৯৬। শিরোনাম ছিল: অসামান্য সন্দীপন।

দ্বিতীয় প্রকাশ: এই শহরের রাখাল, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০। বর্তমান শিরোনামটি এই বই থেকে নেওয়া।

# সূ চি প ত্র

## অগ্রন্থায়িত নতুন গল্প


কুইনি ১
টেলিফোন ৪
ড. রণবীর পোদ্দারের আমেরিকা আবিষ্কার ৯
মাঝে মাঝে কার কাছে যাব ১১
তৃতীয় চক্ষু ১৫
হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ১৭
ডাবল বেডে একা ২৩
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো ২৭
চতুর্থ পর্বত ৩০
ঘাটশিলার অশ্বিনী ৩৩


## গ্রন্থায়িত গল্প


বিজনের রক্তমাংস ৩৭
আট বছর পরে একদিন ৫২
মীরাবাঈ ৫৯
ক্রীতদাস ক্রীতদাসী ৭০
সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ৮৫
নলিনী শাটার নামিয়ে দেয় ৯৬
আত্মক্রীড়া ১০০
ঐ দিকে ১০৫
রূপালি পর্দায় ১০৭
একজন নিরুদ্দিষ্ট ও তিনজন এলেবেলে ১০৭
ধলভূমগড়ের ব্যানার্জিবাবু ১০৯
উৎপল সম্পর্কে ১১১
মৃত্যু সম্পর্কে ১১৩
কয়েকটি শিরোনামা-১ ১১৬
পরিচারিকার নাম আশা ১২০
কাল দেখা হবে ১২০
চাইবাসা চাইবাসা ১২১
কয়েকটি শিরোনামা-২ ১২৬
কাউন্টার পয়েন্ট ১২৯
নিদ্রিত রাজমোহন ১৩২
বিপ্লব ও রাজমোহন ১৩৬
অংশু সম্পর্কে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি ১৪১
বড় দুঃসময় ১৫৪
আলমারি ১৬১
দোলনা ১৬৭
মাঝখানের দরজা ১৭৫
মাতৃস্তোত্র ১৮২
হ্যাঁ, প্রিয়তমা ১৮৮
সাপের চোখের ভেতর দিয়ে ১৯৫
চটি ২০৫
বন্‌ধ-এর ১০ দিন ২১৭
রুবির সঙ্গে হীরা বন্দরে ২২৬
শেষ মেট্রো ২৩৪
জুপিটার ও থেটিস ২৪০


## অগ্রন্থায়িত পুরনো গল্প


এক টুকরো পৃথিবী ২৪৬
উল্টোরথ ২৬১
যাদুসূর্য ২৬৭
গ্রন্থপরিচিতি ২৭১

# কুইনি

সীমা আর্টগ্যালারিতে যোগেন, বিকাশ, মনজিৎ বাওয়া, ভূপেন খাক্‌কার। ভূপেনের ছবির নাম : memoirs.

পেন্টিং -এর মানুষগুলো, ডিনার খেতে গিয়ে রেস্তরাঁয় দূরের টেবিল দেখা মানুষের মতো! শুধু একটিবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা, রাস্তাঘাটে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে এদের সঙ্গে তো আবার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। বা দেখা হলেও, কোথাও দেখেছি বলে মনেও হবে না। পেন্টিং-এর মানুষও সেইরকম। এরা দৃশ্যত যা, তাই। এদের লিভার, কিডনি, মূত্রাশয়, স্তন, লিঙ্গ বা যোনি—এ সব আলাদা করে না দেখালে, থাকে না। বিশেষত বস্ত্রাবৃত যারা, তাদের মধ্যে ও-সব আঁকাই থাকে না। পেন্টিং-এর মানুষ মরে না। কাজেই তাদের বাঁচার প্রশ্ন নেই।

ভূপেনের ছবি কিন্তু দাঁড় করিয়ে রাখল।

পশ্চিমভারতীয় মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোকের টোরসো, বুকে ঝুলছে মহাত্মার গান্ধি ব্র্যাণ্ড গোল চশমা। ভ্রূর পর থেকে ঘাড় পর্যন্ত সবটাই কপাল। যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কাঠামোটি হেড়ো। পর পর ১।! X ১।। চারটি ছোট ছোট ক্যানভাসে একই লোকের ৪টি স্টাডি। অভিব্যক্তি একটাই: নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু, এরাই দাঁড় করাল। এইজন্যে যে, লোকটির মাথা বলতে, অধিকাংশ পেন্টিং-এ যেমন, শুধু একটা স্কাল নয়। তার মাথার ভিতরে কোনও এক বোধ কাজ করছে। আর সেটাও স্পষ্ট দেখা যায়। স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালবাসা নয়, যে দেখা যাবে না। অগণন সঙ্গমের দৃশ্যে তার মাথার ভেতরটা ঠাসা। দাঁড়িয়ে, শুয়ে, ব'সে— সামনে থেকে, পেছন থেকে, মৌখিক— যতরকমের কয়টাস হতে পারে মাথার ভিতরে তারই তুখোড় রেখাচিত্র।

চারটি ছবিতেই লোকটির এ-ছাড়া কোনও স্মৃতি নেই।

ভূপেনের ছবি দেখতে আমার হালিশহরের তারকেশ্বরের কথা মনে পড়ল।

হালিশহরে আমাদের পৈতৃক বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেও, আমার ভাইপো পুষ্পেনকে তার দুই-তৃতীয়াংশ জলের চেয়ে কিছু বেশি দামে বিক্রি করতে দিতে হয়। একদিন পাড়ায় যে বাড়ির সামাজিক নাম ছিল 'নতুন বাড়ি' সেই বাড়িটি প্রতিদিন ভেঙে ভেঙে পড়ছিল এবং 'কোনওদিন কারও মাথায় একটা ইঁট খসে পড়ে মৃত্যু হলে জেলে যাবে তো তুমি'—পুষ্পেন আমাকে এসে ভয় দেখাল। 'আর বাড়ি তো আমার ঠাকুর্দার। অন্য লোককে দেবে কেন?' এক-তৃতীয়াংশ আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার জন্যে রেখে, বাকিটা প্রায় আমার হাত মুচড়ে নিয়ে নিল পুষ্পেন।

তিনতলা বাড়িটা ভেঙে ফেলে রি-মডেল করে পুষ্পেন যে নতুন বাড়ি বানাল, তা দেখে কী যে দুঃখ হল আমার, যখন প্রথম দেখলাম। পুরনো বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় গেল সেই টানা চওড়া বারান্দাটা। যেখানে একটা ডেক চেয়ারেই খালি গায়ে শুয়ে রেডিওয় 'বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ' শুনতে বাবা ভালবাসতেন। পূর্বদিকে গঙ্গায় ওপর দিয়ে আসত ভিজে হাওয়া। আমাদের হালিশহরের বাড়ির সঙ্গে কাঠাচারেকের পুকুরটি বোজাতে প্রমোটরের প্রয়োজন হয়নি। পুকুরপাড়ের বস্তি আর রাজ্যের জঞ্জাল জমে আজ স্বয়ং বুজে গেছে। একদিন ঐ পুকুরে বর্ষার টলটলে জলে ছোট তালডোঙা চালিয়ে মাঝখানে দাঁড় তুলে, চুপ করে বসে থেকেছি। গ্রীষ্মে জল কমে গেলে খোলামকুচির ব্যাঙ

জলের ওপর দিয়ে ওপারে কুইনিদের ঘাট পর্যন্ত দিয়েছি পাঠিয়ে। পুকুর আমাদের হলেও পাঁচিল দেওয়া ছিল না। বস্তির লোকেও ব্যবহার করত।

পুকুরের ওপারে থাকত কুইনিরা। তবে তাদের বাড়িটা বস্তির মধ্যে ছিল না। ওদের বাড়িটা ছিল ইঁট বেরনো আর ভাঙাচোরা একতলা, উঠোন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সঙ্গে খানিকটা বাগানও ছিল।

কুইনি যখন ও বাড়িতে এল, দেখল, প্রথম পক্ষের ছেলে নিরাপদ ওর সমবয়সী। কুইনি ডাকত নীরে বলে। নীরে ছাড়া কুইনিকে মা বলতে ডাকত তারকেশ্বর। ডাকত না বলে হাঁক পাড়ত বলাই যথার্থ। তারকেশ্বর ডাকত 'হাম্‌মা' বলে। তবে, বছরে দু-দশবারের বেশি তার ডাক শোনা যেত না। কারণ, আহার ব্যতীত আর যে জন্যে তার ডাক বা হাঁক পাড়া, তার জন্য বছরভর এলাহি আয়োজন থাকত। কেননা, ওদের পারিবারিক আয়ের অন্যতম উৎস ছিল এই সজোয়ান বলীবর্দটি। একচক্ষু প্রৌঢ় ক্ষুদিরাম কীর্তনের তরুণ ষাঁড়টির করিৎকর্মের খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। দূর ও কাছ থেকে হাম্বারবে পরিত্রাহী চিৎকার-কারিনীরা প্রায়ই উপস্থিত হত ক্ষুদিরামের দ্বারে। কুইনি ঐ গো-ভাষা বাংলায় শুনতে পেত। যেমন, তার মতে, 'হাম্‌মা' নয় 'মা' বলেই তাকে ডাকে তারেকশ্বর, তেমনি গাই-গরুগুলো যে, 'ষাঁড়' 'ষাঁড়' বলতে বলতেই ছুটে আসে এ বিষয়েও তার কোনও সন্দেহ ছিল না। এরকম অতি-ব্যক্তিগত উপলব্ধিগুলো সে শুধু আমার মাকে জানাত।

দিদি আর তার বন্ধুরা তিনতলার চিলেকোঠায় উঠে দরজা বন্ধ করে দিত। কারণ, পাঁচিল যত উঁচু করেই তোলা থাক, তিন তলার জানালা দিয়ে যা দেখার সবই দেখা যেত।

ক্ষুদিরামের ষাঁড়ের খ্যাতি দূরবিস্তৃত। কারণ কেউ বলতে পারবে না যে কোনও গাভীকে কার্যোদ্ধারের জন্য তারকেশ্বরের কাছে দু'বার নিয়ে যেতে হয়েছে। এদিক থেকে তার ষণ্ডদেবতাটি ছিল কল্পতরু বিশেষ। কাজ হত পাঁচিল তোলা উঠোনের দরজা বন্ধ করে। গাভীর মালিক সারেজমিনে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। কোন যাদুমন্ত্রবলে প্রতিক্ষেত্রে সফল হত তারকেশ্বর, তা জানা যায় নি। অনেকেরই ধারণা, যেহেতু কর্ম-সম্পাদনের পর ক্ষুদিরাম 'হর হর মহাদেও' বলে চিৎকার করে উঠত তাই অনুগত বাহনের সাধনা ও সিদ্ধির পিছনে দেবাদিদেবের আশীর্বাদের ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে। এই সব সময় তারকেশ্বরের গলায় ঝুলত গাঁদা ফুলের মালা। রূপোয় মোড়া সিংদুটির মধ্যস্থল থাকত মেটে সিঁদুরে লেপা। এটা ছিল বাবার কল্পতরু বেশ।

যাই হোক, রহস্যটা কী, সে তো আর কোনওদিন জানা যাবে না। উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে আমাদের দেশে রোপট্রিক থেকে বশীকরণ, মারণ, উচাটন—কত গুপ্তবিদ্যাই তো চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে।

কেননা, শিক্ষা বলতে বংশ পরম্পরা। এভাবেই এদেশে চলে আসছে। কিন্তু, নিরাপদ তার মা যাকে ডাকত নীরে বলে—এই বংশগত বিদ্যা যা ক্ষুদিরাম শিখেছিলেন পিতা গয়ারাম কীর্তনের কাছ থেকে—গয়ারামের শিক্ষাদাতা মাতামহ ওইরাম কাঁড়ার—নিরাপদর সে-বিদ্যায় বিদ্বান হতে ন্যূনতম আগ্রহ থাকলে তো। আর, হায় যে, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে পড়ল, পশুপ্রজননবিদ ক্ষুদিরামের গুরুকুলবিদ্যা তবু তার প্রযোজ্য হল না। এঁড়ে অথবা গাই কিছুই সে প্রসব করতে পারল না।

আমাদের পুকুরের ওপারে গরম কালে স্নান করানো হত তারকেশ্বরকে। মা ও সপত্নী-পুত্র দু'জনে মিলে দু'গাছা খড় দিয়ে তার সর্বাঙ্গ বহু সময় ধরে মর্দন করত।

তারকেশ্বরের সারা গা-টা থাকত জলের নিচে। শুধু তাঁর কুকুদটি জলের ওপর জেগে থেকে সহর্ষে নড়াচড়া করত। আমার মনে হয় যন্ডদেবতাকে স্নান করাতে করাতেই কুইনি আর নিরাপদ জলের মধ্যে কোনওভাবে কাছাকাছি এসে পড়ে। এবং তাদের সম্পর্ক বদলে যায়।

বাড়ি একতলা বলে কুইনির শোবার ঘরের জানালা দুটি ছিল লোহার ঘন জাল দিয়ে ঢাকা। মরচে পড়ে আর সাফ না-করা বছরভর ধরে জমা ধুলোর জন্যে, দূর থেকে তো বটেই, কাছে থেকেও ভেতরটা দেখা যায় না। কুইনি তাই জানত। পুকুরপাড়ের বস্তির চাঁপির মায়ের চাঁপি জালের একটি ছোট ফুটো দিয়ে যা দেখার একদিন দেখে ফেলে। তখন ভোরের আলো সবে ফুটছে। সেটাই ভুল হল কুইনির। সে বেরিয়ে এসে চাঁপির উদ্দেশ্যে কাঁচা খিস্তি শুরু করে দিল। চাঁপির মাও কম যায় না। রে-রে করে বেরিয়ে এল বস্তি থেকে। বার্ন কোম্পানির শ্রমিক, লেদ মেসিনের টার্নারের বৌ সে—বর লহরী পূজা বোনাস পায়—মাখনবাবুর বস্তিতে সে রীতিমতন ম্যানগণ্যা। সেও এপার থেকে চিৎকার শুরু করে দিল। আর খিড়কির দরজা খুলে ওপাড়ার কুণ্ডুগৃহিনী যেই না জানতে চেয়েছেন, 'কী হয়েছে লা চাঁপি?'—চাঁপির সুর গেল পাল্টে।

'এই দ্যাখো না মাসিমা'—গুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে কালো থুতুর পিক ফেলে চাঁপির মা হাসতে হাসতে বলল, 'উনি ভাতার ছেড়ে ব্যাটা—ভাতারের সঙ্গে শুয়েছেন—তা তোর জালের ফুটো দিয়ে তা দেখার কি দরাকার লা? মরন! ছুঁড়ির মুয়ে আগুন' এত বলে সে তর্জনী আর মধ্যমা ভাঁজ করে গাল ঠুসে দেয় চাঁপির—দুজনেই হাসছে।

বলতে ভুলেছি, কুইনিদের আর একটি পেশা ছিল: সলতে বিক্রি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশে রাখা পেঁজা তুলো থেকে একটু খানি ছিঁড়ে নিয়ে সলতে বানাত কুইনি। তখন তার হাতির দাঁতের মতো মইসে—ধরা সাদা ঊরু থাকত সন্ধি পর্যন্ত উন্মুক্ত। কতদিন ডজন হিসেবে গুণে গুণে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। মনিহারি দোকানে রোজ সেগুলো যেত বিক্রির জন্যে। অন্তত, আমাকে দেখে খোলা ঊরু কাপড়ে ঢাকে নি কোনওদিন কুইনি। আমার বয়স একটা সন্দেহজনক জায়গায় পৌঁছলে, আমার চোখের দৃষ্টি কখন যে বদলে গেল কুইনির খোলা ঊরু দেখতে দেখতে, সেটা কুইনিও টের পায়নি।

তাদের ঘটনা জানাজানি হবার পর নীরে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হরিদ্বারের মন্দিরে যেতে অলকানন্দার সেতু পেরতে হয়। সেখানে সেতুর নিচে এক তাঁবু থেকে মাকে দেখে 'মাসিমা' বলে বেরিয়ে এল নীরে। না, সন্ন্যাসী সে হয়নি এখনও। এখনও চেলাগিরি চলছে। দেখলাম, দিব্যি নাদুস-নুদুসটি হয়েছে। ভুঁড়িটিও নেয়াপতি। কুইনিকে 'মা' সম্বোধন করেই সে তার কুশল জানতে চায়। কিন্তু তখন 'ভালই আছে' ছাড়া দেবার মতো খবর কিছুই ছিল না। কারণ, ক্ষুদে কীর্তনীয়ার মৃত্যুর পর বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া কুইনির আর কোনও উপায় ছিল না। ঠিক বেশ্যা নয়, যেখানে সে সারাদিন খেটে সলতে পাঠাত, সেই গরাই স্টোর্সের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত ওর ভার নিল। সেদিক থেকে রক্ষিতাই বলতে হয়। কুইনি কিন্তু বেশ্যাই মনে করত নিজেকে। বিয়েতে কুশন্ডিকার দিন বেশ্যাবাড়ির মাটি লাগে। ছোড়দির বিয়েতে সে নিজেই তার বাড়ির মাটি দিয়ে গেল।

লক্ষ্মীকান্ত দোকান বন্ধ করে বাড়িতে খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রা দিতে আসত কুইনির বাড়ি। কুইনি ততদিনে বছর-চল্লিশ। 'আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে' সে একদিন হেসে বলছে দিদিকে, আমি শুনতে পাই। মেদবর্জিত চমৎকার পেটা চেহারা ছিল পরপর তিন মেয়ের পিতা লক্ষ্মীকান্ত গরাই-এর। যে লম্বা খুঁটিতে বলীবর্দ বাঁধা থাকত, তার সবুজ,

সেন-র‍্যালে সাইকেলটা সেখানে হেলান দিয়ে রেখে সে ঘরের ভেতরে চলে যেত। কুইনি তাকে অভ্যর্থনা করত হাসতে হাসতে।

ঐ দেখুন। কী কথা থেকে কোন কথায়। হচ্ছিল ভূপেন খাক্‌কার—কোথা থেকে এসে গেল বলীবর্দ তারকেশ্বর, তার পালক পিতা ক্ষুদিরাম কীর্তনীয়া আর তার হাম-মা কুইনি, নিরাপদ আর লক্ষীকান্ত গরাই। একেই বলে ধান ভানতে তারকেশ্বর-গীতি।

আসুন, ভূপেন খাক্‌কারে ফিরে আসি। কিন্তু, তার আগে বলে নিই একটা কথা। টেস্ট পরীক্ষা আর স্কুল ফাইনালের মাঝখানের সময়টা একান্ত পড়াশোনার জন্যে আমি তিনতলার চিলেকোঠায় প্রমোশন পেয়েছিলাম। ততদিনে ওদের একতলায় শোবার ঘরের জালে ফুটোটা বড় হয়েছে। আঁচ্ছা, আমি কি বলেছি না বলতে ভুলেছি, কুইনি একদিন আমাকে ডেকে বলেছিল, শুধু দেখলে হবে? শুধু কি নেকাপড়া। সবই শিখতে হয় গো ছোটবাবু।

যাক, যা বলতে চাইছিলাম। আমার ভাল লাগল ভূপেন খাক্‌কার। কিন্তু, ভিজিটর্স বুকে কমেন্ট লিখে এলাম: যোগেন চৌধুরিজ লোটাস ইটার ইজ দ্য বেস্ট অফ দেম অল।

মাঝে মাঝে ভাবি লিখলে হয় একটা উপন্যাস, যেখানে সবাই সবাইকে মিথ্যে কথা বলছে তো বলছে তো বলছেই.....।

*আজকাল, ১৭ অক্টোবর ২০০৪*

## টেলিফোন

আজকাল স্বপ্নে জীবিতের চেয়ে মৃতদের আনাগোনাই বেশি। তাদের সঙ্গেই দেখা হয়। বয়স বাড়তে বাড়তে যা হয়। আমারে চেয়ে বড় যারা, মৃত তো সবাই। কত তরুণ-অরুণ গেল অস্তাচলে! স্বপ্নে তাদের সঙ্গে কথা হয়। অথবা, হয় না। তাদের নিয়েই যত ঘটনা, স্বপ্নে। যেন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা দিতেই ক্বচিৎ এক-আধজন জীবিত যোগ দেয়।

আজ ভোরের স্বপ্নটা যেমন। প্রথমে ছিল একটা নিরীহ পিঁপড়ে। ওই ফুর্ফুরে কালো পিঁপড়েগুলোর একটা। টয়লেটের ছায়াচ্ছন্ন দেওয়ালে উদ্বিগ্নভাবে ঘোরাঘুরি করছে। কমোডে বসে আমি নিরুপায়ভাবে লক্ষ্যও করছিলাম তাকে। কারণ, আর কী বা করব! গৃহিণীর বায়ুগ্রস্ততাবশত বইটই দুরস্থান, পুরনো খবরের কাগজও টয়লেটে আনতে পাই না। আহা—পিঁপড়েটির উদ্বিগ্নতা, স্বপ্নের বোধ আমাকে প্রথমে জানাল, সে দলছুট একা বলেই। ক্রমে দেখা দিল তার মুখে একটি মৃত পিঁপড়ে। ও সে তাহলে শ্মশান খুঁজছে! তখন আমি পিঁপড়েটাকে তুলে সেই দেওয়ালের সেই গর্তের সামনে রাখতে গেলাম, যেখান থেকে হাজার হাজার বাস্তুত্যাগী পিঁপড়ে বেরিয়ে গেছে (সে সেটাই খুঁজছে)। ঠিক এই সময় আমার কাছে এবারের গল্পটি দেখা দিল। যখন মৃত পিঁপড়েটি তার মুখ থেকে আমারই অপরিণামদর্শিতার কারণে, ঝরে পড়ে গেল। স্বপ্নে শোনা গেল জলস্থল-অন্তরীক্ষ জুড়ে এক হাহাকার, যখন তার মুখ থেকে মৃতের শব ঝরে পড়ে গেল।

ক্রমে সেই শব্দই রূপবদল করল টেলিফোনের শব্দে। সোমেশ দেখল, ক্যালিফোর্ণিয়া নয়, টেলিফোনটি রয়েছে তুম্বনিতে। সান্তাল পরগণার সীমান্তে

মুকুন্দ স্মৃতি বিদ্যায়তনে স্কুল ক্যাম্পাসের একটি নির্জন কোয়ার্টারে। অদূরে শাল জঙ্গলের ধারে মাস্টারমশাইদের ছোট ছোট কোয়ার্টার, তারই একটি তার বাবা নীলমাধব সেনের। টেলিফোন বাজছে সেখানেই। আই সি, সে ভাবল তাই এস টি ডি'র মতো বাজছিল। সোমেশের একবার মনে হল, আরে, এ তো তার ছোটবেলার কথা। এই স্কুলেই সে পড়েছিল স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত। বাবা নীলমাধব তো এখানেই ইংরেজির শিক্ষক। একবার তার মনে পড়ল বটে, আরে আরে, তখন ইলেকট্রিক কোথা—টিউবওয়েলই ছিল না। কুয়োর জল খেত তারা। যদিও মাস্টারমশাইদের পানীয় জল আসত বেনাগড়িয়া মিশন চার্চের পাতকুয়ো থেকে। গরুর গাড়িতে। ৪০০ স্কোয়ার ফুটের দুঘরা নিচু ছাদের কোয়ার্টার। তবে হ্যাঁ, ছোট মনে হত না কখনওই। ফ্ল্যাট থেকে বেরুলেই সান্তাল পরগণার উঁচু নিচু ল্যাটেরাইট জমি। সেই রাজমহল পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত দেখা যেত। অন্য সব কোয়ার্টারের দেখাদেখি তারাও বেড়া দিয়ে অনেকখানি জায়গা বাড়িয়ে নিয়ে বাগান করে নিয়েছিল।

কিন্তু আজ কী অবাক আনন্দে বাড়ির সামনে সোমেশ দাঁড়িয়ে আছে! বাড়ি একটাই। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। শুধু তাদের বাড়িটা। আর সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জঙ্গল। আর তার মাথায় সদ্য-ধোওয়া সাদা-কলাই-এর থালার মতো চাঁদ। গোলাকার কালো বর্ডার তাকে ঘিরে। সারারাত ঝড়বৃষ্টির পর, দুর্গারও মৃত্যুর পর, নিশ্চিন্দিপুরের ভেঙে-পড়া ভিটেবাড়িটি কানু ব্যানার্জি যেভাবে ঘুরে-ঘুরে দেখেছিল, অনেকখানি সেইভাবে, সন্তর্পণে পা ফেলে, শরীর দু-ভাঁজে ভেঁঙে, চাঁদের আলোয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে বাড়িটিকে দ্যাখে। কখনও বা দাঁড়িয়ে পড়ছে। আর দাঁড়ালেই মজা। বাড়িটা নিজেই ঘুরতে শুরু করছে। যদিও অতি ধীর গতিতে। কানু বা হরিহরের সঙ্গে ভঙ্গিতে মিললেও, তার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আর তাই বেদনা নয়, সোমেশের চোখমুখ এত আনন্দে অবাক।

এও কি সম্ভব? হ্যাঁ। এই তো আমাদের বাড়ি। কিন্তু কোথায় গেল সেই ভাঙাচোরা দেওয়াল, বর্ষায় টপটপ জল পড়া সেই ছাদের ফাটল, গরাদহীন জানালার সেই হানাবাড়ি। রাতে জঙ্গল থেকে শেয়াল এসে ঢুকে পড়ত এক-আধদিনে। শীতের রাতে গা থেকে লেপ টেনে নিচ্ছে হাপু পাগল, মা বলছেন, 'চুপ, তোর বাবা বাড়ি নেই।' কোথায় গেল সেই ভগ্নস্তূপ! এই টানা বারান্দা, মেঝেয় সাদা আর লাল বরফি-টালি—ভেতরে না ঢুকেও সোমেশ দেখতে পায় সমস্ত আসবাবপত্রে ঝাঁ-চকচকে পালিশ—বিস্কুট রঙের তেলতেলে দেওয়াল—জানালায় জানালায় উড়ন্ত পর্দা, গোল টেবিলের ওপর পেতলের ভারি অ্যাশট্রেটা, কামানের গোলার খোল থেকে তৈরি—বাবাদের আমলে খুবই সস্তায় পাওয়া যেত। কী ঝকঝক করছে এখন, ভেতরে না গিয়েই দেখতে পায় সোমেশ। তারই পাশে নীল রঙের টেলিফোনটি বেজে চলেছে। ক্রিরিরিরিরিরিং...ক্রিরিরিরিরিরিং... ক্রিরিরিরিরিং...

কেউ ধরছে না কেন? সে দেখল, বাবা মা পাশাপাশি একখাটে চিৎ হয়ে শুয়ে। কৈফিয়ত চাওয়ার স্বরে সে চেঁচিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার, টেলিফোন ধরছ না যে। মরে গেছ নাকি তোমরা?

কিন্তু এইসব, এতসব কী করে হল? কে করল? কে টাকা দিল? আমি তো পাঠাইনি! 'সবই করে দিয়েছেন তোমার জামাইবাবু'। তার বিধবা দিদি (মৃত) এসে বিড়বিড় করে জানিয়ে গেল তাকে।

'হ্যাঁ, তা, এই বাউণ্ডারি ওয়ালে ঢোকার দরজাটা অত ছোট কেন?' সোমেশ কৌফিয়ত

চায়, 'মাথা নিচু করে ঢুকতে হল আমাকে। জঙ্গলের দিকের পাঁচিলটায় তো হাতই দেওয়া হয়নি। সেই নোনা-ধরা ইঁট। খানিকটা তো ধসেই পড়ে আছে। ওখান দিয়ে তো শেয়াল কুকুর ঢুকবে'—শুনে দিদি কাচুমাচু গলায় জানায়, 'শেষের দিকে তোমার জামাইবাবুর টাকায় কম পড়ে গেল, তাই ঐটুকুন আর...।'

তার চেঁচামেচি শুনেই বোধহয় এইসময় একবার চুপ করে গেল টেলিফোন। তাই সেদিকে চোখ গেল সোমেশের। সে দেখল ঝকঝকে হ্যারিকেনের আলোয় একটি নীল টেলিফোন। নতুন বলতে শুধু একটাই। তবে নীল তো নয়, মনে হল তার, এ তো নীলিমায় নীল! নীল ছিল বটে ক্যালিফোর্নিয়ার মার্সেদ শহরে তার হোয়াট গেট ড্রাইভের বাড়ির টেলিফোনটা। কিন্তু সে অনেক ক্যাটকেটে।

কিন্তু এমনটাই তো হবার কথা ছিল। নয় কি! একটা টেলিফোন আসার কথা ছিল। এ তার ছেলেবেলার সাধ। রামপুরহাটে, দুমকায়, যখন যেখানে দেখেছে, ভেবেছে কবে আসবে, তাদের তুম্বনির কোয়ার্টারে, ধন নয়, মান নয়, পাখি নয়, পরী নয়—শুধু একটা টেলিফোন! তার এই প্রাণাধিক প্রিয় আকাঙ্ক্ষার কথা বাবা নীলমাধবেরও অজানা ছিল না। তারপর একদিন কাছেই, দুমকা রোডের ওপর বি. টি কলেজ হল। সেখানে টেলিফোন এল। সেই দূর বেনাগড়িয়া মিশন থেকে পোস্ট পুঁতে পুঁতে। তখন আশা জাগল। একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। সামান্য একটা টেলিফোন। তারই অভাবে তার গোটা ছেলেবেলাটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে মুরুব্বির পর মুরুব্বি ধরে তারা পৌঁছেছিল একজন সেন্ট্রালের মিনিস্টারের কাছে। বাবা ছোট্ট সোমেশকে দেখিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে এই ছেলেটার জন্যে। এর একটা স্বপ্ন। একটা টেলিফোন। টেলিফোনের স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে কাঁদে।'

মিনিস্টার ছিলেন খোশ মেজাজ। গ্রামের ইস্কুল মাস্টারের ছেলের এই পরম প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিতও হলেন। দেশে ও দশের জন্য একটুও সহানুভূতি না থাকা সত্ত্বেও, বোধহয় মুরুব্বির গুরুত্বের কারণেই বালক সোমেশের নিজের হাতে লেখা আবেদনপত্রটি হাতে নিয়ে তিনি বললেন, বা:, কোনও বানান ভুলটুল নেই তো! কাগজখানা পি-এ' কে ডেকে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'চিফ সেক্রেটারিকে এটা দেবেন। উইথ অ্যান ইংলিশ ট্রানস্লেশন অফ কোর্স।' 'আচ্ছা'? মুরুব্বির দিকে চেয়ে বললেন, 'এই লালকৃষ্ণ আদবানি আর হিটলারের মধ্যে কমন ফ্যাক্টরটা কী বলুন তো? 'দুজনেই মিডিওকার।' ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয় সোমেশ না বলে পারেনি।

'ব্রেভো। ব্রেভো।' সোমেশকে কাছে টেনে দিলেন তিনি, 'ব্রেভো মাই বয়!' তারপর মুরুব্বির দিকে চেয়ে বললেন, 'হিটলার যু-দের মনে করতেন প্ল্যানেটরি ব্যাসিলি। আর এঁরা মনে করেন ভারতীয় মুসলমানরাও তাই।' মুরুব্বি : 'কিন্তু এরাই তো পাওয়ারে আসছে।'

এম পি : 'হ্যাঁ। আর তাদের পথ দেখাচ্ছে, কমিউনিস্টরা। কারণ কী? না, নেহরু ডায়েনেস্টি হঠাও। লাঠি ভেঙে এরা সাপকে ডেকে আনছে।' রাজনৈতিক কথাবার্তা আগে-থেকেই হচ্ছিল।

এই সময়, নীলমাধব বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ স্যার। সেটা ঠিকই। কিন্তু দেখুন, সেই হিন্দু কোড বিলের সময় নেহরু যদি মুসলিম কোড বিলও পেশ করতেন, একটাই যদি আইন হত হিন্দু-মুসলমানের জন্য তাহলে কি দেশের চেহারাটা অন্যরকম হত না?'

মন্ত্রীদের বিরক্ত হতে নেই। সিডিউল কাস্ট হলেও ওঁরা অভিজাত। প্রসন্নতা বজায়

রেখেই উনি বললেন, 'হিন্দুদেরর মধ্যে কত সমাজসংস্কার হয়েছে মাস্টারমশাই, আপনি জানেন না? ওদের মধ্যে কি একজনও রামমোহন জন্মেছে না রবীন্দ্রনাথ হয়েছে? তাও তো রাজেন্দ্রপ্রসাদ সই করতে চাননি রি-অ্যাকশানের কথা ভেবে।' বলতে বলতে মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। মুখ তখনও প্রসন্ন। কিন্তু ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয় তখনই বুঝতে পেরেছিল, তাহলে হল না।

বাইরের ঝকঝকে রোদে সোমেশকে দেখে মিনিস্টার বললেন, 'বাঃ ছেলেটির ছায়াটা তো দারুণ। কী খাপি আর মোটা ছায়া পড়ে!' ফের ভেতর ডেকে নিয়ে গেলেন মরুব্বিকে। তারপর থেকে শুরু হল মরুব্বির নিত্য যাওয়া-আসা। মন্ত্রী ছায়াটা চান। যাঃ ছায়া আবার চাওয়া যায় নাকি। দেওয়া যায় নাকি নিজের ছায়া কারুকে। ছায়া নেবেই বা কী করে। সেটা মন্ত্রীর ব্যাপার। বিশেষজ্ঞ আছে। এজন্য আলাদা সার্জেন আছে। তারাই এসে কেটে নিয়ে যাবে। চাই শুধু সম্মতি। ছায়া অথবা টেলিফোন। ছায়া দাও, টেলিফোন নাও। টেলিফোন দাও, ছায়া দাও। ছায়া দাও, টেলিফোন নাও। মা শেষে একদিন ঝাঁটা হাতে তাড়া করলেন মুরুব্বিকে। টেলিফোনও এল না। নীলমাধব শেষপর্যন্ত নিমরাজি হয়েছিলেন। সোমেশ তো একপায়ে খাড়া।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল। সবাই যাকে ভেবেছিল একজন হেরো লেখক, এখন, ওই যে তার বাড়িতেই টেলিফোন বাজছে। কেউ আটকাতে পারল?

ধ্বস্ত পাঁচিলের ধারে সাফল্য না চাঁদ কীসের আলোয় সোমেশের মুখ এখন উজ্জ্বল তার নির্ণয় করা কঠিন।

সব আশাই কি পূর্ণ হয় মানুষের? হয় না।

বীরভূম সান্তাল পরগণার এই সীমান্ত এলাকা। দিনের বেলা ৪০ কিলোমিটার তো হবেই, দুমকা পেরিয়ে রাজমহল পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত দেখা যায়। সান্তালদের গ্রাম আছে মাঝে মাঝে। সেগুলি দেখা যায় না দিনের বেলায়। দৃষ্টি বাঁধা পায় না কোথাও। অথচ, সন্ধ্যার পর মা কেরোসিনের ল্যাম্প আর হ্যারিকেন দুটি একে একে জ্বেলে দিলেই ৪০ কিলোমিটার জুড়ে অন্ধকার কত অবলীলায় সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ত তাদের কোয়ার্টারে। এতবড় বিরাট পটভূমি-জোড়া অন্ধকারে একরাত্রির মতো বেশ এঁটে যেত ছোট্ট ছোট্ট দুটি ঘরে আর ঢাকা বারান্দায়। কিছু থেকে যেত আরসোলাময় ৬'x'৫ ফুট টয়লেট-কাম বাথরুমের পিছল ফাঁকে-ফোকরে।

সব কামনাই যে সকলের পূরণ হয়, তা তো নয়। অনন্তই নাম ছিল তার। অনন্ত মাঝি। স্কুলের ধানজমির সে ছিল বর্গাদার। স্কুলের পিওনও একাধারে। হেডমাস্টার যামিনীবাবুর ঘরের সামনে ঝুলতে ঘন্টা। দিনভর সে-ই পেটাত। একদিন শোনা গেল, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজু বনের ধারে, চড়ুইভাতির ভাঙা উনুনগুলোর পাশে সে আর তার ছেলে বাঁটুল একটা কুয়ো খোঁড়া শুরু করেছে। তখনও মুর্গি ডাকেনি। সূর্য উঠেনি। সেদিন ঘন কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর থেকে ভেসে আসছে কোদাল চালাবার একের-পর এক ঝপ-ঝপ শব্দ। সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা। অনেকদিন রাত পর্যন্ত। লণ্ঠন হাতে ছেলে বাঁটুল গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তেল ফুরুলে বাড়ি যায় তেল ভরতে। দিনের পর দিন দু'শিফটে কাজ চলল। একদিন নির্মীয়মান পাতকোর ভেতর মাথা পর্যন্ত ডুবে গেল অনন্তর। সে নিচে থেকে ঝুড়ি ভর্তি মাটি এনে ফেলতে লাগল বাইরে। একদিন রাত তখন আটটা। সেই গর্তর ভেতর থেকে আওয়াজ উঠল—ঠঙ! শীতের প্রান্তর ডিঙিয়ে সেই আওয়াজ কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে এসে ধাক্কা মারে। ঠঙ-ঠঙ-ঠঙ প্রবল ক্রোধে গাঁইতি দিয়ে পাথর

খণ্ডকে গুঁতোচ্ছে অনন্ত। কী হয়েছে? পরদিন জানা গেল। বিধাতার অভিসম্পাতের মতো পাতকোর নিচে জেগে উঠেছে এক পাহাড়ের মাথা।

এরপর পাক্কা বছর খানেক পড়ে থাকল গর্তটা। যতদিন না হাল দিতে দিতে ভরদুপুরে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল তার বলদটা। সেই যে শুল আর উঠল না। মাঠেই পড়ে রইল। গুনিন এসে তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করে যেতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। মাঠেই পড়ে রইল সারারাত। সারারাত পাশে জেগে রইল লণ্ঠন। আর অনন্ত আর বাঁটুল। তেল ফুরুলে বাঁটুল আমাদের বাড়ি থেকে তেল নিয়ে গেল।

বুড়ো হয়েছিল। মস্ত দশাসই বলদ। নামও ছিল তার একটা। কী যেন... কী যেন...ও, হ্যাঁ, মহাদেও। তার শিঁ দুটি ছিল টিনের পাত দিয়ে মোড়া। মাথায় লেপা মেটে সিঁদুর। স্কুলের ছুটি সাড়ে তিনটেয়। হেডস্যারের নির্দেশে সেদিন ঘন্টা দিচ্ছে বুড়ি মেথরানি শনিচারী।

বাজছে ঠিকই। কিন্তু কেমন যেন ঠাকুরঘরের ঘন্টার মতো। ধ্বনি আছে। প্রতিধ্বনি নেই।

বইখাতা হাতে সোমেশ ছুটছে কাজুবনের দিকে। গিয়ে দেখল, অসমাপ্ত কুয়োর ধারে মহাদেও কাত হয়ে পড়ে আছে। সামনের পা দুটো উঁচু। পিছনের পা গুটিয়ে একদম পেটের কাছে। চোখদুটো খোলা। চোখ থেকে জলের শুকনো ধারা। গুহ্যে একতাল আধ-শুকনো গোময়। এই গরুটার চোখের পাতা ছিল অস্বাভাবিক বড়। ইঞ্চি খানেক করে তো হবেই এক-একটা।

হবার কথা ছিল কুয়ো। কী হল শেষ পর্যন্ত। মুড়েঝুড়ে, হাত-পা লাঠিপেটা করে ভেঙে, মায় ঘাড় ভেঙে বুকের দিকে নামিয়ে, অতি কষ্টে মাপসই করে করে মহাদেওকে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। একবছর আগে মাটি যা উঠেছিল তার সামান্য অংশই কাজে লাগল মহাদেওকে চাপা দিতে। সব মাটি ফেলা হল না। কেন? অন্ধকার হয়ে আসছিল বলে? একটা লণ্ঠন জ্বলে রইল সারারাত। শিয়ালকুকুর তাড়াতে। মাঝে একবার তেল চেয়ে নিয়ে গেল অনন্ত।

কত কাজই করতে করতে মানুষ পেরে ওঠে না। সবসময় যে, অনন্ত মাঝির মতো পাষাণদের মাথা তুললেন বলে, তা নয়, স্রেফ 'ধুর আর ভাল লাগছে না', বলেও মানুষ কাজ ফেলে উঠে পড়ে কত সময়।

কিন্তু এক্ষেত্রে কী হল? কোনও চেষ্টা করতে হল? কেউ আটকাতে পারল?

ওই বেজে যাচ্ছে টেলিফোন।

ছোটবেলার তুম্বনির কোয়ার্টারে। বাবা-মা চিৎ হয়ে শুয়ে। ঝকঝকে ঘাটে। নতুনের মতো পুরনো বাড়িতে।

প্রান্তর জুড়ে আবছা আলোর আল্পনা।

কালো বর্ডার দেওয়া সাদা কলাই-এর থালার মতো চাঁদ।

সেই কখন থেকে কাজুবনের মাথায়।

ওখানেই থাকবে আজ সারারাত।

তারই আলোয় সুখে, তৃপ্তিতে, আশাপূরণের আনন্দে, অন্ধকার সরিয়ে, ক্রমেই টায়ে টায়ে ফুটে উঠতে লাগল ফ্যালিফোর্নিয়া থ্রি-জিরো থ্রি হাইওয়েতে আজই মাঝরাতে এইমাত্র কার অ্যাকসিডেন্টে মৃত ডাঃ সোমেশ্বর পাইন, এম.ডি।

*শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন ১৪১০*

# ড. রণবীর পোদ্দারের আমেরিকা আবিষ্কার

৫২-য় শুরু হলেও মাধবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ড. রণবীর পোদ্দারের ১২ বছর ধরে হস্তরতি-নির্ভর বিপত্নীক যৌনজীবনের নতুন করে শুরু হয়েছিল যাকে বলে—উইথ এ ব্যাং! ৫২ বছর বয়সে ফিফথ্ ইয়ারের ছাত্রী দ্বীপশিখা পাইন তাঁর জীবনে উঠে এল, তুলনামূলকভাবে বললে বলতে হয়, ভূমধ্যসাগরের ভেতর থেকে যেমন ভেনাস, ঝরে-পড়া জলকণা ছাড়া যার গায়ে সুতোটি নেই। অবশ্য বিখ্যাত গার্ডলটিও যদি ভেনাস থেকে খুলে নিতে চান, তাহলে আলাদা।

আমাদের আলোচ্য গল্পের নায়িকার বয়স ২২ আর তাঁর ৫২—দুটি ক্ষেত্রেই অন্তত শুক্রের অবস্থানের দিক থেকে একটা অর্থাৎ বয়সের গরমিলে যে মিল সেদিক থেকে তুলনামূলক রয়েছে বৈকি। এবং রবীন্দ্রনাথ। সেও কিন্তু সেই তিরিশের ফের। যদিও এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ৬২ এবং ভিক্টোরিয়া ৩২। রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পোর দেহতত্ত্বের ব্যাপারটা চিরতরে সাব্যস্ত করতে তিনি গিয়েওছিলেন আর্জেন্টিনায়—সে-বছর ১৯২২-এ তপতী গোস্বামী ওপেন হাইমারকে ডিঙ্গি মেরে তিনি যেবার মেরিল্যান্ডের ওপেন ইউনিভার্সিটি অফ ডায়িং কালচার থেকে গ্রান্টটা পেলেন। সান ইসিদ্রো-ফিসিদ্রোর বাগানবাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। স্প্যানিশ দোভাষীর সাহায্যে পড়লেন ভিক্টোরিয়ার ডায়েরি। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে আছেন, পিছনে ভিক্টোরিয়া—হয়তো চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন অসুস্থ কবির—যখন অন্তত একবার স্তনস্পর্শ পেলেন কবি। হাতে দিয়ে ধরলেনও একবার। ব্যাস, ঐটুকুই। ভিক্টোরিয়ার মনে হল, যেন গাছের আপেল ধরেছেন। ছিঁড়লেন না। এই সেই ভিক্টোরিয়া, সান ইসিদ্রোর নির্জন বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ঘরের পাশের যে শুয়ে থাকে, অভিযাত্রী অধ্যাপক যেতে যেতে আরও দেখলেন, 'কুকুরের মতো' কবির একটি ইশারার অপেক্ষায়—যদিও শালীনতার কারণে বাঙালি অনুবাদে 'কুকুরের মতো' হয়ে দাঁড়ায় 'প্রাণী বিশেষের মতো'! ভিক্টোরিয়া তো রবীন্দ্রনাথের ৬২ বছর দেখেননি—গবেষণা করতে গিয়ে ড. পাইন যা পেলেন—দেখেছিলেন, এক পরমপুরুষের 'সুগঠিত গ্রীবা।' আর রবীন্দ্রনাথের অনুভব তো ছড়িয়ে আছে 'পুরবী'র ছত্রে-ছত্রে। যেমন :

'ফিরিয়া যেও না শোনো শোনো
সূর্য অস্ত যায়নি এখনও
সময় রয়েছে নাকি
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনও।' ইত্যাদি

ভিক্টোরিয়া প্রস্তুত ছিলেন দেহে এবং মনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? পারলেন না। কারণ শান্তিনিকেতনে মনীষী ক্ষিতিমোহন থেকে চাকর বনমালী, তিনি সকলেরই গুরুদেব। সত্যি, খ্যাতির বিড়ম্বনা আর কাকে বলে। 'স্বখাত সলিল'ও বলা হয়ে থাকে একে।

তখনও গবেষণা-গ্রন্থের একচ্ছত্রও লেখা হয়নি (এখনও হয়নি)। কিন্তু এইসবই—এই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তার গবেষণামূলক আবিষ্কারের গল্প দিয়েই, বিমুগ্ধ ছাত্রী দ্বীপশিখার কুমারী দেহতত্ত্বের উপকূলে তাঁর জলদস্যু-অবতরণ।

'কিন্তু ওঁর তখন ৬২—'

রবীন্দ্রনাথের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে দ্বীপশিখা বলে।

'তাহলে পিকাসো?' নাকের ডগা থেকে প্রফেসর পোদ্দারের চশমা বুকে পড়ে যায়। ভাগ্যিস কর্ণে বাঁধা ছিল, 'ফ্রাঁসোয়া জিলোকে বিয়ে করলেন কবে? যখন ৭২। সন্তানাদিও হয় এবং পরে ডিভোর্স হলেও তারা পিকাসোর বলেই প্রকাশ এবং তারা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হয়নি কি?'

'জিলো এসেছিল মডেল হতে।' অধ্যাপক জানালেন তাঁর জ্ঞানতাপসী ছাত্রীকে। তথ্যে সমৃদ্ধ করছেন, কাজেই খুলে বলতে তাঁরও অসুবিধার কিছু থাকতে পারে না, যখন বললেন, 'পিকাসো মাঝে মাঝে গিয়ে বুক টিপে অসেন ফ্রাঁসোয়া জিলোর। দোষের মধ্যে জিলো জানতে চায়, 'মঁসিয়ো, আপনি তো আমার নিউড আঁকছেন না, আঁকছেন জামাকাপড়-পরা ছবি—তাহলে এ-সবের দরকার পড়ছে কেন?'

'তুমি কি ভাবছ,' অয়েল ক্যানভাসের বুকে রঙ বোলাতে বোলাতে তুলির বাঁট দিয়ে ছবির স্তনশিখর চেপে ধরে পিকাসো জানতে চাইলেন, 'এখানে কোনও মাংস নেই? শুধু রঙ আর রেখা? এখানে কতটা মাংস লাগবে, আমি সেটাই দেখে নিচ্ছি তোমার বুকে হাত রেখে।'

'আচ্চা এ-সব কি সত্যি?'

'তুমি জিলোর 'মাই লাইফ উইথ পিকাসো' বইটা পড়ে দেখো না। সঙ্গে জন বার্জারের লেখা পিকাসো-অ্যাসেসমেন্টটা। ঐ তো সেল্‌ফ-এ রয়েছে'—দ্বীপশিখা হাত পাচ্ছে না দেখে ড. পোদ্দার এই সময় উঠে গিয়ে ছাত্রীর বাহুসন্ধির নিচে দু-হাত রেখে দ্বীপশিখাকে তুলে ধরেন বই-এর নাগাল যাতে সে পায় সেজন্যই—এবং দ্বীপার স্বাস্থ্যদুটি কেমন তা প্রথমে জানতে পারেন, যদিও দ্বীপশিখা তাঁর সুগঠিত বাহুদ্বয় আগেই লক্ষ্য করেছিল। তখন লং প্লেয়িং-এ বাজছিল মোৎসার্টের 'ম্যারেজ অফ ফিগারো।'

এভাবেই তার প্রথম দ্বীপা-আবিষ্কার। হ্যাঁ, আবিষ্কারের সম্মান অধ্যাপক পোদ্দারেরই প্রাপ্য। যদিও শ্রীরামপুরের প্রতিবন্ধী মস্তান ট্যাংরা ওরফে শুদ্ধশীল ধাড়া এসে তাঁর কলার চেপে ধরে একদিন তার দাবিও রেখেছিল।

কিন্তু, বল্লেই হবে! মাইরি আর কী।

আমেরিগো ভেস্পুচি এসে দাবি করলেই হবে যে, আমিই আবিষ্কারক। তুমি তো বাবা, জল থেকে জেগে ওঠা বাহামা আর কিউবা এই ভূখণ্ড দুটি শুধু ছুঁয়ে দেখেছিল! সেখান থেকেই বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে ফিরে গেলে আপন দেশে। কিন্তু, মেনল্যান্ডের নাবি জলাভূমিতে সমুদ্রমেখলা সরিয়ে প্রথম অবতরণ করেন কলম্বাসই—যখন দু-পা ফাঁক করে দূরে তটভূমির অন্ধকার জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে।

আমেরিকার সঙ্গে আমেরিগো ভেস্পুচির নাম জড়িয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু ভুল করে। এবং প্রথম প্রকৃত আবিষ্কারকের ক্ষেত্রে যা হয়।

চলে নির্বিচার লুটপাট। যত বেশি সম্ভব মাল যত তাড়াতাড়ি পারো তুলে জাহাজে তুলে নাও। কলম্বাস তো তাড়াহুড়োর কারণে সোনার গহনা শুদ্ধ আদিবাসী রমণীদের মুণ্ডুগুলো কেটে আনতে বলেছিলেন। গহনা রেখে সুন্দরীদের মুণ্ডুগুলো পরে জলে ফেলে দেওয়া হয়। কলম্বাসের বয়স তখন ৪৭। যখন লুটপাট। বাঁচবেন আর মাত্র ৮ বছর। এ-দিক থেকে লুটের মাল তোলার ব্যাপারে বিশেষ তাড়া ছিলই বলা যায়।

ক্যাম্পাসের মধ্যে প্রথম যেদিন তাঁর ফ্ল্যাটে এল দ্বীপা।

মিউজিক্যাল বেল-এ যে সুরটা আবিষ্কারের মুহূর্তে বেজে উঠেছিল, ড. পাইন জানতেন

ওটা বেটোফেনের অ্যালিস নামে বালিকার জন্য রচিত ছোট্ট সোনাটার প্রথম ছত্র। রা-রা/রা-রা-রা/রা-রা-রা-রা/রা-রা-রা/রা-রা-রা-রা/রা-রা-রা/রা... এইভাবে পর্বভাগ। সোনাটাটি ছোট্ট বাঁশি পিকোলোতে। কিন্তু মিউজিক্যাল বেল কয়েক মুহূর্তে ঐটুকু পর্বাংশ শেষ হবার আগেই ল্যাচ খুলে সেদিন চৈত্রমাস, আর দুপুরবেলা বিপত্নীকের গুহায় দ্বীপাকে ঝটিতি ঢুকিয়ে নেন ড. পোদ্দার। নরম আলিঙ্গনে মেয়ের-মতো-কিন্তু-মেয়ে-নয় ছাত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে, তাকে দরজা-সংলগ্ন রেখেই দ্বীপশিখার বোতামগুলি তিনি খুলতে থাকেন। বলাবাহুল্য, মেয়েদের শারীরিক অবস্থানগুলোর মধ্যে তাদের বুক দুটিই তাঁর কাছে বরাবর অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে।

ঠিকই যে, দ্বীপশিখা পাইনের স্বাস্থ্যদুটি কেমন, ডা. পাইন ছাড়াও তা বিশদভাবে জানে শ্রীরামপুরের ট্যাংরা ওরফে বর্তমানে বিশিষ্ট যুব-নেতা শুদ্ধশীল ধাড়াও। তারা ইতিমধ্যেই সল্টলেকে কো-অপ-ফ্ল্যাটের চারতলায় উঠে পড়েছে এবং সন্তানসন্ততি ক্রমে আরও উচ্চাতায় যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এভাবে, আমেরিকার সঙ্গে আমেরিগো ভেস্পুচির নাম বৈধতা পেয়ে গেলেও—আসলে তা খ্রিস্টোফার কলম্বাসের আবিষ্কার। কারণ, আগে এলেও জলের ব্রেসিয়ার সরিয়ে ভেস্পুচি দেখেছিলেন শুধু উন্মুক্ত দ্বীপ দুটি। আর, কলম্বাসের কৃতিত্বের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

*বিনোদন বিচিত্রা, শারদ সংখ্যা, ২০০২*

## মাঝে মাঝে কার কাছে যাব

আমার তিন নম্বর প্রেম প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর মহীনের কাছে আবার আমি পুরোপুরি আত্মসমর্পন করলাম। শেষবারের চেষ্টা ছিল তিন বছর জুড়ে এবং তিন-তিনটি বছর আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। তিন বছরে ফোন করিনি একদিনও। না-বাড়িতে, না-অফিসে। রাস্তাঘাটেও যাতে দেখা না হয়, সেজন্য রুট বদল করেছিলাম। অবশ্য, মুখোমুখি পড়ে গেলে আলাদা কথা। তিন-তিন বছর এবার তাও হয়নি।

এর আগের দুবার যখন এমন হয়েছিল প্রথমবার ছ'মাস এবং দ্বিতীয়বারে ঝাড়া একটি বছর পার করে তারপর যোগাযোগ করেছি। তাও ফোন-টোন করে গেছি যে, তা না।

দু'বারই অফিসে ঢোকার মুখে মহীন দূর থেকে দেখতে পেয়েছে আমাকে। কোলের ওপর হাত দুটি জড়ো করে রিসেপশানে আমি চুপটি করে বসে আছি।

ওদের অফিসের রিসেপশান থেকে দূর গেট পর্যন্ত সবটা দেখা যায়। গেটের দু'দিকে দুই পাম গাছ। মধ্যিখান দিয়ে মহারাজকে এগিয়ে আসতে আমি দেখিনি কোনদিন। দেখব কী করে। আমি তো কোলের ওপর রাখা হাত দুটির দিকে চেয়ে থাকি।

ও-ই প্রথম আমাকে দেখেছে। বরাবর। দু'বারই প্রশ্ন একটাই।

'কী ব্যাপার, কতক্ষণ?'

অথচ ছ'মাস দেখা নেই।

আমি অবশ্য তিনবারই সব জানিয়ে, বলে-কয়েই গেছি। এবং একদিনও ফোন

করিনি। আর মহীন তো নিজের থেকে যোগাযোগ করেই না। আমার এসব বিয়োগান্ত গল্প নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি।

প্রথমবার ছ'মাস পরে আমাকে দেখে অফিসে আর ঢোকে-টোকেনি। আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক করে কিছুক্ষণ, ভরদুপুরে তারা দেখার প্রস্তাব করল। তারা মণ্ডলের ভেতরে অবশ্য তখন অমাবস্যার রাত। শুধু গভীর কৃষ্ণ আকাশ আর অমাবস্যার অগুন্তি তারা।

বলল, 'আমার প্রতি তোমার আনুগত্যের পরিচয় দাও।'

যা করতে বলছে, কিন্তু মুখে বলছে না, আমি তাই করলাম। আমি ব্লাউজের তিনটি বোতাম খুলে দিলাম। চার নম্বরটি না হয় ও নিজেই খুলুক।

যতদূর যেতে পারে গেল। আমিও বুঝলাম, কত অনুগতভাবে ও এখনো আমাকে চায়। আমার শরীরকে।তা হোক। তবু আমারই শরীর। ওর বউ গীতিকার নয়।

দ্বিতীয়বারে তো লম্বা ছুটি। এক বছর দু'মাস। আমি তো কবরই না, পরীক্ষা দিচ্ছি। চৌদ্দটা মাসে একটি দিনের জন্যও কি যোগাযোগ করতে নেই? মহীন করেনি। ভাবা যায়?

ঝাড়া এক বছর দু'মাস তেরো দিন পরে রিসেপশানে দেখে শুধু বলল, 'কী ব্যাপার, কতক্ষণ।'

বিকেলে আসতে বলল।

ট্যাক্সি করে নিয়ে গেল সল্টলেকে। ওর বন্ধু রতন বসুমল্লিকের ফ্ল্যাটে। গিয়ে বুঝলাম, বলা-কওয়া রয়েছে। রতন দরজা খুলেই একটুও সময় নেই, এত দেরি করে' বলতে বলতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে কিচেনের ড্রেনের ঢাকনা খুলে মনে করিয়ে দিয়ে গেল, রাবার-টাবার ইউজ করলে কোথায় ফেলতে হবে।

অবশ্য তার দরকার নেই। এবার ফিরে আসতে বছর কাবার হয়েছে। এবার আনুগত্যের ফিস ঢের বেশিই চাইবে। আমারও আপত্তি নেই। ছিলও না কোন দিন। আমি ইনস্ট্যান্ট ট্যাবস নিয়ে গিয়েছিলাম।

রতনের ফ্ল্যাটে আগেও এসেছি। তবে তখন ও ব্যাচেলর ছিল। ও যাকে বিয়ে করল, সেই সুষমার সঙ্গে রতন ও-ঘরে। আমরা এ-ঘরে। রতন পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলত, 'ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।' সঙ্গে সুষমার খিলখিল হাসি। যেই-না সিঁদুর পরল মাথায় সুষমা সব বন্ধ করে দিল। ওটা রাতারাতি হয়ে গেল গেরস্ত বাড়ি।

তখন আমিই বরং খোঁচাতাম ওকে।

'এ তো খালি রেস্তরাঁয় খাচ্ছি আর মোটা হচ্ছি। রতনের বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে। অন্য ব্যবস্থা কিছু করো। সপ্তাহে অন্তত একদিন না হলে গা গুলোয়।'

কাগজের অফিস। ওর ডেস্কে কাজ। রোজই নাইট ডিউটি। মেয়ের স্কুল বাস আসে দশটায়। একই স্কুলের মহীনের ইতিহাসের টিচার গীতিকা খানিক আগেই স্কুল বাসে উঠে পড়ে। ওই মাঝখানের সময়টা না জলপাইগুড়িতে যখন সকন্যা গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ওর বউ বাপের বাড়ি যায়—মহীন বহুবার বলেছে আমাকে যেতে। এইসব সরকারি ফ্ল্যাটবাড়ির মৌচাকের কোন গর্তে কে ঢুকছে আর কে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেইবা খবর রাখছে। খুন করে খুনী বেরিয়ে গেলেও তো কেউ জানতে পারে না।

কিন্তু গীতিকা আর ঝুমির অবর্তমানে আমি কখনও যাইনি। বলেছি, না, ওটা তোমার বাড়ি। রতনের ফ্ল্যাটে যেতাম। সুষমাও তো যেত তখন। কিন্তু যেই বিয়ে হল—দেখলে না!'

ওদের ফ্ল্যাটে প্রথম যেতে তিন বছর লেগে গেল। যখন ঝুমির স্কুল ফাইনাল। মাইনে নিতাম না। ফাইনালে অংকে লেটার পেতে ওর বউ আমাকে দিয়েছিল বালুচরি শাড়ি। জিমিজ কিচেনে সেলিব্রেট করেছিলাম আমরা তিনজনে। মহীন ছিল না। ওখানে গীতিকাদি যখন আমার হাত দুটো টেনে জোর করে পরিয়ে দিল বি. সরকারের দোকান থেকে কেনা সবুজ আর লাল মিনে করা দু'গাছা রুলি, হাত থেকে মেটালের ড্রাগনমুখো তিব্বতি বালাটা খুলিনি কিছুতেই। ওটা কালিম্পঙের কিউরিও শপ থেকে কিনে এনে মহীন আমাকে দিয়েছিল ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪। আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় বছর। সেই থেকে শাঁখার মতন পরে আছি।

কিন্তু বউ-মেয়ের অবর্তমানে আমি মহীনের ফ্ল্যাটে কখনো যাইনি। আসলে কাউকে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া আমার স্বভাবে নেই। তিন-তিনবার তিন-তিনজন পুরুষের সঙ্গে আমার বিবাহ-প্রয়াস চলেছে আপ্রাণ, আমি মহীনের সঙ্গে কোন প্রকার, প্রত্যক্ষ তো নয়ই, পরোক্ষেও কোনও যোগাযোগ রাখিনি তো। তা সে ছ'মাস, দু'বছর বা তিনবছর যতদিনই হোক।

এক সঙ্গে দু'জন? ছিঃ।

আমার তৃতীয় উদ্যোগ ফ্লপ করতে, আগেই বলেছি, সময় লাগে দু'মাস কম তিন বছর। ইতিমধ্যে একটা গোটা শতাব্দীর শেষ দিন বলেই বোধহয় মহীন আর পারেনি।

সেদিন ফোন করেছিল বাড়িতে।

আমি বললাম (গলা নামিয়ে), 'কী বলছ বলো? ও তো এখানে বসে।'

'ও?'

'ইন্দ্র। আজ বাড়িতে জানাতে এসেছে।'

ওদিক থেকে শুধু মহীনের নিঃশ্বাসের শব্দ। একবার মনে হয়েছিল, এত জোরে আর এমন থেমে থেমে শ্বাস তো আগে নিত না, যা টেলিফোনে এমন সাঁ-সাঁ শব্দে শোনা যায়। কিন্তু, তখন ইন্দ্র এসেছে বাড়িতে। বউদি দাদা তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করছে। এ নিয়ে ভাববার তখন সময় নয়।

'কী বলছ, বলো? আমার বিয়ের নোটিশ দিয়েছি।'

ও পাশে থেকে শুধু, বুনোহাঁস পাখা মেললে যেমন, পাজর ঝাঁপটার সাঁই-সাঁই শব্দ। তবে, মহীন যতক্ষণ না কেটে দেয়, আমি রিসিভার ছাড়িনি।

প্রায় তীরে এসে এ তরীটাও ডুবে গেল। আসলে, ইন্দ্রর আর একটা বিয়ে আছে, যা সে শেষ মুহূর্তে বলল।

হিস্টেরকটমির পর থেকে ওর স্ত্রী যৌন-অক্ষম। ডিভোর্স দেয়নি এবং দেবেও না। এক্ষেত্রে, বলি-বলি করেও ও যা বলতে পারেনি, আমি যদি লিভ-টুগেদার করতে রাজি হই তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। আমার সঙ্গেই থাকবে। ওর একটা আলাদ ফ্ল্যাটেও আছে। ফ্ল্যাটটা আমার নামে, লিখে দেবে। ফ্ল্যাট ছাড়া ওর একটি পুত্র সন্তানও আছে।

এবার দু'বছর দশমাস দশদিন পরে ওর অফিসে এসেছি। আজ হোক, কাল হোক, আনুগত্যের দাম এবার বেশ মাঙ্গা পড়বে। ওরালে রাজি হইনি আগে। এবার হয়তো সেই মূল্য দাবি করবে।

ভিজিটর্স রুমে বসে আছি তো আগেই। অনেকের ভিজিটরই এসে দাঁড়াল এবং বেরিয়েও গেল। আমি অবশ্য চোখ তুলিনি। নতুন জুতো পরে এলেও, মহীনের পা? সে আমি ঠিকই চিনব। শেষে রিসেপশান জানাল, মহীন হালদার মাসখানেক হল ছুটিতে।

সামনেই পুজো। ফি বছর সপরিবারে কোথাও না-কোথাও যায়। এবার একটু আগে-

আগেই বেরিয়ে পড়ল নাকি?

অপারেটর অঞ্জলি সেন আমাকে চেনে। আমাদের বহু কথাবার্তা আঁড়ি পেতে শুনেছে এবং অনেক গোপন অ্যাপোর কথাও জানে। কানেকশান দেবার আগে একবার জানতেও চেয়েছিল, জোকার ফারুকস রিসর্টটা কেমন এবং আমাদের চেনাজানা কিনা। চার্জই বা কত।

আজ অফিসের ইন্টারকমে অঞ্জলি বলল, 'ওমা, আপনি জানেন না? উনি তো হসপিটালাইজড। ওর লাং-টিউমার'। একটু চুপ করে থাকে, গলা নামিয়ে, 'ম্যালিগন্যান্ট'।

এবার মহালয়া থেকেই বৃষ্টি। আজ সকালে কিছুক্ষণ ধরে শেষ জলটুকু নিঙড়ে দিয়ে আকাশ আবার নীল হয়েছে। ফুরফুরে মেঘের দল আবার দেখা দিয়েছে। পিজির উডবার্ন ওয়ার্ডের সামনে ভিজে গাছ থেকে নেমে এসে বিকেলের রোদে এক্কা-দোক্কা খেলছে দুটি চড়াই।

দোতলায় ভিজিটরদের জন্য ঘেরা বারান্দায় গীতিকাদি চুপ করে বসেছিল। আর কেউ ছিল না।

আমি পাশে গিয়ে বসতে ঘর দেখিয়ে বলল, 'এখুনি আসবে। সিটি স্ক্যান করতে,' নিজের মাথা-দেখিয়ে, 'নিউরোলজিতে নিয়ে গেছে'।

'মাথা?'

'মাথাতেই। লাং-এ সেকেন্ডারি স্টেজ'।

আমি শেষ টেলিফোন মহীনের শ্বাস টানার সাঁই-সাঁই শব্দ শুনতে পেলাম।

একটা ট্রলি বেরুচ্ছে লিফট থেকে। নার্সের হাতে উঁচু করে ধরা বোতল থেকে ডিপ, মুখে অক্সিজেন মাস্ক। ট্রলি ঘরে ঢোকার সময় এক পলক দেখতে পেলাম মুখটা সবুজ।

সঙ্গে একজন নয়, দুজন ডাক্তার।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমি বসে পড়লাম। গীতিকাদি বলল, 'যাও। যাও না তুমি। তোমাকে ও খুঁজেছে।'

আমার নার্ভাস হতে যেটুকু বাকি ছিল 'তোমাকে ও' খোঁচাটুকুতে তা সম্পূর্ণ হল।

'আপনিও চলুন।'

'না।' সাইডব্যাগ খুলে একগোছা ইনল্যান্ড বের করে আমার হাতে দিল গীতিকাদি, 'আজ সকালে তোমার ফোন পেয়ে এগুলো নিয়ে এলাম। ওর অফিসের ড্রয়ারে ছিল এতদিন।'

ইন্দ্রর সঙ্গে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে—এমন সময় ওর ফোন পেয়ে আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কাঁচিয়ে দেবে নাকি, খোঁজখবর করে! যদিও জানতাম, সে ধাতুতেই তৈরি নয়। তবে সব কিছুরই ভাংচুর আছে। কফিনে শেষ পেরেক মারার মতো তাই ওর লেখা চিঠিগুলো ক্যুরিয়ারে ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেইসব খোলা চিঠি গীতিকাদি পড়েছেন জেনে আমার ভেতরটা হঠাৎ মূক হয়ে গেল।

কোলের ওপর হাত জড়ো করে আর সেখান থেকে চোখ না তুলে আমি বসে রইলাম।

'মারি স্টোপসে' গীতিকাদি বলল, 'তুমি আবোর্সন করাতে গিয়েছিলে? সঙ্গেও ছিল?

মাথা আমার আরও হেট হয়ে এল, কোলের দিকে। সেই অবস্থায় যেন নিজেকে শোনাতেই আমি বিড়বিড় করে বলে গেলাম, 'সে তো আমার সঙ্গে বি.বি.আই ক্লিনিকেও গিয়েছিল। ল্যান্সডাউনে। ডা. ইয়াসিন অ্যাট্রোফিন দেবার আগে বললেন, সঙ্গে লোক আছে তো। সেদিন হাত ধরে আমাকে রাস্তা পার করিয়ে দিয়েছিল মহীন। মহীন

আমাকে—এইখানে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি।

এই সময় নার্স এসে বলল, '৬ নং রুমের ভিজিটর কে কে আছেন আসুন। ডাক্তার বাবু ডাকছেন।

'তুমি যাও শুচিস্মিতা।' গীতিকাদির হাত আমার পিঠে, 'ও তোমাকে অনেক খুঁজছে। এমনকি আমাকেও বলেছে, তোমায় ডেকে আনতে। কিন্তু আমি—

'আপনারা শিগগির করুন।' নার্স বলল, 'সিটি স্ক্যান রুমেই আপনাদের পেসেন্ট এক্সপায়ার করেছে।'

আমার হাত ছেড়ে গীতিকাদি ঘরের দিকে দৌড়ল। ওর সঙ্গে লুটোতে লুটোতে চলল কাঞ্জিভরমের একখানা জমকালো আঁচল।

আমি লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমার সামনের নিচে থেকে উঠে এসে লিফটের আলোকিত দরজা বারবার খুলে যাচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে। ওপরে উঠে যাচ্ছে। বারবার সেই একটাই ছবি লিফটের ভেতরে। একটা ফ্যামিলি অ্যালবাম। বুড়োবুড়ি, ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনী—সব মিলিয়ে জনাকুড়ি তো হবেই। গাদাগাদি ভিড়ে ভীষণ মোটা, মুখ নিচু মেয়েটিই সবার আগে চোখ টানে।

অনেকবার এমন হল। এমনটা হতেই থাকল। জায়গাও নেই। তাছাড়া, লিফটের লোকজনদের আমায় কেমন কিছুতেই পছন্দ হয় না।

তারপর...একবার দেখি, নিচে থেকে উঠে এসেছে বিলকুল ফাঁকা লিফট। দরজা খুলে গেল। কিন্তু এবার লিফট আর ওঠে না।

উঠবে কী করে। লিফটম্যানই নেই। ব্রিটিশ আমলের বিশাল ও কারুকার্যময় ওক কাঠের লিফট। এক এক ট্রিপে কুড়িজন তো ধরেই। এসব লিফট অটোমেটিকে চলে না।

হঠাৎ দেখি, ভোরের আলোর মতো অনুজ্জ্বল, এক অদ্ভুত আঁধারের মধ্যে, লিফটের ভেতর, কলির কেষ্টটির মতো দু'পা মুড়ে মহীন দাঁড়িয়ে।

তার সর্বাঙ্গ থেকে পাইডার-মিনি মাটি ঝরে পড়ছে ঝুরুঝুরু।

জীবনের শেষ অভিব্যক্তির মতো তার মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে।

লিফ্‌ট ওঠাবার পেতলের হ্যাণ্ডেল তার মুঠোয়।

মহীন বলল, 'ওপারে যাবে না?'

*যুগান্তর। ঈদ সংখ্যা*

## তৃতীয় চক্ষু

মানুষের চোখ কিন্তু দুটো নয়। মানুষের চোখ তিনটে। আর এই তৃতীয় চক্ষু নয় কোনও আন্দাজি ব্যাপার।

যেমন ধরো, স্বপ্ন। দেখি তো আমরা। দেখি না? কোনও চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়? নিশ্চয়ই তৃতীয় চক্ষু। কারণ তখন তো অন্য চোখ দুটি বোজা।

তাহলে এ থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসছে যে, দুটি চোখ আগে বোজাও—এবং ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ে বিদায় দাও দুচোখে যা দেখছ তার সবটুকু। কারণ দু'চোখ ঘুমিয়ে পড়লে তবেই জেগে উঠবে তৃতীয় চোখ। তখন তুমি সেই জিনিস দেখবে, যা দু'চোখে কোনওদিন দেখো নি।

তৃতীয় চোখ যখন দেখতে শুরু করে, তখন কী সেই দেখা—যা দু'চোখে দেখা যায় নি, বোঝা যায় নি?

একজন সন্ন্যাসী এসে পড়েছে রাজদরবারে। দরবার চলছে। সিংহাসনে রাজা। তাঁকে ঘিরে পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী সেনাপতি, সভায় হাজির দেশের মান্যগণ্যরা। গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে আলোচনা ও আদেশদান করে রাজা উঠলেন। সভাও খালি হয়ে গেল।

চলে যেতে যেতে রাজা হঠাৎ দেখলেন, এক সন্ন্যাসী কম্বল পাতছে সভার একধারে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজা বললেন, কী ব্যাপার, আপনি বিছানা পাতছেন যে?

সন্ন্যাসী : রাতটা এখানে কাটাব স্থির করেছি মহারাজ।

রাজা : কিন্তু এটা কি সরাইখানা? এ তো রাজদরবার।

সন্ন্যাসী : মহারাজ?

রাজা : হ্যাঁ, বলুন।

সন্ন্যাসী : নির্ভয়ে বলি?

রাজা : আরে বলুন-বলুন! আমার সময় নেই।

সন্ন্যাসী : মহারাজ, আপনার আগে এ রাজ্যে কে রাজা ছিলেন?

রাজা : কেন, আমার পিতা?

সন্ন্যাসী : তার আগে?

রাজা : আমার পিতামহ।

সন্ন্যাসী : তার আগে?

রাজা : আমার প্রপিতামহ।

সন্ন্যাসী : তার আগে কে রাজা ছিলেন মহারাজ?

রাজা : আমার প্রবৃদ্ধপিতামহ। আঃ, আপনি কি বলতে চান?

সন্ন্যাসী : বিরক্ত হবেন না মহারাজ। এবার শুধু বলুন, আপনার পরে কে রাজা হবেন?

রাজা : কেন আমার পুত্র।

সন্ন্যাসী : তারপরে?

রাজা : আমার পৌত্র। তার পরে আমার প্রপৌত্র। তারপরে...

সন্ন্যাসী : হয়েছে, হয়েছে।

রাজা : এবার খোলসা করে বলুন দিকি আপনার মতলবখানা কী? কী বলতে চান আপনি?

সন্ন্যাসী তখন হেসে বলল, মহারাজ যে সভাকক্ষে অতীতে এতগুলো লোক যাতায়াত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে—তাকে সরাইখানা ভেবে আমি কি খুব ভুল করেছি?

শুধু দুটি চোখে এ জিনিস চোখে পড়ে না। রাজসভা সরাইখানা হয়ে দেখা দেয় শুধু তৃতীয় চক্ষুর সামনে।

এই জন্যে রূপসী বাংলার কবি বলে গেছেন, 'যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।'

ঠিক দু'চোখ দিয়ে নয়, সমস্ত সুন্দরকে দেখতেই এই তৃতীয় চক্ষু লাগে। এবং দেখতে হয় ব্রেল পদ্ধতিতে, চোখ বুজে। শুধু সুন্দর নয়, সুন্দরীকে দেখার পদ্ধতিও এই একটাই।

*পত্রপাঠ, শারদীয় ১৪০৮, ২০০১*

# হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

—বাবা?

— হ্যাঁ। বলরে।

— তোমাদের অ্যাফেয়ারটা কতদিন চলেছিল?

— কতদিন? হ্যাঁ, তা মাসছয়েক তো হবেই।

— তুমি নাকি সাসপেন্ড হয়েছিলে?

— সাসপেন্ড? না তো। কে বলল তোকে?

— ছোটোপিসি ফোন করে বলল একদিন।

— কী বলল।

— ওই তোমাকে নিয়ে কলেজে স্ক্যান্ডাল।

— না, সাসপেন্ড করার আগেই তো রিজাইন করলাম আমি।

— কেন?

— আরে ওই বাসুদেব মণ্ডল। কলিগ আমার।

— হ্যাঁ-হ্যাঁ। সে তো ছাত্র ছিল তোমার। ডক্টরেট করার সময় পড়ে থাকত বাড়িতে। বাজার করে দিত।

— হ্যাঁ এ সেই বাসু। একদিন কাগজপত্র টাইপ করে এনে বলল, স্যার, রেজিগনেশন দিন। তাহলে কমিশন বসবে না। কেসটাও পুলিসে যাবে না।

— তুমি অমনি রেজিগনেশন দিলে!

— দিলাম। কারণ কমিশন হলে রিপোর্ট কী বেরুবে সে তো জানাই ছিল। আমি না রিজাইন করলে, সাসপেণ্ড না হলে, বাসু আমার চেয়ারটা পায় না। কমিশন হলে ও-ই তো তার চেয়ারম্যান হত। এর আগে একবার আমাকে পাগল সাব্যস্ত করার চেষ্টায় ছিল। চাঁদনিতে ডাক্তার বিভূতি হাড়ির চেম্বারে গিয়ে জেনে এসেছিল আমার কীসের চিকিৎসা হচ্ছে। তখন ক্লাসে একটু আল-ফাল বলে ফেলছিলাম তো। পড়াচ্ছি অশোক বলে যাচ্ছি এমপিডোক্লজ। ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি করত। করিডোরে দেখলে গা-টেপটেপি করত। মেডিক্যাল লিভ নিয়ে আমি যে ব্যাঙ্গালোরে ডাঃ নাম্বিয়ারের মেন্টাল ক্লিনিকে ছিলাম সে খবরও রাখত বাসু।

— তারপর এই ব্যাপারটা যখন জানাজানি হল—

— ব্যাপারটা তো ছিল খুবই ব্যক্তিগত লেভেল। আমাদের দু-জনের ব্যাপার। স্ক্যান্ডালের পর্যায়ে নিয়ে গেল তো বাসুই। যে সাপের কামড় দিল, সে-ই আবার ওঝা হয়ে এসে বলল, সব ধামা চাপা পড়ে যাবে। এনকোয়ারি—টোয়ারি। যদি সই করি। যদি রেজিগনেশন দিই।

— তুমিও সই করলে?

— হ্যাঁ। তখন তো চারিদিকে আগুন। ধ্বংসের হাত থেকে তো আগে বাঁচব?

— ধ্বংস? কীসের ধ্বংস বাবা? উইদাউট কনসেন্ট তো হয়নি। অ্যাডাল্ট মেয়ে। রেপ তো হয়নি। ছাত্রীর সঙ্গে প্রফেসরের অ্যাফেয়ার থেকে যদি প্রফেসরের ধ্বংস হত তাহলে হাঃ—তাহলে পৃথিবীতে প্রফেসর বলে কিছু থাকত না। ইউনিভার্সিটিগুলো উঠে যেত। মেয়েটার দিক থেকে কি কোনও কমপ্লেন ছিল?

— না। কমপ্লেন করেছিল ওর লাভার।

— আমি সব শুনেছি ছোটোপিসির কাছে। তখন রোজ ফোন করত। কী নাম ছিল যেন ছেলেটার?

— ফিরাদ। ফিরাদ হুসেন।

— না-না। আসল নামটা? লোকে কী বলে ডাকে?

— ট্যাংরা।

— গুডনেস! হোয়াট এ স্টিংকিং নেম। ট্যাংরা! যা বলার সব তো নামটাই বলে দিচ্ছে। তা কী টার্মস-এ সেটলমেন্ট হল?

— টার্মস? হ্যাঁ। ওয়ান রেজিগনেশন। টু আমার গ্র্যাচুয়িটির টাকা। সব রূপা পাবে।

— ওর নাম রূপা?

— রূপবীথি ঘোষ। রূপা আমি ডাকতাম। ট্যাংরা ডাকত বীথু বলে।

— গ্র্যাচুয়িটির টাকা! সে তো অনেক।

— হ্যাঁ। তা ২২ বছরের চাকরি। ২২ মাসের লাস্ট বেসিক ড্রন।

— সে তো তিন-চার লাখ টাকা। তুমি রাজি হলে?

— কী করব বল। আমার বয়স আটান্ন। রূপার একুশ। তোর চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। বাসুই ব্যবস্থা করল।

— কীসের ব্যবস্থা বাবা? হয়েছিলটা কী? রেপড হয়েছিল, না প্রেগনান্ট হয়েছিল? অ্যাডাল্ট মেয়ে ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট। একবার ফেল করেছে। ওরা কী কোর্টে যেত? ওর বাবা মা কী বলছিল?

— ওর বাবা এসেছিলেন একদিন। কর্পোরেশনে কাজ করেন। কনজারভেন্সি সুপারভাইজার। একেবারেই চেপে যেতে চাইছিলেন। স্ক্যান্ডালের ভয়ে। ওঁরা চান মেয়ের বিয়ে দিতে। ওঁরা, আমি রাজি থাকলে আমার হাতেও তুলে দিতে রাজি। তুব ট্যাংরা নয়। ট্যাংরাকে জামাই হিসেবে ভাবতে পারেন না পরেশবাবু। ট্যাংরার ছেলেমেয়ে ওঁকে দাদু বলে ডাকবে আর ওঁকে সাড়া দিতে হবে ভেবে কেঁদেই ফেললেন।

— আমি বুঝতে পারছি না তাহলে কেন এত টাকা....

— একদিন তাজা খবর থেকে লোক এল।

— তাজা খবর?

— টিভির স্ক্যান্ডাল চ্যালেন।

.... সেটা শুনেই তো বোঁ বোঁ করে উঠল মাথার ভেতরটা। হলুদ বোলতাগুলো ঘুরতে শুরু করল মাথার চারপাশে। বলতে লাগল, কাকু! ঢুকতে দাও আমাদের। চাকে ঢুকতে দাও! বলে আটান্ন কেন — আটষট্টি বছর বয়েসেও আমার রূপার সঙ্গে শুয়ে থাকতে চাই। আর তখনও ওর বয়স ২১ থাকা চাই। চির-একুশ রূপাকে ভোগ করে আমরা তার ওপর হলুদ মৃত্যু হয়ে হলুদ ফুলের মতো ঝরে যেতে চাই। আমরা তা-ই চাই আর সে অধিকার আমাদের কেন নেই। কেন নেই। কেন নেই। বোঁওওও! বোঁওওও! বোঁওওও!

— বাবা?

— হ্যাঁ।

— কী ভাবছ। উত্তর দিচ্ছে না যে?

— না-না বল। কী বলছিস বল?

— তুমি কি রূপাকে ভালোবাসতে?
— নানা।
— রূপা তোমাকে?
— না-না, সেসব না। ও খানিকটা ভুল করে ঢুকে পড়েছিল ব্যাপারটার মধ্যে।

...মনে কর একটা খরগোশ। চোখদুটো ইয়া বড়ো আর লালচে। চোখের পাতার ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে তাকাতো যখন, সেই রকমটাই তো মনে হত। অক্ষম আর বৃদ্ধ জেনে কৌতূহলবশতই ঢুকে পড়েছিল নেকড়ের গুহায়। ঢুকে বুঝেছে ভুল হয়েছে। এদিকে পালাবারও শক্তি নেই। নখে-দাঁতে নিজেকে ছেঁড়াবার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আজ না হয় কাল তো যেতেই হবে। আজই হয়ে যাক না! ওর ভাবখানা ছিল এ-রকম। বাবার বয়সি। বাব না-হোক, বাবার মতো তো বটে। মেয়ে হিসেবেও তো দেখবে একটু। অন্তত গোড়ায় আমি তো সেইরকমই ভেবেছিলাম।

— বাবার বয়সি তুমি। তোমাকে পছন্দ তো করেছিল। কিন্তু কী করে!
— সেই কথাই তো বলছিলাম।
— কী বলছিলে?
— বলিনি? ও, না হ্যাঁ।
— না-হ্যাঁ, কী আলফাল বকছ?
— না-না। কী যেন বলছিলি তুই?
— তোমাকে পছন্দ করল কী করে। বাবার মতো তুমি।
— বাবার মতো? গোড়ায় একদিন সেই কথাই তো বলেছিলাম। আমি তোমার বাবার মতো। শুনতে স্মার্ট লাগবে বলেই চোখে একটা কটাক্ষ টেনে এনে বলেছিল, বাবার মতো। কিন্তু বাবা তো ন-অ-অ-য়!

...বাবা তো নয়। আবার বাবাও! তাই ভুল করে প্রথম দিন ঠোঁটে চুমু খেতে গেলে ঠোঁট ফাঁক করল না। কপালে নিল। এবং মাথায়। মেয়েদের শরীরে বুক দুটিই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। অথচ তারই আন্দাজ নিতে হল ব্রেসিয়ারহীন আঁটোসাঁটো ব্লাউজের ওপর দিয়ে। হাত ঢোকাতে দিল না। মুখ আগাগোড়া ঘুরিয়ে রাখল। যদিও আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকল্ সবসময়।

— মেয়েটা বলল ওই কথা?
— কী কথা বলতো?
— ওই যে।
— কী যে।
— বলল, 'বাবা তো ন-অ অ অ-য়?
— তাই তো বলল।
— তাহলে তো আমি যা ভেবেছি ঠিকই। শী ইজ আ হোর। বাই অল মিন্‌স।

... হোর? না-না। বিপত্নীকের যৌন—সমস্যার সমাধান করতে আমার কাছে আগে যারা এসেছে, তারা হোরই ছিল বটে। একজনের সঙ্গে ছিল মাসকাবারি বন্দোবস্ত। তুই

তো মা মারা যাবার বছর না ঘুরতেই কম্পিউটার বাফ উন্নিকৃষ্ণানের সঙ্গে পালিয়ে এলি কেরালার এই ফোর্ট কোচিতে। যোগাযোগই রাখলি না মায়ের বিছানায় শান্তির সঙ্গে আমাকে রেখে। আরে, শান্তি-ফান্তি কেউ না। ওর সঙ্গে তোর বাহান্ন বছরের বাবার ছিল একটা মাসকাবারি বন্দোবস্ত। মাইনে পেত মাসে মাসে। ফোনে ডাকা যেত। আর ডাকলেই চলে আসত মানে যখন তুই নেই তখনই তো আসতে বলতাম। এলে পার শট পঞ্চাশ বোনাস। বাহান্নায় বিপত্নীক, তোর বাবার তখন মুরগির সন্ধানে কঁক-কঁক মোরগের অবস্থা। হতে পারি জন হপকিন্সের ডক্টরেট। পায়খানা পেচ্ছাপ সেক্স এগুলোয় তো ডক্টরেট করিনি। এগুলো তো আর পাঁচজনেরই মতোন। নাকি?

— না-না হোর নয়। ওহ্ নো। নট অ্যাট অল। দ্যাটস নট হোয়াট শী মেন্ট অ্যাট অল।

...সেই প্রথম একজন এল যার কাছে আমি টিউশন ফি চাইতে পারতাম। কারণ সে এল শুধু নিরাপদ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে। শিক্ষিত হতে। প্রথম যেদিন জানতে চাইলাম, আচ্ছা—এই কি তোমার প্রথম। ঠোঁট-টোট ফুলিয়ে সে কি ফুঁপিয়ে কান্না। অবশ্য আমারই ভুল। শুধু ভার্জিন ঠোঁটই অমন লাল হয়ে ফুলে উঠতে পারে। প্রথম চোটে ওর কান্না-লাল চোখ দুটো, আঁখিপল্লবের ঝোপের মধ্যে সত্যিই দেখাচ্ছিল বাচ্চা খরগোশের মতো। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে জীবনের প্রথম অর্গাজশের আনন্দে ওর ভেতরটা তিরতির করে কেপেই চলেছে।

— তা বাবা-মা'র অভিযোগ নেই। মেয়ের অভিযোগ নেই। এনকোয়ারি হল না। এফ আই আর-ও হয়নি। অ্যাফেয়ারটা নষ্ট হল কেন?

— ওই যে, রূপা একদিন ভুল করে ব্যাপারটা বলে ফেলল শ্রেয়াকে।

...একবার, একদিনের ব্যাপার তো নয়। টুকটুক করে খরগোশ তো প্রায়ই আসত। ছাল ছাড়াতে ছোট্ট করে কড়া নাড়ত। যাতে অন্য ফ্ল্যাট শুনতে না পায়। বেল দিত না। পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে বলত শুধু একটু কথা, 'যাব?'

আমি ঃ এসো।

— ক-টায়?

— আড়াইটেয়। ঠিক আড়াইটেয়।

যাদবপুর থেকে কাঁকুড়গাছিতে আসতে গিয়ে কতদিন আগে এসে পড়েছে। রাস্তায় বাসস্টপে টিনের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘেমে চান করেছে। তারপর ঠিক আড়াইটেয় কুট কুট কট। তিনবার নক। সেই রূপাই একদিন টাকা চাইবে, কে জানত।

— কী বাবা। চুপ করে আছো যে।

— কী বলব।

— ওই যে যা জানতে চাইলাম।

— কী জানতে চাইলি?

— অত টাকা দিতে হল কেন?

...একদিন ক্যাম্পাসের মধ্যে, অবশ্য তখন আর কেউ ছিল না, ভাগ্যিস—কলেজের

ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—অন্ধকার আর্টস বিল্ডিং-এর লেডিজ বাথরুমের মধ্যেই ভুল করে ঢোকাল আমাকে ফিরাদ। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'এই শালা। তুই আমার লাভারকে ঝেড়েছিস?' তার আগে আমি ওকে দেখিনি। ও-ই যে ট্যাংরা তা-ও জানি না। তাই আরও ভয় পেলাম। যে, কে এ। ব্যাপারটা কতদূর জানাজানি হয়েছে। তবু কে। তোমার লাভার জানতে চাইতে জামার কলার ধরে রেখে বলল, 'বীথু রে। রূপবীথি! কিন্তু যেই না আমি জানতে চেয়েছি তুমি কে ও আমার ফ্লাই এর চেন একটানে নামিয়ে দিচ্ছে দেখি। 'আমি ট্যাংরা। তোর বাবা বে।' এর পর আমার রেজিস্টান্ট বলতে কিছুই থাকল না। রেজিগনেশন না দিয়ে উপায় রইল না।

— বাবা?

— হ্যাঁ, বল।

— অত টাকা দিতে হল কেন?

— টাকা তো রূপাই চাইল। বলল, এই কেলেঙ্কারির পর সে আর কলেজে আসতে পারবে না। কলকাতায় থাকতে পারবে না। ফিরাদের সঙ্গে রাণীগঞ্জ চলে যাবে। টাকা ফিরাদই চাইছে। রাণীগঞ্জে ও একটা ই-মেল পার্লার খুলবে। প্লাস ফ্যাক্স অ্যান্ড এস টি ডি। ওখানে এর আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা সাহায্য করবে। নিকা ওখানেই হবে।

—বাবা?

— বলরে বুড়ি।

— কত বছর পরে এলে মেয়ের কাছে?

— পাঁচ বছর।

— খোঁজ নাওনি।

— না।

— রাগ করেছিলে?

— হ্যাঁ। তুই পালিয়ে এলি কেন, আমার মুখ পুড়িয়ে। একটা মেয়ে ফ্ল্যাটে থাকত। হঠাৎ উধাও। কী বলব আমি লোককে।

— একদিনে আমার এক-জীবনের ঘেন্না ধরে গিয়েছিল তোমার ওপর।

— ঠিক আছে। ঠিক আছে। আই এগ্রি। কিন্তু বিয়েটা তো ওখানেই করে আসতে পারতিস।

— উন্নি কিছুতেই রাজি হল না। বলল, সব কোট্টায়মে হবে। এনে তুলল, এনার্কুলামের এই দ্বীপে, ফোর্ট কোচিতে। অবশ্য ব্রিজ দিয়ে রেল ওখানে আসে। আর পাবলিক টান্সপোর্ট বলতে তো স্টিমার, যাতে তুমি এলে।

— শুনেছি আমি সব।

— কার কাছে শুনলে?

— কেন, তোর ছোটোপিসির কাছে?

— কী বলল ছোটোপিসি? আমি বারণ করেছিলাম বলতে।

— বলল, উন্নির বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে। তারা ওকে কোট্টায়মে নিয়ে গেছে। সব শুনে ফোন করেছিলাম আমি তোকে।

— হ্যাঁ। আমি যাচ্ছেতাই বলেছিলাম তোমাকে। ফোন কেটে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম তোমার মতো বাপের মেয়েরা এন্ড আপ ইন আ ব্রথেল। আমি তো তবু অনেক ভালো আছি ভদ্রভাবে আছি।

— তোর চলে কী করে।

— ওই! একটা পারিবারিক ফুলের দোকান ছিল ওদের। মাত্তানচেরি ফ্লাওয়ার শপ। মাত্তানচেরি প্যালেসের গায়ে। বেশ নাম করা দোকান। ওটা আমাকে লিখে দিয়েছে ওরা। বায় ওয়ে অফ অ্যালিমনি, তুমি বলতে পারো।

— ও। তাই তোর নাম করতে সবাই ফ্লাওয়ার ম্যাডাম বলছিল।

— বাবা?

— কতদিন পরে আবার দেখা হল, না? আই আম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ মাই ডটার। দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ রিসিভড্ ইওর আনফেইথফুল ফাদার।

— বাবা?

— বলরে।

— এখানেই থাকবে?

— থাকব বলেই তো এসেছি।

— আর কোথাও যাবে না?

— না।

— আর কখনো যাবে না? উন্নির মতন আমাকে ছেড়ে যাবে না?

— যাব না।

— বাবা, এখানেই তো প্রথম ভাস্কো ডা গামা নেমেছিল না?

— কাছেই। কালিকটে।

— তুমি আমাকে সেই ভাস্কো ডা গামা থেকে এখানকার হিস্ট্রি বলবে।

— গামা কী রে। তার আগে কত গল্প আছে। সামুদ্রি রাজারা ছিল। হায়দার আলি টিপুর ব্যাপার ছিল।

— তুমি সব বলবে বাবা। এখানে তো চারিদিকে শুধু ব্যাক ওয়াটার। ন্যাচারাল পোর্ট। বলে ওয়ার্ল্ডস বেস্ট। কতো বড়ো বড়ো জাহাজ। কাল সকালে দেখবে। সন্ধেবেলা তো কিছুতেই দেখতে পাওনি বাবা?

— ওঃ। আর কত বাবা বলবি।

— বাবা-বাবা-বাবা-বাবা। একশো বার বলব। আমার একমাত্র বাপি বলে কথা।

— আরে, ছাড় ছাড়।

— না, ছাড়ব না।

— রান্নাবান্না কখন করবি?

— সব করা আছে।

— কখন করলি?

— হোটেল সব করে রেখেছে। উই উইল ডাইন আউটসাইড।

— বাবা? সেই কিং লিয়ারের গল্প শোনাতে মনে আছে। কিং লিয়ার আর তার ভালো মেয়েটার কী নাম?

— কর্ডেলিয়া।

— তারাও তো শেষকালে ছিল এমনি একটা দ্বীপে। না বাবা? ছুঁয়ে আছো আমাকে। বলো কোনওদিন ছেড়ে যাবে না।

— যদি ওরা এখানেও হানা না দেয়। তাহলে না।

— ওরা? ওরা কারা বাবা? ওরা কারা, ও বাপি!

...ওই যে বোলতাগুলো। ওই যে, এসে গেছে। বোঁ বোঁ করে এখন ঘুরছে আমার

মাথার চারদিকে। বলছে, চাক খুলে দাও, কাকু, চাক খুলে দাও। আমার মাথাটাও কেন যে বোলতার চাক হয়ে যায়, যেই ওরা বলে। ওই! বন্ধ ফুটোগুলো এক এক করে খুলে যাচ্ছে। এক এক করে গাঁ গাঁ শব্দে ওরা ঢুকে পড়ছে চাকের দখল নিতে। যত ঢুকছে, হলুদ মৃত্যু হয়ে তত ঝরে পড়ছে মাথার ভিতরে। ঝরুক, ঝরুক। ওরা ঝরুক রে বুড়ি। ওদের ঝরতে দে। মাথার ভিতরে শব্দহীন অন্ধকার জ্যোৎস্নার ভিতরে, ওরা যত ঝরবে তত ভালো। আমি ততই সেরে উঠব। তোর দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবা তোর জন্যে ততই দায়িত্ববান হয়ে উঠবে।

২০০১

## ডাবল বেডে একা

বিভাস মারা গেল ভোরবেলায়, একা-একা। একা? হ্যাঁ, একা। যুদ্ধবিগ্রহ, কি মড়ক-. টড়ক হলে আলাদা। অন্যথায়, একাই তো মরতে হয় মানুষকে। এক এক করে। আসলে বিভাস যখন মরতে থাকল, কেউ তার পাশে রইল না। কেউ তার সাক্ষী রইল না।

বিভাসদের ফ্ল্যাটে ঘর বলতে দুটো, যার মধ্যে বেডরুম একটিই। পাশের ঘরটি বেঠকখানা। সেটারই দিনের বেলায় বহু নিতম্ব-নিন্দিত প্রকাণ্ড সোফাটি রাত্রে ডাবল বেডে রূপান্তরিত করে সে একাই শুতো। মেয়ে বিয়ে করে বাঙ্গালোরে চলে গেলে প্রশ্ন উঠেছিল যে তাহলে আর দু'ঘরে কেন দুটো পাখা সারারাত? মিছিমিছি বিল বাড়ে।

কথাটা তুলেছিল নীলাই। মেয়ে তিথি তত বড় হবার আগেই, সে তাকে নিয়ে পাশের ঘরে শুতে শুরু করে, কারণ মেয়ে তো আর বৈঠকখানায় শুতে পারে না। বহুবছর ধরে আলাদা ঘরে শুতে শুতে তারা, আলাদা বিছানা তো বটেই, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর আলাদা ঘরে শোবার ভাল দিকটাও বিলক্ষণ টের পেয়েছিল। বিশেষত নীলা। মেয়ে চলে যাবার পরেই সে প্রথম জানতে পারে, একখানা ডাবল বেড কার্যত এত বড় হয় এবং সেখানে সারারাত একা শুতে পেলে, স্বাধীনভাবে একা শুতে পেলে যে এত প্রাপ্তি তা আগে কে জানত। এক-একটা ঘুম তো নয়, গাওয়া ঘিয়ে ছাড়া যেন লুচি এক-এক খানা। ফেলেছ কি ফুলেছে। হায় যে, কৌমার্য আর ফেরার নয়। কিন্তু কুমারী বেলার সেই সব অতল ঘুমের আহবান আবার ফিরে এসেছিল। ডাবল বেডে এই যে একা, বিধবা হবার আগে এর মজা অনেক স্ত্রীই জানতে পারে না। কিন্তু, তখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ তখন তো বিধবা। তখন তো অপসনই নেই।

এই যেমন এতদিন চলছিল। মাঝে ছুটিছাটা থাকলে বা কোনওদিন দুজনেই মদ খেয়ে এলে আলাদা। সপ্তাহে একটা র‍্যাশন তোলার ব্যাপার এখনও আছে। খানিকক্ষণ এক ঘরে কাটিয়ে, যে যার ঘরে চলে গেলেই হল। তাই ইলেকট্রিক বিলের কথাটা অযৌক্তিক না মনে হলেও বিভাসের কেন, ঠিকই তো আছে, শুনে নীলা আর কথা বাড়ায়নি।

কিন্তু হল কি, ৩ আগস্ট ভোরবেলা ছিল রুমাল, সে হয়ে গেল একটা বেড়াল। বিভাস হঠাৎ মরে গেল।

হঠাৎ কী আর, সেই অর্থে। লেডিজ সিটে বসে চলেছে। লেডিজ এলে উঠে দাঁড়াতে হবে না?

খুব ভোরবেলা, তখন ৪টে-১৫, আলো জ্বেলেই ঘড়ি দেখেছিল বিভাস। পেচ্ছাপ করতে করতেই গলগলিয়ে ঘামতে শুরু করল সে, সারা গা শব্দহীন ঘামে ভরে যেতে লাগল, যত্র তত্র থেকে ঘাম বেরুচ্ছে ফিনকি দিয়ে, দেখল। এমন কি, শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালে যেমন, মাথার চুল বেয়ে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল টপ টপ করে।

খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সে দেখল, সে কেমন নেতিয়ে পড়ছে, তার ভেতরে হাড়ের কাঠামোটা আর নেই যেন, নীলাকে যে শুধু ডাকতে পারছে না তাই নয়, নীলার নামটাই সে মনে করতে পারছে না। স্বপ্নে এমন সবারই হয়, ভয় পেয়ে চিৎকার করলেও স্বর বেরোয় না গলা দিয়ে। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? নাকি, সারাজীবন বিপদগ্রস্ত হতে হতে শেষে যে বিপদ আসে, সেই শেষ বিপদটাই এসে পড়ল। যদি তাই হয়, তবে, এতই সামান্য নাকি ব্যাপারটা? মুখে মাথায় কোথাও কোনও যন্ত্রণা হবে না, শুধু বরফের গা থেকে বেরনো অনর্গল ঘামে ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা, কেবলি আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে শরীর। এই শুধু?

এত কম বয়সে। এটা সে ভাবতে পেরেছিল। তারপর বাথরুমের মেঝেয় সে নিজে নিজেই শুয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে, সে দেখল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ একটি মুখোশে পরিণত হয়ে গেল। মুখ তারই, কিন্তু এখন মুখোশ।

এখন সকাল ৭টা। ঘুম থেকে উঠেই ডিডি-৭ চালিয়ে দেয় নীলা। 'সুপ্রভাত' শোনে এবং দেখে। কাগজ আসার আগে সকালের কাগজের হেডিংগুলো সব শুয়ে শুয়েই দেখে নেয়। বাথরুমের দরজায় টোকা দিতে তার সাড়ে ৭টা বেজে যায়।

## ২

— এই শুনছ, তোমার হল?

...আরে বাবা, জোরে ধাক্কা দাও না। ছিটকিনি তো দেওয়া নেই।

...আচ্ছা, ঐসময় পাশে যদি থাকত নীলা, তাহলে ব্যাপারটা কি অন্যরকম হত? বমি হল না তাই, নইলে বমি পেয়েছে বলেই তো তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই নীলাকে জাগাত আর নীলা তাকে ধরে ধরে বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে যেত। এইটুকুই তো হত শুধু আলাদা। নীলা অর নো-নীলা—তার মরে যাবার বাকি ব্যাপারটা নীলা পাশে থাকলেও যা না থাকলেও তা। তবে নীলা পাশে থাকলে ফ্ল্যাট থেকে ফ্ল্যাটে অনেক আগেই জানাজানি হয়ে যেত, কেউ কেউ; যতই অপছন্দ করুক, যদিও ভোর ৪টে,-১৫, অনেকক্ষণ এসে গেছে বৈকি—অনেকে চলেও গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলে ৬-৪০ এর প্লেন ধরে তিথি তো এখন হায়দ্রাবাদে ব্রেকফাস্ট করছে। কানেক্টিং ফ্লাইট ধরতে পারলে হয়তো এ-বেলাই পৌঁছে যেত? অন্তত, আজকের মধ্যে পোড়ানোটা তো হয়ে যেত। এখন বাসি মড়া থাকবে পিস হেভেনে। রোজ ৭৫০ টাকা। তিথি কাল ১২টা-১টার আগে পৌঁছতে পারবে না।

—কী হল। কথা বলছ না কেন। এই, দরজা খোল শিগ্‌গির!

...কথা আমি বলছি না, না, তুমি শুনতে পাচ্ছ না? আরে বাবা, আমার শেষ চৈতন্যটা কী ছিল জানো কি। 'যাক ছিটকিনিটা দিইনি।'

ধাক্কাধাক্কি লোক ডাকাডাকি সে বড় বিশ্রী।

বিভাস কিছুদিন ধরেই শরীর খারাপের কথা বলছিল। ঠিক বুঝতে পারত না কী হয়েছে। একটা নাম দিতে হয়, তাই বলত অবসাদ। অসুখ হয়েছে অথ সিম্পটম নেই তেমন, নীলা তাই মাছি উড়িয়ে দিত। ওর মামাতো বোন মনিয়া ডাক্তার। সেদিন এসেছিল। পাশের ঘরে নিউজিল্যাণ্ডে থাকার সময় ওর এক্স-হাজবন্ড পিটার ফ্লেমহিলের (দ্বিতীয় রমেশ দূবে—আর্কিটেক্ট) ছবি দেখাচ্ছে—, হঠাৎ সে গিয়ে বলেছিল, 'মনিয়া তোমার ব্যাগে স্টেথো আছে' বলতে বলতে শুয়ে পড়েছিল। অজ্ঞান হয়ে ছিল মিনিট দুই। জ্ঞান ফিরে এল নিজে নিজেই।

'ও কিছু না', প্রেসার, নাড়ি, স্টেথো দিয়ে বুক-পিঠ সব দেখেশুনে মনিয়া বলেছিল, 'একে বলে টি-আই। মাথায় হঠাৎ অক্সিজেন কমে গিয়েছিল আর কি। আপনার তো স্পণ্ডিলোসিস আছে।'

'সে তো কোমরে।'

'না-না। এক্স-রে করান। ঘাড়েও আছে।'

বলে সে ফের পাশের ঘরে ছবি দেখাতে শুরু করে দিদিকে। ১০ বছর ছিলাম ওখানে। পিটার নরওয়ের লোক। ওদের দেশ তো বরফের দেশ। নর্থ পোলের কাছাকাছি। এই দ্যাখো, ওর ছোট ভাই। প্রায় এস্কিমো, না? কী বলত জানো? আমাদের দেশে ৫৮ রকমের বরফ, ৫৮টা বরফের প্রতিশব্দ আছে। ইংরেজির মতো মাত্র দুটো নয়। তুমি তো হয় স্নো আর নইলে আইস...আমাকে বলত। ৫৮টা প্রতি-শব্দই জানত পিটার। সেবার দেশে গিয়ে আর ফিরল না। বরফের প্রতিশব্দের ঠিক কোন স্টেজটাতে যে ট্রেকিং-এ গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল....

'ভাগ্যিস ছিলাম', যাবার সময় বিভাসকে বলে গেল, নইলে, দিদি তো এতক্ষণে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিত। সপ্তাখানেক অবজার্ভসনে তো রাখতই। হাজার তিরিশ তো আপনার গলে যেতই জামাইবাবু মিনিমাম'।

দশ দিনের মাথায় এই কাণ্ড। ডেথ সার্টিফিকেট লিখল মনিয়াই। সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। বিভাসের ছোট ভাই শ্যামলেন্দু অ্যাডভোকেট। তাকে সার্টিফিকেট দেখিয়ে মনিয়া বলল, বানান-টানানগুলো দেখে নিন তো চ্যাটার্জি, অবলিক চট্টোপাধ্যায় দুটোই দিয়ে লিখে দিলাম। ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো যা ছ্যাঁচড়া!'

...একটা ফোন এসেছে। আমাকে চাইছে। রু করল নাকি।

ফোন ধরেছে শ্যামলেন্দু।

—'না-না। নম্বর ঠিক আছে।' প্রয়োজনে চার পাঁচ পর্দা গলা নামাতে পারে শ্যামলেন্দু। থিয়েটার করে। শ্যামলেন্দু বলল, 'ওর সঙ্গে আর কথা বলা যাবে না।'

'....'

'উনি আজ ভোরে এক্সপায়ার করেছেন।'

না, রু নয়। রু করলে, আজকের মতো ছুটির দিনে করলে, রু করত ঠিক দেড়টায়। সেই ফোনটা আমি ধরতাম। নীলা তখন থাকে বাথরুমে। যদি অন্যথা হয়, ফোন কেটে দেয়। নীলা ওর গলা চেনে। ওকে চেনে। ওর সঙ্গে তাইওয়া-তে খেতে গিয়েছে।

ওর দু-হাতে হোয়াইট মেটালের তিব্বতি বালাদুটো নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, 'সবসময় এ-দুটোই পরে থাকো কেন? এ-ভাবে তো শাঁখা পরে থাকি আমরা—যারা ম্যারেড—'

জানে না ও-দুটো আমার দেওয়া।

রু কি ফোন করবে?

(... 'তোমার গায়ের গন্ধ আমি চিনি। আমি তোমার জামাকাপড় শুঁকে বলে দিতে পারি, এগুলো তোমার।'—রু।)

এই তো এবছর বড়দিনের আগে একদিন না, দু'দিন না, দিন পনের দেরি হল। ফাঁসির হুকুমের জন্যে অপেক্ষার চেয়ে গুরুত্বে তা কম কী। প্রায় রোজ দেখা করতে হত তখন। হয়তো, আসল কথাটা হলই না। তবু, সব কথাই হল ঐ একটি অনুচ্চারিত প্রশ্নকে ঘিরেই অর্থাৎ, হয়েছে কি, যা ছিল হবার?

অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রই জানেন, বিশেষত বিবাহিত পুরুষের পক্ষে, প্রেগন্যান্ট প্রেমিকা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তার চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। ভয়াবহতায় বরং দ্বিতীয়টির গুরুত্ব কিছুটা কম। কেমনা কুষ্ঠ তো সেরেও যায়। অন্তত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু খুন না করে ভ্রূণের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

দিন সাতেক যেতে না যেতেই রু-র মুখ সাদা। বলল, 'এত দেরি তো কখনও হয়নি।'

তুমি পিল ইউজ করোনি?

ছিল সঙ্গে। তুমি সময় দিলে কই। যা তাড়াহুড়ো করলে!' জিভ টাগরায় লাগিয়ে ওষ্ঠলীলা দেখাবার এই কি সময়! এই কি সময়, চোখের তারা ওভাবে উত্তর-পূর্ব কোণে ঠেলে দেবার?

কাজের মেয়ে চপলা আজ আর কোনও বাড়ি কাজে যাবে না। সে রান্নাঘরের দায়িত্ব নিয়েছে।

ফোন আসছে মাঝে মাঝে।

এইমাত্র বীথি জানাল, সে এখন বোম্বেতে। ওখানকার ফ্লাইট ধরে আজই রাতেই কলকাতা পৌঁছে যাচ্ছে।

...আজ ছুটির দিন। ঠিক দেড়টায় ফোন আসত রু-র। রু কি আজ ফোন করবে!

'চা না কফি' জানতে চাইলে শ্যামলেন্দু বলল, 'কমপ্লান আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কর্নফ্লেক?'

'হ্যাঁ।'

'ও! দাদা খেত বুঝি?'

'না। বৌদি খেতেন।'

'ঠিক আছে, ঐ দাও তাহলে। কমপ্লান-কর্নফ্লেক। আজ খাওয়া হয়নি।'

ছোট্ট ফ্ল্যাট। লোকজনে ভরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আবার খালিও হয়ে যাচ্ছে। মনিয়া চট করে একটা অপারেশন সেরে আসছে, বলে গেছে। ওর ছেলে নওরোজকে রেখে গেছে। ১ জানুয়ারির আগে ব্যাটা কিছুতেই নামল না। শুনে রু বলেছিল, তাহলে ওর নাম রাখতে বলো, নওরোজ।' অবশ্য সবাই জানে, নাম জামাইবাবুর দেওয়া। সে কার্টুন নেটওয়ার্ক খুলেছে। মাঝে মাঝে ট্রেতে করে চা বিস্কিট নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে চপলা। ঠিক হয়েছে, বরফের স্ল্যাবের ওপর শব রাখা হবে বাড়িতেই। যতক্ষণ না বীথি আসে। বরফ

আনতে গেছে শ্যামলেন্দু। একটু আগে ফোন করেছিল। ১টার মধ্যে বরফের গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি।

'কিন্তু তা কী করে হবে' ১৪ দিনের মাথায় তাহলে এবার আর হল না ভেবে বিভাস বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো প্রোটেকশান নিয়েছিলাম। আই ডিড ইউজ দা রাবার।'

শুনে একদম সাদা হয়ে গিয়েছিল রু-র মুখ। মিউজিয়ামে স্কন্ধকাটা কণিষ্কের মূর্তির নিচে তারা তখন।

'কী বলতে চাও তুমি'?

শীতের বেলা। মিউজিয়াম বন্ধের ঘন্টা বাজছে ঢঙ ঢঙ করে। কুষাণ পিরিয়ডের ঘরে তখন আর কেউ নেই। হাজার হাজার বছর আগের ভাঙা তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে সে কী আর্ত চিৎকার করে, বিভাসের হাত দুটো যে চেপে ধরেছিল সে। জানতে চেয়েছিল, তুমি কি আমাকে ভালবাসো না?'

সেই ছিল তার শেষ জিজ্ঞাসা। তারপর আর কখনও দেখা করেনি। যদিই শেষ পর্যন্ত প্রেগন্যান্টই হয়ে থাকে, জানায় নি। টার্মিনেট করিয়ে ছিল একা-একা।

ঠিক বেলা দেড়টায় একটা ফোন। আমি তখন বরফ-চাঙাড়ের ডাবল-বেডে শুয়ে একা? হ্যাঁ, একা! এদিকে ফোন বাজছে তো বাজছেই। ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে নওরোজ আর চপলা ছাড়া আর কেউ নেই। আর নীলা।

...ধরো ধরো নীলা। ফোনটা ধরো। নিশ্চয় রু। নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে।

...ওকে বলো। আমার হয়ে ওকে বলো, নিশ্চয়, নিশ্চয় তোমাকে ভালবাসে। বিভাস রুবিকে ভালবাসে।

*বিনোদন বিচিত্রা, শারদীয় ২০০০*

## সূর্য অস্ত যায়নি এখনো

শেষ পর্যন্ত সেটাই হল যা ছিল হবার। রুবির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। দেখা হল মেট্রোর কালিঘাট স্টেশনে। শেষ মেট্রো থেকে নেমে রুবি উঠে আসছে এসকালেটরে। আর সেই ট্রেনটাই ধরবে বলে সে তখন অবতরণিকার মাথায়। চলন্ত সা-রে-গা-মা-র আর সব কটি রিড ফাঁকা। শুধু একটিতে একটা রুবি। উঠে আসছে। বিগত তিনটি বছর ধরে তার সমস্যা ছিল একটাই। রোজ, প্রায় দিনই, একবার না একবার সে ভাবত, আমি কালই ষাঁড়ের শিং ধরব। আমি রুবির অফিসে যাব। রুবির সিটের সামনে দাঁড়াব। অবশ্য এমন হতে পারে যে, এতদিনে অফিসার হয়েছে। একটা ঘর পেয়েছে। তখনই তো সামলে ছিল মাত্র দুজন। তাহলে স্লিপ পাঠাতে হবে এবং দেখা নাও করতে পারে? দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারবে কি?

না, তাহলে তো লোক ডাকবে। প্রায় তিন বছরের নীড়-জীবন তাকে কতটা প্রতিসরিত করেছে, জানা নেই একেবারেই। নীড়ে ডিম ফুটে, একটি বাচ্চা? না-আঃ। তিন বছর যেতে না-যেতে ছেলেপেটে ধরার মেয়ে রুবি বোস নয়।

ষাঁড়ের শিং কথার কথা নয়।

গত তিন বছরে রুবির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়াবার সাহস মরতে মরতে একেবারে মরে যাবার পর সে হাড়ে মজ্জায় টের পেয়েছে—এখন শুধু মাতাদোরের সাহসই তাকে রুবির সামনে দাঁড় করাতে পারে।

ষাঁড় বলতে যে লোকই ডাকবে রুবি, মারধোর করাবে, তা না।

আর আঙুল তুলে দেখানে মাত্র তারাই বা ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন? একটা নির্দিষ্ট অভিযোগ তো চাই। কীই বা বলতে পারে রুবি? বিয়ের আগের চেনা মানুষ (প্রেমিক বলে মানবে না জানা কথা)—বিয়ের পরেও জ্বালাতন করতে এসেছে? তা, এতে এমন ফণা-টানা তুলে রুখে দাঁড়াবার কী আছে? না-বাবা, তাহলে ডালমে কিছু কালা আছে—এই তো হতে পারে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তাছাড়া, এই ভয়ে রুবি কি থাকতে বাধ্য হয় যে, সে রকম বিপদে পড়লে তার মতো আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষও ঘুরে দাঁড়াতে পারে? সেও বলে বসতে পারে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মারি স্টোপস ক্লিনিকে যান। জেনে আসুন। সেখানে তিন বছর আগে ১৬ অক্টোবর যে একটা আবোর্সান হয়েছিল, সেই পেশেন্ট মল্লিকা বড়ুয়াটি আসলে কে! সে কি সত্যিই লামডিং-এর মেয়ে? বন্ডে সই যার, সে কি সত্যিই তার ছোট মাসি?

অফিসের মধ্যে এত বড় স্ক্যান্ডাল? না-না, এ রিক্স সে নিতে পারে না।

ওঃ কি ভয়ঙ্করই না ছিল সেইসব দিনগুলো। যখন সময় থমকে দাঁড়িয়েছে, অথচ পিরিয়ডের দেখা নেই। ৫/৭ দিন এদিক-ওদিক কার না হয়—যদিও নিয়মিত যৌনতায় অন্যভস্ত অবিবাহিত মেয়েদের ও সব বরং দিন ৫/৭ আগে হওয়াই শ্রেয়।

আসলে কখন, কোথায় কবে যে সুযোগ হবে—আগে থেকে তো ঠিক নেই। কখন রুবির মণিকাদি হঠাৎ সুযোগ দেবে। কবে তার স্ত্রী সুষমা চলে যাবে স্কুলের দৈব পিকনিকে এবং সারা দিনের জন্যে। এবং বুম্বাকে নিয়ে। সারাটি মাস ধরে পিল খেয়ে গিয়ে তাই লাভ নেই। সারা মাসের ক্যালেন্ডারে একটি দিনের ওপরেও ইয়েস মার্ক নেই এমন দৃষ্টান্ত তো গত তিন বছরের আগের পাঁচ বছর জুড়ে আকছার পাওয়া যাবে। এদিকে, নিজের জন্যে কিছু রাখা-টাকাও রিস্কি। সুষমা দেখলেই বুঝবে, এ জিনিস তার জন্যে নয়।

তাই ঝাড়া দেড়টি মাস দেখার পর রুবি যখন ভয়-পাইয়ে দেওয়া মুখে নিজেই বলল, 'এত দেরি তো কখনও হয়নি' আর বলতে বলতে তার মুখটা হাড়ের মতো সাদা হয়ে গেল, সে বুঝল, শেষ পর্যন্ত সে তাহলে ফেঁসেই গেল।

আবোর্ট যত আগে করানো যায় তত সেফ। ভ্রূণ বেড়ে চলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের মতো, তরতরিয়ে। চার মাসেই মনুষ্যমূর্তি। তখন তো মানুষ খুন!

হেস্টিংস স্ট্রিটে মাদ্রাজ কাফের দোতলার ঢাকা কেবিনে ওর একটা আঙুল ধরে সে বলেছিল, 'তাহলে কি একটা টেস্ট করাবে?'

'তারপর?'

'তারপর কোথাও—ধরো মারি স্টোপস্-এ'।

'অ্যালিবাই কী? কী বলব?'

'কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেয়, আমাদের কোনও জিজ্ঞাসা নেই?'

'কে সঙ্গে যাবে?'

'কেন মোনি—'

মণিকাদির পুরোটা ওর চোখমুখে দেখে সেদিন সে আর বলেনি।

রুবি একটু চুপ করে রইল। তাপর বলল, 'অফিসে ঢি-ঢি পড়ে যাবে।'

'বারণ করে দেবে বলতে।'

'হ্যাঁ। কেটে কেটে বলল রুবি, 'কিন্তু একটা অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে ওর হাতে। বাকি জীবনের জন্যে।'

'তাহলে একাই যাও না।'

'কী বললে?'

'এন-না। মানে—'

সে রুবির হাত চেপে ধরে। তার মুঠো থেকে ধীর ও নিশ্চিতভাবে হাত খুলে নিচ্ছে রুবি, সে টের পায়। সেই শেষবার তাকায় রুবি। তাকে খোঁজে। তার সেই শেষ চাহনি এখনও চোখ বুজলেই যতবার ইচ্ছা সে দেখতে পায়।

একই সঙ্গে সোডোমির আবেদনে ভরা তার ছেলেটে মেয়ে-শরীরে দেখবার মতো বলতে তো ছিল শুধু চোখদুটোই—সদা বিস্ফারিত দুটি মস্ত চোখের মাঝখানে অতখানি ফাঁক থাকে শুধু প্রস্তরমূর্তিতে।

কনুই-এর ভরের ওপর মাথা রেখে দু-হাতে দু-চোখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে রইল রুবি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে জল নেমে আসছে, দেখা যায়। 'যে কাজ দু'জনে মিলে করেছি তার শাস্তি আমি একা নেব? কেন!'—এত বলে উঠে দাঁড়ায়।

সেই তার শেষ কথা। তিন বছরর আগে। রেস্তরাঁর কেবিনে একা বসে সে তার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার শব্দ গুণতে লাগল। আজ জানা গেল মোট বারোটি সিঁড়ি। কিছুক্ষণ পরে সে শুনতে পেল বৃষ্টির শব্দ, যখন তা নেমে এল ঝমঝমিয়ে। কতক্ষণ ধরে পড়ছে কে জানে।

কয়েকদিন বাদ দিয়ে রুবির অফিসে ফোন করেছিল সে। বোর্ড অপারেটর মণিকাদি তার গলা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন। বললেন, 'মিস বোস আজ অফিসে আসেননি।'

মিস বোস? রুনি নয়! অবাক না হয়ে সে ভয়ই পেয়েছিল তাঁর কণ্ঠস্বরের হিমশীতলতায়।

'আজ আসেননি?'

'না, কয়েকদিন আসছেন না।'

'মণিকাদি, আমি—' কেমন কট করে লাইন কেটে দিলেন মণিকাদি। ছোট্ট একটা শব্দ— কট। কী আছে এতে। অথচ, কুয়াশার মতো বিস্ফোরিত হতে হতে তাই কী নিদারুণ ভয়ে ছেয়ে ফেলেছিল তার শরীর।

তাহলে এস্পার-ওস্পার যা হয় একটা কিছু হয়ে গেছে এতদিনে। সবে মাস দুই-এ পড়েছিল—প্লাসেন্টাই ফর্ম করেনি। বিপদ হবার কথা নয়। রুবি বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। নইলে তো অফিস জানত। মণিকাদি অন্য স্বরে কথা বলতেন। তাহলে পুলিস আসত তার কাছে, এতদিনে।

তারপর... বছর ঘোরার আগেই রুবির বিয়ের খবর। একটা পাঁচিল উঠে গেল মাঝখানে তরতর করে। তারপর... রাস্তাঘাটে কি একদিনও দেখা হতে নেই? হয়েছে। একাধিক বার রুবিকে দেখেছে সে। দূর থেকে কখনও। কখনও কাছাকাছি। একদিন দুপুরবেলা। নির্জন সদর স্ট্রীট দিয়ে একা-একা হেঁটে যাচ্ছে রুবি। সেই কোথাও-যাবার নেই হাঁটা, হর্স-টেল চুল, চুলে লম্বালম্বি মস্ত ক্লিপ। একবার ঘাড় ঈষৎ ঘুরতেই যেটুকু ঝলক, রুবি না হয়ে যায় না। দ্রুতপায়ে হেঁটে সেই একবারই একদম কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে, যা বলতে চেয়েছে, বারবার কিন্তু কখনও পারেনি, সেই কথা বলতে। বলতে হয়ত আজও পারব না। কিন্তু তাকে দেখে দাঁড়িয়ে তো পড়বেই রুবি। কে জানে, হয়ত হেসেই

বলবে, 'এ কি, তুমি।'

সে বলবে, 'হ্যাঁ, আমি।'

তারপর... রুবি যাকে মনে করত 'মোস্ট গ্রেসফুল'— সেই আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে কাঁপতে কাঁপতে ঢোঁক গিলে যে কোনও রকমে বলে ফেলবে, 'খুব ভাল লাগছে আমার। তো-ওমাকে দেখে।' এই সময় গ্রহান্তর থেকে উড়ে এম আর এফের আলোর টায়ার এসে দাঁড়িয়ে পড়বে তাদের মাথার ওপর আর সেই অনির্বচনীয় ঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধ, তাদের মধ্যে দেখা দেবে পরস্পরকে নিঃশেষে ক্ষমা করার অফুরান আবেগ। যখন বোঝা যাবে, যাই হয়ে থাক, কিছুই এসে যায় না। কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

যদিও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দ্রুত হেঁটে, প্রায় ছুটে, একেবারে কাছে গিয়ে দেখা গেল, রুবি নয়। অথচ পিছন থেকে অবিকল এক, এমন কি যখন ঘাড় ঘোরাল একবার, তখনও। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়াতেই সেই চোখ নয়। এতে সেই শেষ চাহনি নেই যা প্রস্তরমূর্তির। এ সেই মুখ নয় যাকে সে ঘুমন্ত দেখেছে। কতবার যে রুবি অথচ রুবি-নয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এভাবে। কলকাতার অলিগলিতে। সিনেমা কি থিয়েটারের লবিতে। থিয়েটার, বিশেষত গ্রুপ থিয়েটার ছিল, তাদের জীবনে, তৃতীয় ব্যক্তি। রুবির দ্বিতীয় পুরুষ।

এখন ওই উঠে আসছে।

এসক্যালেটরের সঙ্গে হু হু করে উঠে আসছে একলা রুবি।

সিঁড়ির মাথায় সে।

ধীর ও নিশ্চিতভাবে রুবি উঠে আসছে তারই দিকে।

আর-পালাবার পথ নেই।

রুবি মাথা রাখবে বলে একটা খোঁদল তৈরি হচ্ছে তার বুকে, সে দ্যাখে।

আঃ কী যেন সেই কথাটা প্রথমে মুখোমুখি হবে যেদিন সে বলবে, বলবে, বলবেই রুবিকে। আঃ-হা, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

'এই। খবরদার। একটুও ভয় পাবে না। তুমিও আমাকে খুঁজছিলে। তুমি আমাকেই খুজছ।'

*আজকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯*

## চতুর্থ পর্বত

*'বিপ্লবের আগে চীনের পুরুষদের বইতে হত তিনটি পর্বত: সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ। আর চীনের নারীদের বইতে হত চারটি। বলাবাহুল্য, চতুর্থটি চীনের পুরুষ।'*—মাও-জে-দং।

'অ্যাই! তুমি তো একজন কমিউনিস্ট। নেতৃস্থানীয়।' সুরজিৎকে ঠেলা দিয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'তোমাকে এক-এক সময় মানুষ মনে হয় না কেন?' 'কোন-কোন সময়?'

'এই যেমন এখন।'

'মানুষ মনে হয় না?'

'একদম না।'

ঠিক এমন সরাসরি না বললেও, এ-রকম অনুভব আগে হয়েছে। যদিও অন্যভাবে

এসেছে তা। অন্য ভাষায়। ভিন্ন ছবিতে। কখনও ওকে হেড-লেস মনে হয়েছে। মুণ্ডহীন। তখন বলেওছি।

এই প্রথম একেবারে মনুষ্যত্ব ধরে টানা।

'এই একটা সময় যখন মানুষ আর মানুষ থাকে না।' চিৎ হয়ে শুয়ে গোড়ালির দিক থেকে জাঙ্গিয়া টানতে টানতে (বডিবেসিক্স ছাড়া পরে না) সুরজিৎ বলল, 'দ্যাট ইজ হোয়াই, মাই ডার্লিং। এই যে এতক্ষণ ধরে আমি যা করলাম। তুমি কি মনে করো এর দায়দায়িত্ব সবটাই ছিল আমার? সবটাই আমি! সামবডি এলস্ ওয়জ অলসো টেকিং পার্ট, বিলিভ মি, অ্যাণ্ড অল দা হোয়াইল?' আমার ঘাড়-পিঠে হাত বুলিয়ে সে আদর জানায়, 'আই অ্যাক্টেড মিয়ারলি অ্যাজ হিজ এজেন্ট, সর্ট অফ।'

'সে মানুষ কিনা।'

'সামবডি এলস্, বললাম তো। মানুষ কিনা জানি না। সামথিং এলস্-ও হতে পারে। কই',— এতক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়েছিল, মাথার পিছনে দু'হাতের আঙুল কব্জা বানিয়ে। মসৃণ বাদামি চামড়ায় ঢাকা আর আকর্ষণীয় বক্ষপটের খোঁদলে সে ঢুকিয়ে নেয় আমার মাথা, 'তাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না' নিতে নিতে বলে।

নারীসুলভ একটি সৌন্দর্যতিলসহ তার পাতলা ঠোঁটদুটো আত্মপ্রত্যয়ী হাসি দিয়ে মুছে সে বলেছিল, 'কেটে পড়েছে। অথচ দ্যাখো, তুমি কনসিভ করলে কিনা দায়দায়িত্ব সব আমাকেই নিতে হবে!'

'দায়দায়িত্ব?'

'আপাতত অ্যাবোর্ট করাবার। আমরা বিবাহিত হলে, ঐ ছেলেই,' হাই তুলে, 'বা, মেয়ে, আমাকে ব্যা-ব্যা বলে ডাকত আর আমাকে সাড়াও দিতে হত, হত কিনা? যদিও আসল বাপ হাওয়া।'

'সামওয়ান এল্স্?'

'অফ কোর্স!'

ভি-আই-পি হাইওয়ের কসবা ক্যানেক্টরে ৫২ নং ফ্ল্যাটের এই রেসিডেন্সিয়াল ব্লকটি সরকারি। এরই একটিতে সুরজিৎ সরকার সম্প্রতি গৃহপ্রবেশ করেছে। ওদের আদি বাড়ি বাঘাযতীনের কলোনি থেকে মামা-মামিমা এসে সত্যনারায়ণ পুজো করে গেছেন। তার ফুল-বেলপাতা এখনও পরিষ্কার হয়নি। একটি সোফা-বেড, ফ্রিজ এবং টেলিফোন (আগে থেকেই ট্রান্সফার অর্ডার করানো ছিল) এসে গেলেও রান্না-বান্নার ব্যবস্থা এখনও নেই। সুরজিতের ডাকে সাড়া দিয়ে দুপুরের খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে আমরা খানিক আগে-পরে ফ্ল্যাটে ঢুকেছি।

আমরা এখন আড়াআড়ি বিছানায় শুয়ে। এখন ওর মাথা আমার পেটের ওপর। হাতের তালু আমার পিছনে। আমি পিছন-ই বললাম। সুরজিতের ভাষায় পাছা—যা নাকি, একটি রয়াল বেঙ্গলের মধ্যাহ্নভোজের পক্ষে যথেষ্ট, তার মতে। যার তদ্ভব আছে, ও কিছুতেই যদি তা তৎসমে বলবে। ওর সব কথা তখন বাংলায়, যার বাংলা আছে, অন্তত তখন। নিশ্চয়ই সুখ পায় বলে, তাই বলে। এই সব ভাষায়, শব্দে, নাকি এক মজাদার নাগরিকতা আছে যা আমিও—আমার সমস্ত আপত্তি সত্ত্বেও—উপভোগ করি। এবং এ-কথা অস্বীকার করতে পারি না। স্রেফ আত্মম্ভরী পুং-শুওরের ঘোঁৎ-ঘোঁতানি বলে ওকে উড়িয়ে দিতে পারি না। উত্তরে আমি তার চুলে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি দেখি। আমার ভাষা এ-রকম। বা, গ্রাম্য।

তা, হয়ত সত্য কিছু আছে ওখানেও, ও যা বলে আর যেভাবে বলে, নইলে আর বলে

কী করে। একটা আস্ত মিথ্যে কী বলা যায়? আস্ত একটা সার্কল কি আঁকা যায়, যার সেন্টার নেই? সত্যিই তো, শরীরের তুলনায় আমার পেছনটা তো বেশ ভারিই। হাঁটলে, ওর ভাষায় দুই গোলার্ধ নাকি নড়ে-চড়ে। রীতিমতন ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয় তারা। তখন—আমি টের পাই যে অশ্লীল দেখাচ্ছে আমাকে। পিছন থেকে। সেজন্য সিল্ক, শিফন এসব পরি না। তুল্যমূল্যে, কই, স্তন দুটি তো সেই চোদ্দো পনেরো বছরটির মতো থেকে গেল—বিশেষ আর বাড়ল না। সে জন্যে বিশেষ ধরনের ব্রেসিয়ার পরে থাকি। বাঘের লাঞ্চসহ আমি যদি এখন আমার উন্মুক্ত গোলার্ধদুটি নিয়ে বাথরুমে যাই ও ফিরে আসি, আমার লজ্জাই করবে। কিন্তু সুরজিৎ? এই তো একটু আগে পার্টির এম পি'র সি-এ'র ফোন এল। বাহুল্যবর্জিত ও সুঠাম, লম্বাপানা, উদোম ন্যাংটো অবস্থাতেই তো ফোন ধরল সুরজিৎ। কত সহজভাবে কথা বলল লোকাল কমিটির কমরেডের সঙ্গে। স্বয়ং এম-পি'র ফোন এলে বড় জোর মেঝে থেকে কুড়িয়ে পায়জামাটি পরে নিত, তার বেশি কী? আমার সঙ্গে একটু আগের কৃতকর্ম নিয়ে কোথাও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, না শরীরে, না মনে। নতুন বলতে ঠোঁটে ৫৫৫। যখন সি-এ'র সঙ্গে।

ফ্ল্যাট খুলে দেবার দিন আমি সুরজিতের সঙ্গে এসেছিলাম। ভাঁড়ে চা খেতে খেতে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মনোহরবাবু বলেছিলেন, 'আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশায়। সরকারি ফ্ল্যাট, এ ক'জন পায়। রিটায়ার করতে আর পাঁচ বছর, এ-এ, আমি তো মাথা খুঁড়েও পেলাম না।'

সুরজিৎ সমবেদনা জানিয়ে বলল, 'কতদিন আগে অ্যাপ্লাই করেছেন?' যেন খোঁজখবর নেবে।

'অ্যাপ্লাই? অ্যাপ্লাই করে কিছু হয় নাকি? এ, আপনি কতদিন আগে করেছিলেন বলুন তো?'

সুরজিৎ আর কথা বাড়ায়নি সেদিন। সবই জানেন মনোহরবাবু। খোঁজখবর তো ওঁর কাছেই পেয়েছিল। সে ফ্ল্যাট পেয়েছে শুধু একটি শব্দের দৌলতে—'অ্যাপ্রুভড্।' নিচে সেক্রেটারির সইয়ের খোঁচা—যা আবেদন হাতে হাতে পাওয়ামাত্র উনি করেছিলেন। সে কেন ফ্ল্যাট পেয়েছে, আর মনোহরবাবু কেন পাননি—তার পিছনে আছে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস আর তা বোঝার ক্ষমতা প্রোমোটি অ্যাঃ ই-র নেই। উনি তো আপাতত এইটুকুই জানেন যে সে বেসরকারি কলোনি-কলেজে ইংরেজি পড়ায়। জানেন না, ৭৬-এ, মাত্র ১৮ বছর বয়সে সে ছিল, হোক রাজনৈতিক কারণে, এস আই খুনের দায়ে আলিপুর জেলে, ৭৭-এ বামফ্রন্ট এসে গেল ভাগ্যিস, নইলে তো কমসে-কম যাবজ্জীবন! ক'বছর চারু মজুমদার করা না থাকলে, তখন থেকেই মূল স্রোতে থাকলে এ তো ভারি ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের ছটাকিফ্ল্যাট একখানা—সে হত হাউজিং বিভাগের মন্ত্রী। শুরুই দেরিতে। তাই সবে এল-সি-এম।

যে জন্যে এম. পি তো একরকম যেচেই ওকে ফ্ল্যাট দিয়েছেন।

'জানেন তো, ও কিছুতেই অ্যাপ্লাই করবে না, আপনি আমাকে দিন। আমি সই করছি'—আমাকে বলতে বলেছিল সুরজিৎ, আর আমি এম-পি'কে তাই বলেছিলাম। এত আগ্রহ! ব্যাচেলর হলেও এম-পি আমাদের ভবিষ্যৎ সুইট হোমের ব্যাপারটায় আগ্রহী মনে হয়েছিল। ফ্ল্যাট অবশ্য শেষমেষ সুরজিতেরই নামে। আপাতত গৃহপ্রবেশ করেছে সুরজিৎ। আমরা আসব বিয়ের পর, জোড়ে। আসলে লাঠি না ভাঙা নিয়ে কথা। আবার সাপেরও মরা চাই।

সুরজিৎ আমার কথার এমনি একটা উত্তর দেবে, তা আমি জানতাম।

'এ-সময় কেউ কমিউনিস্ট থাকে না,' সুরজিৎ বলল, 'বরং ফ্যাসিমিজমের এ খুব কাছে। অকুপায়িং আদার্স টেরিটোরি বায় ফোর্স।'

'আমি তো সে কথা বলিনি।' ওকে কাছে টেনে এনে আমি বলি, 'মানুষ মনে হয় না কেন তোমাকে?

তখন মানুষ মনে হয় না। রেড আর্মি যারা জার্মানিতে ঢুকেছিল, তারাও ছিল কমিউনিস্ট। কিন্তু সৈন্যদলের নিজস্ব নিয়মেই তারা দখল্ নিয়েছিল জার্মানির। স্তালিন বলেছিলেন, হ্যাঁ, কিছু এদিক-ওদিক হয়েছে, আমি জানি। কিন্তু, জার্মান সৈন্যরা ওদেরও মা-বোনেদের রেপ্ করেছে। এখন জার্মানিতে যদি কিছু এদিক-ওদিক হয়ে থাকে, আমি ওদের দোষ দিতে পারি না।'

এ-সব কথা তখন, যখন আমি বিছানায় এবং নগ্ন। প্রাইভেসি বলতে আমার কিছুই নেই। হয় তার মুখ আমার নিপ্‌ল্-এ, যা ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠেছে প্রখন থেকে প্রখরতর, আমার অঙ্কুরের ঘুম ভাঙাচ্ছে তার তর্জনী। নিদারুণ শীতেও আমি লেপ ফেলে দিয়েছি মাটিতে।

কথাগুলো তদবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যই তো মনে হত। আমি নিজেও কি টের পেতাম না, সাম্য ও স্বাধীনতাকামী আমার শরীরোত্তর সমস্ত স্বপ্ন কীভাবে ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সুরজিৎ, সীমান্ত পেরিয়ে আমার স্বাধীন দেশ দখল করছে ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল, কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধী দেশপ্রেমিকরা, সবচেয়ে যা হতাশার—আমার শরীর আক্রমণকারীর সঙ্গে নিয়েছে কোলাবরেটরের ভূমিকা।

'আই!' চোখ পাকিয়ে আমি ধমক দিই ওকে, 'চেকোস্লোভাকিয়ায় রেড আর্মি ঢুকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল?' টের পাই আমার গালে জিভ এবং চোখেও কটাক্ষ এসে গেছে ত পারল? হোনেকার পালাল। কমিউনিস্ট পার্টি ব্যানড্ হল প্রায় সারা ইওরোপে। রাশিয়া পরিণত হল কমনওয়েলথ অফ ইনডিপেন্ডেন্ট স্টেটস-এ। সি-আই-এস আদ্যাক্ষরে ইউরোসকারে খেলতে নামল।'

সুরজিৎ বলে, এ-সব পাসিং ফেজ। গর্বাচভ-ইয়েলৎসিন এরা ছিল সি-আই-এ'র এজেন্ট। তবে তার পার্টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। মার্কসবাদের মৃত্যু হয়নি। মৃত্যু হয়েছে মার্কসবাদের অপপ্রয়োগের। মার্কসবাদ অমর, সে মনে করে।

*শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন ১৯৯৮*

## ঘাটশিলার অশ্বিনী

১৯৬০-৬১ সালে ঘাটশিলায় অশ্বিনী দাস নামে এক বালক বাস করত। সে বছর চেঞ্জের শেষে বাবা-মাকে আনতে গিয়ে শুনলাম, অশ্বিনী নামে একটি ছেলে তাঁদের কাজ করে, এমন কি রান্নাবান্না পর্যন্ত করে দেয়, কিন্তু সেদিন দুপুর পর্যন্ত তার দেখা মিলল না। বিকেলে সে এল। তার মুখে আঁচড়, বুক ছড়ে গেছে। বুকের কাছে সে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া রক্তাক্ত ঘুড়ি জাপটে ধরে আছে। মুসাবনির দিক থেকে নদী পেরিয়ে ঘুড়িটা যখন এপারে এসে পড়ল—চারজন দাবিদারের সঙ্গে লড়াই করে সে ঘুড়িটা ঘরে এনেছে।

ছেলেটা জাতে নাপিত, রাতে খেতে বসে তার সঙ্গে পরিচয় হল। সে একটা আলকাতরা মাখানো টিনের মেনু-বোর্ড টাঙিয়েছে। তাতে ক্লাস থ্রি অব্দি পড়েছিল, সেই আত্ম-পরিচয় দিতে ইংরেজিতে লিখেছে To day. তারপর দু-তিনরকম ভাজা, শুক্তো,

ডাল, কই-কপির ঝোল ভেটকির ফ্রাই, মায় মালাইকারি ব্র্যাকেটে চিংড়ি। দই-মিষ্টি।

আমাকে খাবার জন্য ডাক দিয়ে, সে টিনটা উল্টে দেয়। উল্টোপিঠে জল, ডাল, কপির তরকারি, টক, দুধ, নুন এবং লঙ্কা। আজ মাছ-মাংসই নেই।

'ওট্‌টা বাইরে লোকের জন্যি আঁইজ্ঞা' গম্ভীরভাবে জানিয়ে সে তারপর হাসে। সেই শুরু হল হাসি। আর থামতে পারে না। ঘরের ভেতর থেকে বাবার বকুনি খেয়ে তবে থামে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর চেয়ার টেনে আমি বারান্দায় গিয়ে বসি। দূরে বুরুডি যাবার পথ জুড়ে বৃষ্টি নামল। শীতকাল, গা-হাত নতুন করে কেঁপে উঠল। নদীর ওপারে কপার মাইনস-এর আলো—বিদ্যুৎ চমকালে শালবন—মেঘের মধ্যে চাঁদ ঢুকে গেলে বৃষ্টি যেন আরও মুখরভাবে নেমে এল। ঘরের ভেতর লেপের তলা থেকে মা বললেন, 'শনির সাত মঙ্গলের তিন, আর সব দিন দিন। কাল যাব কী করে রে খোকা?'

বাবার পায়ে গরম তেল মালিশ করে অশ্বিনী এসে বসেছিল বারান্দায়, শুধু চোখ আর নাকটুকু খুলে রেখে। মার কথা ঘাড় কাৎ করে বুঝে নিয়ে, অশ্বিনী আমাকে বলল, 'তার মানে শনিবার বৃষ্টি নেমেছে, সাতদিনের আগে থামবেক নাই।' বলেই মাথাটা সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে নিয়ে কাঁথার ভেতর থেকে ফ্যাক ফ্যাক করে সে হাসতে থাকে। কী ব্যাপার? না, সে বুঝে ফেলেছে যা বোঝার। এই কথাটার মধ্যে হাসিখুশির একটা ব্যাপার ছিল—আর সেটার সে রীতিমত মালুম পেয়েছে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে আমিও আর হাসি চাপতে পারি না। কী সংক্রামক হাসি অশ্বিনীর। আমিও ঠিক ওর মতো, বোকার মতো দাঁত বের করে হাসতে থাকি। আসলে, এই হাসির জায়গাটায় আমার আর অশ্বিনীর অবস্থা এখন একাকার। অশ্বিনী যেমন প্রথম শোনা আপ্ত-রচনাটির তাৎপর্যে কী এক দারুণ অট্টহাসির কারণ খুঁজে পায় সেই জানে এবং আর কেউ জানে না, তেমনি অশ্বিনীর হাসি কেন আমাকে হাসায়, তা শুধু আমিই জানি। কিম্বা, আমিও জানি না। হাসি আমি থামাতে পারি না। অথচ মজা এই, আমাকে হাসতে দেখে আসল আসামী অশ্বিনীই কৈফিয়ত তলব করে বসে, 'হাসছ ক্যানে, অ্যাঁই, ক্যানে হাসছ?' আমি আর হেসে ওর প্রশ্নের জবাব দিই। অশ্বিনী আবার তার মধ্যে কী একটা নিগূঢ় হাসির কারণ খুঁজে পায়। এবার দুজনে গড়গড়িয়ে হাসি।

বিধবা ও শুচিবায়ুগ্রস্ত, সন্তানহীনা বাড়িওয়ালির অশ্বিনীকে খুব পছন্দ। ভোরবেলা উপত্যকার মতো দিকচিহ্নহীন মাঠময় গরুদের পিছনে একটা টিন নিয়ে সে ছোটাছুটি করে। জংলিদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সে টিন বাজায়। গরুগুলো ভয় পায়, লেজ তুলে ছোটে। কোনও মলত্যাগকারী গরুর পিছনে সে শান্ত হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ও টিনের ভিতর গরুর নাদা পড়লেই 'হুর-রা-রা-ররা-রা' বলে চিৎকার করে ওঠে এবং একই সঙ্গে হৈ-হৈ হাসি শুরু করে দেয়। গৃহকাজে, এমন কি ঘুঁটে দেবার জন্যও এই সরাসরি নাদা বাড়িওয়ালি মতিয়া দেবীর প্রয়োজন হয়। দুপুরে সর্বাঙ্গে থলি বেঁধে, মাথায় টিন লাগিয়ে সে নিমগাছে বোলতার চাকে পাথর মারে। মাছ ধরার জন্য বোলতার ডিমের তার প্রয়োজন হয়। ছেঁকে-ধরা বোলতার ঝাঁকের মধ্যে তার হাস্যরোল শোনা যায়। বিকেল নাগাদ ল্যাজের ডগা তিন আঙুলে ধরে কেলেকুলো সাপের বাচ্চা সে আমার নাকের ডগায় তুলে ধরে, তারপর বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেউটে? ভয়ে আমি হেসে ফেলি।

অশ্বিনীকে নিয়ে হরিণধুকড়ির দিকে গেলে আমারই বিপদ। পথের কুকুরগুলো ওকে দেখলে প্রথমে পালায়, তারপর তারস্বরে চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছু নেয়।

ওদের বেয়াদপ ব্যবহারেও অশ্বিনী হাসে, তবে করুণ হাসি। পুরুষোচিত গম্ভীর গলায় সে আমাকে জানিয়ে রাখে যে বাড়িওয়ালির লাললক্ষ্মী ও বুধুয়া (গাভী ও ষাঁড়) কালু (কুকুর), পুষু (বেড়াল) এরা তাকে সবিশেষ সমীহ করে। আমিও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, হ্যাঁ, ওরা তার হুকুমের চাকরই বটে। আমার এই স্বীকৃতি, এও এক নিগূঢ় হিউমার ভেবে আমার খামকা হাসি পায় কেন যে। নাপিতের ছেলে চোখ ঘোঁজ করে আমার হাসির কারণ খোঁজে। খুঁজে পায়। তবে হাসে।

সেদিন ছিল টুসুর পরব। সারাদিন সুবর্ণরেখার দিকে লোক গেলে টুসু মাথায়, গান গাইতে গাইতে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি। বাঘ অথবা শীত তাড়াবার জন্য পাহাড়ের বস্তিতে আগুন জ্বলছে মাঝে মাঝে। বাঘের থাবার মতো মাঘের শীত। পাহাড়ের গা বেয়ে মাদলের শব্দ নেমে আসছে গড়াতে গড়াতে। গোড়ালি অব্দি কম্বল চাপা দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, শেষবারের মতো বাবার পা মালিশ করে অশ্বিনী আমার পায়ের কাছে এসে বসল। আমরা কাল চলে যাব।

টুসুর গান শোনায় অশ্বিনী—

'কত বনফুলের মালা দোলে
আমার টুসুর গলে।'

'টুসুর মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করলি কেন রে অশ্বিনী?'

'করবক নাই?' অশ্বিনী এই প্রথম রেগে যায়, 'মাঝিপাড়ার উইমেয়্যাটা আমাকে ডেক্যে বলল কি—

ভ্যলভালানো ভালাই রহিলি
ভালার উত্তর না ঘুরালি।'
শুনে রাগ হোবেক নাই?'

বুঝলাম ব্যাপারটা। মেয়েটা আর-কি বিহিত কটাক্ষপাতাদি সহ হাত উল্টে সুরানিন্দিত কণ্ঠে ও সুরসহযোগে অশ্বিনীকে বলেছে, ওহে ভালমানুষ, তুমি ভালমানুষই রইলে। আমার ভাল কথার উত্তর দিলে না।

আমি মাথা নেড়ে বলি, 'রাগবিই তো। রাগবিই তো।'

'তাহলেই দেখুন', তার ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা দেয়।

'তখোন উই মেয়্যাটাকে আমি বলবক কি বলবক নাই যে—

ও তুই নাচ্‌চু কি আটুপাটু
তকে কাট্যে করব খাটবাজু....

(কী উল্টোপাল্টা নাচিস তুই? তোকে কেটে আমার খাটের বাজু বানাব।)

'এইগুলানই আপনার টুসুর গান আঁইজ্ঞা।' অশ্বিনী বলে হাসতে হাসতে, 'গানে বইলতে হয়।'

হঠাৎ ঝগড়া হয়ত হয়নি মেয়েটার সঙ্গে। একটা ব্যাকগ্রাউণ্ডের গন্ধ পাই আমি। এবং, অশ্বিনী তা কবুলও করে। আসলে, মেয়েটার নাম কদম আর ওরা খ্রিস্টান। টুমাংডুংরি গ্রামে চার্চের মধ্যেই ওরা থাকে, মা চার্চের হাসপাতালে আয়া। একদিন হয়েছি কি, তখন বিকেলবেলা, মেয়েটা চার্চের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অশ্বিনী গিয়েছিল মাসির বাড়ি। বিশেষ কিছু না ভেবেই সে জানতে চেয়েছে, 'কদম তুই একা একা দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে?' পাজি মেয়েটা কী বলল আমি জানি কী?

বলল, আমি যার জন্য দাঁড়িয়ে আছি সে তুই না।

— সে তাহলে কে?

— যে আমার বর হবে সে।

— আমিও বড় ট্যাঁটা ছেলে আইজ্ঞা। আমি বললাম,

— সে কি আমি হতে পারি না?

কদম হেসে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু তার তো তোর চেয়ে দু'চার বছর বড় হবার কথা, নইলে কী কর‍্যে হব্‌বে!

বড়দিনে সাইমন বাবা সাদা দাড়ি লাগিয়ে ঘোরে। ওর মাথার কাছে রেখে গিয়েছিল একটা আপেল। এক পা বেড়ার ওপর তুলে খেতে খেতে হঠাৎ বাড়িয়ে দিল আমার দিকে বলল, 'নে খা।'

'তারপর বাঁশবাগানের অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার বাবু.... খালি চুমা খায়—এখানে ওখানে সিখানে—'।

বলতে বলতে ঘুম ঢলে আসছিল তার চোখে। 'তারপর এই একটি বছ্ছর পরে দেখ্যা...'।

বলতে বলতে বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

কাল চলে যেতে হবে বলে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকি। ক্রমে হ্যারিকেন নিবে গেল। একটু পরে দেখি, দেওয়ালে কীসের একটা ছায়া দুলছে। রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে একটা গরুরগাড়ি। দিগন্ত থেকে চাঁদ সবে উঠেছে হাত খানেক, তাই স্পষ্ট দেখতে পাই, গলুই-এর কাছে কোনও গাড়োয়ান নেই। আমাদের বাড়ির একদম গা ঘেঁষে বেঁকে বুরুডি যাবারর পথ দূরে হারিয়ে গেছে। গাড়িটা ঘুরে গেলে দেখি, মানিকবাবুর 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'তে যেমন, গাড়োয়ান এক নারীর কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে বসে, পাশে পুঁটলির মতো ঘুমন্ত শিশু। তাদের মাথার ওপর দুলছে কানা লণ্ঠন, আলোর চেয়ে তা থেকে অন্ধকারই ঝরে পড়ছে বেশি। বরুডির পথ ধরে যেতে যেতে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে চাঁদের ঢাল তুলে পথ তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়।

পরদিন সকাল নাগাদ দেখি অশ্বিনী ঘুড়িটা জুড়ে ফেলেছে। লাল আলতা দিয়ে তার ওপর লিখেছে, অশ্বিনীকুমার দাস। ক্লাস-III

'বিকেলে ওড়াব।' অশ্বিনী আমাকে বলল।

'এখন ওড়াবি কী রে। এখন কি কেউ ঘুড়ি ওড়ায়। প্যাঁচ খেলবি কার সঙ্গে?

অশ্বিনী যথারীতি হাসল। কিন্তু, এই প্রথম ওর হাসি আমাকে হাসাতে পারল না। বিকেলে সাইকেল রিক্সায় ওঠার সময় বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও অশ্বিনীকে পাওয়া গেল না। জানা গেল, ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে সে মাঠে গেছে। সাইকেল রিক্সা স্টেশন রোডে পড়তে দেখি, একটা ঘুড়ি উড়ছেও। সেই ময়ূরপঙ্খীটাই।

ট্রেন আসতে দেরি নেই। রিক্সাওলাকে আরও জোরে চালাতে বলি। হাওয়া চালাচ্ছে বেশ জোরে। ঘুড়িটা ছোট্ট হয়ে আসছে। খুব সুতো ছাড়ছে অশ্বিনী। শীতকাল আর কেউ ঘুড়ি ওড়ায়নি। সুতো ফুরুলে এত বড় আকাশে একা, কেমন অবুঝভাবে ব্যাপারটা হাস্যকর লাগবে না কি অশ্বিনীর? হাসতে হাসতে তখন সুতো কেটে হয়তো উড়িয়েই দেবে ঘুড়িটা।

১৯৬০-৬১ সালের ঘাটশিলায় দেখা অশ্বিনী দাস নামে এক বালক। আজ ৩৬ বছর পরে তাহাকে প্রণাম।

*বিনোদন বিচিত্রা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭*

# বিজনের রক্তমাংস

আজ ভোরবেলা বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে গিয়ে বিজন দেখল পেচ্ছাপের বদলে আজ রক্ত বেরুচ্ছে; সে রক্ত-প্রস্রাব করছে। বাধা না দিয়ে বিজন পেচ্ছাপ করল। আরও পেচ্ছাপ পায় কিনা দেখে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সে ঘরে এল। শীত পাচ্ছিল, তাই কাঁথা মুড়ি দিয়ে, দেওয়ালে দুটো বালিশ রেখে তাতে ঠেস দিয়ে বসল। তখনো তার কপালে রক্ত লেগে ছিল।

এই ভোরে মেজদা ফ্যাক্টরি যাবে, যাবার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, বিজন তার শব্দ পেল। এই সময়টাকে ধরে রাখার চেষ্টায়, বিজন জানে, মেজদা এখন বউদিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। মেজদা বেরিয়ে গেল, বউদি হাসিমুখ জানালার গরাদে চেপে, তারপর কাছে এসে বলল, 'এই চা খাবে?' বাইরে বহুদূর পর্যন্ত তখন বৃষ্টি পড়ছিল, স্নানের পর মেয়েরা যেমন চুলে ঝাপ্টা দেয়, তেমনি করে হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঝাপ্টা মেরে যাচ্ছে। দু-একটা কাক-পায়রা ওড়াউড়ি করছিল, বৃষ্টি হঠাৎ ঝেঁপে এলে বিজন বউদিকে বলল, 'হ্যাঁ, করো', তারপর বলল, 'আদা দিও, বুঝলে?' এই যে এখন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, পাখিদের এতে খুব একটা আপত্তি আছে বলে ত মনে হয় না। এ দু-এক মিনিটের ব্যাপার নয় বুঝে অনেকেই চোখ বুজেছে নিশ্চিন্তে। এদিকে কাছেই জানালার শার্শিটা ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে বারবার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটু মন্থরভাবে নেমে এসে ফেটে যাচ্ছে হঠাৎ, তারপর চৌচির জলরেখা কী তীব্রতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে কাচময়। বিজন মনে করে দেখল, অন্য সব কিছু স্তব্ধ হলে তবে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় যা কিছু শব্দ শোনা যায়— রেল, মেঘ কি ট্রাফিকের হর্ন, জলের ছপছপ বা মানুষের স্বর, সবই প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়।.... বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে হাল্কা জামরঙের।

বিজন বসে বসে আরও ভাবতে লাগল। বিজন সবচেয়ে বেশি ভালবাসত তার আন্তরিকতাকে, সন্দেহও করত তাকেই সবচেয়ে বেশি, আজ আর কোনও সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই, আজ সে খুব আন্তরিকভাবে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। বাকি ভাবনাগুলো খুব এলোমেলোভাবে এলেও দুটো ব্যাপার তার মনে এল প্রথমেই। এক হল এই যে, তার যে খুব গুরুতর অসুখ হয়েছে এটা আর অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। বিশ্বাস করতে পারছে না অথচ অনস্বীকার্য, এমনি একটা অনুভব বৃষ্টিশেষের অপরাহ্নের আলোর মতো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল তার বুক জুড়ে। বিজনের মনে হল, ঠিক এরকম আলোতেই মেয়ে দেখাতে হয়, দেখালে, কালো মেয়েকেও সোনালি-ফরসা দেখায়। দ্বিতীয় কথা তার এই মনে হল যে, সে কোনও মহিলার সঙ্গে প্রেম করে না। এরপর বিজন অন্য কিছু ভাবল না কয়েক মুহূর্ত। এই সময় হাওয়া উঠে এমন ফাঁপিয়ে দিয়ে গেল বৃষ্টিটা যে, কিছুক্ষণ বারিপতনের আওয়াজও আর শোনা গেল না। বিজন তখন ভাবল, আচ্ছা, ভাল যদি বাসত কেউ, তাহলে আমার এই অবস্থাটা কি অন্যরকম হত? এই যে আজ সকাল থেকে অনুভবের একটা আলো বুক জুড়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে ক্রমশ, যার ফলে তার বক্ষদেশ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, আলোর সামনে মেলে-ধরা এক্স-রে প্লেটের মতো তার সমস্ত অন্ধকার বুক এখন ঝলঝল করছে—তাহলে, যদি নারীর ভালবাসা থাকত, এ-রকম অবস্থা তার হত কি? বিজন বুঝতে পারল, না, অপ্রেমে আছে বলেই বুক জুড়ে আছে এমন ঝলমলানি, সেখানে তাই এত কোলাহল। বিজনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গুরুতর অসুখ হবার পর তার বন্ধু হিরন্ময় যখন ছমাস অনুপস্থিত রইল আড্ডায়, কই, এত সেনসিটিভ হওয়া সত্ত্বেও, হিরণ্ময়

ওই ছমাস কাল যে দুঃখ ভোগ করেছে একা, সেই দুঃখ তার ত একদিনও হয় নি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে পড়েছে বটে যে, হিরণ্ময় আমাদের মধ্যে নেই, সে বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু তাকে যে ইনজেকশান নিতে হচ্ছে—যন্ত্রণাকর, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতে হচ্ছে—যন্ত্রণাকর, তার যে মনে পড়ছে, সে যে হিংসে করছে, ওই যে লোকটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাজার করতে, চাকরি করতে, মোট বইতে—ওরই মতো কয়েকটি লোক, তাদের শুধু হাঁটাটুকু জানালার ধারে বসে সে যে নীরবে হিংসে করছে—এইসব দুঃখের কথা তার ত মনে হয় নি! তারপর সেরে উঠে হিরণ্ময় যখন তাদের মধ্যে ফিরে এল, তা আরও দুঃখের, নয় কি? তারা যখন একটার থেকে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে নিত, হিরণ্ময় কি অন্যমনস্ক হয়ে যেত না? বা, সবাই মিলে যখন মদ খেতে হেঁটে যেত এসপ্লানেড অব্দি, 'যাই বাড়িতে কাজ আছে', হিরণ্ময় তা এই কথা বলেই চলে যেত। এটা ত অধিকতর দুঃখের যে, একজন যুবা যদেচ্ছ খরচা করতে পারছে না তার শরীর, তাকে সাবধানে থাকতে হচ্ছে, সন্ধে হলে ডিম ও দুধ খেতে তাকে বাড়ি যেতে হয়। 'সমস্ত দুঃখ আমাকেও একা ভোগ করতে হবে,' বিজন এতদিনে বুঝতে পারল; বুঝতে পারছে কিন্তু কান্না পাচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না, কেননা, এই সমস্ত বুঝতে পারাই বিজনের মনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে চলে যাচ্ছে। এরা এত সঠিক যে বিজনের কোনও দুঃখবোধকেই এরা পরোয়া করে না। সমুদ্র নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিল বলে, বিজন জানে, গত কমাস ধরেই তার পুরীতে, সমুদ্রের ধারে, কিছুদিন কাটিয়ে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এখন যদি বিজন যায়, ছোটাছুটি করতে করতে যায় সমুদ্রের ধার অবধি, যে জ্বলন্ত জামা-কাপড় সে পরে আছে—সবই রাস্তায় ফেলে দিতে পারবে, কিন্তু সমুদ্রের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেও বীজাণুগুলির হাত থেকে তবু সে কি পরিত্রাণ পাবে! কিছুতেই, কিছুতেই রেহাই সে পাবে না। অসুখ কোথায় কামড়ে পড়ে রয়েছে, সে বোঝে। কিন্তু সে কি পারে কিডনিটাকে খুলে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে? সে যদি বলে, আমি কিছুই চাই না, মানুষের পরিবর্তে একটা কেঁচোর জীবন গ্রহণ করতেও আমি খুব রাজি আছি, কারণ, আমি যদিই বেঁচে উঠি, অর্ধজীবিত হয়ে বেঁচে থাকতে আমি চাই না, এর চেয়ে মেরুদণ্ডহীন হলেও কেঁচোর সম্পূর্ণ জীবন আমার কাম্য—এমনকি সে যদি লিখে দেয় যে ভবিষ্যতে নারী সম্পর্কেও সমস্ত দাবি সে ছেড়ে দিচ্ছে, তাহলেও কি সেই অনির্বচনীয় হুণ্ডির মালিক তার শরীর থেকে সবকটি জীবাণু তুলে নিতে পারে, পারে না।

বিজনের খেয়াল হল বৃষ্টি থেমে গেছে, শোকের মতো ফোঁটা ফোঁটা এখন পড়ছে, ওড়াউড়ি করছে হাওয়ায়। বিষণ্ণভাবে ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে সে তা দেখল। সহসা তার কবির দুটি লাইন মনে পড়ল....

The candle on the table burned,

The candle burned.

কবিতাটা সে একবারও অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিল কি? সে লাইন দুটো বিড়বিড় করতে লাগল।

কোলের ছেলেটা তার বউদির গলা জড়িয়ে ধরে আছে। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, তার হাত গলা থেকে টেনে ছাড়াতে ছাড়াতে, বউদি, যাকে বলা হয় অর্থপূর্ণ, সেইরকম হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কীগো, কবিতা?' বিজন বলল, 'আদা দিয়েছ?' ছেলেটা মেঝেয় হামা দিচ্ছিল, এখন আঙুলে একটা জ্যান্ত পিঁপড়ে টিপে তুলে ধরে হাঁ করছে, এই মুখে দিল বলে, তাকে বাধা দেবে কি—একদিন বউদির ছেলেটাকে কোলে তুলে নেবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে, এটা আগে থেকে বুঝতে পেরে, কেন সে তাকে যথেষ্ট আদর করে নেয় নি, এই আপসোসে বিজনের চোখে জল এসে গেল, সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বউদি আরও কাছে এগিয়ে

এসে বলল, 'কীগো....' 'আঃ' বলার মতো করে বিজন বলল, 'না'; বলে হাসল। নিজের হাসিটা সে দেখতে পেল।

সমস্ত কোমর জুড়ে বিজন এবার একটা ব্যথা অনুভব করল। সেই কোন ভোরে বাথরুমে প্রস্রাব করার পর, সে-কথা এই প্রথম আবার তার মনে পড়ল।

বৃষ্টি থামলে বিজন রাস্তায় বেরুল। রোদ উঠছে, শরীরের কোথাও কোনও অসুবিধে নেই। না-কোনও যন্ত্রণা, না মাথা-ধরা, না-কিছু। সকালে অল্প কাশি ছিল, এখন তাও নেই। জ্বর নেই। শুধু চোখর পাতা ভারি হয়ে আসছে বারবার।

কবে থেকে মনে নেই, বহুদিন, বোধহয় তো সেই কৈশোর থেকে; ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আয়নায় মুখ দেখা বিজনের অভ্যাস। বড়দির কাছে শুনেছে, সাত-আট মাস বয়সে যখন তাকে প্রথম আয়না দেখানো হয়, সে নাকি মিনিট-দুই গম্ভীর হয়ে ছিল, তারপর ফিক করে হেসে ফেলে। ছেলেবেলা থেকেই বিজন স্বপ্ন দেখত অত্যন্ত বেশি, বড় বড় ঘুমে ও স্বপ্ন দেখে দেখে ক্লান্ত নিজের ফোলা মুখটা, রাত পোহালে, আয়নায় দেখতে বরাবরই তার ভাল লাগত। বাবার কথা মনে পড়ল বিজনের। বাবা শেষ যে-কদিন বেঁচে ছিলেন, প্রায়ই বলতেন, 'কিরে, তোদের আজকালকার ছেলেদের হল কি। আয়নার কি দেখছিস? এই ঘুম ভাঙল, এখন মুখ-হাত ধো, বাইরে যা। সূর্য ওঠে নি, পৃথিবীটাকে দেখার এই ত সময়।'

ছেলেবেলা থেকেই বিজনের সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুটিকে বড়দের কেউ-না কেউ প্রায়ই বলে গেছে, 'বাঃ, ছেলেটি বেশ সুন্দর ত!' অথচ কেউ কোনওদিন বলল না তাকে কেমন দেখতে, শুধু চুপচাপ থেকে গেল। সস্তা আয়নাগুলির কথা বাদ দাও, সেগুলোর পারা খারাপ, কাচ ভাল না। কিন্তু এ-বিষয়ে, দামি এবং বিলিতি ও ভাল আয়নাগুলিও তাকে কিছু জানাতে পারল কই? কলেজে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল বরুণের; বরুণ প্রথম দিনেই ওয়াই এম সি এ রেস্তরাঁর কেবিনে বসে তার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতো কেমন মৃদু হেসে জানাল, 'আমার রূপের, বুঝলেন না, ছেলেবেলা থেকেই প্রশংসা শুনে আসছি।' ঠোঁটের কোণ দিয়ে বরুণের ধোঁয়া ছাড়া বেশ মনে পড়ে। বিজন হঠাৎ ভাবল, আচ্ছা, রূপসীরা আয়নাকে কত ভালবাসে? বিজনও আয়না ভালবাসত।

আজ সকাল থেকে বিজন আয়না দেখেনি। দেখেনি, কিন্তু বর্ণনা-করা কোনও মুখের মতো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার মুখটা ফোলাফোলা, গাল দুটো চিনচিন করছে, চোখের নিচে দুতিনটে বেশি আঁচড়। কোলে কালি। বারবার চোখদুটো টেনে তুলেছে সে ভ্রূ দিয়ে। বিজনের চোখ বরাবরই একটু বেশি কালো, আপনপ্রিয়, ভাসাভাসা। চোখদুটি আজ বসে গিয়েছে বলে সে খুবই মনোকষ্ট পেল। সে আট নম্বর বাস ধরল।

'কী বিজু, কী খবর!' বুকটা ধড়াস করে উঠল বিজনের। বেচুর সঙ্গে আজকাল বিজনের প্রায়ই দেখা হয়; কিন্তু সেই কবে স্কুলে সেকশান বদল হবার জন্যে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে দু-একবছর দূর থেকে যে-কোনও একজনের ভ্রূ-নাচানো অর্থাৎ 'খবর ভাল', এবং আর-একজনের ঘাড় হেলিয়ে সম্মতিসূচক হাসি, এই ছিল। ক্রমশ এটা পীড়া হয়ে উঠলে, হঠাৎ দেখা হলে কেউ কারুকে আর দেখতে পেত না। তারপর প্রায় নবছর পরে, আজ, এই ভোরের বেলা, বিজন নয়—বিজু—'কী বিজু', কী খবর ? 'অনেকদিন পরে দেখা হল'। প্রীতিকর হাসি হেসে স্মিতচক্ষে বেচু তাকাল। বিজন মুখের কিছু ঢাকবার চেষ্টা করল না। মুখ শুকনো হয়ে গেছে সন্দেহ নেই সাদাটে দেখাচ্ছে, দেখাক। 'হ্যাঁ, তা সত্যি', সে বলল। গালের যেখানটা চিনচিন করছে, সেখানটা কি কাঁপছে? বিজন সেজন্যে কমপ্লেক্স বোধ করল। হয়ত খুব ফোলাফোলা দেখাচ্ছে, অভিনেতা রুজ মাখলে যে-রকম হয়, হয়ত তেমনি লাল.... 'বেশ লাল দেখাচ্ছে তোকে। মোটা হয়েছিস!' মোটা? বিজন অস্বীকার করে হাসল না, স্বীকার করেও না। এমনি

হাসল। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বেচু ছেলেবেলার গল্প শুরু করল। ওরা যখন মর্নিং-স্কুলে যেত, বিজন বাড়ি থেকে ডেকে নিত বেচুকে, বিজনের কি মনে পড়ে? মনে পড়ে বিজনের; মনে পড়ে ছোটবেলায় একদিন এই বেচুকে দেখে এমনকি মা পর্যন্ত বিজেনর সামনেই বলেছিল, 'আহা, কী সুন্দর দেখতে রে তোর বন্ধু!' কিন্তু কেন বেচু এতদিন পরে তার সঙ্গে কথা বলছে, বলল যদি এসব বলছে কেন, 'বিজু' বলে ডাকছে কেন—তবে কি, তাহলে সকালের রক্তপ্রসাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কিছু? বেচুকে তার এত ভাল লাগছেই বা কেন, তার মধ্যে ভালবাসা হচ্ছে কেন, এমন ব্যাকুল! হঠাৎ একটা কথা মনে হল বিজনের। আরে, মর্নিং-স্কুল ত গ্রীষ্মকালে হয়। অথচ তার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল স্কুল-যাবার সমস্ত পথটা শীতের কুয়াশায় ভরতি। বস্তুত, শীতের ভোর ও তার কুয়াশাকে সে কিছুতেই আলাদা করতে পারছে না তার মর্নিং-স্কুলের পথ থেকে। আচ্ছা, ভাল কথা, এএএ, বিজুর কি মনে পড়ে যে তাদের মর্নিং-স্কুলের পথে একটা দেবদারু গাছ পড়ত? মনে পড়ে, এ্যাঁ? মনে পড়ে? 'মনে পড়ে কি বিজন, তোর?'

ড্রাইভারের পিছনের সিট থেকে লম্বা ও বাঁকা নাকওয়ালা ওই রোগা লোকটা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে আছে, এইমাত্র তাকে দেখে ও চমকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিজন ভাবল। একটু ভাবতেই বুঝতে পারল, দেখছিল।

লোকটা নামল কয়লাঘাট ষ্ট্রিটে, বিজনও নেমে পড়ল। নেমেই বলল, 'দেশলাই আছে?' লোকটার কাছে, আশ্চর্য, ছিলও। হাতের ফাঁকে পুরো কাঠিটা জ্বলে যাবার পর, নিবে যাবার আগে বিজন সিগারেটটা ধরাল ও ততক্ষণ ধরে ভ্রূ-দুটো নামিয়ে রেখে লোকটাকে দেখল। বিজনের গালটা চিনচিন করতে লাগল। গালের রুজ তুলতে ভুলে গিয়ে অন্যমনস্ক অভিনেতা থিয়েটার থেকে অনেকদূর চলে আসার পর যেমন বিব্রত বোধ করে, বিজন সেইরকম কমপ্লেক্স বোধ করল।

লোকটা চৌরাস্তার মোড় অব্দি ক্রমশ ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। একবারও ফিরে তাকাল না। লোকটা খোঁড়া নাকি?

বিজন ঠিক করেছিল, আজ রাত পর্যন্ত সারাদিনটা সে রেণুর বাড়িতেই কাটাবে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে অবিনাশ কবিরাজ লেনে ঢোকার মুখে তার যা-একটু লজ্জা করবে, এপাশ-ওপাশ দেখে নেবে একবার। কিন্তু গলির ভিতর খানিকটা অগ্রসর হতে হতে ক্রমশ এবং ৪নং বাড়ির চৌকাঠে পা দেবার আগে সে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ বোধ করবে। যেন এই নিয়ে তৃতীয়বার সে এ বাড়িতে এল না, বহুদিন ধরে আসছে। প্রকৃতপক্ষে একতলায় কড়া নাড়ার আগে সে মনে করে নেবে ভেবেছিল যে, যেন ন-পিসিমা বা সুকুমারের বাড়িতে ঢুকছে।

বিজন ভেবেছি, রেণুকে না-জানিয়ে একবারে বাজার করে নিয়ে ঢুকবে। রেণুর সামনে থলেটা উপুড় করে দিলে সে অবাক হয়ে বলবে, 'ওমা, একী! বললেন না কেন, কত-কী আনতে বলতাম!' কত-কী কথাটার মানে তাহলে এইভাবে করে নেবে, বিজন ভেবেছিল যে, রেণু যেন, জানিয়ে গেলে, আলু-পটল কি মাংস পেঁয়াজের সঙ্গে, বাজার থেকে, তাকে কয়েকগাছা কাচের চুড়ি কি একটা ভাল রুমাল বা দামি একটা সাবান আনতে বলত। রেণুকে, সে ভেবেছিল, রাঁধতে বলবে। দুপুরে যে-ঘন্টাখানেক রেণুর সঙ্গে শুয়ে থাকবে তার একটি মুহূর্তও অপব্যবহার করবে-না, তারপর নিজে অল্প ঘুমিয়ে বা ঘুমন্ত রেণুকে ঘরে রেখে, তিনটি-চারটে নাগাদ সে একবার অফিসে যাবে ঠিক করেছিল।

বিজন বারটার আগেই অফিসে গেল।

এর আগে তার কখনো লেট হয়নি, আজ পি এ-র ঘরে গিয়ে সই করতে হল। হরিকান্তবাবু

মোটাগোছের নন, বেশ রোগাই, কিন্তু বিশেষ নড়াচড়া করেন না। হরিকান্তবাবু চুলে কলপ মাখেন, মাথাটা পাকা তালের মত, লম্বা লম্বা মাথা-ভাঙা কানের ভেতর থেকে ঝুলে রয়েছে কয়েকগাছি চুল, যেন দুটো জামরুল গোঁজা দুকানে—তাঁর মুখ লাবণ্যময়, চোখ ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া—আসলে, কৃতি ও তৃপ্ত মানুষগুলির মুখে যে একটা রগড় আছে, হরিকান্তবাবুকে না দেখলে তা বোঝা যায় না। চশমাটা কপালের ওপর তুলে দিয়ে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়েছিলেন। বিজন চলে আসছে, এমন সময় ফকফক করে বললেন, 'কী মশায়, দেরি হল?'

'এই এমনি!' বিজন জানাল।

'কোনও বিপদ?' আবার ফকফক আওয়াজ শুনে বিজনের টেবিলের ওপর চোখ পড়ল। পেন-হোল্ডারে কানে সুড়সুড়ি দেবার পালক, তার পাশে একটা মোটা ফাইল রয়েছে টেবিলে; বেশ ভারি হবে, বিজনের মনে হল।

এস্ট্যাবলিশমেন্টের সুপ্রভাত কী-একটা ছুটিছাটার বিষয়ে ও একবার একটা স্ট্রিকচারের ব্যাপারে ওর পার্সোনাল-ফাইল খুব তাড়াতাড়ি মুভ করিয়ে দিয়েছিল বলে, তার জের টেনে সে বিজেনের বন্ধু। বিজন তার পাশের সিটে বসে বলল, বোধ হয় তাকে ছুটি নিতে হবে, হয়ত তার কোনও গুরতর অসুখ করেছে, বলে সে একটা গুরুতর অসুখের নাম করল।

'সে কি মশায়, তাহলে ত চাকরি যাবে!'

'কী!' বিজন ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এত আহত সে বহুদিন বোধ করে নি। কী কথার কী উত্তর! সে নীরবে বলতে লাগল, আমার অসুখের নাম শুনে, হ্যাঁ, খুব ছোঁয়াচে, ভয়ঙ্কর অসুখ, বাঁচব কি মরব ঠিক নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ কথাটা মনে হল আপনার! আমার যদি ওই অসুখই থাকে, তাহলে, চাকরি যাবে কি যাবে না....

'কী বলছেন?' বিজন জিজ্ঞাসা করল।

'না। বলছিলুম যে—' বিব্রত গলায় অথচ যেন সত্যি সত্যি বলছে, এমনভাবে সুপ্রভাত জানাল, 'মানে, ছুটি নিতে হবে ত অনেকদিন, উইদআউট-পে হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত, ফিট-সার্টিফিকেট দিয়ে তবে জয়েন করতে পারবেন, তারপর ধরুন না—'

বিজন অবিকল ওর দিকে একভাবে চেয়ে আছে দেখে, 'দূর মশায়, আপনার কিস্যু হয় নি, যত্তসব—হ্যাঁঃ—', দূর মশায়টা বেশ জোরের সঙ্গে এবং ভালবেসে 'কিস্যু হয় নি' উচ্চারণ করতে পেরে, পকেটে রুমাল খুঁজতে গিয়ে একটা সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চিরুনি বের করে ফেলে, সুপ্রভাত চুল আঁচড়াতে শুরু করে দিল।

সাতের ডিভিশানে গিয়ে বিজন দেখল, ঘরে কেউ নেই। তিনের ডিভিশানে চৌধুরী, প্রমোদবাবু, নিমাই ও রাসবিহারী, কেন কে জানে, আজ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। ডিভিশানাল ক্লার্ক প্রফুল্লবাবুকে ফিসফিস করে একজন বলছে, 'একটা উপায় করুন দাদা!' রাসবিহারী বলেছে, এবং বাকি সবাই সব বিষয়ে ওর সঙ্গে একমত হচ্ছে। অবশ্য, মধুসূদনের সনেট-সম্পর্কে ঈষৎ অমিল রয়েছে। কিটস্ এবং ফ্যানি ব্রাউনের প্রেম-সম্পর্কে রাসবিহারী দুকথা বলল, বুদ্ধদেবের অমুক কবিতা আসলে বোদলেয়রের অনুবাদ, বলল, অপ্রত্যাশিতভাবে এলিয়ট থেকে দুলাইন কোট করল। ভুল, বিজনের না-পড়া থাকলেও সে বুঝতে পারল।

হঠাৎ বাইরে ইলেকট্রিক এঞ্জিনের তীব্র সিটি বেজে উঠল। রাসবিহারী বিজনের দিকে ফিরে বলল, 'এই যে! আচ্ছা, এই সিটি শুনলে আমার কী মনে হয় জানেন?'

'আপনার?'

'কী-রকম বলুন ত এই আওয়াজ। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে বলতে হবে কিন্তু। ইশ, বলতে

পারছে না', রাসবিহারী আপসোস করল, 'হোয়ট এ পিটি!

'কী?' বিজন জিজ্ঞেস করল গলার স্বর না পালটে।

'ঠিক শাঁখের মতো, নয় কি?' রাসবিহারী তৃপ্ত হাসল, 'শুনলে মনে হয়, যন্ত্র যেন তার জয়ধ্বনি করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।'

'চুলন যাই!' একটা প্রশ্নবোধক হাসি হাসল রাসবিহারী, যেন, বলছে, কেমন দিলাম? বিজন ও রাসবিহারী চা খেতে গেল।

রাসবিহারী সবসময়ই তার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলত, বিজন ভাবত নিউরোসিস, শেষের দিকে সন্ধ্যাবেলায় জ্বর ও ভোরবেলাকার বুক ধড়ফড়ানির কথা বলতে গিয়ে এমন যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলত মুখে যে, বিজন ধরে নিয়েছিল, ও সত্যিই অসুস্থ। রাসবিহারী যখন একমাস ছুটি নিল, বিজন ক্রমাগত ওর জন্যে সহানুভূতি বোধ করেছিল। আজ রাসবিহারী রেস্তরাঁয় বসেই, 'সুস্থ আছি', 'নেভার ফেল্ট বেটার', 'বুঝলেন বিজনবাবু, ভোরে দুধ খান পোয়াটাক আর সন্ধেবেলা দুটো ডিম, তাহলেই দেখবেন—' বলে তারপর মেয়েদের স্তন পাছা ইত্যাদি নিয়ে নপুংসকের খিস্তি সুতরাং অশ্লীলতা করতে করতে, পরপর দুবার, 'জানেন, আমি একটা সাঙঘাতিক কাব্যনাট্য লিখব,' জানিয়ে উত্তর না পেয়ে, 'আমি কি কাব্যনাট্য লিখতে পারব না বলে মনে করেন—' জিজ্ঞেস করায়, 'আপনি কোনওদিন কিছু লেখেননি ও ভবিষ্যতেও কিছু লিখতে পারবেন না', বিজনের এই অনমনস্ক ও উদাসীন উক্তিতে ধীরে ধীরে খেপে গিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে যথেষ্ট অপমান করল, অপমান করার সমস্ত সময়টা ধরে বিজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বাক, শুধু এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, আমি কি ক্লীব, আমার কি আত্মসম্মান নেই, এবং আমি কেন রেগে উঠছি না? অনেক আশা ছিল যে এইবার, এরপরেই সেই রেগে উঠবে। একবার যদি দৈবক্রমেও রেগে যায়, তাহলে যদি কটূক্তির কথা ওঠে, বিজন জানে, তাকে চেষ্টা করতে হবে না, জিভে নিপুণতম শব্দ তার এমনিই আসবে, ওর দুর্বলতম জায়গাটাতে আলপিনের পুরোটা ফুটিয়ে, চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে কুঁড়ের বাদশার মতো তারপর সে শুধু ওর কাতরানি দেখবে।

আশ্চর্য হয়ে গেল বিজন, তার রাগ হল না। রাসবিহারী অবশ্য পরে নিজেই ক্ষমা চাইল, বুঝেছে, যে সব দোষ ওর, বলল, ওর অসুস্থতার। বুঝতে পেরেছে বলল যে, বিজন সত্যিসত্যিই তা বলতে চায়নি।

রাসবিহারী উঠে গেল, বিজন রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বাইরে রাস্তায় অফিস-ফেরৎ জনতার ভিড়, ওপারে শিবপুরের কাছে একটা লম্বাটে মুখের মতো সূর্য ঝুলে রয়েছে।

বিজন রেস্তরাঁয় বসে রইল। পাখাটার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হল তার, আরে, পাখার মুণ্ডটা যে এমন কারুকার্য-করা, এতদিন এসেছে, কই, তার চোখে পড়েনি ত। কেন সে দেখে নি এতদিন! বিজন বড্ড কষ্টবোধ করল। কাল থেকে কতদিন আবার আসবে না, হয়ত কোনওদিনই আসবে না আর, কেন সে আগে বহুদিন ধরে পাখাটা দেখে রাখেনি! ছেলেবেলা থেকে আয়নাই দেখেছে শুধু, কিছুই তার চোখ পড়েনি, ব্যাধির কথা তার মনে পড়ে নি। নইলে কীসের ভুলে, কার ওপর অভিমানে, কাপের পর কাপ চা খেয়ে, সারারাত ধরে মদ খেয়ে, একটা সিগারেট থেকে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, স্বাস্থ্য খরচ করে করে—হ্যাঁ, অসুখটা ত সে নিজেই ডেকে এনেছে। অথচ, তার মধ্যেও ব্যাধি রয়েছে অনিবার্য, এই বোধ সে কী করে বিস্মৃত হয়েছিল? তা না হলে, সে কাউকে ভালবাসে না, নিজেকেও না, পঁচিশ বছর বয়সের তার এই যন্ত্রণা, এ কত মিথ্যা হয়ে যেত! বিজনের মনে হল, রাস্তা

দিয়ে এই যে অফিস-ফেরৎ কেরানিরা যাচ্ছে হুড়মুড় করে, যারা ভুল জীবন কাটাচ্ছে, যাদের জীবনে আর কিছুই হবার নেই, যা কতকগুলি মাস-পয়লা ও স্ত্রীর মেনস্টুরেশানের মধ্যে খণ্ড খণ্ড একটা ব্যাপার—এই যে জীবন, এও কত গুরুত্বপূর্ণ, যদি তা মৃত্যু-সম্পর্কে চেতনার দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়। এইসব লোক, এরা প্রত্যেকে বীজের মত এক-একটা মৃত্যু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা প্রত্যেকটি লোক আলাদা, কারণ, এদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব এবং আলাদা আলাদা মৃত্যু, বিজনের ইচ্ছে হল, সকলকে ডেকে ডেকে সে এই কথা বলে; হ্যাঁ, নতুন কথা বৈকি, অনেকেই শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারে, তুমি রক্তপ্রস্রাব করেছ, তুমি গুরুতর অসুস্থ, তুমি অস্বাভাবিক, তাই তুমি একথা বলছ। তাই কী? 'না' বিজনের ব্যথিত দুই চোখে তাকিয়ে বিস্ফারিত স্বরে সে বলে উঠল, 'তা নয়।' সে অতি সাধারণ মনের লোক ছিল বলেই জীবন-সম্পর্কে সবচেয়ে যা স্বাভাবিক, তা জানার জন্য এই অস্বাভাবিকতা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যে-কোনও উপায়ে এ তার আগেই জানা উচিত ছিল। কিন্তু এখন, যখন সে জানে, তার অসুস্থতার জন্যই জানে, সে সকলকে তা জানাতে চায়। এদের সকলেরই ত অসুস্থতার আগেকার সেই অস্বাভাবিক অবস্থা, যখন সে তার প্রতিটি প্রশ্নের একটিরও উত্তর পায়নি! আজ একটির পেয়েছে। আজ সকালে বেচুকে ডেকে সে বলতে পারত, 'বেচু, তোর কী উচিত জানিস? তোর উচিত সবসময় চোখ নামিয়ে, নিচু গলায় আর হেঁটমুখে কথা বলা, যেমন, যখন তুই মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকিস। কী ডিগনিটি এই অসুস্থতার, জীবনের সঙ্গে তারই শুধু ক্ষমাহীন সম্পর্ক, মৃত্যুর কথা মনে রেখে, বেচু, তোর ঘুমঘোরে প্রতিটি কাজ করা উচিত।'

অথচ, অন্যদিকে, বেঁচে থেকে পড়ন্ত আলো হাঁটাহাঁটি করছে এইসব নারী ও পুরুষ, এই শুধু-বেঁচে থাকাটুকুই কত উপভোগ্যতার! কিন্তু সে যাই হোক, বিজনের চোখে তবু জল এসে গেল এই ভেবে যে, সে কেন দু-এক বছর ধরে এই রেস্তরাঁয় এই কারুকার্য-করা পাখাটার নিচে বসে রইল না, অনন্ত বসে থেকে, চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে, বারবার শুধু-বেঁচে থাকা লোকগুলোর সহসা বিকেলবেলার এই নীরব হাঁটাহাঁটি লক্ষ্য করে যেতে পারল না! চশমাটা খুলে ফেলে বিজন বারবার তার কাচ মুছতে লাগল।

রাস্তায় বেরিয়ে বিজন একটা ক্যাপস্টান কিনল। আজ সকাল থেকে সে সিগারেট খায় নি। কিনেই ভাবল, এহে, দুটো কিনলেই হত, মিছিমিছি আধ নয়া-পয়সা গেল। কিন্তু সিগারেটটা দড়িতে ঠেকাতেই এ কী হল বিজনের, রেণুর নগ্ন দেহটার জন্যে সে আপাদমস্তক কামনা বোধ করল।

একতলায় সিঁড়ির নিচে শেফালির মা শুয়েছিল। তিনতলায় উঠে যার সঙ্গে দেখা হল, কী নাম মনে পড়ার আগেই লোকটা, 'কী মোশা, কোতা চিলেন এ্যাদ্দিন?' বলে ওঠায়, গলার স্বর শুনে বিজনের মনে পড়ল, ভদ্রলোকের নাম বর্মন। বর্মন বললে, 'পত বুলে নাকি?' বিজন বলল, 'না, পথ চিনেই ত এলুম।'

এই ভরা সন্ধেবেলায় বর্মন বাঁ-চোখ টিপে বললে, 'বেশ করচেন। তারপর? রেণুর কাচে?'

'লোক আছে?'

'লোক? দেকুন গিয়ে!' রেলিঙে হাত রেখে বর্মন নিচে নামতে লাগল, 'কাল থেকে খিল মেরে পড়ে আচে। মাচের মতো মাল খাচ্ছে মোশা, দুদিনে বোতলদশেক ওপরে গিয়েচে।' বর্মন তার নিরপরাধ মুখ ঘুরিয়ে জানাল, 'শেপালির কাচেই শুনচিলাম।' বলতে বলতে বর্মন নিচে নেমে গেল।

বিজন ওপরে উঠতে লাগল।

ছাদের কোণে খাতুনের ঘরে আলো জ্বলছে। এদিকের ঘরটা রেণুর। দরজায়, কই, খিল দেওয়া নেই ত। কলের নিচে চাকর গোপাল বাসন মাজছিল, বলল, 'মা ভেতরে আছেন।'

পরদা তুলে ভেতরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিজন। ঘরে কোনও আলো জ্বলছিল না, একখণ্ড দেওয়ালের মতো বিরাট আয়নাটার ওপাশেই, যেন রাস্তার আলোয়, রেণু শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। রেণু ঘাড় ফিরিয়ে বিজনকে দেখল। ইশারা করে তাকে পাশে বসতে বলল। পাশে বসে বিজন ওর ওপর হাতের সাপমুখো বলয়টা দেখতে লাগল। ধাবমান সাপের মতো আঁকাবাঁকা ঠিকই, কিন্তু আজ কি বিজনের সবই অন্যরকম মনে হবে? বিজনের মনে হল, খুব উঁচু থেকে সে যেন একটা পাহাড়ি নদী দেখছে।

শব্দহীন ঘরে রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে; মাঝে মাঝে সে তার চুল ও ঘাড় স্পর্শ করছে, যেন সেখানে চুম্বন ছিল, যেন-বা স্বগতোক্তি করছে। তখন, বিজন তার চুল ও ঘাড় স্পর্শ করতেই, হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল রেণু। উঠে বসে কোমর জড়িয়ে ধরল বিজনের। ওর বুকে মুখ ঘষড়াতে লাগল, কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বিজন লম্বা ও প্রকাণ্ড আয়নাটায় তাদের দুজনের ছবি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল রেণু?'

রেণু অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তারপর যখন মুখ তুলল, এলোচুলে, কান্নার ফোলা, অশ্রু আর কফে ও মদের গন্ধে মাখামাখি—ওই মুখটাই তুলে ধরল। 'আচ্ছা, আমি কি চোর?' বলল, 'আমি কি চুরি করতে পারি?'

শায়ার দড়িটা দাঁতে চেপে দোতলার শেফালি ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বিজনকে দেখে, 'ওমা', বলে তিড়িং করে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে, ফের শায়া পরেই ঘরে ঢুকে বলল, 'ওমা', আপনি! কার কাছে খবর পেলেন? বলুন ত একটু বুঝিয়ে, কী এমন হয়েছে বলুন না, যে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করতে হবে?' বাইরে মিনিটখানেক ধরে রগড়ে মুখ থেকে কী তুলতে চেয়েছিল সেই জানে, শেফালি আয়নায় তার ছুলিধরা টকটকে মুখটা দেখতে লাগল। একবার চোখের একটা পাতা টেনে নামাল, দেখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আয়নায় নিজের পেছনটা দেখতে দেখতে বলল, 'কী মালই খেতে পারিস বাবা।'

'আপনি ত ছিলেন সেদিন, দেখেছেন ত লোকটাকে?' জিজ্ঞেস করেই শেফালি সচকিত হয়ে উঠল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কীরে মীরা, তোর হল ভাই?'

বিজন লোকটাকে দেখেছিল বৈকি। তবে সপ্তাতিনেক আগের কথা, ভাল মনে নেই। লোকটা আসতে গোপাল বাইরে থেকে ডাকল, 'মা'? ভয় ও উৎসাহে চমকে উঠে রেণু বলল, 'অই! লোক এসেছে', দরজার কাছে উঠে গিয়ে গোপালকে বলেছিল, 'একটু দাঁড়াতে বল, ছাদে চেয়ারটা পেতে দে', বিজনকে বলেছিল, 'নইলে, ফিরে যাবে। কত লোকসান খাব আপনার জন্যে। খামকা বসে রইলেন, কথাবার্তা বললেন; এখন তাড়াতাড়ি নিন দেখি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিজন বলেছিল, 'না আমি আজ যাই। আর একদিন আসব।' বিজনের অত্যধিক শান্ত স্বর শুনেই রেণু বলেছিল, 'কেন, নয় একটু দাঁড়াবে', নইলে বলত না। বিজন সেকথা শোনে নি।

দুজনেই কেউই জামাকাপড় খোলেনি, রেণু নীল আলোটা নিবিয়ে নিয়ন জ্বালাল, খিল খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে, কিন্তু পরদা তুলে বেরুতে যাবে বিজন, অপরিচিত লোকটা ওর দুকাঁধে দুহাত রেখে জড়িতস্বরে বলে উঠল, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন ত?'

বিজন দেখল একজন বুড়ো লোক। ভদ্রলোককে দেখে, কেন কে জানে, তার রাঁচির কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'আমাদের রাঁচিতে আলাপ হয়েছিল।'

'রাঁচিতে, রাঁচি হিলে, না? আরে, আসুন মশায়, যাচ্ছেন কোথায়, ও রেণু, এ যে আমাদের চেনা লোক হে। কদ্দিন আসছেন তোমার কাছে—'

ভদ্রলোক একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিজন জানতে পারল, কিছু পরে মদ এল। শেফালিকে ডাকিয়ে আনা হলে, কষা মাংস এল। শেফালির সঙ্গে এল বর্মন। 'দুটো নইলে জমে?' হাড়ের নালি থেকে সকসক করে শাঁস টেনে নিলেন সরকারি কর্মচারী, বিজনের হয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'চলে ত আপনার', শেফালি দ্বিতীয় চুমুকে মেরে দিয়ে ঠক করে গ্লাশটা ট্রে-র ওপর রেখে বলল, 'ফাঁক!' এমন সময় ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজার সময় জুড়ে গম্ভীর ও সুরেলা গলায় দোরগোড়ায় ফুলঅলা হেঁটে উঠল, 'চাই বেলু উ-উ-উ-উল!'

'অ্যা—অ্যাই! ঠিক ধরেছেন, এই লোকটাই। আপনি ত খানিক পরেই চলে গেলেন, অ্যাঁ? পরদিন মিনসে কী বলে জানেন? ওর নাকি পাঁচশ টাকা চুরি গেছে। ইকি কাণ্ড বলুন দেখি, অ্যাঁ?' শেফালি জানতে চাইল।

বিজনের গালটা ফের চিনচিন করতে লাগল। সেদিন রেণুর কাছ থেকে যাবার পর বোধহয় পরদিন ভোরবেলা থেকে তার কোমরে একটা ব্যথা হয়, একটা বেল্ট থাকার জায়গা জুড়ে ব্যথাটা এখনো রয়েছে। বিজন বার-দুই কাশল, কাশির শব্দটা মন দিয়ে শুনতে গিয়ে সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কীরকম অদ্ভুত কাশি হচ্ছে তার—কী অমানুষিক....

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে রেণু ওর গলা জড়িয়ে ধরল, 'আমি কি চোর, আপনি ত ছিলেন। আমাকে চুরি করতে আপনি দেখেছেন?'

বিজন চমকে উঠল, কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইল না কিছুতেই। এলোচুল, সিকনি আর চোখের জলে মাখামাখি চৌকোগোছের একটা মুখ, চোখে লালের ছাট, চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কাজল, গা দিয়ে দিশি মদের গন্ধ ছাড়ছে ভুরভুর। ওর চোখের দিকে বিজন এখন তাকাবে না। না, বিজন অনুমানে বুঝল, ওর চোখে এমন প্রেতিনীর চাউনি।

'কী লো মীরা, তোর হল?' জানালা দিয়ে একতলার দিকে মুখ নামিয়ে শেফালি আবার চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বিজনের দিকে ফিরে, যেন কী গূঢ় মানে আছে কথাটার এমনভাবে হেসে বলল, 'যাই। চান করব।'

'আমাকে দুদিন হাজতে রাখল।' বিজনের বুকে মুখ রগড়াতে রগড়াতে ফোঁপাতে লাগল রেণু, 'খিস্তি-খেউড় করল। বুক জ্বলে গেল, তবু মদ খেতে দিল না।'

'বড়বাবু আমাকে লাথি মারল', কোমর দেখিয়ে রেণু বলল, 'এইখানে।'

রেনু শুধু শায়া পরে ছিল। শায়াটা হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছে। একটা পায়ের ঊরু পর্যন্ত দেখা যায়। ব্লাউজের নিচের বোতামটা খোলা, রেণুর ঝোলা স্তন দেখা যাচ্ছিল। স্তনের বোঁটায় শ্বেত অশ্রুর মতো জমাট দুধ। রেণুর স্তন ও ঊরুর রঙ একই রকম, বিজন লক্ষ্য করে দেখল। ঘুমন্ত শশকের গায়ে যেন হাত রাখছে, বিজন ওর খোলা ঊরুতে হাত রাখল। সেদিন তাকে চলে যেতে হয়েছিল, আজ সুদে-আসলে উসুল করবে, এই জন্যেই ত সে এসেছে। এই নিয়ে তিন্ দিন এল, অথচ এখানো ওর ব্লাউজের সবকটি বোতাম সে খুলতে পারেনি। রাস্তার দড়ির আগুনে যখন সিগারেটটা ঠেকিয়েছিল, বিজন সেই মুহূর্তের মতো উত্তেজিত হবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে গলাকাটা ছাগলের মুণ্ডটার মতো ছটফট করছে রেণু। মাঝে মাঝে বলছে, 'ওরা নিক না। আমার আলমারি, ড্রেসিংটেবিল সব বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিক।'

'বিজনের গালটা গলাকাটা রক্ত লেগে লাল হয়ে উঠছে। সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

'বলুন আপনি, কে চুরি করেছে?'

বিজন নিঃশব্দে ওর ব্লাউজের বোতামটা পরিয়ে দিল। গাল দুটো চিনচিন করছে অসহ্য। জ্বর হয়েছে নাকি তার!

আচম্বিতে রেণু উঠে বসল ধড়মড়িয়ে, 'কে চুরি করল তা হলে? আপনি জানেন কে চুরি করেছে?'

প্রশ্নদুটো যেন আঠা-লাগানো দুটো রুজের প্যাড, পটপট করে তার দুগালে সেঁটে দিল রেণু। আগুনের ঘর থেকে অন্ধ মানুষ যেমন করে প্রশ্ন করে, 'কী হল?' তেমনি ব্যাকুল হয়ে উঠে রেণু জিজ্ঞেস করল, 'কে চুরি করল?'

বিজন এবার রেণুর গালে হাত লাগল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। হাতই ত, গাল নয়। দাঁতে-দাঁত চেপে বিজন বলল, 'না, তুমি চুরি কর নি।' কিন্তু তার গলা কেঁপে গেল কেন?

সেই কখন সন্ধের মুখে এসেছে বিজন, এখনো পর্যন্ত সে এই স্বরে কথা বলে নি। এই স্বর রেণুর বড় চেনা। সে টের পেল। টের পেয়েই আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নেবার চেষ্টা করল, তখুনি নড়েচড়ে শুল। হাসিও টেনে আনল ঠোঁটে। কিন্তু বিজন তা দেখতে পেল কৈ। তার চোয়াল নড়ছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে মুখ, যেন রেণুর মুখটাই কাঁপছে থরথর করে, বিজনের দুহাতের দশটা আঙুল রেণুর গালের ওপর চেপে বসে যেতে লাগল....

বিজনের ম্লান দুই চোখে সে রেণুর দিকে তাকায়।

এই মুখ হ্যাঁ, কান্নায় ফোলা, চোখের কোল দিয়ে গলে পড়ছে রাত্রির নিষ্প্রভ কাজল, সিকনি আর চোখের জলে মাখামাখি এলোচুলের ঠিক এই মুখটাই সে আগে কখনো দেখেছে কি? বিজন অনুভব করল সে দেখেছে, কিন্তু কোথায়! মনে করার আকুল ইচ্ছায় বিজন উন্মুখ হয়ে উঠল, দেখতে দেখতে দূর থেকে দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসা একটা ঢেউয়ের মতো ছুটে এল স্মৃতি, বিজনের সমস্ত অস্তিত্বকে নিয়ে ফেঁপে উঠে, তারপর খুবই কাছে তা ভেঙে পড়ল। কিছুতেই মনে পড়ল না। মনে পড়ল না, কিন্তু বিজন বুঝতে পারল, বড় ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি।

অথচ, বেশি দূরে নয়, ঘরের অন্ধকার থেকে ভেসে উঠছে ঠোঁট দুটি, কাছেই কাঁপছে। এখনো গ্লাস, গঁদের শিশি, আলমারিতে শূন্য বোতল, কাঁচি, পাপোশ, বৃষ্টিশেষের পিচের রাস্তায় ঠিকরানো গ্যাসের আলোর মতো কালো আয়নার একটা অংশ, তাতে জলভরতি গ্লাস, তাতে ভিজে বেলফুল, পাপোশ, তাতে গঁদের শিশি ও আলমারিতে শূন্য বোতল, নীলসাপ লতা ও পদ্মা-আঁকা একটা চীনা ফুলদানি, এইসব দেখা যাচ্ছে। একটু পরে ঠোঁঠ দুটিই শুধু ভাসবে, আর সব ডুবে যাবে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে, অন্ধকার লালরঙে একটু তুলি চুবিয়ে বারবার রঞ্জিত করে দিচ্ছে ঠোঁটদুটি, যেন দুটো ফুলের পাপড়ি, কী ফুল, নিমজ্জমান ব্যাকুলতায় বিজন প্রাণপণে স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। খুব জানা ফুল, কী নাম যেন ফুলটার....অথবা, হঠাৎ মনে হল বিজনের, এ যেন একটা লাল ফড়িং বসে রয়েছে ঠোঁটে, দু-আঙুলে এখুনি চেপে ধরলে যার ধুলোমাখা পাখনাদুটি ঘনঘন শিউরে উঠবে!

নাঃ। মনে মনে, যেন স্বপ্নে, বিজন চিৎকার করে উঠল, না-আ! ভালবাসে না, ভালবাসা-নেই এমন দুটি ঠোঁটে সে চুমু খাবে কেমন করে।

বুক খালি করে বিজন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আঃ! 'কী গরম', রেণু বলল।

বিজনের চোখের সামনে একে একে গঁদের শিশি, আয়না, শূন্য বোতল, ফুলদানি, গ্লাস, কাঁচি, পাপোশ, গ্লাসে বেলফুল, এইসব ভেসে উঠতে লাগল। ফুলগুলো বাসি, বিজন দেখল। বিবর্ণ হয়ে সে জানতে চাইল, 'সেই ফুল, সেদিনের?' বোধহয় তার গলা দিয়ে স্বর বেরয় নি ভয়ে, দুহাতে ওর বুকে মৃদু ঠেলা দিয়ে চাপা কামনাকাতর গলায় রেণু বলল, 'একটু সবুর করুন না, আঃ!' হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিই?'

নীল আলোটা জ্বালিয়ে, বুকটা এমন টান করে চিতিয়ে দাঁড়াল সে, যে বডিজের স্ট্রাপে সেলাই ছেঁড়ার আওয়াজ শুনতে পেল বিজন। সমস্ত চুল খুলে ফেলে টান করে বাঁধতে লাগল রেণু, রেণু ব্লাউজের প্রথম বোতামটায় হাত রাখল।

এই প্রথম বিজন ওর আঙুলের নড়াচড়া লক্ষ্য করল। আঙুলে মরা মাংস, বুড়ি কাকাতুয়ার মতো বাঁকা, চামড়া-পরা গাঁটগুলো কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, রেণুর নোখগুলো বিজন দেখতে পেল না।

'না!' আততায়ী ছুরি হাতে সামনে এসে দাঁড়ালে যেমন হয়, বিজনের সেই রকম, স্বপ্নের সেই বদ্ধমূল ভয় হল। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না, তার বুকে পাথর...

'কী হল আবার!' রেণু জিজ্ঞেস করল।

'না।' বিজন বলল।

'আপনি খুলে দেবেন?' নিতম্বটা অর্ধেক ঘুরিয়ে যেন শরীরটাকে উথলে দিয়ে দারুণ কটাক্ষ করে রেণু জিজ্ঞেস করল, 'দেবেন নাকি? খুলে?'

সহসা বিজন ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। তিন সপ্তাহ আগের না-পালটানো উলটে-যাওয়া ফুলদানির জলের মতো ভারি অলোয় ঘর ভরে গেল। বেশ্যাপটির মাঝখানে উজ্জ্বল আলোয় এই ঘর, ঘরের মাঝখানে পুরু গদির বিছানা, দেওয়াল জুড়ে আয়না, দেওয়ালে ঝুলন্ত ঈশ্বরের ছবি, সব কিছুর মাঝখানে পুরুষানুক্রমে বেশ্যা রেণুকে দেখে বিজন এবার চিনতে পারল।

'না।' হাতের মুঠো শক্ত করে রেখে বিজন বলল, 'আমি যাব।'

'সে কী!' রেণু বলল, সন্দেহের হাসি হেসে।

'এই নাও টাকা', বিজন ওর দীর্ঘ, কঙ্কালসার হাতটা রেণুর দিকে বাড়িয়ে দিল। মুঠি খুলে ধরল।

আর এক মুহূর্ত দেরি হলে কড়া নড়ে উঠত, দরজাটা দুহাট করে খুলে ফেলতেই অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ বিদ্যুতে ঝলসে গেল বিজনের, সে আর চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াতে পারল না, দুহাতে পাল্লাদুটো দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অপ্রত্যাশিত কিছু নয় তবু। বাসের সেই খোঁড়া লোকটা। গোড়ালির কাছে দুপা মুড়ে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে, ভ্রূ অবধি নামানো ফেল্টের টুপি, লম্বাটে মুখের থুতনিটা বুকের কাছাকাছি, এখন তার গায়ে একটা ভারি ওয়াটারপ্রুফ। সপসপে ওয়াটারপ্রুফটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিজন ক্রমশ বৃষ্টির শব্দ পেল, তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, সোঁ-সোঁ করে হাওয়া চালাচ্ছে বেশ, বিজনের বাঁ-গালে বৃষ্টির উড়ন্ত একটা ঝাপ্টা এসে লাগল।

লোকটা চুরোট খাচ্ছে। চুরোটের আগুনে মৃত লোকের স্ট্যাচুর মতো ওর মুখের বাঁ-দিকটা বারবার প্রতিভাত হচ্ছে, বিজন ওর জীবন্ত চোখের দিকে চাইল। লোকটা চোখ ফিরিয়ে নিল না, দেখার সুযোগ দিল, ওর চোখে-চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। মাটিতে পোঁতা একটা শক্ত দেবদারুর মতো বিজনও দাঁড়িয়ে রইল ওর চোখে চোখ রেখে, মুখোমুখি, শুধু তার শেকড় ভয়ে সড়সড় করতে লাগল। রাস্তায় একটা কুকুর ডাকল। আর একবার ডাকল। লোকটা দুবার কাশল। কাশিটা অমানুষিক, অনেকটা ছাগলের কাশির মতো, বিজন শুনেই বুঝতে পারল, ঠিক এই রকম কাশিই সে আজ সারাদিন কাশছে এবং কোনও সুস্থ লোক এভাবে কাশে না। লোকটার স্থির চাউনি বিজনের ভিতরে গিয়ে পড়লে সে ভীতভাবে হাসল।

একতলার বাথরুম থেকে শেফালির সাবান কে মেখে গেছে? ক্ষয়ে গেছে তার সাবান। 'ছীঃ, ছীঃ, ছীঃ, ছীঃ' ঘৃণায় শেফালি থুতু ছিটচ্ছে উত্তরে, দক্ষিণে, চতুর্দিকে। 'এ কী প্রবৃত্তি!'

শেফালি চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। শেফালি থুতু ছিটচ্ছে, 'ছীঃ, ছীঃ', বিজন রাস্তা থেকেও শুনতে পেল।

সেইদিন রাত্রে বিজন একটা স্বপ্ন দেখল। ছেলেবেলায়, মা মারা যাবার পর, ভোরবেলা, বাবার সঙ্গে সে পুরী বেড়াতে গেছে। সে দেখল, উত্তাল সমুদ্র থেকে ঢেউ আসছে একটার-পর একটা, শব্দ হচ্ছে না। অধিকাংশ স্বপ্নের আকাশে যেমন থাকে, মেঘলা, সূর্যোদয়ের আগের এক ফালি ঘন লাল আলো এক জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ হয়ে; ওখানে জলতলে ঘুরন্ত বিশাল শৃঙ্খলের লোহা থেকে জেগে উঠছে মরিচার রঙ, স্বপ্নে বিজন বুঝতে পারল।

ওদিকে দিগন্তে সূর্য উঠল লাফ দিয়ে, দূরে দেশলাই কাঠির মতো একটা নৌকা লাট খেয়ে পড়ল তার ভেতর, নৌকাসমেত এখন বনবন করে ঘুরছে, একটা ফেনাময় ঢেউ কাছে এসে বিজনের পায়ে পড়ল। পায়ের পাতা ভিজিয়ে সরসর করে সরে যাচ্ছে জল, এ কী, বিজনের পা ডুবে গেছে একরাশ বেলফুলে, ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে তার, বিজন ফিক করে হেসে ফেলল।....

বিজন দেখল তার গলায় একটা বেল্ট। বেল্ট ত? হ্যাঁ বেল্ট। বোধনের আগের দিন ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে সারারাত, বিজন লাল হ্যাফপ্যান্ট ও বুক পকেটে সোডার ছিপি-আঁটা একটা সবুজ সেলুলার শার্ট পরে পূজামণ্ডপে ঢুকল। স্বপ্নে বিজনের মনে পড়ল, তার ত ছেলেবেলায় কোনও ফোটো নেই, বা-বা, ওইরকম দেখতে ছিল নাকি তাকে? স্বপ্নে যেমন হয়, বিজনের একবার মনে হল, সে কি স্বপ্ন দেখছে?

শূন্য মণ্ডপ। ভারি পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বিজন প্রতিমা দেখছে। প্রতিমা? প্রতিমার পিছনে রাত্রির একটা সিন টাঙানো, চিত্রকর যাতে চাঁদ আঁকে নি। রাত্রির ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে প্রতিমার ডাকসাজ, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, রঙচটা শরীরের এখানে-ওখানে মাংস-কাদা খোবলানো, এখনো অস্ত্র দেওয়া হয় নি, দশ হাতের প্রত্যেকটি মুঠি কুষ্ঠরোগিণীর মতো অসম্ভব রূঢ়, বিজন দেখল, একটা ভ্রূ নেই। চোখের কোল বেয়ে তারার কালো গড়িয়ে পড়ছে, চুলের মধ্য দিয়ে গর্জন তেলের সঙ্গে গড়িয়ে এসে সিঁথির সিঁদুর লাল রক্তে ঢেকে ফেলছে মুখমণ্ডল। পিতলের প্রদীপের বুক জুড়ে এখন চচ্চড় করে সলতে পুড়ে যাচ্ছে। প্যান্টটা এক হাতে টেনে তুলে, অন্য হাতে বিজন তার প্রিয় সবুজ সেলুলার জামাটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল। সোডার ছিপিটা স্পর্শ করে দেখল।....

অন্ধকার। একটা সিঁড়ি। বিজন উঠছে। গলায় দুলছে বেল্ট, বিজন ছুঁয়ে দেখল, সেই ছোটবেলার বেল্ট। স্বপ্নের মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করল। বিজন একটা লম্বা করিডোরে পা দিল। দুদিকের উঁচু দেওয়ালে সারি সারি ও মুখোমুখি দরজা। দরজাগুলোর সামনে এক চিলতে করে আলো। বিজন দেখল করিডোরটা অন্ধকার, তবে মাঝে-মাঝে আলোগুলিও তাকে পেরতে হবে। বিজন দেওয়াল ধরে অগ্রসর হল। উঁচুতে একটা জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে, 'রেণুর ঘরে যাচ্ছেন?' বলেই ফটাস করে শেফালি জানালাটা বন্ধ করে দিল। এরপর বিজন যত এগিয়ে যাচ্ছে ভয়হীন, দরজায়-দরজায় মীরা, বাসন্তী, খাতুন, চামেলি, ওরা সব ভীত সরীসৃপের মতো চমকানো মুখগুলি গর্তে ঢুকিয়ে নিচ্ছে লহমায়, বিজনের পিছনের আলোগুলি একে-একে নিবে গেল। রেণুর ঘরের সুদূর দরজাটার সামনে পৌঁছে হাতখানেক আগে থমকে দাঁড়িয়ে বিজন পিছন ফিরে দেখল করিডোরটা এবার ডুবে গেছে ঘন ও নিরেট অন্ধকারে। অন্ধকারে? না, বিজন নিজেই দপ করে নিবে গেল, করিডোরটা আর নেই! তা হলে! সে

ফিরবে কী করে?

রেণুর ঘরে সরকারি কর্মচারী বিজনকে দেখে হইহই করে উঠলেন। শেফালি গ্লাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে বলল, 'ফাঁক!' এমন সময় বাইরে গম্ভীর ও সুরেলা গলা শোনা গেল, 'চাই বেল-ফু-উ-উ-উল!'

ঘড়িতে আটটা বাজল। রেণু সরকারি কর্মচারীকে ফুল কিনতে বলল। যদিও দেওয়ালের ওপাশে, শেফালি ফুলঅলার কাছে কমিশন নিচ্ছে, বিজন দেখতে পেল। শুকনো মুখ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কব্জিভরতি গোড়ের মালা, হাতে বেলকুঁড়ির মুকুট, রজনীগন্ধা, কয়েকটা ব্ল্যাকপ্রিন্স—আরে, ওই লোকটা ফুলঅলা! চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়ে লোকটা মাঝে-মাঝে মাজন বিক্রি করে না? বিজন বেশ অবাক হয়ে গেল। সরকারি কর্মচারী রেণুর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ঘরে পড়ে গেলেন বিছানায়। বিজন দেখল ওঁর ব্যাগ থেকে ঝুলে রয়েছে গোছা-গোছা নোট। বিজন বালিশের তলা থেকে ব্যাগটা বের করল। তখন, মাথার সুদীর্ঘ চুল একবার খুলে, তারপর তুলে, টান করে বাঁধতে-বাঁধতে রেণু চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান! দাঁড়াও—এই দেখ—' দুহাতে বুকে এমন চাপড় মারতে লাগল রেণু যে, বিজনের মনে হল, সে বুঝি তার বুক দুফাঁক করে ফেড়ে ফেলে তাকে কিছু দেখাতে চায়। তার বদলে, রেণু, পট পট করে ব্লাউজের সব কটা বোতাম খুলে ফেলল। আঁতকে উঠে বিজন দেখল, রেণুর বুকে কাকাতুয়ার নোখের মতো কর্কশ ও বাঁকা, ভয়ঙ্কর কয়েকগাছি চুল!

রেণু রাক্ষসীর মতো ওষ্ঠহীন হাসল।

স্বপ্নের ভয় জাগরণের চেয়ে অনেক বেশি। মানিব্যাগটা কোথায়, ডান পকেটে, বাঁ-পকেটে? দুহাতে বুক চেপে ধরে আতঙ্কের বর্ণনার মতো বিজন রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।.....

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। রামাধার সেলাম করল। দুতিনটে ফাঁকা হল পেরিয়ে বিজন ঢুকল পি এ-র ঘরে। পি এ নিঃশব্দে তার হাতে ভারি ও মোটা পার্সোনাল ফাইলটা তুলে দিলেন। বিজন ওলটাতে-ওলটাতে দেখল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফাইলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা এবার জি এম-এর কাছে সই হবার জন্যে যাবে। এতদিন চাকরি করছে, জি এম-কে বিজন কোনওদিন দেখে নি। স্বপ্নেও সে তাঁকে দেখতে পেল না।

অফিসে এতদিন ধরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে, অথচ সে তা জানতে পারে নি। শুঁড় বের করা দুটো মুখোমুখি পিঁপড়ে যেমন করে পরস্পর কথাবার্তা বলে, পি এ ও বিজনের মধ্যে সেইরকম কথাবার্তা হতে লাগল। বিজন বলল, 'আমাকে সাবধান করে দেন নি আপনি?'

বিজন দেখল, বাঁ-দিকে মার্জিনে লেখা, 'পি এ টু জি এম থ্রু প্রপার চ্যানেল' ও কয়েক পৃষ্ঠা পর ওপরে লাল কালিতে লেখা হেডিং। নিচে বিবরণ—

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৃ. | ৪১ | আইটেম নং | ২০ | সিসিল বারে একাকী মদ্যপান ও | তার | বিস্তৃত | বিবরণ | তাং |
| পৃ. | ১১০ | ... | ৫২ | ঐ | ... | ... | ... | ... |
| পৃ. | ৫৪ | | ২৭ | কোবাল্ট রুম থেকে পলায়ন: বন্ধু হিরণ্ময়ের অসুখের জন্য অপারেটেড হতে আপত্তি | ... | ... | | - |
| পৃ. | ৮১ | ... | ৩৮ | ১৯-৬-৫৯ থেকে ১৮-৬-৬০ পর্যন্ত ২৩০০ ফাইল গ্রহণ ও ২১৩টি প্রত্যার্পণ | ... | ... | ... | ... |
| পৃ. | ৯৮ | | ৪৩ | মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নতজানু রমণীকে টেনে তুলে উপর্যুপরি চুম্বন | ... | ... | ... | ... |

| | | |
|---|---|---|
| পৃ. ১৮৯ | ৮৯ | বাবা ও আরও ২০ জনের মুখ ম্লান করে দেওয়া |
| পৃ. ১৪৫ | ৭২ | বৌদির সঙ্গে অবৈধ ও গোপন প্রণয় |
| পৃ. ১৭৩ | ৮০ | সিসিল বারে একাকী মদ্যপান |

এখানে পি এ বললেন, '২০০ পৃষ্ঠা দেখুন।' পাতা উলটে বিজন দেখল, পাতা জুড়ে লাল কালির হেডিং: আইটেম নং ৯২; সোনাগাছিতে রেণুর গৃহে রাত্রিযাপন তাং ২রা সেপ্টেম্বর...। বিজনের দম বন্ধ হয়ে গেল, সে বিস্তৃত বিবরণ পড়তে লাগল।

ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর-পর তার হৃদপিণ্ডে শব্দ হয়। ঘরে অন্য কোনও শব্দ নেই, ঘরের চারপাশে আহত কুকুরের মতো রাত্রি ঘুরছে প্রভুভক্ত, গোল ঘড়িটা সময়ের এ-ঘরে ও-ঘরে হাত রাখছে ঠিক-ঠিক, মাথার ওপর দঁড়িতে-বাঁধা ব্যাঙের মতো পাখাটা ঝুলছে হাত-পা ছড়িয়ে। পড়তে-পড়তে দম আটকে এল বিজনের, বুক ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে, বিজন আইটেম নং ৯২ পড়ে শেষ করল। 'নাঃ, সেকথা নেই, সেকথা কেউ জানে না...' এই বলে, বুক খালি করে এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে, যে, ফাইলের অনেকগুলি পাতা উড়ে গেল ফরফর করে। বিজন দেখল:

পৃ. ১ আইটেম নং ১ লাল পিঁপড়ের গর্তে খোঁচা দিয়ে, তার মধ্যে একটি জীবন্ত কেঁচো নিক্ষেপ ও তার বিস্তৃত বিবরণ তাং ১৯।৬।৩৯।

বিজন মূক হয়ে গেল। সে এইবার টের পেল কী ভয়াবহ ও ব্যাপক এদের অনুসন্ধান। সে বলতে চাইল, 'এ ত আমার ছেলেবেলার ঘটনা। এ আপনারা জানলেন কী করে?' কিন্তু বলার আগে বিজন আবার ভয় পেল, স্বপ্নের সেই ভয়, জাগরণের চেয়ে যা অনেক বেশি। বিজন দেখল, পি এ টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়েছেন। টেবিলে নীলসাপ লতা ও পদ্ম-আঁকা রেণুর ঘরের সেই ফুলদানিটা তাতে সুদীর্ঘ রজনীগন্ধ, আর তার ঠিক পাশে, দেখে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার উপক্রম হল বিজনের, মুখ থেকে খুলে-রাখা পি এ-র দুপাটি দাঁত তার লাল লাল মাড়িসুদ্দু! পোড়া রাবারের গন্ধ ছাড়ছে তা থেকে।....

বিজন আবার প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে-ছুটতে ফের সেই সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হল। বিজন দেখল, অদ্ভুত অবস্থা। রাস্তা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে, সমুদ্রের ওপারে প্রবাস থেকে হাওয়া আসছে হা হা, হোটেলের দরজা-জানালাগুলি বন্ধ, অদূরে হাড়-পাঁজরের মতো একটা নারকেল পাতা টাঙানো। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। বিজন জানতে পারল, কে যেন বলেই গেল তাকে, 'আজ সাইক্লোনের আবহাওয়া। ফ্ল্যাগ-স্টাফের কাছে একটা নোটিশ পোঁতা দেখল, দুদিকে হাড়ের ক্রুশচিহ্নের মধ্যে দুটো মড়ার খুলি, মাঝখানে লেখা :

বিপদ
অদ্য কেহ সমুদ্রে স্নান করিবেন না।

জনহীন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা দিয়ে গোড়ালি অব্দি জলস্রোত ভেঙে ছপছপ শব্দ তুলে বিজন পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। কী বিপুল এই অন্ধকার, এ-রকম ছায়াবিহীন অন্ধকার বিজন আগে কখনো দেখে নি। অথচ একটা আভাও রয়েছে তার, কারণ, বিজন পথঘাট সবই দেখতে পাচ্ছে। একটু আগে মিউনিসিপ্যালিটির নোটিশও সে পড়তে পেরেছিল।

উড়ন্ত জলকণায় ভরতি হাওয়া চালাচ্ছে উলটোদিক থেকে, বিজন অন্ধকারের স্রোত ঠেলে

এগিয়ে যেতে লাগল। এক জায়গায় যেমন মঞ্চের মাঝখানে, ঘুরিয়ে-ফেলা গোল আলো, সেখানে একটা জেটি। জেটির ওপর দাঁড়িয়েও, জেটি কোথা থেকে এল, বিজন বুঝতে পারল না। সমুদ্রে জেটি থাকে কি? ওপর থেকে সে দেখল অনেক নিচে একটা বালির পাহাড়, ছোট একটা বিচ রয়েছে সেখানে। অনেকক্ষণ পর ঢেউ আসছে। দূরে একটা ফাঁপছে প্রথম ব্রেকারের কাছে, 'দা লাস্ট ওয়েভ'.... অই মূর্ত হয়ে উঠছে তার স্ব-নির্বাচিত কবিতা থেকে শ্রেষ্ঠ পঙক্তি—ছুট! ছুট! উঁচু গড়ানো বালুস্তূপের ওপর থেকে বিজন তরতর করে নেমে গেল, ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন সে সমুদ্রের ধারে পৌঁছল—শেষ ব্রেকারটি তখন ভেঙে পড়েছে।

সমুদ্র তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরে গেল।

ভিজে বালি উঠছে চকচকিয়ে, পায়ের পাতা এখনো সরসর করছে, ফসফরাসগুলো জ্বলছে, নিবছে। জল সরে যাবার পর বিজন দেখল, পায়ের কাছে কয়েকটি লাল পাপড়ি পড়ে রয়েছে। বিজন উঁচুতে রাস্তার দিকে তাকাল। শ্মশানটা দেখা যাচ্ছে না, কোনও মৃতদাহের আলো নেই, কিন্তু দেবদারু গাছটার চেহারা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, এক ঝাঁক জোনাকি চক্রের মতো ঘুরছে তাকে ঘিরে, তাতে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে—যেন ভীষণ-দর্শন একটা ডোম দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানে।

বিজন গলায় হাত দিল। বেল্ট, হ্যাঁ, বেল্ট-ই ত। সেই শিশুবেলার বেল্ট। সে হেঁট হয়ে পাপড়িকটি কুড়োতে গেল। কালো লাল হয়ে গেল যেমন, তেমনি রঙ পাপড়িগুলির। এ যে খুবই চেনা ফুলের পাপড়ি, আ, ব্ল্যাক প্রিন্স, বিজনের মনে পড়ে গেল, খুব হত তার মায়ের হাতের, প্রায় কনুই-অব্দি সোনার চুড়ি-ভরতি, শাঁখের মতো সাদা, ভারি মিষ্টি গোলাপ ফোটাবার হাত ছিল মায়ের।

পাপড়িগুলি হাতে নিয়ে বিজন চোখ বুজল। চোখ বুজতেই এ কী হল তার। পায়ের নিচে বিপুল একটা অন্তঃস্রোতের টান অনুভব করল বিজন, অমাবস্যার ছায়াবিহীন অন্ধকার অতর্কিতে তার ছদ্মবেশ খুলে দাঁড়াল একটা গোটা সমুদ্রের চেহারা নিয়ে, ওপরে শ্মশানে দেবদারুসমান ডোমের গলায় জোনাকির মালা দুলছে মুহুর্মুহু, চূর্ণ হবার মুহূর্তটা নিয়ে ফেঁপে উঠল যে বিশাল ঢেউ, বিজনের চাউনিসুদ্দু সাড়হীন দেহটা তার ভিতর চিৎ হয়ে ঢুকে যেতে যেতে দেখল যে, তা থেকে ছিটকে পড়েছে লম্বা লম্বা বেঁকে-যাওয়া ফেনা, বিদ্যুচ্চমকের শেষ চৈতন্যটুকু দিয়ে বিজন দেখল ঢেউ-এর গায়ে ডোরাকাটা দাগ, তার কষে ফেনা। সম্পূর্ণ নেবার আগে সকলকেই যেমন দেখায়, সমুদ্র বিজনকেও তার সেই বিশাল থাবার লম্বা ও বেঁকে-যাওয়া ক্ষমাহীন নোখগুলি একবার দেখাল ও দেখিয়ে লুকিয়ে ফেলল।

আগে থেকে এনগেজমেন্ট করে পরদিন বিকেলে বিজন একজন স্পেশালিস্টের কাছে গেল। স্পেশালিস্ট প্রথমে প্রায় আধঘন্টা ধরে পরীক্ষা করে, তারপর সাঁড়াশির মতো স্টেথিশকোপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ব ল্লেন যে, বিজনের অতি গুরুতর অসুখ হয়েছে। এর কোনও ওষুধ নেই, এর কোনও চিকিৎসা হয় না; কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে এর ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে, এইজন্যে, যতদিন সম্ভব বেশি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, তিনি এখুনি বিজনের চিকিৎসা শুরু করবেন।

বিজনের ততদিন বেঁচে থাকার দরকার।

*ছোটগল্প : নতুন রীতি, ১৯৬০*

# আট বছর পরে একদিন

একদিন দুলাল দত্তর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা। বলল, 'আমায় চিনতে পারছিস? আমি দুলু।'

দুলাল! বিজনের মনে পড়ল। স্কুলে ছাড়াছাড়ি হবার পর তারা যখন আলাদা কলেজে পড়ত, তখনো মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। সে বহু বছর আগের কথা।

'তুই না এলাহাবাদে চাকরি পেয়েছিলি?' বিজন জিজ্ঞেস করল।

'বদলি হয়েছি কলকাতায়। তুই সেই কালিদাস পতিতুণ্ডিতেই ত?'

'মনে আছে তোর?' বিজন বলল, 'ক-নম্বর বল দিকিনি?'

নাম্বার বলে দুলাল হাসল। বলল, 'চলি রে। ট্রেন ধরতে হবে।'

'চল না।' হাঁটতে শুরু করে বিজন বলল, 'যাবি কোথা?'

'শ্বশুরবাড়ি।' দুলাল তখন থেকেই হাসি রেখে দিয়েছে মুখে, 'তোর ছেলেপিলে কটা?'

'একটাও না।'

'সে কী রে! কদ্দিন বিয়ে করেছিস?'

'করি নি।'

'সে কী রে!'

বিজন হাসল, 'কেন রে?'

'এই দুটো-তিনটে আর কি!' দুজনের হাসির মাঝখানে দুলাল বলল, 'আয় না একদিন আমাদের বাসায়। সামনের শনিবার ত ছুটি আছে, আসবি বিকেলের দিকে? বউকে আনতে যাচ্ছি, ওকেও দেখবি সেইদিন।'

ট্রেনে উঠে দুলাল ঠিকানা দিল। ট্রেন ছেড়ে দিল বিজন চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক যাব। তুই ভাল করে গুনে আসিস কটা!'

শনিবার দিন দোলের জন্যে ছুটি ছিল, বিকেলে রাস্তায় বেরিয়ে দেখল ধুলো উড়ছে রঙিন, বিজনের বেশ ভাল লাগল। বাসে-ট্রামে অসম্ভব ভিড়, একটার পর একটা রাস্তা পেরিয়ে, ঠিকানা খুঁজে, সন্ধেনাগাদ সে সত্যিই দুলালের বাসায় গিয়ে হাজির হল। হলিডে-অন-আইস ফ্রক পরা একটি ছোট মেয়ে দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করল, 'বাবাকে খুঁজছেন, না দাদুকে? আসবার সময় একটা পার্ক দেখেছেন? দাদু ওই পার্কে বেড়াতে গেছে।'

ঠোঁট উলটে বিজন বলল, 'তবে আর কী করা যাবে। বাবাকেই না হয় ডাক?' বলতে বলতেই ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল দুলাল, 'কে বিজন! এসেছিস', হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আয় আয়', একটা ফোল্ডিং-চেয়ার ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'খুলে বোস', বলেই দ্রুত চলে গেল অন্দরমহলে। বরাবরই খুব ফুর্তিবাজ ছেলে দুলাল, ফিরে এল ম্লান মুখে, হাত উলটে বলল, 'মা-র সামনে কোলে করে আনতে পারলুম না তাই। ম্যাডাম একেবারে চা-টা নিয়ে আসছেন। চল, ভেতরে চল।'

দুলালের শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে দুই যুবক বন্ধুতে মিলে বিগত যৌবনের গল্প করতে লাগল। গল্প-গুজবে কিছুক্ষণ কাটার পর দুলাল জিজ্ঞেস করল, 'কে কোথায় থাকে বল ত? মাসদুই এসেছি, তোর সঙ্গেই প্রথম দেখা।'

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল বিজন, সে বলল, 'বলছি', জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী ফুল

রে? কাগজের নয় ত?'

'না-না রিয়্যাল।' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করল দুলাল, 'শিমুলফুল, আমার শ্বশুরবাড়ির। ওর জন্মদিনে নাকি পোঁতা হয়েছিল গাছটা। এই সময় প্রত্যেকবার আনে।'

'বাঃ, জন্মদিনের গাছ? বেশ টাটকা আছে ত ফুলগুলো!' আচমকা জানতে চাইল বিজন, 'তোর বউ ভীষণ সুন্দরী নয় ত রে, দেখিস বাবা!'

একটু পরে দুলালের বউ এল। পিছনে ঝি-এর হাতে খাবার আর চায়ের সরঞ্জাম। পরদা সরিয়েই হাত দুটো জড়ো করল বুকের মাঝখানে।

'মে আই ইন্ট্রোডিউস? উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতটা দরজার দিকে প্রসারিত করে দিল দুলাল; পরে, যেন গোপন খবর, বলল, 'মণিমালা।'

স্মৃতি বড় কম নয়। স্মৃতির চেয়ে বড় এক আকাশ।

দুই বন্ধুতে গল্পগুজব করতে করতে রাত কাবার হয়ে যাবার কথা, কিন্তু আধঘন্টার মধ্যেই বিজন উঠে পড়ল। মণিমালা বলল, 'সে কী!' বিজন বলল, 'শিগগির আসব একদিন। আমাদের বাড়িতেও আসবেন। দুলালের মুখস্থ আছে ঠিকানা।'

রাস্তায় বেরিয়ে দুই বন্ধুতে হাঁটতে লাগল। এই গলিটা প্রায় ফাঁকা, লোকজন নেই বললেই চলে। যেন একটু বেশি দূরে দূরে গ্যাসের আলো, পথ চকচকে, শুধু সাইনবোর্ডটুকুকে আলোকিত করে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। এখন বসন্তকাল, হাওয়া চালাচ্ছে বেশ, চিক্কণ পথের উপর দিয়ে খরখর করে উড়ে যাচ্ছে শালপাতার ঠোঙা, মোড়ে গ্যাসের আলোর নিচে একটা রিকশা। আরও দূরে ট্রামের তারে আওয়াজ, ঘন্টার শব্দ।

না-দেখেই অনুমান করে নেওয়া যায় তবু, যে তারা, দুই বন্ধু, বাসন্তী রঙ, ম্যাজিক রঙ, বাঁদুরে রঙ কি খুনখারাবি, অন্ধকারে এই সব নানারঙের রাস্তা মাড়িয়ে হাঁটছে।

একবার শুধু বিজন জানতে চাইল, 'তোর কোথায় বিয়ে হয়েছে রে?'

'উত্তরপাড়ায়। কেন, বলি নি তোকে সেদিন?'

'না।' শান্ত গলায় বিজন বলল। আজ বেচুর কথা তার খুব মনে পড়ছে। বেচু এই রকম শান্ত স্বরে কথা বলে। সে কি বেচুকে অনুকরণ করল?

কেউ হাঁটা থামাল না। হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা ব্যস্ত রাস্তায় এসে পড়ল। এখানে কোলাহল, আলোয় আলো, সকলেই ব্যস্ত ভাবে হাঁটাহাঁটি করছে। বাস চলে যাচ্ছে লোকবোঝাই ট্রাম চলে যাচ্ছে দ্রুত, ছড়-তুলে-নেওয়া এস্রাজের তারের মতো চকচকিয়ে উঠছে ট্রামলাইন, লাইনের ধারে পোড়া ঘাসের কাছে ঘাস থরথর করে কাঁপছে। গলির মুখে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ আলোর জন্যে, হেডলাইট থেকে তীব্র আলো গিয়ে পড়েছে ওই ফুটপাথের চুমকামকরা দেওয়ালে, পানের পিচের মতো টকটকে এক পোঁচড়া রঙের ওপর। স্টপে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে বেচুর মতো অবিকল বিষাদময় গলায় বিজন জিজ্ঞেস করল, 'তোর ঘরে একটা সেতার দেখলাম, কে বাজায় রে?'

'বাজায় আর কে। বল বাজাত। বউ-ই বাজাত। সেই ছেলেবেলা থেকে চর্চা, শুনেছি ভাল নাচতেও পারত, দেখ না, একদিন ছেড়ে দিল হুট করে। এখন আর ছোঁয় না। ছোঁবে কী করে', দুলাল বলল, 'যা ধুলো।'

'হয়ত ভুলেই গেছে।' একটু থেমে দুলাল আবার বলল, 'তুই রবিশঙ্করের সেতার ভালবাসতিস খুব। এখনো শুনিস রাত জেগে?'

বছর পাঁচেক আগে একদিন রবিবার বিকেলে বিজন মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিল।

ছোড়দি তখনো বেঁচে ছিল, জামাইবাবুকে নিয়ে ছোড়দি আসবে স্টেশনে, সাড়ে-তিনটের সময় ঘড়ির নিচেই অপেক্ষা করবে। দু-তিনদিন আগে বিজন বন্ধুদের বলে দিয়েছিল, সেদিন আড্ডায় সে হয়ত অনুপস্থিত থাকবে, বা তার দেরি হবে।

সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুপুরবেলা তাকে ডেকে তোলা হল। ঘুম ভাঙতে প্রথমেই সে বুঝল বউদি তার মাথার বালিশ ধরে টানাটানি করছে। 'এই! বিজু—' তারপর শুনল, 'ঠাকুরপো?' পরমুহূর্তে বৃষ্টির ছরছর শব্দে বউদির ডাক আর শোনা গেল না, মন দিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনবে বলে সে তাড়াতাড়ি বলল, 'যাচ্ছি', তখুনি তার মনে পড়ল কেন তাকে ডাকা হচ্ছে; তারপরেই আবার বৃষ্টির শব্দ শুনতে গিয়ে সে সবই ভুলে গেল।

বেশ কিছু মুহূর্ত আরও কেটে গেলে সে ট্রামের শব্দ পেল। তখন আস্তে আস্তে চোখ না খুলেই সে বুঝতে পারল, না বৃষ্টি না, এ হল চারতলা থেকে ট্যাঙ্কের জল উপচে পড়ার শব্দ। মনে হতে খুবই দমে গেল সে। এইজন্যই পরিপূর্ণ ঘুম থেকে জেগে-ওঠা রবিবার সন্ধেবেলার আড্ডায় একদিনও সে প্রাণ খুলে হাসতে পারল না। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়া, কি ঘুম ভাঙতে-ভাঙতে বৃষ্টির শব্দ, বা, এই যেমন আজ, দাদা কি বউদির ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠেই বৃষ্টি, আ, এটা কত প্রীতিকর! কিন্তু, কী হতভাগ্য সে, এ-বাড়িতে উঠে আসার পর আজ তিন বছর হতে চলল, প্রায় প্রতি রবিবার ঘুম থেকে উঠেই তার এই আশাভঙ্গ, দিনের পর দিন স্নায়ুর ওপর এ-রকম উৎপীড়নের জন্যেই হয়ত সে এমন নির্জীব হয়ে পড়েছে! বিজন আজও হতাশ হল, সন্ধেবেলার ডিপ্রেশান আজ বিকেলের আগেই তাকে ছেঁকে ধরল।

বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে সে দাড়ি কামাতে বসল। বউদি এসে একবার তাড়া দিয়ে গেল, 'কীগো, যাবে কখন, তাড়াতাড়ি করো?'

বিজন বলল, 'আচ্ছা বউদি, চিঠির একটা উত্তর না পেয়ে, এ-রকম হুট করে চলে-যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

বউদি বলল, 'ওমা, উত্তর আবার দেবে কি!'

তা সত্যি। মেজদা চিঠি দিয়েছে বেস্পতিবার। সময় কই উত্তর দেবার?

'ইশ!' ঠোঁটের নিচে একটু কেটে গিয়েছিল, আঙুল দিয়ে সেখানে অল্প ফেনা লাগিয়ে দিল বিজন, 'সময় রেখে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল।'

বিজনের কণ্ঠস্বরে বরাবরই ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা থাকে, শেষ কথাটিতে কি অস্বাভাবিক কিছু বেশি ছিল? বিজন পেরেকে টাঙানো আয়নাটার দিকে তাকিয়েছিল, তার ভ্রূ, সরু দাড়ি, চোখের কোলে কালি, এ-সব আর কিছুই দেখা যায় না। এখন গলা কাটছে; বউদি তার গাঁট-ওঠা উন্মুক্ত মেরুদণ্ডটার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী খুঁজল, তারপর বলল, 'তোমার দাদাকে সঙ্গে যেতে বলব?'

'বলো না। আবার যাবে কি?' বিজন বলল। মুখ ফিরিয়ে বউদির চোখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে সে চাইল, 'তা হলে ত ভালই হয়—' নইলে, ছোড়দির হাত ধরে, যদিই জামাইবাবু না আসেন, কোনও-একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে তারপর সে কী করে আত্মপরিচয় দেবে, বর্ণনা করবে তার উদ্দেশ্য, বলবে, আমি মেয়ে দেখতে এসেছি?

অন্য কোনওভাবে কাটাবার উপায় নেই, চিরকাল পিসতুত দাদার বাড়িতে থাকা চলবে না, অফিস থেকে বেরিয়ে সে তবে যাবে কোথায়, ভবিষ্যতের কোন-একদিন? সেদিন যখন তার আটত্রিশ বছর বয়স, কি চল্লিশ, সেদিন, তখন, সে ত শুধুই নিঃসঙ্গ নয়! কারণ, নিঃসঙ্গের মধ্যেও একটা রক্তক্ষরণ থাকে, সে ভেবে দেখেছে, স্মৃতির প্রতি, অতীত সঙ্গের জন্য বেদনা থাকে। দশ বছর পরে সে-দিন অফিসের বাইরে জনতার স্রোতের ধারে দাঁড়িয়ে যখন তার নিজেকে অবয়বহীন মনে হবে, অবয়বহীন শূন্য মনে হবে, সে তখন যাবে কোথায়? কেউই

হাঁটা থামাবে না, সব চেয়ে বিহ্বলতার কথা এই, 'আমার কোথাও যাবার নেই কাজের আমি কেন হাঁটব', সেদিনও একথা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ থাকবে। বিয়ে করে কিছুই হবে না, কিন্তু সেদিন একটা বাসাবাড়ির দিকে, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আছে, সেইদিকে হেঁটে-যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই।

ওই উপায়হীনতার পৌঁছে যেতে চেয়েই বিজন তার বিয়ের জন্যে চেষ্টাকে বাধা দেয়নি, ন্যাকামি করাকে ঘৃণা করে বলে নয়, ঘৃণা ত করেই। তবে এও ঠিক যে মেয়ে দেখতে যাবার ইচ্ছে তার ছিল না। তাকে ফোটো দেখানো হয়েছিল, অতটা কল্পনাশক্তি তার নেই, ফোটো থেকে জীবন্ত একটি মেয়ে-সম্পর্কে কোনওরূপ বা বিন্দুমাত্র ধারণা সে করতে পারে নি, বিজন সেজন্যও মেয়েটিকে দেখে নিতে ইচ্ছুক হয় নি। আসলে মেয়েটি সুশ্রী না হলেও সে তাকে বিয়ে করবে, সুন্দরী হলেও করবে। মেয়েটির শুধু এইটুকু যোগ্যতা থাকা দরকার যে, তারা যখন প্রয়োজনবোধে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটবে, লোকে যেন চেয়ে না দেখে, তারা যেন চোখে না পড়ে, ভিড়ে মিশে থাকার যোগ্য হয়। আসলে, মেয়েটিও তার পারিবারিক লোকজনদের সামনে বিজন নিজেকে একবার দেখাতে চেয়েছিল।

সে নাও যেতে পারত। দাদা-বউদির মেয়ে পছন্দ হয়েছিল, ছোড়দি আর জামাইবাবু দেখে এলেই দিন ঠিক করে ফেলার ইচ্ছে ভদ্রলোকের ছিল। তবু দিন-দুই পরে বউদি হঠাৎ বলতেই বিজন রাজি হয়ে গেল। কেন? কারণ ব্যাপারটা নিয়ে তার ভাবা ছিল। তার নিজেকে উপস্থিত করা দরকার। মেয়েটি বা তার পারিবারিক লোকজন যদি তার ত্রুটিগুলি ধরতে না পারে, তবে সে দোষ তার নয়।

ভাগ্যিস মেজদা সঙ্গে এসেছিল। জামাইবাবু মাছ ধরতে গেছেন, চিঠি পাবার আগে থেকে প্রোগ্রাম ছিল। ছোড়দি একটু দেরিতে এল। ছোড়দি সেই জবরজঙ মুর্শিদাবাদিটা পরে আসে নি, গলায় একগাছি সরু চেন ছাড়া কিছু নেই, ভাগ্যিস সেই শস্তা আর কুচ্ছিত হ্যাণ্ডব্যাগটা ছোড়দির কবজি থেকে দুলছে না।

'কী ভাই, তুমি এমন আধময়লা শার্ট পরেছ কেন? একটু স্নো না হয় মাখতে একদিন? সহাস্যে মুখ তুলে ছোড়দি তার দিকে চাইল। ভাবখানা, 'দেখ ত চেয়ে আমারে এবার চিনিতে পার কি না' গোছের। বিজন হেসে ফেলল।

স্টেশনের চত্বরটা পেরতে পেরতে দিদির বয়সী কয়েকটি ভদ্রমহিলাকে সে ভাল করে দেখল। না, অন্তত এই কজনের প্রত্যেকের চেয়ে তার দিদিকে দেখতে ভাল। এমন একজন সুন্দরী দিদির পাশে বসলে মেয়েটি ও তার পারিবারিক লোকজনের সামনে তার ত্রুটিগুলি অনেকটা ঢেকে থাকবে, এই দুর্বলতাকে টের না পেয়ে বিজন প্রশ্রয় দিয়ে বসল।

'মেয়ের আবার তোকে পছন্দ হলে হয়?' ট্রেনের দিকে যেতে যেতে ছোড়দি বলল। চমকে উঠে, পরমুহূর্তে দিদির সহজ মুখ দেখে বিজন আবার হেসে ফেলল।

সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকিয়েই বিজনের ভাল লেগে গেল। সন্ধেবেলায় নাকি মেয়ে-দেখা ঠিক নয়, সূর্য-ডোবার পরে যে আলো হয় তাতে মেয়েদের বড় কাম্য বলে মনে হয়, তাই তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল। বিকেল শুরু হয়ে গেলেও এখনো রোদ্দুরের ঝাঁঝ যায় নি। একটু পরে আজকাল সুন্দর হাওয়া দেয়।

গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের ধারেই একতলা ছোট বাড়ি, পাঁচিলের কাচ-বসানো নিরাপত্তাকে হাস্নুহানার ঝাড় আংশিকভাবে ঢেকে রেখেছে। একটা ছোট বাগান পেরিয়ে ওরা সদর ঘরে বসল। আগে থেকে যেমন ভেবে রেখেছিল, বিজন দেখল, এককোণে দেওয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারও রয়েছে। তবে আশানুরূপ বেতের মোড়া নয়, তবু সে তাড়াতাড়ি সেটাতে বসে

পড়ল। মেয়েটি যদি ও-দিকটায় বসে, এটাই হবে দূরতম জায়গায়।

ভেতরে খবর দিয়ে ভদ্রলোক ঘরে এসে বসলেন। রাজনীতি, আবহাওয়া, বিজন-সম্পর্কে আরও কিছু খবর ইত্যাদির মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর নীরবতাগুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ভদ্রলোক, দাদা ও বিজন তিনজনে তিনখণ্ড খবরের কাগজ আগে থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল। কাজেই অসুবিধা হচ্ছিল না। একটি বছর-বারোর মেয়ে এসে ঘুরেফিরে দেখে গেল, তারপর চা নিয়ে এল। দাদার সঙ্গে ভদ্রলোকের কথাবার্তার ফাঁকে কী করে বিজন, ভাবুক চোখে সে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে চোখ বোলাতে লাগল। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে কাগজের ফুল। পশ্চিমের লালধুলোওড়া রশ্মি এসে স্পর্শ করছে ফুলগুলি, খরখর আওয়াজ উঠছে তা থেকে। শুনে, সিমেন্টের মেঝেতে খোলামকুচি ঘষলে যেমন হয়, গা কিশকিশ করে উঠল তার। তখুনি প্রকৃত ফুলের কথা বিজনের মনে পড়ল। তারপর তার ভাল লাগল। এও মন্দ কী, সে ভাবল যে, ট্যাঙ্কের জলের ছরছর শব্দ শুনে ঘুম ভাঙলেও প্রতি রবিবার জেগে উঠে প্রথমেই তার বৃষ্টির কথা মনে পড়ে। সহ্যের অতীত পীড়নের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত উলটো পদ্ধতিতে মনে পড়ে। কিন্তু, মনে ত পড়ে।

শেষাবধি বিরক্ত হয়ে উঠল বিজন, সে ভাবল, সে কি একটা পোকা নাকি যে, জুতো, আলনা, গ্রুপ-ফোটো, ক্যালেণ্ডার, টেবিল, ছবি, ফুলদানিতে কাগজের ফুল; ছবি, টেবিল, ক্যালেণ্ডার, আলমারি, ফুলদানিতে কাগজের ফুল; গ্রুপ-ফোটো, আলনা, জুতো, গঁদের শিশি, ফুলদানিতে কাগজের ফুল—বারংবার এই সব দেখছে, দেখে তার কিছুই মনে হচ্ছে না, দেখে দেখে ক্লান্ত হচ্ছে না তার চোখ!

এই সময় বাবার সঙ্গে মেয়েটি ঘরে ঢুকল এবং সে চেয়ারে বসার আগেই তাকে যা দেখার দেখে নিল বিজন। অর্থাৎ কিছুই দেখল না, কারণ, দেখে তার কিছুই মনে হল না। আজ যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, কী দেখেছিলে, কী রঙের শাড়ি পরেছিল সে, তার কানে ফুল ছিল না দুল ছিল, সে এ-সম্পর্কে কোনও প্রশ্নরই উত্তর দিতে পারবে না। কারণ, তার সতর্কতা ছিল মেয়েটির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হওয়ার বিরুদ্ধে; সে তার দেখাটুকু দেখতে গেছে, দৃষ্টিবিনিময় করতে চায় নি! তার ত্রুটিগুলি যেন কারুর চোখে ধরা না পড়ে, এই ত ছিল তার উদ্দেশ্য?

মেয়েটি কি তাকে দেখছে? (পরে শুনেছে, মেয়েটি আড়চোখে বারবার তাকে দেখেছিল।) পাঞ্জাবির হাতা গুটনো, বেশ রোগা হাতদুটো এতক্ষণে ওর চোখে পড়ার কথা। দেখুক, তাতে তার কিছু এসে যায় না। দেখবেই ত, না-দেখে বিয়ে করার অতবড় ঝুঁকি সে মেয়ে হয়ে নেবে কী করে? আর বিজনের যত রিস্ক দেখলে, অর্থাৎ দেখতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল।

সেই যে নিমেষে দেখে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল বিজন, দ্বিতীয়বার মুখ ফেরায় নি। বাইরে তাকাতেই তার চোখ পড়ল পুষ্পপত্রহীন একটি গাছ ও তার ডালপালা। দেখে তার মন মনকে শোনাল, 'আরে এতক্ষণ দেখ নি!' তারপর বিস্তৃত গঙ্গা, সায়াহ্নের খোলা আলোয় রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে প্রায়-অদৃশ্য একটা অতিকায় স্টিমার গঙ্গার প্রকাণ্ড বুক মুচড়ে ভয়াবহ বাঁক নিচ্ছে; দেখে বিজনের মনে হল, সন্ধের সময় এলেই ভাল হত। ওপারের বরাহনগর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, দেখে তার মনে হল, অতদূর পর্যন্ত যখন দেখা যাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই এখন মানুষের চোখে দেখছে। সে তার অনুভবকে ভাল লাগার কাছাকাছি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল, তাই তার মনে পড়ল, তকন বকুলদের বাসা ছিল এই পারের বরাহনগর ছাড়িয়ে ডানলপ-ব্রিজের কাছাকাছি। রমার বিয়ে হয়েছে ভবানীপুরে। দু-দুবার, বিজনের মনে পড়ল, সে প্রাণপণ চেষ্টায় ভালবাসার কাছাকাছি পর্যন্ত নিজেকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল।

'কীরে, তুই কিছু জিজ্ঞাসা করবি?'

ইতিমধ্যে ঘরে যা যা কথা হয়েছে বিজন সবই শুনেছে। দিদি যখন মেয়েটিকে দাঁড়াতে বলে, ও অনুমান, পাশে দাঁড়িয়ে তার দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করল, এমনকি তখনো বিজন মুখ ফেরায় নি। কিন্তু এই সামান্য প্রশ্নে সে এমন চমকে উঠল কেন?

মুখ ফেরাতেই মেয়েটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল! তৎক্ষণাৎ ভীতুর মতো চোখ সরিয়ে নিয়ে মেয়েটির মুখের অন্য এক জায়গায় সে দৃষ্টি স্থাপন করল, চেয়ে রইল। কেউই আশা করে নি বিজন এমন স্বরে কথা বলবে, সে নিজেও না, যখন সে বলল, 'কী জিজ্ঞেস করব!' সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত তার গলার স্বর, যেন সে মূঢ়তাকে স্বচক্ষে দেখছে। যেন সে বলতে চায়, কী জিজ্ঞেস করব?

সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বিজন বলল, 'ওঁকে যেতে বলো।' মেয়েটি উঠে গেলে একটু পরে বছর-বারোর সেই মেয়েটি ছোড়দিকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল।

ট্রেনে উঠে বিজন দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেজদা আর ছোড়দি বসেছে পার্টিশানের ও-পাশে। সে একটা সিগারেট ধরাল। বাইরে হাজার হাজার বাড়ির ছুটন্ত অন্ধকার দৃশ্যের দিকে সে চেয়ে রইল। সে দেখল, সমস্ত ঘরে আলো জ্বলছে; দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু-তিনটে স্টেশন পেরিয়ে গেল, তার বসার ইচ্ছে হল। দিদির পাশে গিয়ে বসলে হয়, বেশ হয়, এই মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে গেলে। প্রথমত, সে সাম্প্রতিক যুবক, এই ধরনের বিয়ে তার কাছে সব মিলিয়ে একটা কুচ্ছিৎ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম সে মেয়ে দেখতে এল এবং এখানেই বিয়েটা হয়ে গেলে অন্তত এই আত্মসম্মানটুকু তার নিজের কাছে থাকত যে, এই ধরনের বিয়ের সুযোগ নিয়ে সে জঘন্য মেয়ে-বাছাই করে বেড়ায় নি, বাদবিচার না করে প্রথম-দেখা মেয়েটিকেই বিয়ে করেছিল। মেয়েটি কলেজে পড়ে, পরে বকুলের মতো স্কুল-মাস্টারিও করতে পারবে—এই রকম দুটি মেয়ের সঙ্গেই ত প্রাণপণ চেষ্টায় থাকার জন্য সে প্রেমে পড়েছিল বলে মনে করেছিল।

হাওড়া স্টেশনের ইয়ার্ডে যখন ট্রেন ঢুকছে, বিজনের হঠাৎ মনে হল, এহে, দিদি যখন তাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, একটা প্রশ্ন ত সে অনায়াসে করতে পারত। মেয়েটি নিশ্চয়ই কোন ডিভিশানে হায়ার-সেকেন্ডারি পাশ করেছে, সেলাই ও গান জানে কি না, শুক্তো কী করে রাঁধে, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে বোর্ড। তাকে সে জিজ্ঞেস করতে পারত, 'আচ্ছা, ওটা কী গাছ?'

বাড়ির পাশের গাছ, মেয়েটি নিশ্চয়ই জানে, বলত, 'শিমুল।'

'শিমুল গাছে কখন ফুল ফোটে আপনি জানেন?'

যদি লক্ষ্য না করে থাকে বা প্রশ্ন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বলেই হয়ত সে হকচকিয়ে যেত। জানলে যত অস্ফুট স্বরেই হোক তাকে উচ্চারণ করে বলতে হত, 'ফাল্গুনে'। মাথা নিচু করতে সে বাধ্য হত।

স্টেশনে নেমে দিদি বলল, 'দ্যাখ, ওদের ভেতরেই ঘরে দেখলুম একজোড়া তবলা, ঘুঙুর, সেতার এইসব রয়েছে। তুই ত কিছুই জিজ্ঞেস করলি না, আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি বুঝি সেতার বাজাও?'

দিদির স্বরে অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা লক্ষ্য করে বিজন দিদির দিকে চাইল। জানার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল। চলতে চলতে দিদি বলল, 'না। ও বলল, গান জানে না। ওর বোন নাচে। সেতারও সে-ই বাজায়।'

'মণিমালা আমাকে ভুলে গেছে, চিনতে পারে নি মোটে...'

টেবিলের ওপর রাখা কনুই-এ ভর দিয়ে দুহাতের তালুতে মুখ রেখে শ্বেতপাথরের মতো দেওয়ালটার দিকে সে ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ে আছে। মাত্র একহাত দূরেই দেওয়ালটা, সে বোধ হয় পোকার চাউনি মেলে তাকিয়ে রয়েছে, তার চোখ এখনো ক্লান্ত হয় নি। টেবিলের ওপর ঢাকা-দেওয়া ভাত হিম হয়ে যাচ্ছে। পাশে কুঁজো, একগ্লাস জল।

চেয়ে থাকতে থাকতে সে হঠাৎ লক্ষ্য করল, একটা কালো পিঁপড়ে দেওয়াল বেয়ে নেমে এল, পিঁপড়েটা টেবিল পার হচ্ছে। কী বিশৃঙ্খলভাবে টেবিল পার হচ্ছে পিঁপড়েটা, যেন তার কোথাও যাবার নেই! কিছুক্ষণ সে সেটার দিকে চেয়ে রইল। তার গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে তার চতুর্দিকে সে জলের একটা শূন্য এঁকে দিল। তার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নতুন বলে, সেটা শূন্যের ধারে-ধারে ঘুরতে লাগল তীরবেগে, বেরবার জন্যে সে কী ছটফটানি তার। মাঝে-মাঝে হঠাৎ থেমে পড়ে, শুঁড় বের করে, জল শোঁকে, আবার ঘুরতে থাকে বোঁ-বোঁ করে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবশেষে শূন্যের মাঝখানটিতে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

এই সময়, যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করার চেষ্টা করে সে বলে উঠল, 'না', যখন দিদি এসে তাকে বলে গেল, 'ও বললে গান জানে না। এর বোন নাচে। সে-ই সেতার বাজায়।' গায়িকা হয়ে একজন যুবককে সে বলতে পেরেছিল, জানে না, সেতার বাজায় তার বোন, আ, কী ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান মণিমালা তাকে করেছিল। পাশবিক অপমানের বোধ ভোঁতা ছুরির মতো উলটে-পালটে মাংস কেটে ঢুকে যাচ্ছে তার বুকে। কী-রকম উলটো পদ্ধতিতে, কী বেদনাহীন রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে সে আজ জানতে পারল যে, গান তার এমন প্রাণাধিক প্রিয়। গানকে এ-ভাবে ভালবাসে, তাই সে এমন বদ্ধমূল অপমানিত, মণিমালা তার কাছে গান গোপন করেছিল বলে।

মণিমালার জন্য নয়, গানের জন্য তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় সে মূক হয়ে গেল। আজ সকাল থেকেই ঘুরে-ফিরে বেচুর কথা কেবলি মনে পড়ছে, আচ্ছা বেচু যদি কোনওদিন অভিনেতা হয়? সে ভাবল। সে হঠাৎ বেচুকে দেখল। তার পিঠ থেকে বাঁকানো পিতলের তারের মতো রক্ত উঠছে ফিন্‌কি দিয়ে, গুপ্তঘাতকের ছুরি পিঠে-গাঁথা আহত বেচু, মঞ্চের মাঝখানে টলতে-টলতে এসে দাঁড়ায়। কোনাকুনিভাবে পা-ফেলে বেচু চলে যাচ্ছে উইংসের দিকে, টেবিলের সাদার দিকে চেয়ে-চেয়ে অগণিত দর্শকের মধ্যে বসে নিশ্চুপ সে, সেই অলীক মূকাভিনয় প্রত্যক্ষ করল।

সে এবার দেখল, জল শুকিয়ে গেছে। শূন্য থেকে বেরিয়ে এসে সেটা এখন কুরকুর করে হাঁটছে। দু-আঙুলে সেটাকে সে তুলে নিল দাঁড়িয়ে উঠে, চিৎ করে ঢাকা-আলোর নিচে মেলে ধরল। সেটা ছটফট করছে, কিলবিল করছে তার পাগুলো, পিঁপড়েটা তাকে, হ্যাঁ, তাকেই ত, তাকে দেখছে; স্পষ্ট অনুভব করল সে তার চাহনি, আরে! দাঁড়াদুটো ফাঁক করে পিঁপড়েটা যে তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। দুই আঙুলে সে তার শরীরের প্রবাহ অনুভব করতে লাগল।

তার চোয়াল নড়ে উঠল। কিলবিল-করা পাগুলোর একটা ধরে মৃদু টান দিল সে, ছিঁড়ে গেল পাটা, ক্রমে এককণা রস জমে উঠল সেখানে। শরীর দুমড়ে সামনের অর্ধেকটা উঁচু করে তুলে ধরে, শুঁড় জড়ো করে, যেন করজোড়ে, ঠিক তার আগের মুহূর্তে সেটা তার কৃপা চেয়েছিল।

পিঁপড়েটাকে টেবিলের ওপর ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে। আহত পিঁপড়েটা লেংচাতে-লেংচাতে কোনাকুনিভাবে পার হচ্ছে টেবিলটা। যাবে কোথায়! কেউ ত হাঁটা থামায় নি, সকলেই চলে গেছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ও ঘুরেই মরবে শুধু। ওর স্পৃহা কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, তা ওর চাহনি দেখে সে বুঝেছে, যতদিন যাবে ছোট পিঁপড়েটার হিংসা বাড়বে,

বাড়বে অবর্ণনীয় বেদনার বোধ, বাড়ুক, আত্মহনন ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে ওর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে না কোনওদিন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওর সবই মনে থাকবে, ওরা কোনওদিনই সেরে ওঠে না, পিঁপড়েরা মানুষের মতো বিজন ভুলে যেতে পারবে না কিছুই।

সে দেখল পিঁপড়েটা টেবিলের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ঝুঁকে পড়ে সেদিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল, দশ বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সে একবার সিংভূমে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একজন লোককে বহুসময় ধরে নিচের উপত্যকাটা পার হতে সে দেখে। একা বলেই লোকটি সেদিন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আজ বুঝতে পারল বিজন।

১৯৬০

# মীরাবাঈ

## ভূমিকা

বাড়িতে টিয়া থাকলে, কাঁশি বাজিয়ে বাসনওলা চলে যাবার পর নিঃসঙ্গ দুপুরে সে হঠাৎ 'চিক' করে ডেকে ওঠে। তারপর শৃঙ্খলাবদ্ধ এক-পা তুলে, ঘাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকে কান পেতে। পা-ফেলে পা-ফেলে বাসনবোঝাই মুটেটাও গলি দিয়ে চলে যায়। পাশের বাড়িতে টিয়াপাখি থাকলে তখন সে তার উত্তর দেয়। উত্তর শুনে, এ-বাড়িতে টিয়ার সে কী ছটফটানি; যদিও চাপা অহংকারে গলা ফুলে যায়, লাল বৃত্তের ভিতর চোখদুটো পালটে যায় ঘন-ঘন, কিন্তু উত্তেজনা প্রকাশ করে না তবু, হাঁটে পদক্ষেপ গুনে গুনে—দাঁড়টা তাই সম্পূর্ণ ঘুরে যায় না, হাওয়ায় দোলে। আমাদের বাড়ির টিয়াটার সঙ্গে পারেকসাহেবের বাড়ির টিয়াপাখিটির বন্ধুত্ব পুরনো হতে চলল।

পারেকের বাড়ি মানে আমাদের বাড়িরই একটা অংশ, আমরা বলতাম ছোটবাড়ি, একদিন ওটা আমাদেরই বাড়ি ছিল। ঠাকুর্দার আমলে বিক্রি হয়ে যায়, কিনেছিল পারেকের মামা। ছোটবাড়ি ও আমাদের বাড়ির মধ্যে তাই মিউনিসিপ্যাল আইনের চার ফুট ফাঁকও নেই। ওদের একতলা বাড়ির ছাদ আর আমাদের দোতলার দালানের মাঝখানে তাই একটা সাদা দেওয়াল, দেওয়ালের গায়ে প্রায় দেড়মানুষ উঁচু এক বিশাল জানালা, একদিন সম্ভবত যেটা দরজা ছিল। জানালাটা ছিল আগাগোড়া একটা জাল দিয়ে মোড়া, আজও তাই আছে, গরাদের ওপাশে ছোটবাড়ির ছাদের দিক থেকে আঁটা। দ্বিতীয়পক্ষের বউ ঘরে আনার পরে পারেকসাহেব ওটা নিজের হাতে এঁটে দিয়েছিলেন।

পারেকসাহেবের বউ, মানে আমাদের কৈশোরের মীরাবউদি। আসলে কী নাম ছিল কে জানে, ওরা দেশী খ্রিস্টান, হয়ত ছিল মেরি, কিন্তু মা ডাকত মীরা। কী রূপ ছিল মীরাবউদির!

জ্বলন্ত টর্চ-লাইট চেপে ধরতুম ছেলেবেলায়, মুঠি-করে-ধরা সেই আঙুলগুলি মনে পড়ে, আর মনে পড়ে মীরাবউদির গায়ের রঙ। বহুদিন পর্যন্ত মা বলত, তাও মনে পড়ে, 'ও যখন ঘোমটা দিত, ওর লাল কপাল আর শাড়ির পাড় আলাদা করা যেত না।' অমন পাকা শরীর আমি আর দেখি নি, মনে হত এই বুঝি ফেটে যাবে তা, যা দশ বছরের দাম্পত্য সত্ত্বেও টাল খায় নি কোথাও।

ঊরু দুটো পরস্পর এত ঘননিবদ্ধ ছিল যে, ছেলেবেলায় তা নিয়ে কিম্ভূত ভাবতুম। ভাবতুম যে, মীরাবউদির পা-দুটি বোধহয় হাঁটুর নিচু থেকে শুরু হয়। পা ফাঁক করে হাঁটতেন যখন, যখন রাজহংসীর মতো পা ফাঁক করে, গোড়ালি থেকে আঙুল পর্যন্ত পায়ের পুরো পাতা

পড়ত। অতগুলি ছেলেপিলের মা হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, অথচ যখন হাসতেন, রুক্মিণীর হাসির কথাই আমার মনে পড়ে যেত। কোলজোড়া শেষতম মেয়েটির ওপর কাচের চুড়িবোঝাই সোনালি লোমে-ভরা দুটি হাত, ঢালু কাঁধ, প্রতিমার পরচুলার মতো কৃষ্ণ এলোচুলে ঢাকা কান, কানে সোনার জুঁই, ছোট্ট কপালে গোল সিঁদুরের টিপ—জানালার জালের ওপাশে সোনার দুপুরে বসে-থাকা সরু মফ্‌চেন ও রূপালি ঘামের দুগাছি হারসমেত বাঁকানো গ্রীবার ওই মূর্তিটি আমার আজও মনে পড়ে। মীরাবউদির সবই স্পষ্ট মনে পড়ে, কিছুই অনুমান করতে হয় না, শুধু চোখদুটি ছাড়া। কেমন বা ছিল তার চাহনি, সুদীর্ঘ পাতা ছিল কি চোখের? খুব টানা-টানা ছিল কি, চোখের তারা দুটি কি ছিল মার্বেলের মতো বড় বড়? আমার মনে পড়ে না মোটে। আর মেয়েদের চোখের দিকে চোখ তুলে চাইবার বয়সও সেটা ছিল না।

আজ আর মা নেই যে জেনে নেব। 'সাবিত্রীসমান হও মা', মা বলত বউদিকে, 'তোমার সিঁদুর-আলতা অক্ষয় হোক।' পাড়ায় বলে বেড়াত, 'সাক্ষাৎ মীরাবাঈ। ওর মতো সতী এ-যুগে হয় না। পারেকটা বাঁদর, মীরার মর্ম ও কী বুঝবে?'

পারেকসাহেবকে আমরা কদাচিৎ কথা বলতে শুনেছি। শুনে থাকলেও মনে নেই। মাঝে মাঝে শুনেছি শুধু ভয়ঙ্কর গলা-খাঁকারি দেবার আওয়াজ। যেন কেউ তাঁকে ভয় দেখাতে এসেছে, তিনি তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চান। পরনে চেকলুঙি, আদুড় গা, বুকে চুলের জঙ্গল, গা ভরতি বড়শির মতো লোম ও ছড়ানো কুঁচ-বিচির মতো একরাশ লাল তিল, মাথায় একচাপড়া কোঁকড়ানো চুল, যার দুচারগাছি সবসময়েই ফণা তুলে থাকত। হাঁটতেন থপথপ করে, বুড়ো গরিলার মতন বিশ্বাসে। বসন্তক্ষতে বিকৃত তাঁর বীভৎস ও ফরশা নতমুখ আমরা দৈবাৎই দেখে থাকব। পারেকসাহেবের ভ্রূ-কঞ্চন মনে পড়ে, ভ্রূ-দুটো ঠেকাতে পারতেন, যেন দুটো জোঁক পরস্পরের রক্তপান করে কালো হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলায় যে-ঘন্টাকয়েক ছাদে থাকতেন পারেকসাহেব, একমনে কন্বি দিয়ে কোপাতেন টবের মাটি, সার গুলতেন কনুই অবদি হাত ডুবিয়ে। কাঁচি দিয়ে আলতোভাবে, যেন ভালবেসে, পোকাধরা পাতাগুলি কেটে দিয়ে পাউডার ছড়িয়ে দিতেন তার ওপর। ঝাঁঝরি দিয়ে জল ঢালতেন গাছের গায়ে, মগে করে গোড়ায়। এই সব করতেই সকাল গড়িয়ে যেত, দোকানে বের হবার সময় হয়ে যেত তাঁর। এ-সব কাজই তিনি করতেন হেঁটমুখে, ব্যস্ত না হয়ে ও বিনয় সহকারে। মাথা তোলবার অবকাশ কোনওদিন হয় নি।

এ-ছাড়া ছিল পাখি। ছেলেবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনই আমার মনে হত, বুঝি জলধারার পাশে শুয়ে আছি। পরমুহূর্তেই হতাশা। না, মীরাবউদি স্নান করছেন। কী যে স্নান করতেন একঘন্টা ধরে, ও-রকম ভোরে, গা থেকে রগড়ে কী যে তুলে ফেলতে চাইতেন অতক্ষণ ধরে, আর অত ঘটা করে! তুমুল শব্দ হত, মনে হত মারাবউদি বুঝি জলপ্রপাতের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। কতদিন জলপ্রপাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠে ভেবেছি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি। কোনওদিন বা ঘুম ভেঙেই মনে হত, 'আরে, বাগান?'

সত্যিই, পারেকসাহেবের বাড়ি ছিল পাখিতে ভরতি। কত রকমের যে পাখি ছিল, চিড়িয়াখানা বললেই হয়। চার-পাঁচটা টিয়াপাখি ত ছিলই, হরিয়াল ছিল, বুলবুলি-টুনটুনি ছিল, রাঙা খাঁচায় ছিল বন্দি কোকিল। ক্যানারি ছিল। একটা কমলারঙের ল্যাজঝোলা ছিল, কাকাতুয়া-পায়রা ছিল অনেক। কালো সিল্কের তাফতায় মোড়া মস্তবড় খাঁচায় ছিল একটা সোনালি ময়না। একদিন পরদা তুলে দেখেছিলুম। কথাকলির মুখোসের মতো কারুকার্যকরা ভীষণ সুন্দর, কী বিপুল চোখ ছিল তার।

ছাদের এককোণে জালের ঘরে আর ছিল একটা ময়ূরী। আমাদের এ-তল্লাটে আর কারো বাড়িতে ময়ূর নেই, কুণ্ডুরা অত বড়লোক, তাদের বাড়িতেও ছিল না। নুরওয়ালা শ্বেতির দাগে ভরতি এক রোগা মুসলমান নিত্য আসত, সাইকেলের ঘন্টি শুনতুম বিছানায় শুয়ে। পাখিদের জন্যে সে আনত নানরকম পোকামাকড়, টিয়ার জন্যে টুকটুকে তেলাকুচে। ময়ূরীর জন্যে আনত হরেক জিনিস দিয়ে মাখা পাউরুটির গোটাকতক গোল্লা, এক ঠোঙা কেঁচো। কোনওদিন দিয়ে যেত আধমরা সাপ। দু-আঙুলে সাপটাকে চাবুকের মতো করে ঝুলিয়ে, লোমশ ও বিশাল পারেকসাহেবকে দরজা খুলে ময়ূরীর ঘরে প্রবেশ করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দরজা বন্ধ হয়ে যেত সশব্দে। ভিতরে সাপের হিসহিস, সানের ওপর ঠোঁটের ঠোক্করের শব্দ, পাখার ঝটপটানি, এই সব শুনতে পেতুম। শব্দহীন শুধু পারেকসাহেব। কোনওদিন পাখার ঝাপটায় টিনের চাল বেজে উঠত ঝনঝন করে। ময়ূরীটা ডাকত বছরে কয়েকবার, কিন্তু বাকি এতগুলি পাখি অন্ধকার থাকতেই মাঝে-মাঝে ডেকে উঠত, চেঁচামেচি শুরু করে দিত আলো ফুটলে। ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে তাই আমার কতদিন মনে হয়েছে, 'আরে, বাগান!'

কিন্তু সে যা হোক ফুল-ফোটাবার ভারি মিষ্টি হাত ছিল পারেকসাহেবের। লাটসাহেবের বাড়ির প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় সূর্যমুখীর চেয়ে দুইঞ্চি বড় ফুল পারেকের টবে সবসময়েই থাকত। নকশা-করা লাল টবে ছাদের কার্নিশ কোনওদিনই দেখা যেত না, দিশি-বিলিতি নানা জাতের ফুলে ছাদ বোঝাই হয়ে থাকত। আজ যদি আমি বলি, 'আমি পুষ্পের প্রতিমা দেখেছি, পারেকের টবে ফুটে থাকতে দেখেছি বিরল অ্যাজেলিয়া', কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে কি করবে না! একটা গাছ ছিল, তার ফুলে আঠার-উনিশটা পাপড়ি হত, (আমি আর রুক্মিণী সংখ্যার ওপর বাজি ধরে তার পাপড়ি ছিঁড়তুম)। প্রত্যেকটি পাপড়ির রঙ ছিল আলাদা, কিন্তু তাদের সমবেত রঙে একটা নালাভা ছিল। কী তীব্র মত্ততা ছিল তার গন্ধে, নীল কানপাশার মতো সেই ফুলে। আমরা বলতাম পাগলাফুল।

আর হত গোলাপ, ইজিহিল, বার্সিলোনা, এটোলি-ডি-লিঅন—এইসব। একটা কালো গোলাপের গাছ ছিল। এক ঋতুতে সাত-আটটার বেশি ফুল হত না। এক-একটা ফুল ফোটার আগে তার সারা গায়ে বড় বড় কাঁটা দিত। সেই গোলাপগুলির একটি আমাকে দিয়ে, হাড়-চিববার সমর্থ সাদা দাঁতগুলি বের করে পারেক একদিন মাকে বলেছিল, 'ব্ল্যাকপ্রিন্স কি ভারতবর্ষে জন্মায় মাসিমা, জন্মাবে কেন! এ হল নিগ্রিটি। গেল বছর বেরিয়েছে এই ফুল।' মা কত সলাপরামর্শ নিত, কত রকমের সার দিত, পারেকসাহেবের কাছে প্রায়ই চেয়ে নিত কলমকরা গোলাপ ডাল, চারা কি বীজ। কিন্তু মায়ের হাতে তেমন ফুল ফুটত কৈ! মা তাই বলত, 'তোমার হাতদুটো আমাকে দাও পারেক। নইলে ফুল হবে না।'

ওই রকম অদ্ভুত নেশা ছিল পারেকসাহেবের। পারেকসাহেব গাছ পেলেই টবে পুঁতে দিত। পাখি পেলেই খাঁচায়।

যতদূর বিশ্বাস, পারেকসাহেবের বাড়ি থেকেই আমার কিশোরবয়সী মনে প্রথম অলৌকিক রহস্যের চেতনা আসে। ছোট বাড়িটা ছিল, যে-কোনও খণ্ড আংশিক জিনিস যেমন, শ্রীছাঁদহীন—একটা দেশলাইয়ের খোলের মতো। না কোনও বারান্দা, না রোয়াক, না একটা বড় উঠোন কি লম্বা দালান, কিছুই ছিল না। সারাদিন আমাদের বাড়ির ছায়া পড়ে থাকত তার গায়ে, রোদ্দুরের জন্য ছোটবাড়িটা অপেক্ষা করে থাকত অপরাহ্নকাল পর্যন্ত। রাস্তার দিকের আলকাৎরা-মাখানো জানালাদুটি বন্ধ থাকত সবসময়, দরজাটা প্রয়োজনে ছাড়া খুলত না। বাইরে আসা দূরে থাক, খেলার জন্য বাড়ির ছেলেমেয়েদের ছাদে পর্যন্ত উঠতে দেখা যেত না।

ছোটবাড়ির ছাদে রোজ সকালে পারেকের এঁটিলি-মারা লোমশ পিঠ তাই আমার ভয় দেখাত, যদি পারেকসাহেব ঘুরে দাঁড়ায়, তাঁর রক্তের ছাট-ধরা চোখের ওপর পরস্পর-রক্তচোষা জোঁকদুটি কপাল জুড়ে বেঁকে যায়, যদি। তবুও কৌতূহল! আকাশ ঝুলে পড়েছে মেঘে, ভিজে হাওয়া বইছে সোঁ, সোঁ, ময়ূরীটা কই ডাকছে না ত। কী করছে সে জালের ঘরে? রুক্মিণী কী করে দুপুরবেলা? ঘুময়, না পড়ে, না শুধু জেগে থাকে আমার মতো? মেঘ করলেও পড়ে?

ও-বাড়িতে আমরা কালেভদ্রে যেতে পারতুম, কাজেকর্মে পারেকসাহেবের মামা যখন মারা যান, মেহগিনি খাটের পালঙ্ক থেকে তাঁকে ইঁদুর-আরসোলায় ভরতি ভাঁড়ার ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। মামা বেঁচে থাকতে থাকতেই নতুন বউকে নিয়ে পারেক তাঁর পালঙ্কে শুতো, মামার অসুখের সুযোগ নিয়ে দোকানটা লিখিয়ে নিয়েছিল, মৃত্যুর পর বাড়িটা গ্রাস করেছিল মামীমাকে ঠকিয়ে। কালো কাপড় পরে, গলা অবদি ঘোমটা টেনে, পারেকের মামীমাকে একদিন ছেলেপিলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

পারেকের মামার মৃত্যুদৃশ্যে আমি মায়ের আঁচল ধরে ঘরের কোণে বসেছিলুম। ঘরভরতি আত্মীয়স্বজন, তার মাঝখানে একপাল বোকা ছেলেমেয়ে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে তাঁর বোধহীন স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের মতো সোনালি দাড়ি ছিল পারেকের মামার, মহাভারতের রাজা যযাতির ছবির মতো তিনি শুয়েছিলেন, স্থবির বুক থেকে ফতুয়ার সবকটি বোতাম খুলে দেওয়া হয়েছিল, তার ফেটেপড়া চাহনি পারেকসাহেবকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

পারেকসাহেব এল মধ্যরাতে, কালো কিংখাবের মতো লরেন্স কোম্পানির গম্ভীর গাড়িতে চেপে। ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা সবাই অন্ধকার বারান্দা থেকে সারবন্দি ঝুঁকে রইলুম। কফিনটা রাস্তা নামানো, তার চতুর্দিকে হি হি ঠাণ্ডার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে কয়েকটি ছায়াশরীর, চাপাস্বরে ব্যস্ততাহীন কথাবার্তা বলছে সকলেই, দূর থেকে দূরে বসানো গ্যাসলাইটগুলো ধোঁয়া ছাড়ছে, সম্মুখের সমস্ত পথটা আলোকিত করে গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। আলোয় বৃষ্টির কণা উড়ছে ফরফর করে, অদূরে মোড়ে দীর্ঘ ডাকবাক্স নীরব ও নতমুখ মানুষের বর্ণনার মতো দাঁড়িয়ে।

এরই মধ্যে এক-একবার পারেকের উদ্ধত গলা-খাঁকারি শোনা যায়। একটু পরে গলি দিয়ে লম্বা গাড়িটা ক্রিমেটোরিয়ামের দিকে বেরিয়ে গেল হর্ন না দিয়ে। ভিড় সরে গেল। কোনও জানালা খোলে নি, ছোটবাড়ির দরজা শব্দ করে বন্ধ হল। সেদিন বাড়ির ভিতর রোদনের কোনও চিত্ররূপ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল কান্নার অস্ফুটতম কোনও ধ্বনিও বাইরে আসে নি।

মা বলল, 'শয়তান!'

বাবা বলেছিলেন, 'ও ভোগ করতে পারবে ভেবেছ, ওর বুকে বজ্রাঘাত হবে।'

পারেকের দ্বিতীয়পক্ষের বউ মীরাবউদি এল মামার মৃত্যুর কিছু আগে। পারেকসাহেব তখন সদ্য লাগিয়েছে সেই পাগলা-ফুলের চারা, তখনও তার ফুল হয় নি, তখন তার সমস্ত পাতাই নবীন, রাতারাতি উৎসাহে বেড়ে উঠে পামগাছটার পা জড়িয়ে, খাঁজকাটা গা জড়িয়ে, গলা পর্যন্ত লতিয়ে উঠবে। এই আশায় পারেকসাহেব চারাটা পুঁতেছিল পামগাছের গোড়ায়।

মীরাবউদির চোখের সামনেই পারেকের বিধবা মামীমা ছেলেপিলের হাত ধরে অধোবদনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন একদিন। মামীমা ঝি-গিরি করত, বেশি দূরে নয়, তাও মীরাবউদির শ্রুতির মধ্যেই ছিল। একদিন পারেক ছাদের সুদীর্ঘ জানালাটা জাল দিয়ে মুড়ে দিল। জালের ওপাশে ছাদের আলসেয় বসে কতদিন দুপুরবেলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরাবউদি বলেছে, 'কী করব মাসিমা। আপনার ছেলেকে ত জানেন।'

পারেকের বাধানিষেধ ছিল অনেক। ছাদে ওঠা বউদির বারণ ছিল। তবু পারেকসাহেব দোকানে বেরিয়ে গেলে মীরাবউদি রোজ দুপুরে এসে বসত ছাদের আলসেয়।

স্কুল থেকে ফিরে কতদিন দেখেছি, তখনও দিদির সঙ্গে আড্ডা চলছে। আমাকে দেখলেই বউদি বলে উঠত, 'কী গো, প্পা- প্পা- প্পা-পাউরুটি?' আমি ছিলুম তোৎলা। দিদি বলত 'যা, কেন লজ্জা দিচ্ছ বেচারাকে।' আমি বসে পড়তুম দিদির গা ঘেঁষে।

দিদি বলত, 'লাল সায়া পরেছ, পারেকসাহেব জানতে পারলে?'

বউদি বলত, 'ধুর'!

'আচ্ছা, তবে কিনে দেয় কেন, পরবে না যদি?'

'পরি ত।'

'কখন পরো?' দিদি যেন জানে না কিছু।

'পরি।' মীরাবউদি বলত অধরে জিভ বুলিয়ে।

'রাত্তিরে পর?'

'যাঃ নেকি কোথাকার।' মীরাবউদি মেয়ে রুক্মিণীর মতো হেসে ফেলত ফিক করে।

'আচ্ছা বউদি', অস্থির হয়ে উঠে দিদি এক-একদিন বলে উঠত, 'তোমার যে এত দামি-দামি জামাকাপড়, তোরঙ্গভরতি, আলমারিভরতি। কই, পরো না ত কিছু।'

'কেন, এই ত পরেছি।'

'এ ত বিচ্ছিরি। শস্তা।'

'কী করব রে।' মীরাবউদির লাল মুখটা বড় অসহায় দেখাল, 'তোর দাদা যে এই বের করে দিয়ে গেল আজ। অন্য কিছু পরলে জানিস ত, রক্ষে আছে!'

'সিল্ক পরো না? জর্জেট পরো না, ব্রোকেডের সেই ব্লাউজটা?'

'পরি ত।'

'রাত্তিরে?' দিদি চোখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করত ফের।

'আচ্ছা মীরাবউদি', একটু চুপ করে থাকায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় দিদির, সেই লালপাড় গরদটা ত পরলে না কোনওদিন।'

'ওমা, কোনটা বলত!' ভুরু তুলে, ঘাড় কাৎ করে, পা ছড়িয়ে মীরাবউদি ভাবতে বসত, 'ইশ! সেই গেরুয়া-রঙেরটা, পুজোর সময় যেটা বাগবাজার একজিবিসন থেকে কিনেছিলুম, না? সত্যিই তো, ওটা ত পরিনি কোনওদিন।' এরপর মীরাবউদি চুপ করে বসেছিল অনেকক্ষণ। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ক্রমশ রক্তিম হয়ে উঠেছিল তার মুখটা, ব্যথায় করুণ দেখাচ্ছিল। যেন জ্বর হয়েছে তার। গ্রীবা বাঁকিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে অতক্ষণ কী ভাবল কে জানে, দিদিও জিজ্ঞেস করার মতো আর-কিছু না পেয়ে চুপ, হয়ত মারাবউদি তার ভুলে-যাওয়া গেরুয়াবসনের জন্যে অত্যন্ত মমতা বোধ করছিল।

হঠাৎ কী মনে পড়ায় চকিত হয়ে উঠে বউদি বলল, 'ওই যা একদম ভুলে গেছি। উঠে দাঁড়িয়ে দিদির দিকে চেয়ে বলল, 'ওটা কী পরেছিস রে, ধুতি, কার বিশুঠাকুরপোর? কেন তোর থান কী হল?'

বিশেদা আমার পিসতুতো দাদা, বিধবা হবার ন-মাস পরে নাড়ি কাটা হয় মা ও ছেলের, তার ছোটবেলাতেই পিসিমা মারা যান। আমার জন্মের আগের ষোলবছর বাবা-মার অপত্যস্নেহে বিশেদারই একমাত্র অধিকার ছিল।

আমার ছবছর বয়সের সময় যুদ্ধ বাধে, কিরকিতে মাসআটেক ট্রেনিং নিয়ে বিশেদা যুদ্ধে

যায়। ঠিক তখনকার কোনও স্মৃতি নেই বিশেদার, শুধু মনে পড়ে এটা আমার বড় আশ্চর্য লাগত যে, ডাকটিকিট লাগে না, খামের উপর খালি 'অন হিজ ম্যাজিস্টিস সার্ভিস: লোকো ড্রাইভার ১০০০৭, এফ পি ও', লিখে দিলেই তার কাছে চিঠি চলে যায়।

মণিপুর রোড স্টেশন অবধি ফ্রন্টে এঞ্জিন চালাত বিশেদা। যুদ্ধের শেষাশেষি বাঁ-হাতের কবজি জখম হওয়ায় ফিরে এল। তখন জাপানিরা পশ্চাদপসরণ করেছে। হসপিটাল হিল দখলের জন্যে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে তামু-প্যালেল রোডে।

পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাঁধে ফেল্টের ওয়াটার-বটল ও সাদা কলায়ের মগ, জামার পকেটে এ কাঁধের ফিতেয় আঁটা নানারকম স্মারকচিহ্ন—বুটের শব্দ তুলে হেঁটে এসে, বিশেদা যেদিন দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মামীমা', বস্তুত বিশেদা সম্পর্কে আমার স্মৃতির সেইদিন থেকে শুরু। সেদিন ছিল দোল, আমার জ্বর হয়েছিল। জানালা ফাঁক করে আমি দেখেছিলুম, বিশেদা মোড় বেঁকলো, পরনে নীল মিলিটারি স্যুট তার; ভারি বুটের শব্দ তুলে রঙিন রাস্তা মাড়িয়ে হেঁটে এল সমস্ত গলিটা, পাশে বাবা; দেখেছিলুম শম্ভু, বাদল, মহিম, লাবি, রুক্মিণী এরা সবাই পিচকিরি নামিয়ে নিল একে একে, ভয়ে কেউ বাবার গায়ে পর্যন্ত রঙ দেয় নি। বিশেদাই জানালার জালের গায়ে কনুই অবদি হাত ঢোকাবার মতো করে চৌকা গর্তটা কেটে দেয়।

পারেকসাহেব বেরিয়ে গেলে দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে কাপড়-জামা শুকুতে দেবার জন্যে মীরাবউদি ছাদে উঠত রোজ। জালের ওপাশে বসে থাকা তার অলস-মূর্তি বেশ মনে পড়ে, পাশে আলসের ওপর রাখা মেয়েদের জামাকাপড়, পারেকের চেকলুঙির পাশেই নিঙড়ানো সায়া, নিঙড়ানো, তার ফুলগুলিও। পিঠময় ভিজে চুল, খোঁপা আমি কখনো দেখি নি। চুলের মোটে যত্ন নিত না মীরাবউদি। আজ মনে হয় বিবাহিত-জীবন তার খুবই ব্যস্ততায় কেটে থাকবে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেল আর কই, দশবছরের বিবাহিত জীবনে তাকে আটটি সন্তান প্রসব করতে হয়েছিল।

সূর্যের দুপুরে কি মেঘের, মীরাবউদির কথা মনে করতে গিয়ে এখন মনে হচ্ছে, বউদি যেন জালের ওপাশে তাঁর উঁচু পেট নিয়ে বসে আছে, ঋতুগুলি তার মুখে ছায়া ফেলে চলে যাচ্ছে। শীতে তার শরীর কাঁপছে, সাদা র‍্যাপারের ভিতরে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে মীরাবউদি, গ্রীষ্মে ঝকঝক করছে তার লেস-বসা থ্রি-কোয়ার্টাস ব্লাউজ, কনুই-এর পর থেকে আলসের ওপর রাখা তার এলানো হাত নিশ্চল পথের মতো পড়ে আছে, গ্রীষ্মের রোদ্দুরে পথের মতোই উপায়হীন জ্বলে যাচ্ছে; খোলাহাওয়ায় উড়ছে তার চুল, চিলের ডাক শুনে মীরাবউদি আকাশের দিকে মুখ তুলছে; পরমুহূর্তে সমস্ত উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়ে মেঘ তার মাথার ওপর এসে দাঁড়ায়। টপ করে একফোঁটা জল পড়ে হাতের ওপর। নগ্ন বলতে শুধু হাতটুকু, শিউরে তুলে নিয়ে হাতের দিকে চেয়ে আছে মীরাবউদি, যেন ওটা তারই একখণ্ড, বলছে, 'ইস, ভগবানের কথা মনে পড়ল রে।'

'আজ যে পান খাচ্ছ বড়, পান ত রাত্তিরে?' জালের এপাশে বসে দিদি জিজ্ঞেস করে।

'কী করব, বমি পাচ্ছিল যে বড়। যাকগে ধুয়ে ফেলবে।' তারপর বউদি বলল, 'তোর দাদার জ্বালায় আর পারি না ভাই।'

দিদি গালে হাত রাখল, 'সে কী গো, এর মধ্যেই?'

কোমরের আড় ভেঙে, নাকের পাতা ফুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরাবউদি বলত, 'আর পারি না।' দিদি বলত, 'সে কী গো খাওয়াচ্ছ কবে?'

মীরাবউদির ঠোঁটদুটির কথা ভেবে আজও বিস্ময় বোধ করি। শুকনো ঠোঁট শীতে অসম্ভব ফাটত, জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে সাদা করে ফেলেছিল। বোজা থাকলে হাঁ-মুখটা দেখাত এতটুকু, বাচ্চা মেয়েদের মতো ছোট, কথা বলার সময় ছোট, রান্নার সময় চাপা সরলরেখা, হাসতেন

যখন শুধু তখনই কী অসম্ভব বেড়ে যেত ঠোঁটদুটি, অত ছোট ছোট দুটি ঠোঁট কী করে অমন চওড়া হাসি হাসত মীরাবউদি আমি জানি না, যদি কখনো কোনও মহিলাকে ও-রকম হাসতে দেখি আর, তাকে জিজ্ঞেস করব। মীরাবউদি হেসে বলত, 'বা, বিয়ের আগেই নেমন্তন্ন খাবি নাকি?'

সারাদুপুর দরজার পরিবর্তে জাল-আঁটা সেই বিশাল জানালার পাশে মারাবউদি বসে থাকত রোজ। রোজই লেভেল ক্রশিং-এর গেট নেমে আসত একসময়, তীব্র সিটি বাজিয়ে দূর থেকে ছুটে আসত। মেলট্রেন, নাটবল্টুপিস্টনাফিসপ্লেট, বগির ঠোকাঠুকি, সব মিলিয়ে আওয়াজ হত ঝন্ ঝন্ ঝন্ ছুটন্ত ট্রেনে লহমায় লহমায় মুখ, এগজস্ট-পাইপ থেকে গলগল করে ধোঁয়া উড়ে এসে গ্রাস করতে তাকে, দুহাতে কান চেপে ধরে ধোঁয়ার ভিতর থেকে আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠত মীরাবউদি, তারপর আবার সেই বসে-থাকা।

বছর বছর মেয়ে হত, মেয়েদের প্রতি মীরাবউদির নিষ্ঠুরতা ছিল জানোয়ারদের থেকেও বেশি। জন্তুজানোয়ারদের তবু একটা বয়স পর্যন্ত সন্তানের প্রতি মমতা থাকে, তার তাও ছিল না। অমন টসটসে শরীর, বহুবছরের দাম্পত্য সত্ত্বেও কোথাও টাল খায় নি যা, তবুও কিশোরী মেয়েদের মতো তার ছোট ছোট স্তনে দুধ হত না একফোঁটা। অনেক ইনজেকশন নিতে হয়েছিল নামকরা ডাক্তার দেখেছিল অনেক, কোনও ফল হয় নি। প্রতিবছরই বস্তি থেকে সদ্যপ্রসূতির ডাক পড়ত তাই। ছ-সাত মাস মোটা মাইনে দিয়ে তাকে রাখতে হত। অথচ শেষ সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে প্রসবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে কী উত্তেজনা তার। এটার নাকটা কী-রকম হবে কে জানে, টিকানো হবে কি, মেনির মতো খাঁদা না হয় আবার। 'ব্যাটাছেলের চোখের তারা বেশ বড় হবে, বুঝলি ঠাকুরঝি, ভ্রূ-দুটো হবে টানা-টানা, তবে ত।'

'ইস, নড়ছে যে রে পেটের ভেতর।' শিউরে উঠে একটু পরে আধোজাগা গলায় মীরাবউদি বলত। 'ভীষণ, ভীষণ কালো হবে' দুদিকে অবিরল অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়ে বলত, 'আমার ছেলেকে যেন কোনওদিন কাজল পরতে না হয়। কী করে বলব তোকে কেমন হবে তার চাউনি, কত বড় বড় হবে তার চোখের পাতা, বুকের ভেতর গিয়ে পড়ে থাকবে।'

'আর গায়ের রঙ?'

'সত্যি সত্যি বলছি', জালের ওপাশে উনুনের মাটি চিবুতে চিবুতে বউদি বিরক্তমুখে উত্তর দিত, 'ফরসা ব্যাটাছেলে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আমার গা ঘিনঘিন করে—এ ম্যাগো!'

পারেকের মা ছিল ইহুদি। তার চোখের তারা কটা, গায়ের রঙ খোসছাড়ানো সেদ্দ আলুর মতো ফ্যাঁসফ্যাসে-হলদে।

দিদি জিজ্ঞেস করত, 'তাহলে পারেকসাহেব?'

'ব্যাটাছেলের গায়ের রঙ ঠিক কালো হবে না।' দেখতে দেখতে আবার অপরাহ্ণকাল এসে যেত, মন্দিরের চূড়া থেকে ঠিকরে এসে আলো লাগত মীরাবউদির মুখেচোখে, বুকে; 'শ্যামল হবে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হবে, বুঝলি?' নিচু গলায়, যেন গোপন খবর, বউদি বলত, 'এই যেমন কৃষ্ণের ছিল।'

'কে বাঁশি বাজাচ্ছে রে!' ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াত মারাবউদি, তার হাতের চুড়ি বেজে উঠত ঝমঝম করে। 'ও!' আমূল উৎপাটিত গলায় তারপর বলত, 'এই যা। রেডিও আরম্ভ হয়ে গেল? যাই; শনিবার, তোর দাদা এসে পড়বে। কী বই এনেছে রে বিশুঠাকুরপো? বিশেদা লাইব্রেরি থেকে আনত 'রমাহারা মোহন।' দিদির হাত থেকে মারাবউদি নিত জালের গর্ত দিয়ে কনুই অবদি হাত ঢুকিয়ে।

দুবার চেষ্টা করে ক্লাস এইট-এ প্রমোশন না পেয়ে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিলে কি হবে, বিশেদার হাতের লেখা ছিল তো মুক্তোর মতো গোটা গোটা। পাড়ার মেয়েমহলে এজন্যে বিশেদার চাহিদা ছিল খুবই। সুচের কাজ, পিক্টোগ্রাফ বা আসনের জন্যে অনেকেই বিশেদাকে দিয়ে 'পতি পরম গুরু' বা 'জননী জন্মভূমিশ্চ', 'কিছু লয়ে আসে নাই কিছু নাহি লয়ে যাবে', কি 'যে-জন দিবসে মনের হরষে'—এইসব লিখিয়ে নিয়ে যেত। একখণ্ড কালো মখমলের ওপর বিশেদা দিদিকে লিখে দিয়েছিল, 'সোনার হরিণ, তুমি কোন বনেতে থাক?' বিশেদার সঙ্গে মীরাবউদির কথাবার্তা ছিল না। বউদি দিদিকে একটা বীডিং-করা সাদা বেড-কভার পাঠিয়ে দিয়েছিল একদিন। বলেছিল, 'ঠাকুরপোকে বলিস ত একটা কিছু লিখে দিতে।'.

বিশেদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছিল। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' বা 'দুই বিঘা জমি' পড়েছিল ছেলেবেলায়, জন্মদিনের সভায় 'পঞ্চনদীর তীরে' বা 'প্রশ্ন' কবিতার আবৃত্তিও বারংবার শুনে থাকবে। অথচ কোথা থেকে বা কী করে কে জানে, মীরাবউদির সাদা বিছানার চাদরের ওপর, মুক্তোর মতো ঝরঝরে হস্তাক্ষরে বিশেদা বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছিল :

'যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে
আমায় জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।'

চাদরটা বহু বছর টিকেছিল, খাটজোড়া বিছানার ওপর সেটা পাতা হত বছরে দু-চারবার, বড়দিনের সময় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে আমি একবার দেখেছি। ছাদের তারে তার অক্ষরগুলি গ্রীষ্মের রোদে শুকতো, বসন্তের মনোরম বাতাসে দুলে উঠে গাছের পাতার মতো উলটে যেত অক্ষরগুলি। হঠাৎ বৃষ্টি এলে ছাদে ছুটে আসত মীরাবউদি, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে চারদরটা নামিয়ে নিতে তাকে কত দেখা গেছে। বউদির বিবাহের তোরঙ্গে আজ জাল বুনে যাচ্ছে মাকড়শা, ভিতরে চাদরের পাটের ওপর শুধু 'তোমার আসন' এই শব্দ দু-টি, বাকিগুলি ভাঁজে ভাঁজে, তার ওপর গ্রুপফোটো, চিঠিপত্র, লাল চেলি কি জয়পুরে তোলা তার একা বালিকা বয়সের ছবিটা, তোরঙ্গের ভিতরের অন্ধকারে এই দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি।

## গল্প

মীরাবউদির কথা এই পর্যন্ত লিখে আর সবকিছু মুছে দিয়ে এইমাত্র এমন-একদিনের স্মৃতি ভেসে উঠল, যা আগে মনে পড়ে নি কোনদিন। সেই কোন কিশোরবেলার কথা, দেখে তখন কিছুই মনে হয় নি, তখুনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু যেহেতু আমি ছাড়া জীবিত আর কেউ সে-কথা জানে না, যেহেতু কারুকে বলি নি কোনওদিন, এতকাল পরে এই প্রকাণ্ড ভেসে-ওঠার তাই এত বিস্ময়, গোপনতার এমন দারুণ মূল্য। নিজেকে তাই জাতিস্মর মনে হচ্ছে।

সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। স্কুল থেকে সোজা চলে গিয়েছিলুম মাঠে। সেদিন এম এস পি সি এইচ স্কুলের সঙ্গে ফাইনাল ম্যাচ ওয়াকওভার হয়ে গেল, স্কুলের সেরা গোলকিপার আমি বাড়ি ফিরেএলুম তাড়াতাড়ি। যুদ্ধ থেকে ফিরে বিশেদা একটা মাড়োয়ারি ফার্মে ট্রাক টালাত। একপশলা বৃষ্টিতে ভিজে ট্রাকটা আমাদেরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। কীভাবে পড়ে গিয়েছে কে জানে, দেখি, কাদামাখা সামনের একটা টায়ার জড়িয়ে সেই পাগলাফুলের ছিন্নলতা, যার নাম ক্যাথিফ্লোরা, তার নীলনীল কানপাশার মতো ফুলসুদ্দু।

বগলে ফুটবল, হাতে বই, গায়ে মোহনবাগানের জার্সি, সিঁড়ি দিয়ে শব্দহীন উঠে দরজার

একটা পাল্লা ফাঁক করে আমি দেখলুম। দীর্ঘ দালানের শেষে জানালার জাল, জালের অনেকগুলি গর্ত কমলালেবুর ছিবড়ে ও পানের পিকে বোজা, জালের ওপাশ থেকে বিশেদার সারা গায়ে বৃষ্টিশেষের ভেসে-ওঠা আলোর একটা জাল ছুঁড়ে দিয়ে মীরাবউদি বসে আছে। কনুই-অবদি সোনার চুড়ির অভাবে আজ তার নগ্ন হাত জালের গর্ত দিয়ে ঢোকানো, বিশেদা তার লোহারঙের সমর্থ দুই হাতে জলে অঞ্জলি দেবার মতো করে মারাবউদির কনুই অবদি ডানহাতটা ধরে এদিকে বসে আছে। শীতকাল; বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। মানুষ কাঁপতে ভালবাসে, তবু দুজনেই সাড়হীন নীরব।

মীরাবউদির পিছনে প্রকাণ্ড গোলাপের মতো সূর্য। সূর্য ঝরে যায়। মূল আলো নেপথ্যে চলে গেলে থাকে তার বিম্ব; দীর্ঘ গাছ, পাখির গা কি জানালার আর্চ, সর্বত্র থেকে বিম্বিত হতে হতে অবশেষে লাগে মন্দিরের চূড়ায়। মন্দিরের চূড়া জ্বলে ওঠে। মন্দিরের চূড়া থেকে ঠিকরে বউদির মুখেচোখে, তার আভা যেন মীরাবউদির বুকে লেগে আছে। সাজানো গৃহস্থালি তার মনে নেই।

ওরা মুখোমুখি বসে। অন্ধকার হয়ে এলে পাখিরা চ্যাঁচামেচি শুরু করে। শিশুদের কোলাহল বেড়ে যায়। শাঁখ বেজে ওঠে।

দূর থেকে শব্দ ওঠে। একটা মালগাড়ি ব্যাক করছে। বৃষ্টিভেজা রেললাইনদুটি তাদের সমান্তরাল দীর্ঘতা জুড়ে চকচকিয়ে ওঠে, থরথর করে কাঁপছে। মালগাড়িটা আরও কাছে এসে পড়ে। এখন বাড়ি কাঁপছে, রাস্তা কাঁপছে, জানালা ঝনঝন করে বাজছে। ফিসপ্লেটনাটবল্টুপিস্টনের সমবেত ঝনাৎকারের মধ্যে চাকাগুলি দাত কামড়ে বসে যাচ্ছে লাইনের ওপর। তেতাল্লিশটা বগির অন্ধকার শোভাযাত্রা তাদের শৃঙ্খলের শব্দ তুলে পিছু হটে।

অবশেষে এঞ্জিনটা যায়। মাথায় রুমাল-বাঁধা, নীল হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি-পরা-ড্রাইভার বিধাতার অপূর্ব কারুকার্যময় ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। ইয়ার্ডে ঢোকার সময় ইঞ্জিনটা ধীরে, অতি ধীরে বাঁক নেয়। ঝক, ঝক, ঝক, ঝঝঝঝঝঝঝঝঝ-ঝক্, ঝক্, ঝক্, ঝক, ঝক....ধীর ও উন্মত্ত শব্দের উত্থান ও পতনের মধ্যে অকস্মাৎ ছাদের তারে ঝুলন্ত চাদরটার ওপর হেডলাইটের তীব্র আলো এসে পড়ে।

হাওয়ায় ফেঁপে ওঠে চাদরটা। অক্ষরগুলি আলোর ঢেউ-এ দুলতে থাকে। সিঁড়ির কাছ থেকে দেখে মনে হয়, যেন একটা কালো পিঁপড়ে 'যতবার আলো' থেকে কিলবিল করে হেঁটে 'গভীর অন্ধকার' পর্যন্ত পারাপার করছে।

আবার অন্ধকার। বিশেদার নগ্ন হাতের ওপর মীরাবউদির কনুই-অবদি নগ্ন হাত, যেন একটা নগ্ন হাতের ওপর আর একটা নগ্ন হাত। পিছনে চাদরটা উড়ছে পতপত করে। থরথর শব্দ করছে অক্ষরগুলি। অদূরে নিশ্চিত খড়্গের মতো লেভেলক্রশিং-এর গেট উঠে যাচ্ছে।

## উপসংহার

বাবা বলেছিলেন, 'ও ভোগ করতে পারবে ভেবেছ, ওর বুকে বজ্রাঘাত হবে।' পারেকের বুকে বাজ পড়ে নি, বজ্রাঘাত হয়েছিল পামগাছটার মাথায়। কবর খুঁড়ে খাড়া-করা অলৌকিক অবয়বের মতো রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, জ্যোৎস্নায় ম্লান হয়ে, পোড়া পামগাছটা আজও দাঁড়িয়ে আছে; শবদেহের ওপর যেমন রোদ, যেমন বৃষ্টি, যেমন জ্যোৎস্না। অমাবস্যার কালো হাওয়ার তার গলার ভয়ঙ্কর নীল মালাটা দোলে, জোনাকির ঝাঁক এসে তাকে ছেঁকে ধরে যখন।

আজও পারেক দোকানে বেরয় নিত্য, কিন্তু দোকানের সে কালোবাজারি জৌলুস আর

নেই। ফার্নিচার যা আছে সবই ভাঙাচোরা, এখন ধুলায় মলিন। পাখি নেই, কিছু নেই, ফুল নেই। ময়ূরীর খাঁচাটা ভেঙে গেছে কবে, শ্বেতির দাগে ভরতি নুরওয়ালা রোগা মুসলমান সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে আর আসে না। পারেকের প্রথম পক্ষের ছেলে বাইরে চাকরি নিয়ে চলে গেছে, অনুচ্চারণীয় ভাষায় বাবাকে গালাগালি করবার জন্যে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে সে বাড়ি ফেরে। রুক্মিণীর বিয়ে হয়ে গেছে। পারেকের কানি ঝি-টা মীরাবউদির মেয়েদের অসম্ভব মারপিট করে, বিকট চিৎকার করে, মারতে মারতে হাঁফিয়ে উঠে ঝি-টা বলে, 'সেই মানুষটা কোন সকালে খাটতে গেছে, তোদের এ্যাট্টুকুন মায়াদয়া নেই র‍্যা', আমরা এ-বাড়ি থেকে শুনতে পাই। 'মেয়েগুলোর জন্যে খাটতে খাটতে নঙ্ কালো হয়ে গেল মা', ছাদজোড়া কুমড়ো গাছ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে জালের ধারে দাঁড়িয়ে সে মাকে বলত। মীরা বউদির আইবুড়ো মেয়েটা মীরাবউদির ঢাকাই পরে বিকেলে গা ধুয়ে ছাদে এসে দাঁড়ায়, অসম্ভব বোবা, যেন তার মুখে রুমাল গোঁজা।

তবে তার অনুমান মিথ্যে হয় নি, পরপর সাতটি মেয়ের পর, অষ্টম গর্ভে মীরাবউদি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল। তার আরও অনুমান সত্য বলে প্রমাণ হয়েছিল। তার ছেলের নাক মেনির মতো খাঁদা হয় নি, টিকালো হয়েছিল। সে ফরসা হয় নি, তার ভ্রূ-দুটি হয়েছিল টানাটানা। মীরাবউদি সত্যিসত্যি নীল সন্তান প্রসব করেছিল। আজ আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হলে গায়ে কাঁটা দেয়, যে তবে কি, অষ্টমবার গর্ভধারণ করে মীরাবউদি কোনও দৈববাণী শুনেছিল?

জন্মের কিছু পরে সে মারা যায়। চোখের তারা বড় বড় হয়েছিল কি না, পল্লবগুলি কেমন হয়েছিল, কেমন-বা ছিল তার চাহনি, মুহূর্তের জন্যে মীরাবউদিই হয়ত তা দেখে থাকবে। আমি যখন মা-র সঙ্গে যাই, বউদির তখনও জ্ঞান ফেরে নি, তাকে ঘিরে আছে ডাক্তার, ধাই, প্রতিবেশী দু-একজন ও স্বয়ং পারেকসাহেব। পাশেই মেঝের ওপর, কাঁথার মস্ত বড় পদ্মের ওপর, চোখ বুজে শুয়ে আছে তার নীল ছেলে; যেন সে গর্ভের আঁধার থেকে বেরতে চায় নি, যেন তাকে ছিঁড়ে বের করে পদ্মের ওপর আছড়ে ফেলেছে কেউ, নীল হয়ে যেতে যেতে— গলা কাটা যাবার আগে নিশ্চিত খড়্গের দিকে চেয়ে যেমন মানুষের বোধহীনতার মধ্যে আচম্বিতে বোধ জেগে ওঠে, বেদনাহীন দুঃখে বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে সে তার সকল অতীত দেখে নেয়, যেমন ক্ষণপরে তার গলাকাটা মুণ্ড তার বিচ্ছিন্ন ধড়টার দিকে একলহমা ধরে চেয়ে দ্যাখে—তেমনই, নীল হয়ে যেতে যেতে মীরাবউদির অষ্টমগর্ভে জাত সন্তান কি তার মাতৃমুখ দেখে যেতে পেরেছিল?

বছরচারেক পরে সকলের অজ্ঞাত কারণে রেলইঞ্জিনের ড্রাইভার বিশেদাকে রেলইঞ্জিনের চাকার নিচে গলা পেতে দিতে হয়েছিল। সেদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। খুব কাছে এসে গিয়েছে তখন মালগাড়িটা। ঝক্, ঝক্, ঝক্, ঝক্, শব্দ উঠছে, ঝক্, ঝক্, ঝক্, তারপর আবার সেই উন্মত্ত, ঝঝঝঝঝঝঝ-ঝক্, আবার থেমে থেমে, ঝক্, ঝক্, ঝক....পাঁচিলের ওপাশে রেলইয়ার্ডের মধ্যে লাইন-পালটানোর শব্দ হিশেব করে তেতাল্লিশটা বগি গুনেছিলুম সেদিন, বিছানায় ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে।

পরদিন মর্নিং-স্কুলে যাবার পথে শুনি রেলবাঁধের ওপর সুইসাইড করেছে একজন লোক। বাঁধে উঠে দেখি, কাঁধের কাছ থেকে কাটা একটা ধড় পড়ে আছে, তাকে ঘিরে একদল অপরিচিত লোক, ঢাল দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়েছে কাটা মুণ্ডুটা, তাকে ঘিরে একদল অপরিচিত লোক, তারা সকলেই নিমগ্নভাবে দাঁড়িয়ে, তখনও পুলিস আসে নি। বেচু ও আমি বাঁধের ওপর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে লাইনের ধারে এক জায়গায় কনুই থেকে কাটা একটা নীল হাত পড়ে রয়েছে দেখি, সম্ভবত চাকার সঙ্গে আটকে গিয়ে থাকবে। আমি হেঁট হয়ে তা স্পর্শ করতেই,

'এ্যাই বিজন', বেচু চমকে বলে উঠেছিল, 'কী করলি!' আমি বললুম, 'তোকে ছোঁব না। কিন্তু মাকে বলিস না, খর্বদার।' তারপর আমরা দুই বন্ধু রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগলুম পূর্বদিকে, পাশাপাশি, বহুদূর। যতদূর যাই, দেখি, মাঝে মাঝে শ্লিপারের ওপর রক্তের ফোঁটা দানা বেঁধে আছে। হয়ত রাতের মালগাড়ির কোনও বগিতে কলকাতার জন্যে ছালছাড়ানো ভেড়া কি শূয়ারের মাংস চালান যাচ্ছিল।

কিন্তু সেই স্পর্শে আমার জ্ঞান সেই স্পর্শের কথা আমার মনে পড়ে, তার স্মৃতি আমার মূলে মূলে আজও শিউরানি জাগায়। যখনই মনে পড়ে, যাই ছুঁয়ে থাকুক আমার হাত, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আমি বন্ধু কাঁধ থেকে হাত তুলে নিই, সরিয়ে নিই বই থেকে, আলমারি থেকে, লোভ, আশা, তৃপ্তি থেকে। সেই স্পর্শ আমাকে আচ্ছন্ন করে, 'যতবার আলো' থেকে 'গভীর অন্ধকার' পর্যন্ত পঙক্তিকটি আমার চোখের সামনে বারবার প্রতিভাত করে তোলে। ঘূর্ণির মতো তাদের সর্বগ্রাসী মানে আমাকে টানে, অর্থ না জেনে যে পঙক্তিকটি ব্যবহার করে তার অজ্ঞতা, আজ আমি বুঝতে পারি, বুঝতে পারি অজ্ঞতার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

রেলের লাইনে গলা পেতে তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সুদূরের শব্দ নয়, মাত্র এক হাত দূরে ইঞ্জিনটা যখন, তখন থেকে গলায় চাকা বসার মুহূর্ত পর্যন্ত বিশেদা কি ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেয়েছিল? পেয়েছিল নিশ্চয়, তবু গলা তুলে নিতে পারে নি! তারপর বিশেদার কাটামুণ্ডু ক্ষণেকের জন্য তার ছিন্ন ধড়ের দিকে চেয়ে ছিল নাকি? কী দেখেছিল—কী সেই অজ্ঞতা কারণ, যা রেলইঞ্জিনের-ড্রাইভার বিশেদাকে রেলইঞ্জিনের চাকায় গলা পেতে রাখতে বাধ্য করেছিল, গর্ভের প্রহেলিকার মতো ঘিরে ধরে স্পর্শের সেই রোমাঞ্চ আজ আমাকে তা জানায়।

আটমাসের গর্ভবতী অবস্থায় নীল সন্তান প্রসব করে মীরাবউদি মারা যায়। তার জরায়ুতে ক্যানসার হয়েছিল, সে কারণ নয়। তারপরেও বিশেদা বিয়ে করেছিল, বধূ ছিল, শিশু ছিল, সে কারণ নয়। বস্তুতপক্ষে মীরাবউদির কোনও অসুখে মৃত্যু হয় নি, এই মৃত্যু ছিল তার একান্ত নিজস্ব মৃত্যু, তার অবধারিত। সন্তানের জন্ম দিয়ে, সন্তানের জন্ম দিতে দিতে, শরীরকে ক্রমাগত কাঁদানোর এ-ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারত তার!

মা যতই বলুন, 'মীরার মতো সতী এ যুগে হয় না', যতই বলুন, 'সাক্ষাৎ মীরাবাঈ', একদিন বিকেলবেলার স্মৃতি ও একদা ভোরবেলার কাটা নীল হাতের স্পর্শ থেকে আমি জানি, কী সূক্ষ্মভাবে চরিত্রহীন ছিল মীরাবউদি, আর সেই অজ্ঞাত শিল্পচেতনাকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল পারেক কী অবর্ণনীয় বোধহীনতায় পাখি পেলেই খাঁচায় পুরে দিত ত্বরিতে ও গাছ পেলেই টবে। ফুটপাতে শ্যু-এর শব্দ তুলে গলির মুখ থেকে জনহীন পারেক তাই হেঁটে আসত মাঝে মাঝে, মধ্যরাতের বন্ধ দরজার ওপর দুইহাতের মুঠি দিয়ে ঘুসি মারত কৃপাপ্রার্থী সে; স্খলিত-অস্ফুটস্বরে তাই সে ডাকত, 'দরজা খোলো।' 'দরজা খোলা।'

হতভাগ্য পারেক তাই ৯৬টা পেরেক-মারা খ্রিস্টের ছবির পাশ থেকে নামিয়ে নিত তার নির্জীব চাবুক, কোলের মেয়েটাকে বুকের কাছে চেপে ঝি ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত, দরজা-জানালা একে একে বন্ধ হয়ে গেলে পারেকসাহেব তাই মাঝে মাঝে মধ্যরাতে কাফ্রী হয়ে যেত। লেজের কাছ থেকে চেপেধরা জ্যান্ত সাপের মতো চাবুক দুলিয়ে ঘরের মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এ-যুগের সতীর মুখোমুখি হত।

*ছোটগল্প, ১৯৬০*

# ক্রীতদাস ক্রীতদাসী

১

দেখি, দোতলায় দুজনে বসার সিটে একলা বসে আছে। গায়ে সাদা শাল জড়ানো, ব্যাস, আর কিছু মনে নেই। মন পড়ছে না, ভুলতে পারছি না।

আমি কারো চোখের দিকে আজ পর্যন্ত চাই নি। পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিত, অনেকের দিকে চেয়ে দেখেছি। কারো কারো ঠোঁট, নিতম্ব, স্তন, কারো-বা নগ্ন হাত আমার ভাল লেগেছে। কারো নীরবতা মনে আছে, কারো অভিমান, মনে আছে কোনও হাঁটার ভঙ্গি। একজন গায়িকার গ্রীবা মনে পড়ে। কোনও চোখ মনে পড়ে না।

বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে মায়ার দিকে চেয়েছিলুম। শীতের এত ভোরে আমি আগে কখনো বেরই নি। যখন গঙ্গার ওপর বাস উঠল, মনে হচ্ছিল, গঙ্গায় জীবনের ভাসমান শোভা দেখে বাসের মানুষগুলো সকলেই দ্বিরুক্তিহীন, অতিশয় নম্র ও বিনয়ী হয়ে পড়েছে—৮নং বাসের 'লেডিজ ওন্‌লি' আঁটা সিটে মায়া বসেছিল হেঁটমুখে, চোখ নামিয়ে—তাদের চোখ সহসা ছলছলিয়ে ওঠে, কেননা, তটভূমি ত্যাগ করে এই সময় একটি দণ্ডিত জাহাজ, চলে যেতে হবে বলে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে তার যাবজ্জীবন নির্বাসনে চলে যায়।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল মায়া, অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর সে ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, অবশেষে চোখ তুলে চাইল, চুলে-ঢাকা ডান গালটা একবার ফিরিয়ে-সরিয়ে নিল চকিতে, বাঁ-গালের উড়ন্ত চুল, চাপা কাঁধ ও জাগ্রত কণ্ঠার ফাঁক দিয়ে সেই জাহাজের দূর মাস্তুল দেখা গেল একবার, বাস ব্রিজের উপর উঠছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

পরমুহূর্তে সে আবার চোখ তুলে চাইল। 'ও!' আমূল চমকে উঠল মায়া। হাসল। একেবারে তৎক্ষণাৎ, শিকড় সরসর করে উঠলে গাছের যেমন হয়, আমার সেইরকম হল। কোনও বাস্তব কারণ নেই, অথচ আমি বুঝতে পারলুম, ওর বহুদিনের গোপনতার সঙ্গে এই হাসি ও স্বরের সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত এই চমকে-ওঠার। সেই তখন থেকে শুরু হল এক আশ্চর্য আত্মহনন, সেই মুহূর্ত থেকে একেবারে তৎক্ষণাৎ, ওর সঙ্গে মনে মনে-কথা বলার এক আত্মঘাতী অজ্ঞিতার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়লুম। আর বুঝলুম এই রকম চলবে, এই শুরু হল, যতবার মায়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এই রকম চলবে। এই আমার নিয়তি।

মায়া বলল, 'আরে আপনি?

আমি মনে মনে বললুম, 'হ্যাঁ, আমি।' মুখে বললুম, 'চিনতে পেরেছেন?'

মায়া বলল, 'আপনারা ফিরলেন কবে। পুরী থেকে?'

আমি মুখে তার উত্তর দিয়ে মনে মনে বললুম, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'ভাল আছেন?'

'ভাল।' (বললুম, 'সাদা শাল জড়িয়ে বসে আছো, ও-হো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।')

'কোথায় যাচ্ছেন?' মায়া জিজ্ঞেস করল।

'টিউশনিতে। আপনি এই ভোরবেলায়?'

'এই...এদিকে একটু কাজ ছিল।'

মায়া প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেন? পরে জানতে পারব। এখুনি জেনে লাভটা কী? কিন্তু আমি কী জন্যে বেরিয়েছিলুম, এই ভোরবেলায়?

'কোথায় যাবেন জানতে পারলে টিকিটটা কাটি।'

'ধন্যবাদ। আমি একটু দূরে যাব।' আমি দ্বিতীয়বার বললুম না। কী হবে? আবার ত দেখা হবে। তখন, দুচার বছর পরে, একদিন ও কোথায় যাবে জানা থাকবে এবং টিকিট কাটার অনুমতি চাইতে হবে না।

হ্যারিসন রোড দিয়ে হাওয়া কেটে বাস যাচ্ছিল। হাওয়ায় হ্যারিসন রোডে একঝাঁক পায়রা উড়ছিল, এই উলটে গেল, ক্রমশ আরও উপরে উঠে যায়। যেন শৈশবের স্বাধীনতা দিবসে, যখন কুয়াশার 'মাগো তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি' এই সংগীত চিত্রে অর্পিত হয়, সভাপতি পতাকা উত্তোলন করছেন নিচে, একটা কালোছিট শুভ্র পতাকা উঠে যাচ্ছে পতপত করে, উপরে, আরও উঁচুতে। সেই হাওয়া কেটে হ্যারিসন রোড দিয়ে বাস যাচ্ছিল। অকারণে আমার মনে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষমাণ অমূল্য মুগ্ধতা জাগে। পাখি, বা সূর্যাস্তের আলোয় বিলীয়মান নৌকা মনে পড়ে।

জলকুলিতে রাস্তা ভিজিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই এখনো ঘুমে অজ্ঞ, কেউ কেউ জেগে উঠে পায়চারি করছে রাস্তায়। সূর্য উঠতে পারে। কী-রকম ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে, কী রহস্যময় লাগে জানুয়ারির এই সব ভোর, তা অনেককেই বলে দিতে হবে না, কারণ অনেকে জানে। অনেকেই বলবে, হ্যারিসন রোডকে হ্যারিসন রোডের দর্পণ বলে মনে হয়। আমি কলেজ স্ট্রিটের একটা টিকিট কেটে, কলেজ স্ট্রিট অবদি ওর দিকে চেয়ে রইলুম, যার মধ্যে দু-একবার সাদা শালটা আরও মুড়িশুড়ি দিয়ে বসল ও, ওর কণ্ঠাদুটি জেগে রইল আগের মতো, চেষ্টায় থাকার জন্যে কথা ফুরিয়ে গেল না, একবার যখন ও জানালা দিয়ে মুখটা গলিয়ে দিল, আমার মনে হল ওর শুকনো মুখ থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে হু হু করে—ওর সেই ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সময় কলেজ স্ট্রিট, ওকে কিছু না বলে, আমি টুপ করে বাস থেকে নেমে পড়লুম।

## ২

আমি কী রকম? ছেলেবেলা থেকে সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। বেচুকে দেখে মা পর্যন্ত বলেছিল, 'আহা, কী সুন্দর দেখতে রে তোর বন্ধু!' বেচু জানে ওকে কেমন দেখতে। সবচেয়ে কুৎসিত লোকও আমি দেখেছি, আমাদের অফিসের চৌধুরী। প্রথম দিন আমি চেয়ে দেখতে পারি নি। আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। চৌধুরী কি জানে, সে কী কুৎসিত! জানার দিকে সাহস করে কিছুদূর এগিয়েছিল সে নিশ্চয়। আমি, আমি জানি, চৌধুরী বা বেচু কারো মতোই নই।

আমাকে কেমন দেখতে আমি জানি না। আমার মা নেই, বাবা সওদাগরী অফিসের স্টেনো ছিলেন বলে আঙুলে বাত নিয়ে রিটায়ার করেছেন। ব্যাঙ্কে, শুনেছি, বাবার টাকা আছে। দাদারা বিবাহিত, সন্তানাদি আছে, চাকরি ব্যবসা ইত্যাদিতে উপার্জন করেন। মেজদা কোনওদিন খবরের কাগজের বেতারবার্তা পড়েন না, তবে অফিসফেরত, টিউশন সেরে, নিত্য বাড়ি ফিরে প্রথমেই রেডিওর চাবি টিপে দেন। একটা-কিছু গানবাজনা হোক বা কথাবার্তা, তিনি শুনতে চান। সে-সময় রেডিওতে তা হয়ও। এক-একদিন দেরি হয়ে গেলে অবশ্য, তখন রেডিও খুললে একটা একটানা কুঁই-কুঁই আওয়াজ বেরয়। বড়দা এত উত্তেজিতভাবে ভাত খায় যে, দেড়তলায় আমার এই গর্তের মতো ঘরটায় শুয়ে তার হুশ হাশ শব্দ শুনতে পাই। আমাদের বাড়িতে একটাই হাঁড়ি চড়ে। আমি কিছু লেখাপড়া শিখে চাকরি করি। আরও ভাল একটা চাকরি পাব, জামাইবাবু ব্যবস্থা করেছেন দিল্লিতে, শুনেছি তখন আমাদের বাজার-খরচ দৈনিক আট-আনা হিশেবে বাড়ানো হবে। ততদিনে, নিয়ম-মাফিক হলে, বউদিদের দুটি-তিনটি ছেলেপিলে হবে।

৩

ঈশ্বর ধন্যবাদার্হ যে, ইতিমধ্যে যে-দুদিন মায়ার সঙ্গে দেখা হল, তার প্রথম দিন দাড়ি কামানো ছিল। জামাকাপড়ও ভাল ছিল। দ্বিতীয় দিন পোশাক ছিল শ্যাবি, কিন্তু দাড়ি কামানো ছিল। আরও একদিন দূর থেকে দেখেছিলুম। সন্তোষ গোঁফটা অত্যন্ত সরু, ছোট-বড় আর ছুচলো করে কেটে দিয়েছে সন্দেহ হওয়ায়, (সন্দেহ, কারণ ওর সেলুনের আর্শিটা এত পারা-ওঠা, উঁচু-উঁচু আর এমন ব্যঙ্গ করে যে) আমি ওর সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে থেকে দ্রুত সরে এসেছিলুম। যা হোক, এখন মাসের শেষ, তবু শুধু ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে একটা আর্জেন্ট পাঞ্জাবি করতে দিয়েছি। ধুতি এবং সেটা ডাইং-ক্লিনিঙে দিয়ে, কেচে আসার পর, ওর সঙ্গে পরপর দু-তিনদিন দেখা করার চেষ্টা করলে, ধুতিপাঞ্জাবি ময়লা হবার আগে ওর সঙ্গে একদিন দেখা হবে বলে মনে হয়। আর চৌধুরীবাবু খুব আন্তরিকভাবেই অনুরোধ করেছেন, 'যেদিন মায়ার কাছে যাবে, ভাল জামা-কাপড় পরে যেও, আর চুলটা যেন আঁচড়ে যেও ঠিকমতো।' চুলটা যদি অল্প শ্যাম্পু করি, আমাকে কেমন দেখায়?

৪

আজ রাত আটটা নাগাদ তিন আনায় আমি আর সুরেশ্বর দুজনে টিফিন করলুম খাস চৌরঙ্গিতে, খিদিরপুরের প্রাইভেট বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানে। জল আর পেট্রলে থকথক করছে জায়গাটা। একজন পাঞ্জাবি সিলিং পর্যন্ত জালে-মোড়া টিকিট ঘরটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ ব্যাগ কাঁধে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের ঘামের গন্ধ, সারি সারি লাল শালুর ওপর পাতা পান-সিগারেট, গরম আলুকাবলি, স্তূপাকার ফুচকা, ভাঁড়-ভাঁড় তেঁতুলের ঝোল—স্থান জুড়ে এখানে একটা টক্‌চা গন্ধ। প্রায় পনের কি কুড়িটা বাস হা হা করছে ফাঁকা, একটা বাসে কিছু যাত্রী উঠেছে, মোমিনপুর যাবে, কখন ছাড়বে ঠিক নেই; কিছুই ঠিক নেই!

অদূরে প্রোথিত মনুমেন্ট। আরও দূরে কলকাতার লালনীল ক্ষত দগদগ করে জ্বলছে। বেদুইন যুবতী ঘুরছে দামি সাটিনের সালোয়ার পরে, ছেলেটাকে বুকের কাছে শুইয়ে, পাশে বৃদ্ধা, পিছনে উৎসাহী কুকুর। আরও পিছনে কলকাতার একমাঠ প্রয়োজনীয় অন্ধকার।

দু-আনার মুড়িমশলা খেলুম দুজনে। কত সুন্দর এই মুড়িঅলা, দুগাল মুখে দিয়েই তা বোঝা গেল। ঝাল-পেঁয়াজ-আদা দিয়েছে, তেল দিয়েছে, সবুজ ও লাল লঙ্কার টুকরো আর ঠিকমতো নুন দেওয়ায় বিশেষত স্বাদু। চাঅলাকে বললুম, 'দুভাঁড়ে দু-পয়সা করে চা দাও ভাই।' চাঅলা, আশ্চর্য, দিল। খুরি ভরতি করেই দিল, আমাদের দুর্বল আপত্তি অগ্রাহ্য করে দিল। সুরেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ইজ দ্যাট চ্যারিটি বিজন?' আমি বললুম, 'চারটে মোটে পয়সা দিলুম, দুটো খুরির দামই দু-পয়সা। তার ওপর দু-আনার চা তুমি দিলে, আর এমন সুন্দর চা। তোমার যে লোকসান হল হে। কেন তুমি এমন ভুল করলে?' চাঅলা সংক্ষেপে বলল, 'কোই বাত্ নেই বাবু।' আমি ওকে একটা চার্মিনার দিলুম। কী লজ্জা চাঅলার! বসেছিল, ডান হাতটা সিগারেটসুদ্দু নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে, বাঁ-হাতের ওপর মাথাটা রেখে মুখ লুকিয়ে এক ধরনের হাসতে লাগল। কীসে যে ও ওর অমন নারীসুলভ সুন্দর লজ্জা হল, বুঝলুম না।

তারপর মনুমেন্ট অবধি হেঁটে গিয়ে, মনুমেন্টের নিচের সিঁড়িতে আমি বসলুম, সুরেশ্বর বসল সবচেয়ে ওপরের ধাপে। শীত এলে একাকিত্ব বড় কষ্ট দেয়। কুয়াশায় স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই।

চেঁচিয়ে বললুম, 'ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স নিয়ে, বুঝলি সুরেশ্বর, বেশ উপকার হয়েছে। মন কী শান্ত, বেশ সাফসুফ লাগছে শরীর।' সুরেশ্বর ত হ্যা হ্যা করে হেসে উঠতে পারত, ট্রামে

ওঠার আগে ও কেন বলল, 'এমন গভীর ভালবাসা তোর। এমন গভীরতায় যার শুরু, তা কেন ভেসে উঠবে? ওকে তুই পাবি না, দেখিস।'

সমুদ্র থেকে হাওয়া বহু দূর দেশ অবধি যায়। আমি তার থেকেও দূরে। হু হু করে এত হাওয়া লাগে কেন।

৫

'কোন অফিসে না শুনলেন। ধরুন, ওই—ওই দিকের একটা অফিস! আপনি ত ডালহৌসিতে যান?' বলে তৎক্ষণাৎ অপরে মায়া বলল, 'চলুন, ওই ব্যালকনির নিচে দাঁড়াই।' সম্মতসূচক যা বলার বলে, আমি ওর স্বর যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আসুক না বৃষ্টি। ভেজো না তুমি, বৃষ্টিতে? বৃষ্টি থামার পর জলের ফোঁটা ও তার লম্বা ছায়া পড়ে বিন্দু-বিন্দু তোমার মুখ কেমন হয়, সেও ত দেখার।'

ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে মায়া বলল, 'ও বাবা, এ যে ঝমঝমিয়ে এল। ইস, লেট না হয়ে যায় আবার।'

'বিকেলের আগে থামছে না।' হেসে বললুম।

'ইস! কক্ষনো না।' হেসে বলল।

মুখ শুকনো করে বলল, 'আমাদের বড়বাবু, বুঝলেন...'

'আমাদেরও বড়বাবু...' মুখ শুকনো করে বললুম।

প্রতিমার কঙ্কার মতো ওর কান দুটি কেঁপে উঠল নাকি, যখন আমার হাতের ছায়া ওর মুখটা দুহাতে ধরে, একবার এই কানে, একবার অন্য কানে মুখ রেখে অনেকবার বলল, 'কখনও দেখি নি। হয়ত চন্দনের ফোঁটা-মাখা কনের মুখের মতো হয়।'

'আপনার মা-বাবা আছেন?'

'তোমার হাতটা ধরব?'

'কেউ নেই?'

'না।'

'ভাই?'

একজন যমজ ভাই। হ্যাঁ, একসঙ্গে থাকি। না, সে কিছু করে না। শুয়ে-বসে থাকে। হাই তোলে।

চিক্কণ রাস্তা ধরে মেঘ এগিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা হাওয়ায় ঝাপটায় গোটা রাস্তা জুড়ে দুলে উঠল। রাস্তার মোড়ে আরও মেঘ। স্বপ্নাহতের মতো আমি আবার বললুম, 'হয়ত কনের মুখের মতো হয়। তাই, ভেজো না তুমি বৃষ্টিতে ভিজবে?'

মায়া বলল, 'বৃষ্টি থেমে এল, চলি। আপনার ত ছাতা আছে?'

মাঝে মাঝে ভ্রম হয় ও বড় বেশি কুৎসিত, কিন্তু ওষ্ঠের সামান্য প্রয়াসে পরমুহূর্তেই সে কেমন অপরূপ সুন্দরী হয়ে ওঠে! চোখের পাতা নেই, বৃষ্টিকণায় ঝাপসা চশমার কাচের ওপর ওর চোখের চাওয়া, আসলে কি কাছ থেকে, পাশ থেকে ওকে এমন সুন্দরী দেখায়?

দুপা এগতেই একটা ট্রাম এসে পড়ে, আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। ছুটন্ত ট্রামে লহমায় লহমায় মুখ, বৃষ্টির ছাট এসে পায়ে পড়ছে আমাদের দুজনেরই, কী সামান্য দূরে কাঁপছে ওর ওষ্ঠ, সামান্য দূরে ওর অধর স্থির, চূর্ণ হবার মুহূর্ত পর্যন্ত ফেঁপে উঠে গম্ভীর জলস্তম্ভের মতো আমার শরীর সেই মুহূর্তে ওর ঠোঁটদুটির উপর আছড়ে পড়তে চায়।

ট্রাম চলে গেছে। বৃষ্টি ধীরে ধীরে থামল। একই ছাতার নিচে আমরা দুজনে পাশপাশি

দাঁড়িয়ে। টপ করে একটা ফোঁটা পড়ল ছাতার ওপর। মানুষের ঠোঁট অত শুকনো হয়?

আদর-করা গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'পুরীতে আগে গিয়েছিলেন নাকি?' যেন ফের, 'অত শুকনো কেন তোমার ঠোঁট, জানতে চাইছি।

মায়া উত্তর দেবার জন্যে মুখ তুলতেই, চকিতে আমি : বোধ হয় কাউকে চুমু খাও নি বলে, না?

মায়া : না। পুরীতে ওই একবার।

আমি : এএএ....আচ্ছা জলে চুমু খাও নি, বিকেলে, যখন গা ধোও? .

'হ্যাঁ', ঘাড় হেঁট করে মায়া বলল, 'কোনারকে গিয়েছিলুম।'

## ৬

আমাকে একেবারে অন্যরকম দেখতে ছিল। আমি আপারডিভিশন ক্লার্ক, ভাইয়েরা একসঙ্গে আছি, সংসারে অল্প টাকা দিতে হয় বলে আমার হাতে কিছু টাকা থাকে। আহিরীটোলায় প্রপিতামহের তৈরি আমাদের একটি ছোট দোতলা বাড়ি আছে, যেখানে দাদাদের সংসারে, নামমাত্র খরচায় আমি বেশ দিব্যি ছিলুম। শুধু মাঝে মাঝে ধুতি একটিমাত্র এবং জামা পাঁচ-ছটি হয়ে গেলে, উদ্বৃত্ত জামার সমস্যায় আমি অত্যন্ত অসহায়, বিব্রত ও কখনও-বা বিরক্ত বোধ করতুম।

আমরা জেঠিমাকে 'মা' বলে ডাকি। জেঠিমা দেওয়াল ধরে পাশ দিয়ে চলাফেরা করে, মাঝে মাঝে বলে, 'হ্যাঁরা, বাবা বিজু, তুই আমার কাগজ-পত্রগুলো দেখবি?' মাকে আমি সম্পূর্ণ ভুলতে পারি নি, মাকে আমার একমাস কি দুমাস অন্তর মনে পড়ে।

যে-পেনটায় লিখছি, এটা দিয়ে ভকভক করে কালি বেরয়। ভকভক করে এ ছাড়া যা যা বেরয় সবই ঘৃণা করি, যেমন মানুষের সেন্টিমেন্ট। যা হোক, ক্যাপ খুলে আমি মশারিতে কালি মুছলুম, রোজই মুছি। এ কথা ভাবতে ভাবতেই মুছি যে, মশারিটা আমার বিধবা দিদি পরশুদিন সোডা-সাবান দিয়ে কেচে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পেটে একটা ছেলে থাকলে কি হবে, বউদিকে কিছুদিনের মধ্যেই আবার এটা কাচতে বলতে হবে। এইমাত্র আমি জানালার জালের গায়ে থুতু ফেললুম, গয়েরও ফেলি। কমলালেবুর ছিবড়ে ও শুকনো গয়ের-এ জালের অনেকগুলি গর্ত বুজে গেছে, ফলে আমার সাদা চাদরখানা, রোদ পড়লে, লাল-কালোর একটা শতরঞ্চি হয়ে দাঁড়ায়। বিকেলের কথায় মনে পড়ল, সন্ধের আগে আমার রোজ মাথা ধরে, আমি সারাদিন দুর্বোধ্য চার্মিনার খাই।

বছরখানেক আগে প্রথম বর্ষার দিনে একবার আমি বাড়ি ছিলুম। বিকেলে মেজদার বাচ্চা বুচুকে নিয়ে গেলুম ছাদে, ও ছুটে বৃষ্টির মধ্যে চলে গেল, ছাদে গড়াগড়ি খেতে লাগল—দেখে, আমি ওকে ভালবেসে ফেললুম। একটি শিশুকে ভালবাসতে পারছি, আমি দেখলুম। কিছু পরে ওর গা-হাত মুছিয়ে দিলে, বুচু পকেট থেকে একটা লাল বেলুন বের করে বহুকষ্টে ও দীপ্তমুখে তা ফোলাবার পর, মনে আছে, একটা ছোট্ট পিন দিয়ে আমি সেটা ফুটো করে দিয়েছিলুম।

আমি শেষ পর্যন্ত ভালবাসতে পারতুম না কোনও কিছুই, আবার কারুকে খুন করার ইচ্ছেও আমার কোনওদিন হয় নি। রাগ, ঈর্ষা, অভিমান—এসব কিছুই আমার হত না। পৃথিবী ও মানুষকে আমার মনে হত একটা ছিবড়ে, কালক্রমে নিঙড়ে অভিজ্ঞতা যার থেকেই সবই নিয়ে নিয়েছে।

বন্ধুরা পটাপট প্রেম করলে আমার ঈর্ষা হয়েছে বলে মনে করতুম শুধু এ-কারণে যে, তা করে একটা প্রকারান্তর যৌনতা তারা পায়। প্রেম করার নামে প্রায় সকল বন্ধুর আলজিভে জল-

পড়া এমন যে, যে-কোনও বুদ্ধিমান দালাল একটি আস্ত নপুংসককে মনোমাফিক মেক-আপ দিয়ে তার মানসী করে দিতে পারে। উদ্দেশ্য মহৎ, নারীর প্রেম, তবুও পা-টিপে পা-টিপে সেদিকে এগনো কি উচিত? কিন্তু কে শোনে কার কথা! কোনও স্মৃতি নেই, বিস্মৃতি ত পরের কথা, আমার যুবক-বন্ধুদের লোভ ছাড়া কোনও ঔদাসীন্য নেই দেশে আমার মনস্তাপ ছিল।

কেননা, প্রেম হয়। কেউ করে কি? অন্তত প্রেম করার জন্যে আমি কখনও কোনও মেয়েকে অনুসরণ করি নি।

আমি বরং গণিকালয়ে গেছি। প্রেমহীন দেহ ভোগ করতে গিয়ে আমি বিকল হয়েছি সত্য, তবু আমি চরম পাপ করি নি। আমি কখনও ও কিছুতেই কোনও গণিকার ওষ্ঠ চুম্বন করি নি।

আমি প্রায় সব কিছুকেই মিথ্যে ও ভুল বলে জানতে শিখেছি। সবচেয়ে বেশি ভুল ও সন্দেহজনক মনে করেছি আমার আন্তরিকতাকে। তবুও কোনও ভোর ভাল লাগলে বা পৃথিবীর বিখ্যাত সিনারিগুলির অন্যতম গড়ের পিছনের সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি কাঁধে হাত রেখেছি নিজের, 'সত্যি ত, নাকি বউ পড়ে শিখেছ?' জিজ্ঞেস করেছি, 'বা, এইরকম প্রচলিত বলে ভাল লাগছে?' ভাল-খারাপ মিশিয়ে ভীষণ জটিল ব্যাপার খুলে দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছি, 'একি প্রকৃত, বিস্ময়, না ভান?' দুঃখের ফেরানো মুখরেখা আদরে বারবার আমার দিকে ফিরিয়ে বলেছি, 'দুঃখ, তুমিও কি মিথ্যা!'

প্রেমে পড়ে আমি এই দেখলুম, গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেলে যেমন, প্রেম সে-রকম উচ্ছ্বসিত কিছুই নয়। প্রেম, এমনকি, একটা আবেগহীন ব্যাপার, ক্ষণিকের সুনিদ্রার পর এ যেন আগের মতোই সব ঠিকঠাক দেখা। আমার এক বন্ধুর মা যেমন হাসেন, প্রেম সেইরকম—হোয়াইট লাফ্‌টার, আমি পড়েছিও একটা গ্রন্থে। ভালবাসা, আমি ভালবাসতে গিয়ে দেখছি, শুধু ভালবাসার বাইরেই নয়, সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের বাইরে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে।

৭

'মাসখানেকের ছুটি নিচ্ছি, এখানে কিন্তু আর দেখা হবে না।'

'কমাসের?'

'এক মাসের।'

('অসম্ভব। ন্‌না-না—')

'ঠিকানা মনে থাকবে ত', মায়া বলল, 'গেছেন ওদিকে?'

প্রাণপণে মনে রাখার চেষ্টা করছি কেন? একেও কি মনে রাখা বলে নাকি, এ ত ভুলে-যাবার বিরুদ্ধে সতর্কতা, একাগ্রতা। কারণ দ্রুত-ভুলে-যাওয়া একে ছেঁকে ধরছে কী নিঃশব্দে। কী বললে, ৪।২এ, না-ন্‌না, ৪।২।২, না শশী সুর...লেন? না-না—

('না-না। তুমি কিছুতেই আমার চোখের দিকে চাইবে না, মুখের ওপর চাউনি ফেলে রেখে খালি ফাঁকি দেবে, সে হবে না।')

'কখন যাব বলুন ত?' আমি জানতে চাই।

'সন্ধের পর আসবেন একদিন। বাবার সঙ্গেও দেখা হবে।'

'সামনের সপ্তাহে যাব?'

'ঠিকানা মনে আছে ত!'

আছে কি? পরে মনে করে দেখলে বুঝতে পারব।

বললুম, 'আছে।'

'ও!' আবার সেই আমূল চমকে-ওঠা, 'বাস আসছে। কটা বাজল দেখুন ত?'

পাঞ্জাবির হাতা সরাতেই ওর মুখ আশাময় উজ্জ্বল উঠল কেন? আমার ঘড়ি আছে এই দেখে? ওর অনুমান সত্য এই জেনে? ওর কাছে একটা পেন্সিল আছে, অকারণে জন্ম নিয়ে এই বিশ্বাস আমার মধ্যে বদ্ধমূল হতে দেখি। থাকবে না বা কেন!

'আপনার পেন্সিলটা দিন ত।'

'কী!'

'নেই?'

মাথা নিচু করতে বাধ্য হল। পেন্সিলটা ব্যাগ থেকে বের করে বাড়িয়ে দিল। আ, কলের পেন্সিল! পিছন ঘোরাতেই সিস বেরয়। চার-এর দুই-এর...?

মায়া হেসে ফেলল, 'ওম্মা! ও কীসের ওপর লিখছেন?'

ও হাসছে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কুলকুল করে হাসছে। হাসিটা আমার পক্ষে ভাল কী? আমাকে কি অসহায় দেখাচ্ছে? দাড়ি কাটা থাকলে আরও শীত-শীত লাগত। ও কি আমাকে বাঙাল ভাবছে? ও নিশ্চয় ভাবছে এর আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি।

বললুম, 'আমার কাছে কাগজ নেই।'

'তাই বলে নোটের জলছাপের ওপর?' কেবল হাসি দিয়ে ঠোঁটটুকু ভিজিয়ে রেখে কৌতুকে অস্থির হয়ে উঠে মায়া বলল।

'আপনার কাছে কাগজ আছে কি?'

'না হয় নেই', অনেকটাই পায়রার মতো ডানার আড় ভেঙে ও অবিকল কুহর কেটে সে বলে ওঠে, 'বেশ বাবা, ওতেই লিখুন।'

ছানার জলের মতো নীল কুয়াশায় শ্যামবাজার ডুবে রয়েছে এখনো। বেলগাছিয়ার দিকটা আদৌ দেখা যায় না, দূরে রেল-ব্রিজের ওপর থেকে একটা কালোরঙের পুলিসভ্যান নেমে আসছে নিঃশব্দে। কুয়াশা বাসটাকে কত মন্থর ও ফিকে করে দিয়েছে, দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা। গাড়িটা সোজা আসছিল এইদিকে, আমাদের কাছে পৌঁছে আকস্মাৎ চাপা গর্জন করে ওঠে, কেননা ঢাকা গাড়ির ভিতর থেকে এই সময় কয়েদিদের সমবেত জয়ধ্বনি শোনা যায়,—কারণ, সম্ভবত, আর জি কর হাসপাতালের পিছনে এইমাত্র সূর্য উঠছে। দূরে রশ্মিরেখা দিয়ে সাজানো রেলওয়ে ব্রিজ মূর্তিমান ধাঁধার মতো দাঁড়িয়ে।

'চার-এর...?'

চোখ নাচিয়ে মায়া বলল, 'এর মধ্যেই?'

'মাসখানেকের ছুটি নিচ্ছি।' অন্যমনস্ক গলায় বলল কি? ও বলল, 'এখানে আর দেখা হবে না।' 'কেন' জিজ্ঞাসা করার বদলে আমি বিষাদ খুঁজেছি দেখে, যেন-বা ওর বিস্রস্ততার ফাঁক দিয়ে স্তন দেখা যাচ্ছিল, এমনিভাবে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে মায়া বলল, 'ও কী! নিন, লিখুন চটপট।'

'চলি!' পাগলাটে গলায় বলল।

আবার জয়ধ্বনি! কুয়াশার ভিতর সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে যেতে ওয়্যারলেশ-এর ছিপটি থেকে ঘন ঘন রূপা চকচকিয়ে ওঠে।

ফুটবোর্ডে পা রাখতে ভিড় ওকে গ্রাস করল। মায়া জানালার ধারে এসে বসে। তার ডান গাল চুলে ঢাকা, কানে গাঁথা সোনার যুঁই। খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ শীতে আমার ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে। মায়া হাত ঢুকিয়ে নিচ্ছে সাদা শালের ভিতর।

'না-না, শার্সিটা ত কুয়াশায় ঝাপসা, আমি তোমার খোঁপায়-রাখা হাত দেখছি, এ তুমি

সরিয়ে নেবে কেন?' আমি বলি অথচ আমাকে মুখ খুলতে হয় না। ঠোঁট ব্যবহার করতে হয় না। গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে যাবার বেলা উচ্চারণ করে পিছু ডেকে আমি বললুম, 'তোমাকে একটা কারুকার্য-করা রুমাল কিনে দেব একদিন।'

আমি এসপ্ল্যানেডের একটা ট্রাম ধরলুম। ভুল ট্রামে উঠেছি, এটা গ্রে-স্ট্রিট-চিৎপুর দিয়ে অনেক ঘুরে যাবে, তা যাক। আমার অফিস যেতে দেরি হয়েই গেছে। কদিনই মাঝে মাঝে হচ্ছে, আজও যেতে যেতে বৃষ্টি নামল। গণেশ টকির কাছে পৌঁছে ঢং ঢং ঢং ঢং করে একটা পাগলাঘণ্টির আওয়াজে চমকে উঠেছিলুম। দমকল, মনে হল। এই বৃষ্টির মধ্যে আবার আগুন লাগল কোথায়! ছুটে গিয়ে ট্রাম থামল ঠিক একটা মন্দিরের সামনে। মন্দিরে আরতি হচ্ছে। এমন অশুভ মনে হয়েছিল মন্দিরের সেই আরতি।

কন্ডাক্টর টিকিট চাইল। আমি আমার হাতটা লম্বা করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলুম।

'খুচরা নেহি?'

'খুচরো!'

কন্ডাক্টর নোটটার বদলে বহু খুচরো আমাকে দিল। খুচরোয় আমার দুপকেট ভারি ও ভরতি হয়ে গেল।

আমি কর্পোরেশন গিয়েছিলুম। পরিচিত বন্ধু রেকর্ড দেখাল। রাস্তাটা কী শশী সুর লেন বলেছিল, না বাই-লেন? লেন হলে ৪/২/২এ, না ৪/২এ, নাকি শুধু ৪/২? ৪/২এ আছে লেনে, ৪/২/২ ও ৪/২এ আছে বাই-লেনে। প্রতিটি ভাড়াটে নাম লেখা আছে রেকর্ডে। পদবি জানি। পাঁচজন মিত্র ওই তিনটি বাড়িতে আছে।

লেনে কি বাই-লেনে, ৪/২/২এ নেই কোথাও! না থাক, কিন্তু কী করে অতগুলি বাড়ি হানা দেব, বিশেষত একটি মেয়ের নাম ধরে কতগুলি দরজায় ঘা দিয়ে ডাকব?

কোন অফিসে চাকরি করত, তাও জানি না।

অথচ ওর ঠিকানা ভুলে গেলুম, কেন গেঁথে নিই নি মনে। কী করব, ওর সামনে যতবারই দাঁড়িয়েছি, বেকুবের মতো হতবুদ্ধি, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে আমার। প্রতিবারই ও ভেবেছে, আমি নিশ্চিত বাঙাল এবং এর আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়নি। বিস্মৃতি নাকি সে স্মৃতির-স্মৃতি আমি জানি না যা আমাকে ছেঁকে ধরেছে, ওর সামনে দাঁড়ালেই! এই কারণে যে, কারণও ভেবে দেখেছি, ওর সম্পর্কে আমার একটা গোপনতা রয়েছে। ওর কী, ওর ত কোনও সিক্রেট ছিল না।

আহাম্মক আমি কি অভিশপ্ত নাকি, যে নোটটা কন্ডাক্টরকে দিয়ে দিলুম। কেন আমার কাছে খুচরো ছিল না কেন! আমি ত জাতিস্মর নই যে, ওর ঠিকানা আমার মনে থাকবে।

## ৯

বছর দশেক আগে ছেলেবেলায় সন্ধ্যার ধ্বনি ছিল শাঁখে।

ছেলেবেলার কথায় মনে পড়ল, বছর দশেক আগেও আমার বয়স তখন ষোল, ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ছি, প্রথম দিন কলেজে হাফপ্যান্টুল পরে গিয়েছিলুম এমনি বোকা, আসলে আমার ভুল ধারণা ছিল যে, ছেলেবেলাটা বোধহয় বেশি দূরে ফেলে আসিনি, আজ ধরা পড়ে শুধরে গেল। কিন্তু সে যাই হোক, মনে পড়ে ছেলেবেলায় সরস্বতী পুজোর দিন খুকু যেদিন প্রথম শাড়ি পড়ল হলুদে-ছোপানো, সেই প্রথম দিনেই ওকে বলেছিলুম, 'এই আমায় বিয়ে করবি', ও বললে, 'তোর মায়ের সব গয়নাগুলো দিবি', আমি নাকি বলেছিলুম, 'দাও না মা।' মা আমার গা চাটত, বলত, 'স্কুলে পড়া পারিস নি ত?' বলত, 'আজ তোকে দুটো পয়সা দোব

বিজু, কি কিনবি?' আমি নাকি বলতুম 'বুড়ির চুল।' 'কাউকে বলিস নি যেন তোর বাবা আমাকে মেরেছে, বলবি, ছড়ে গেছি, পুড়ে গেছি, বুঝলি?' মা আমাকে বলেছিল।

বলত, 'তুই এবার ফার্স্ট হবি।'

ছেলেবেলায় সন্ধ্যায় ধ্বনি ছিল শাঁখে। ভূমিকম্প না হলে কেউ কি আর শাঁখ বাজাবে না?

১০

সেই সকালে অফিস যাবার জন্যে বেরিয়ে আজ আর বাস থেকে নামলুম না। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বাসে-বাসেই ঘুরে বেড়ালুম। একবার এ-বাসে উঠি, একবার ও-বাসে। সারা কলকাতার কত রাস্তায় কতবার যে ঘুরলুম।

লাস্ট বাসে একটা ঘটনা ঘটল। বিরক্তি, ক্লান্তি বা শূন্যতা হয়ে বসে আছি এক কোণে, হঠাৎ ফুলের গন্ধ ঘ্রাণে এল। কী ফুল! একবার মনে করার চেষ্টা করে মনে পড়ল না দেখে, আর সে চেষ্টা করলুম না। তারপর একটা কটু গন্ধ পেলুম, তামাকের। তামাকের গন্ধ বাসে উঠতেই, ফুলের গন্ধ বাস থেকে নেমে গেল। কিছুতেই দুটো গন্ধ মিশল না।

কিছুক্ষণ পরে শুধু ফুলের গন্ধ পেলুম। চেনা ফুল। এক ভদ্রমহিলা, বছর তিরিশ, পাতলা গড়ন, কিশোরী মেয়ের মতো ছোট ছোট স্তন, শরীর ধসে যায়নি, বহু বছরের দাম্পত্য সত্ত্বেও, দেখে আমি প্রীত হয়েছিলুম। ভদ্রমহিলা স্বামীকে নিচু গলায় কী বললেন, তারপর আঁচলের গিঁট খুলে ফুলঅলার কাছ থেকে কিনলেন ফুলের মালা।

অশ্লীল, অশ্লীল। সমস্ত ব্যাপারটা কী যে অশ্লীল লাগল আমার! বাসসুদ্দু লোকের সামনে ফুলের মালা কেনা, পাশে প্রচলিত চেহারার স্বামী, ধরা যাক প্রেমিক-স্বামী, (তাহলে ত চূড়ান্ত অসভ্যতা!) এর চেয়ে অশ্লীল আগে কিছু দেখেছি কি? অনায়াসে নির্জনে ও একা ফুলের মালাটা কিনতে পারতেন, বাসে গন্ধ পর্যন্ত লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরও শোভন হত।

এই বিন্‌বিনে ঘাম, পেট্রলের গন্ধ, চোখ, সর্দিকাশি, কন্ডাক্টারের চিৎকার—প্রকাশ্য আলোয় এই ফুলমালা কেনা দেখে, পটপট করে ব্লাউজের বোতাম খোলার মতো তাঁদের শোবার ঘরের মধ্যরাতের জানালাগুলি আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

১১

দেওয়ালে ক্যালেন্ডারে ঈশ্বরের ছবি ঝুলছে। মঙ্গলবারের নিচে রয়েছে পাঁচটা তারিখ—১, ৮, ১৫, ২২, ২৯। কোনও-এক ৮ই মঙ্গলবার ও ৯ই বুধবার একথা ক্যালেন্ডারে রয়েছে। কিন্তু এই যে আজ, আজকের এই দিনটা, আজ মঙ্গলবার না বুধবার ৮ই না ৯ই, এটা বোঝার কী উপায়? মানুষ কি এমন কোনও উপায় আবিষ্কার করেছে, যাতে করে আজ, এই আজকের দিনটা, ৮ই না ৯ই, মঙ্গলবার না বুধবার, একথা নিশ্চিতপক্ষে বলা যায়? যদি ধরেই নেওয়া যায় এটা মার্চ মাস, ১৯৬১ সাল, তাহলে ক্যালেন্ডার থেকে এটা অবশ্য যথেষ্ট স্পষ্ট যে আজ ৯ই হলে, হলে তবে, মঙ্গলবার, ৮ই হলে যেমন বুধবার। এবং উলটোদিক থেকে আজ যদি মঙ্গলবার হয়, হলে ৮ই নিশ্চিত, বুধবার হলে অনস্বীকার্য ৯ই। কিন্তু আসলে আজ মঙ্গলবার না বুধবার, ৮ই না ৯ই?

১২

আমাদের আদিকবিতার প্রথম বাক্য শুরু হয়েছিল 'না' দিয়ে।

জানি না কখন আসবে, ঘুম আসছে না। প্রায় মাসখানেক ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। দিনে সারা শরীরে ঘুম নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ঘুমের দিকে অবিরাম, অবিরাম ভারে নত হয়ে পড়ে শরীরময় সমস্ত জীবন, জীবনের সরল সত্য ও একমাত্র দর্শন মনে হয় ঘুম যা প্রগাঢ়তর ঘুম বিলীন হতে চায়। অফিসে যাই, জেগে কাজও করি, আজকাল হঠাৎ ওজন দেখা শুরু করেছি। অফিসের পর একটা রেস্তোরাঁয় বসে পুনরায় অপরাহ্নকাল এসে যায়, নরনারীর নতমুখ শোভাযাত্রা দেখি কোনওদিন, চোদ্দতলা অট্টালিকার প্রস্তুতিপর্বের দিকে চেয়ে, 'বলছিনু ভুলিব না যবে তব ছলছল আঁখি' সম্পর্কে করমচাঁদ থাপার কী ভাবে; লটারির টিকিটের জন্য লাইনটা, দেখি, বেলাশেষে ছোট হয়ে আসে।

কোনওদিন মোহনবাগান মাঠের পিছনের অন্ধকারে বসে থাকি। একদিন ইডেন-গার্ডেনের কাছে গ্যাসপোস্টের নিচে হড়হড় করে একঝলক লাল উছলে পড়ল, কাছে এসে ঠোঁট লাল, চুড়ি লাল, কারে কুণ্ডল লাল, লাল শাড়ি-পরা একজন ঢ্যাঙা হিজড়ে এসে দাঁড়াল। আমি ভয় পাই নি, কিন্তু সে যখন কঠোর স্বরে বলল, 'কোনও ভয় নেই। তুমি বসে থাকো', তখন আমি আঁতকে উঠেছিলুম, যখন, দূরের রাস্তা উঠল চকচকিয়ে, একজন মাতাল নাবিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ফিটঅন', ও ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে থামল। হিজড়েটা ফোর্টের দিকে একটা উঁচু টিলায়? উঠতে আবার তার উদাসীন আধোজাগা গান শুনতে পেলুম।

জানি না কখন আসবে, ঘুম আসছে না। গত মাসখানেক ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। পরশুদিন ছিলুম পুলকেশের হস্টেলে, তিনটে সোনেরিল ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম এল না দেখে আমার ভয় হয়েছে, এ-রকম ত হয়নি যে আমার আর-সব একে একে ডুবে গিয়ে আজ বেঁচে আছে শুধু চোখদুটো? তবে কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? সত্যি, এত দুর্বল লাগে! কাশলে বুকে লাগে, ভাত খেতে গেলে কষ্ট হয়, মনে হয়, যে-পেশীগুলি গলাধঃকরণের ব্যাপারে সাহায্য করছিল, সেগুলি আর পারছে না। মায়ার জন্যে কিছুই অনুভব করি না আর। প্রকৃতপক্ষে ওর মুখ ভুলে গেছি।

কিন্তু তখন শোনা গেল না যখন ভালবাসতে গেলুম, কেউ বলল না, 'সাবধান!' কেন গেলুম, অপ্রেম আমাকে অনেক দিয়েছিল, বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, অমন চাঁদ দেখিয়েছিল যা থেকে কেবলি অন্ধকার ঝরে পড়ে, আর এক-পা বাড়ালে ছিল সেই আর্তনাদহীন আঁধার, মুহূর্তে আমি চ্যুত হতে পারতুম। হেমন্তের অবিরল পাতার মতো টলতে টলতে নেমে যেতে পারতুম নিচে। কিন্তু যে-মুহূর্তে পা তুলতে গেলুম, হায়, উপত্যকা জুড়ে টালমাটাল, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বাল্মীকির গলা আমাকে ডেকে বলল 'মা নিষাদ!'

১৩

গ্যাসের আলো নিবে-যাবার পর ও সূর্য-ওঠার পর, আজ সকালবেলা দূর থেকে মায়াকে দেখলুম। দুটি বিনুনি করেছে চুলে, চুলের ভিতর দিয়ে চিকচিক করছে সোনার যুঁই, চুলে ওর ডান গাল ঢাকা। বসন্তকালে, এ-রকম ভোরে, লাল বাস-স্টপ ঝোলানো গ্যাস পোস্টের নিচে ও দাঁড়িয়েছিল। বনমহোৎসবের একটা ছোট গাছের কচিপাতা ঢেকে রেখেছে গ্যাসের বাল্বটা, ভোরবেলার প্রিয়তম রোদ্দুরে পাতাগুলো তাকে ঘিরে ঝাড়লণ্ঠনের মতো দুলছিল। সহসা একটা আলোকিত পাতা উলটে গাছটা তার অন্ধকার দিক দেখায়।

রাস্তা জনহীন। ফুটপাতের ওপর জাল ফেলে সারি সারি আরও গাছ নিস্তব্ধভাবে

দাঁড়িয়ে। ফুটপাতে শ্যু-এর শব্দ তুলে দূর থেকে হেঁটে আসছে একজন লোক, তার গায়ে গলাকাটা শার্ট। যেন পদক্ষেপ গুনে গুনে সে এগিয়ে আসছে, ওর কাছে গিয়ে থামল, পাশে দাঁড়াল। ধুলো উড়িয়ে লোকবোঝাই বাস চলে গেল না থেমে। সকালের লালধুলোওড়া সিন্দুরাভ আলো মায়ার পায়ের দিক থেকে উপরে উঠছে ঘূর্ণি দিয়ে, কুশণ্ডিকায় কুনকে থেকে সিঁদুর ঢালার সময় যেমন হয়, ধুলোট সিঁদুরে ওরা গা ভরে যাচ্ছে, দুই গালে লাগল, সমস্ত মুখ রক্তাভ সিঁদুরে ঢেকে গেল; চুলগুলি ওড়াওড়ি করছে তার ওপর। একটা বাস গেল, আর একটা বাস থামল। ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে হ্যান্ডেল ধরার জন্য উত্তোলিত শাঁখা-পরা সাদা হাতটা পলকের জন্য দেখা গেল একবার, তারপর ভিড় এসে ওই নিমজ্জমান ব্যাকুলতা গ্রাস করল।

তারপর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর রেস্তরাঁয় একটা কারুকার্যকরা পাখার নিচে বসে, আমি ফুটপাতের ধারের কার্নিশে নির্জন পায়রার একটা ছবি দেখতে লাগলুম। ওরা সবাই উড়তে গেছে, ও যায়নি কিছুতে। ও ভোরের রাঙা পা-দুখানি বিস্মৃতিতে ডোবাল। কেউ জলে ঢেউ দিচ্ছে না, দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল সারাপুকুর, পুকুর ওর আলতামাখা পা-দুখানি ধুয়ে দিচ্ছে। সারাদুপুর রাস্তা দিয়ে মেঘ গেল। সন্ধ্যা হলে, গা ধুতে এসে জলে ঢেউ দিল কে? রক্তের পুকুরে সর পড়ছে সাদা, একটা সাদা শালুক সুখে ভাসছে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমি দেখে এলুম।

১৪

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছে
শান্তিনিস্তব্ধতা
এখন ভেবো না কোনো কথা
এখন শুনো না কোনো স্বর
নির্জন ঘর
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

১৫

রেণুর কাছে গিয়েছিলুম।

আর একজন লোক আসতে ও বের করে দিল। পূর্ণেন্দুর ওখানে গিয়েছিলুম। রসা রোড থেকে হেঁটে এলুম। সমস্ত পথে গভীর রাতের কয়েকটি লোক উলটোদিকে হেঁটে গেল। পার্ক স্ট্রিট ছাড়াতে অট্টহাস্য করে উঠেছিল কয়েকজন। তারপর থেকে চোখে-জড়িয়ে-যাওয়া রাস্তা। ফুটপাত-বদল। রাস্তা। ফুটপাত-বদল বাড়ি।

পাঁচিল টপকানো।

আজ অমাবস্যা। কালোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে বলে, একটা কাক অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠল, কঃ! কলে জল পড়ছে টপটপ। কার বিশাল চৌবাচ্চা ভরতি হচ্ছে? বা, রাত্রির বুকে বুজকুড়ি উঠছে। বা, দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মতো শব্দ হচ্ছে। রাত দুটো আর দুপুর দুটো কি এক রকম? কোথায় ঘণ্টা বাজছে, মন্দিরে, এত রাতেও! দুপুরবেলা গলি দিয়ে কাঁসি বাজিয়ে বাসনাঅলা যায়, এইরকম আওয়াজ হয়। না, মন্দিরে না, দেখেই ত এলুম, মোড়ে রক্ষেকালী-পুজো হচ্ছে।

রক্ষেকালীটা কী কালো। জিভ লাল টকটকে। তৃষ্ণায় 'কা' করে ডেকে উঠলে, কাকের জিভ যত লাল, তত। মা আলতা পরত, সিঁদুরে মুখ ঢেকে শ্মশানে গিয়েছিল।

ভালবাসা বলে কি কিছু নেই, প্রেম বলে! ঘৃণা, নরহত্যা, পাপবোধ, এগুলি কি মানুষের সঙ্গে অসম্পর্কিত? কারুকে কেন ভালবাসি না, নিজেকেও না, কেন কারুকে হত্যা করার ইচ্ছে আমার নেই।

ও! একটা শেয়াল জল খাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চমকানো ছোরার মতো চকচক শব্দ উঠছে। আর এই অন্ধকার, এই আভা আর অন্ধকার, ঘাতকের বিবেক তৃপ্ত হয়, তার তৃষ্ণা মেটায় যা।

কী কষ্ট দিয়েছি নিজেকে, আজ সারাটা দিন। রেস্তরাঁয় দুচার টুকরো রুটি ছাড়া কিছু খাই নি, জল খাই নি একফোঁটা, ইচ্ছের শরীর ছিঁড়ে দিয়েছি রেণুকে। বাড়ি ফিরে ভেবেছিলুম বিছানায় লুটিয়ে পড়ব, অথচ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি বিছানার পাশে। নিজের ওপর এই সব অত্যাচার করা আমার দরকার। তবু তা পারছি কৈ, আঃ, পারছি কৈ, আঃ, পারছি না। এ ত শরীরের ছালই শুধু ছাড়াচ্ছি। অনেক ভিতরে আরশির মতো চকচকে রক্তে জিভে দিতে পেরেছি কি, পারা আমার অত্যন্ত দরকার। এইরকম আমি আরও দিনকতক চালাব। এও জানি, কষ্টবিনা আমি আজও সারারাত জেগে থাকব।

কিন্তু কখনো করি কখনো তোমাকে বিশ্বাস করি না হে ঈশ্বর, মায়াকে আমার চাই। দুঃখ ও শোক আলাদা, আমি জানি। দুঃখ আমি অনেক পেয়েছি, দেখেছি শোকগ্রস্ত শরীর! কিন্তু এ হচ্ছে ইচ্ছা। রাতের লেপের নিচে আমার উদ্বিগ্ন হাত শরীরময় খুঁজে বেড়ায়, শরীরের কোথাও কোনও ফাটাফুটি নেই, তবু কী নেই আমার শরীরে, কোনটা চলে গেছে, হৃদপিণ্ড? কোন জায়গাটা খালি? অন্ধ হয়ে আমি খুঁজছি সেই জায়গাটা, যেখানে হৃদয় ছিল। তবে কী আমি আর শুনতে পাচ্ছি না, যা যা আমার জন্যে উচ্চারিত হচ্ছে!

অনেক দিন ধরে, অনেক নিচু থেকে ধীরে ধীরে যা জেগে উঠেছে, তা হল এই ইচ্ছা। আমার অস্তিত্বকে উপড়ে তুলে, এ এখন আমাকেই তা অর্পণ করতে পারে। আমার চোয়ালে চোয়াল বসে যাচ্ছে, ঈশ্বর, ও-কে আমার চাই!

আবার! আমার জমাট রক্ত এইমাত্র চমকে উঠল, ঢালু পাড় থেকে নেমে এসে একটা শেয়াল আবার তার ছোরা দিয়ে জলস্পর্শ করছে। ভালবাসা, চরমতম ভালবাসায় আমার চোয়ালে চোয়াল বসে যাচ্ছে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে মাথা, ছুঁচলো হয়ে যাচ্ছে মুখ, সাপের ফণার মতো বাঁকানো নিহত-তীব্রতার এই শরীর কোন অনিবার্য চুম্বনে তৃপ্ত হবে! কার রক্ত স্পর্শ করে চকচক করে চাটবে ভালবাসার এই কাটা জিভ?

আমি আলো জ্বেলেছি। টেবিলের ওপর উপুড় করে আমি শিউরানিতে নরম, শিরার মতো আঙুলের হাড়গুলি দেখছি। চোখ দুটোর পক্ষে আমার আয়ুষ্মান দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভবপর হবে কী?

## ১৬

অন্ধকারে ঝুলন্ত একটা সিঁড়ি, মাঝে মাঝে ধাপহীন, পা-ফেলে পা-ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে, সম্মুখে একটা দরজা পথরোধ করে দাঁড়ায়। পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসা ধুলোট একফালি আলো, হাত দিয়ে ঠেলে দিতে পরদার মতো দুলে উঠল তা, ঘাতকের দীর্ঘ আঙুলগুলির আগে আগে শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তির রক্তকণিকা যেমন ছুটে যায়, লুকিয়ে পড়ে, হাতের ঝাপ্টায় উড়ন্ত ধুলো ব্যাকুলতার সেই নীল চিত্র রচনা করতে লাগল।... ঢালু পাড় দিয়ে নেমে এসে একটা

শেয়াল চোখ ঘুরিয়ে একবার বাঁ-দিক, একবার ডান দিক দেখল। তাতে অন্ধকার থেকে দুবার কাচ চিরে যাবার শব্দ হল।... দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলে গেল। শূন্য ডেকচেয়ারের পাশে মানুষসমান একটা মোমবাতি জ্বলছিল, টানাটানা তারকাহীন চোখ থেকে টসটস করে গরম মোম পড়ছিল তার কোল বেয়ে। দরজা খুলে যেতেই, তীরের দিকে ধাবমান হাঁসের মতো শিখাটা লম্বা হয়ে তার চঞ্চুদুটি উঁচু করে তুলে ধরল। যেন শূন্য ডেকচেয়ারে শায়িত কেউ এখুনি উঠে বসেছে সভয়ে, দুহাতে দুই হাতল আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে দরজার দিকে, তার উৎকণ্ঠিত গলাটা ঝুলে রয়েছে।... এক হাতে ধরা যায় না, দুহাতে মোমবাতিটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলে, তখন, শিখা থেকে ছিটকে লাফিয়ে ওঠে উলের মুহুর্মুহু বল, গা থেকে হাতের উপর টসটস করে পড়ছে ফুটন্ত মোম, দশটা আঙুল মোমবাতির গলায়? চেপে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। খড়খড়ি-নামানো প্রায়ান্ধকার ঘরে এখন চচ্চড় শব্দ করে মোম জ্বলছে। গলাকাটা জানোয়ারের ধড় পুরানো মন্দিরের চাতালে যেমন লাফায়, শিখাটা দপদপ করে তেমনি লাফিয়ে উঠছে। কখনো বা কম্পিত তৃণের মতো ম্রিয়মাণ! শেষাবধি নিস্তেজ হয়ে এল, চোয়ালে চোয়াল-বসা আঙুলগুলো আরও গভীর দাগ ফেলে, আরও বেশি মোম আকর্ষণ করে বসে যাচ্ছে, সাঁ সাঁ শব্দ তুলে দীর্ঘ সময় বহে যেতে দিয়ে মোমবাতিটা শ্বাস টানল কয়েকবার, দেওয়ালে একখণ্ড আয়নায় চকমকিয়ে উঠল অন্ধকার জল, আতের ওপর দুফোঁটা আরও মোম গলে পড়ে—এইসব মিলিত দৃশ্যের সম্মিলিত ও অলীক প্রয়াণের ভিতর থেকে, পোড়া লোমের নারকীয় গন্ধের মধ্যে, শিখাটা মরুভূমির কুকুরের লাল জিহ্বা অন্তিম তৃষ্ণায় উলটে অবশেষে নেতিয়ে পড়ল। কেউ কেউ কালীপুজোর সময় অ্যালুমিনিয়মের তারবাজি পোড়ায়, এখন তেমনি পুড়ে যাচ্ছে। পুড়ে-যাওয়া অংশটা গুটিয়ে পাকিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে—ও কি এক বোবাকালা, যে যন্ত্রণায় ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করছে?... সহসা ঝনঝন শব্দের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তুলে কক্ষান্তরের বিশাল এক দরজা খুলে গেল, সেই আশ্চর্য আলো বিকীর্ণ-করা তারবাজির আলোয় দুহাতে দুই পাল্লা চেপে ধরে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে মায়া চিৎকার করে উঠল, 'বাবা গো!' একবার চিৎকার করে উঠেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাধাদানের ভঙ্গিতে বাহু-মেলে-ধরা সেই অজ্ঞাত প্রতিমা, উন্মোচনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মধ্যে কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরও দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে চিৎকার, ডাকসাজের কোঁকড়ানো কৃষ্ণ পরচুলায় ওর কান ও ডান গাল ঢাকা, চুল মণিবন্ধ অবধি প্রবাহিত, দরজা-চেপে-ধরা ধবল আঙুলগুলি ও মৃগকর্ণের মতো রাতুল তালুর আভাসটুকু দেখা যায়। এখন সিন্দুরাভ রক্ত সিঁথি থেকে গড়িয়ে পড়ে ওর ললাটের রেখাগুলি মুছে দিচ্ছে, নিষ্পিষ্ট ঠোঁটদুটি চিতা থেকে নিক্ষিপ্ত কাঠের মতো জ্বলে লাল ছাই হয়ে আছে, ভিজে সপসপ করছে ভ্রু, রক্তে রক্তে সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেলে গেল। শুধু নিবদ্ধ চক্ষুদুটি অন্ধকারে চিরস্থির হীরকের মতো জ্বলে।

কাছে গিয়ে মোমবাতিটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরার জন্যে আমি চেষ্টা করি। দেখলুম, দুহাতে জড়ানো যায় না। আমার হাতদুটো আহ্বানের ভঙ্গিতে লেপ্টে রইল, আমি সত্যি সত্যি দেখতে পেলুম আমার পিঠে, লেপ্টে রইল আমার সমস্ত শরীর। অতিকায় সেই মোমবাতির পিচ্ছিল গোড়াটা দুহাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে, মোমবাতির গোড়াটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে আমাকে দেখি। পরশুদিন রাতে দিল্লিতে একটা স্বপ্ন দেখে আজ সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। বিকেলে মায়াকে দূর থেকেই দেখা গেল, অফিসভাঙা ভিড় এড়িয়ে স্ট্যান্ডের কাছে একটা কালো টু-বি বাসে বসে রয়েছে জানালার ধারে, মাথা নিচু করে, বোধহয় কোনও মাসিকপত্র পড়ছিল। এর অগে এ-রকম বাসে একা বসে থাকতে আমি কারুকে দেখি নি। শ্যামবাজার মোড় এখন মলিন কিরণে ভরতি, পড়ন্ত আলোয় গৃহ অভিমুখে

মানুষ, গৃহ থেকে নির্গত হয়ে মানুষ, সকলেই হেঁটমুখে ও বিনয়সহকারে হাঁটাহাঁটি করছে। অদূরেএকটা সাবানের বিজ্ঞাপন অসময়ে জ্বলে উঠল, পুরনো বইয়ের দোকানে এসে পড়ল তার আলো, ইলেকট্রিক তারে ঝুলের মতো ধোঁয়া ও লটকানো ঘুড়ি, চুড়ির দোকানে বিচ্ছুরিত শোভার মধ্যে নিঃসঙ্গ মুসলমান, বিকেলের জানালায় দাগকাটা কিশোরী ও ওষুধের দোকানে অসম্ভব ভিড়। মুক্তির অপেক্ষায় একটা ছবির ব্যানারের নিচে রেস্তরাঁর সামনে কয়েকজন যুবক রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে অপেক্ষমান ডাবলডেকার ও দম্পতির নিকট প্রার্থনারত ভিখারি, ট্রাফিক-আইল্যান্ডে ঘূর্ণায়মান পুলিস বা দূরে ব্রিজের ওপর মন্থর ট্রাম—এইসব দৃশ্য। উপরে জীর্ণ বারান্দায় টাঙানো ঢাকাই শাড়ি, চেকলুঙি ও উজ্জ্বল ব্লাউজগুলি মনোরম বাতাসে শুকোয়, সূর্যাস্তের দীর্ঘরশ্মি স্পর্শ করলে সেগুলি খরখর করে ওঠে। এইসব হঠাৎ একসঙ্গে দেখলে মনে হয় এ-পৃথিবীতে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে কিছুই ঘটে না।... নিচে মাটি শুঁকতে শুঁকতে একটা পুলিসভ্যান মাঝে মাঝে যাতায়াত করে।

এখন শরৎকাল। কিন্তু শ্যামবাজারে তার কোনও রূপ, কোনও চিহ্ন নেই। বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর ও অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর মায়া চোখ তুলে চাইল, 'আরে, আপনি!'

হাসপাতাল, বেশ্যাপল্লী ও ভাড়াবাড়িতে, গলির পানের দোকানে ও রাস্তার মোড়ে, চতুর্দিকে এবং এই রেস্তরাঁয় একটা প্রীতিকর সমবেত-গানের রেকর্ড বাজছিল। কেবিনে ঝুলন্ত ঢাকা আলোর নিচে, ব্যস্ত না হয়ে, আমরা অলসভাবে কথাবার্তা শুরু করলুম।

'বাবা, আমার জামাকাপড়ও সব জানেন দেখছি!' মায়া বলল।

'আগে দেখি নি ত, তাই বলছিলুম।' আমি বললুম।

'গেরুয়া রঙের, অথচ মজা দেখুন, সপ্তমীর দিন আমার জন্ম, জন্মদিনে বড়দি এটা কিনে দিয়েছিল বাগবাজার একজিবিশন থেকে! না, সত্যিই এ-শাড়িটা আমি আগে পরি নি।'

'অন্তত আমি দেখি নি।' সাফল্যে হেসে ফেলে বাকিটুকু বললুম শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে, 'এর আগে খালি বাসে একা বসে থাকতে আমি কারুকে দেখি নি।'

'সাত-আট মাস দেখা নেই, কোথায় ছিলেন, কই বললেন না ত?'

'— — — — — —'

'ও!'

'— — — — — — — — — —'

'সত্যি?' মায়া কুলকুল করে হাসতে লাগল, 'তারপর? ওখানে ওরা কী বললে?'

'— — — — —'

'এ হে!'

'— — — — —'

'তাই ত! আমার অফিসটা কোথায় আপনাকে বলি নি, না?'

'— —'

'ইস, কী এ্যামবিশাস্।'

'— — — — — — — — — — — — —'

'তাই নাকি, বেশ বুদ্ধিমান ত আপনি! আচ্ছা, লোকটা কি সত্যিই ভাল?'

'আপনার ভাই নেই? তবে যে বলেছিলেন—কী মিথ্যেবাদী আপনি!' স্ফুরিত ঠোঁটে মায়া বলল। আন্তরিকভাবে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনার মা-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?' 'বেঁচে নেই!' কথাটা এমন দুঃখিতভাবে বলল যে, শুধু অস্ফুটস্বরের 'নেই!' শোনা গেল।

আমার দ্বিতীয়বারের কাপের কিনারায় চিনিভরতি এনামেলের চামচেটা কাঁপতে লাগল,

যেন একটা শিহরন ধরে আছে দু-আঙুলে, যখন ও আগ্রহভরে আমাকে অভিযুক্ত করল, 'মা নেই, বাবাকে দেখেন নি, কে আছে তবে আপনার?'

এই সময় সত্যিই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমরা খুব ধীর ও অলসভাবে দেড়ঘণ্টা সময় বহে যেতে দিয়েছিলুম দ্রুত, ওয়েটার বিল নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেবিনে বসেই আমি টের পেলুম রেস্তরাঁ এখন অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে, যারা আমাদের প্রবেশ করতে দেখছিল তারা আর কেউ নেই, কিছু অন্য লোকজন এখন আমাদের বেরিয়ে যেতে দেখবে।

এই সময় বাইরে ওই ফুটপাথে কী নিয়ে কাদের কোলাহল হল, পরমুহূর্তে একটা ডাবলডেকার রেস্তরাঁর সামনের স্টপে দাঁড়িয়ে মুছে দিল রাস্তাটা, এইসময় সহসা রেকর্ডে এক জায়গায় পিন আটকে গেল।

'এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু'... অকুল হয়ে উঠে কীর্তিনাশা গলা ভাড়াবাড়িতে ও হাসপাতালে ভাঙতে লাগল শতখান হয়ে, 'ক্ষমা করো প্রভু', 'ক্ষমা করো প্রভু', পিন-আটকানো রেকর্ড ভুল সুরে ঘুরে ঘুরে কেবলি বাজতে লাগল বেশ্যাপল্লীতে, 'দীনতা ক্ষমা করো', 'দীনতা ক্ষমা করো', ক্রমে পিন পুঁতে গেলে চাবুকের ঘন ঘন শব্দের মধ্যে রেস্তরাঁর ভিতর অকথ্য বেসুরে শিস দিতে থাকলে সেতার, 'প্রভু', 'প্রভু', 'প্রভু'...

অবর্ণনীয় নরকণ্ঠ থেকে কী আতঙ্ককর সেই রক্তপাত!

আমি হাঁটুমোড়া পা দুটো চেয়ারের তলা থেকে টেনে বের করতে করতে, ঝুলন্ত, ঢাকা আলোর নিচে টেবিলের ওপর হাড়ওঠা দশটা আঙুল উপুড় করে রাখলুম। গুলিয়ে-যাওয়া, প্রায়? অর্থহীনভাবে হেসে উঠে মায়া বলল, 'আচ্ছা, কেন ছুটি নিলুম একমাস, কই কিছু জিজ্ঞাসা—'

আমার সর্বশরীর কাঁপছিল, অবশ্য ও প্রথমে আঙুলগুলিই দেখে থাকবে। আমার চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে আমার কীর্তিহীন শরীর নতজানু হয়ে ওর কোলের উপর শৃঙ্খলিত হাতদুটি রাখল, রেখে বলল, 'এই দশটা আঙুল দ্যাখো। দ্যাখো, আমার দু-হাতের আঙুল একরকম নয়। ভীষণ রুগ্ন ও লোমহীন এই সাদা আঙুলগুলো দ্যাখো।'

'কী হল আপনার? মায়া তখনো বলছিল।

টেবিলের উপর হাতদুটি ফেলে রেখে, ধোঁয়ার মধ্য থেকে ওর সামনে পরিস্ফুট হতে হতে বললুম, 'ঘাতকের এইরকম হয়।' কিন্তু বলার জন্যে এবারেও আমাকে ওষ্ঠ ব্যবহার করতে হল না। ওর ভ্রূ-তে ভ্রূ আটকে আমি ওর দিকে চাইলুম।

ঠোঁট ফাঁক করে আমি অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলুম। স্মৃতি এসে ওষ্ঠ ও অধরে আশ্রয় নিলে ক্রমে রঞ্জিত হয়ে উঠতে লাগল ওর ঠোঁটদুটি, আমার হাঁ-করা মুখ থেকে নির্গত হয়ে এক বোবাকালা ওর অভ্যন্তরস্থ বোবাকে স্পর্শ করল, সহস্রচক্ষু প্রস্থানভূমির অন্ধকার থেকে তুলে এনে, সে পাছে লীন হয়ে যায়, এতদিনের সকল কথাবার্তা, তার প্রতিটি অক্ষর ও তাদের গোপন পরিচয় দেখাতে লাগল। এতদিনের কথাবার্তা নেপথ্য থেকে উঠে এসে কোলাহল করে ঘিরে ধরেছে ওকে, হাত ধরে টানাটানি করছে বারে বারে, যেন-বা মেঘের মতো একঝাঁক ভ্রমর অগ্রসর হচ্ছে তার দিকে...

কাপড় গয়না বাজিয়ে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল মায়া। সম্পূর্ণ পাগলাটে গলায় সংক্ষেপে বলল, 'চলি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এতদিন দেখা হল, এখন আর জিজ্ঞেস করা চলেই না, আপনার নামটা কিন্তু আমি কোনওদিন জানি না।'

আমি হাত তুললুম : দাঁড়াও।

মায়া : যাক, একটা সমস্যা গেল।

আমি : দাঁড়াও!

মায়া : যাই তাহলে?

এইসময় কালো ইস্পাতে ঢাকা একটা পুলিস-ভ্যান রেস্তরাঁর সামনে পৌঁছে দারুণ জোরে ব্রেক কষল। ককিয়ে উঠে রাস্তার ওপর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল গাড়িটা, সমস্ত কেবিন কেঁপে উঠল তারপর। একেবারে তৎক্ষণাৎ ঝনঝন করে রেস্তরাঁর কাচের দরজার বিশাল পাল্লাদুটি খুলে গেল, শ্যু-এর শব্দ তুলে তুলে হেঁটে এসে একজন আগন্তুক অতিরিক্ত আলো ফেলে রেস্তরাঁর ভিতর ঢুকল। হলের মাঝখানে পৌঁছে পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

গান থেমে গেল।

'তোমার ডাকনাম কী?' সেই কাঁপুনি ও ঝনৎকারের মধ্যে আমি এই প্রথম আমার এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম, যে-স্বরে এর আগে আমি কখনো বলি নি।

কিছুকাল পরে মায়া ঘুরে দাঁড়াল টেবিলের কোনাটুকু ধরে, কেবিনের ঢাকা আলোর নিচে টেবিলের উপর পড়ে-থাকা অস্ত্রহীন নিপাতিত ও নগ্ন আমার হাতদুটি নেড়ে দেখল, পরে বাঁ-দিক উলটে অন্ধকার থেকে ডান গাল ফেরাল। অলস মুঠিতে কানের পিছনে কেশরাশ তুলে, ধরে রেখে, ক্ষণকাল ধরে তার ডান গালের গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখাল।

উড়ন্ত পরদার ধার থেকে শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে সে আমার চোখের দিকে তাকায় কতকদূর থেকে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার স্মিতচক্ষুদুটি পৃথিবীতে কিছুই দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে ঘটে না এই জেনে তা সমর্থন করছে।

দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের হাসি স্বচক্ষে দেখে মাতাল যেমন করে হাসে, আমি সেইরকম হাসলুম।

সে বলল : এ আমি জানতাম।

আমি : তুমি বিধবা হয়েছ আমাকে বল নি কেন?

সে : জানি যে তুমিই আমাকে বিধবা করেছ?

*কৃত্তিবাস, গল্পসংখ্যা, ১৯৬০, শ্রাবণ ১৩৬৭*

# সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী

আশালতা

আমি চাইবাসার মেয়ে। আমরা সাত বোন, এক ভাই। আমি বাবার ন'মেয়ে। বড়দিকে কোলে নিয়ে বাবার সঙ্গে মা এসেছিলেন এখানে, সে অনেক বছর আগের কথা। বাবা এসেছিলেন কাঠের ব্যবসা করতে, এখন রুঙটার গুদামে কাজ করছেন। যাকগে সে কথা। সে অনেক বছর আগের কথা।

আমার বড়দি প্রেম করে বিয়ে করেন। সত্যময়দা এদিককারই ছেলে, টাটায় কাজ করতেন, মাসিমার বাড়িতে ওদের আলাপ হয়েছিল। তারপর তাঁর আসা-যাওয়া শুরু হয়। সত্যময়দার মতো রূপবান আমি কখনো দেখি নি, দিদি রূপে মজেছিল। তখন আমি আর দিদির কোলে উঠি না।

ক্রমে আমরা জানতে পারি সত্যময়দা চরিত্রহীন ও চোর, পরে তাঁর জেল হয়েছিল। দিদি টাটায় থাকতে পারত না, কোলেরটা নিয়ে পালিয়ে আসত। রাত্রে বিছানায় পিঠের ছিপটির দাগে দিদি হাত বুলিয়ে দিতে বলত আমায়, বলত, 'বাবাকে বলিস না যেন, বুঝলি।' দিদির প্রথম ছেলেটা পেটেই মারা যায়। দ্বিতীয়বার একটা রক্তমাংসের ডেলা জন্মাল সাত মাসে,

দিদির মাথায় চুল উঠে যেতে লাগল, ক্রমে দিদির মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা গেল। দিদি পাগল হয়ে গেল। টাটা থেকে দিদির চিঠি আসে না আর, ওরা ওখানে নেই, জানি না বেগম কেমন আছে, টুটু কত বড় হল। নারীর মতো রূপবান ও আয়তচক্ষু সত্যময়দাকে বেশ মনে পড়ে।

চুনীদা এখন রাউরকেলায়, আমার মেজ জামাইবাবু। মেজদিকেও প্রেম করতে হয়েছিল, নইলে ডাক্তার-পাত্র জুটবে কী করে। কিন্তু আমি তখন আর একটু বড় হয়েছি, আমি জানি ডাক্তার বলে দিদি চুনীদাকে প্রেমে পড়ায় নি। চুনীদার মতো স্বাস্থ্যবান ছেলে বাঙালি ঘরে কমই দেখা যায়, তার মতো কুৎসিত আমি এখনও দেখি নি। সবচেয়ে যা কল্পনাতীত, চুনীদা জানত সে কী কুৎসিত। এ-বিষয়ে যা জানার চুনীদা সবই জেনেছিল। আমি জানি মেজদি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে নি, মেজদি নিজেই ওই সুঠাম ও কুৎসিত পুরুষের প্রেমে পড়েছিল। মেজদির বিবাহিত জীবন আজও খুব ব্যস্ততায় কাটছে। দুরারোগ্য মেয়েদের অসুখে ভুগে ভুগে মেজদি মারা যাচ্ছে, তবু আট বছরে এই নিয়ে সপ্তমবার তাকে গর্ভবতী হতে হল।

ছেলেবেলাতেই আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি যে, আমাকেও প্রেম করতে হবে। আমি এবার ফ্রক ছাড়ব, আমার পরের বোন পরবে আরও বছর তিনেক। সেও জানে।

আমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম। বড় বেশি ভাল ছিলাম, তবু, ক্লাস সেভেনে উঠে আমায় পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। বাস্তবিক, আমাদের বাইরের ঘরে হার্মোনিয়ম ছিল; ফুলদানিতে ছিল কাগজের ফুল, কেউ এলে পরে বের হবার মতো জামাকাপড় আমাদের সবসময় ছিল। আমরা বরাবর চুলে তেল মাখতে পেয়েছি, আরশির নিচে সামান্য কসমেটিকের অভাব হয়নি কোনওদিন। কিন্তু কী করে যে দুথালা ভাত পেতাম রোজ, তা আজও বুঝি না। সে যাই হোক, এই সময়েই সমীরণদা পাটনা থেকে বদলি হয়ে এল চাইবাসায়। বাবার সঙ্গে আলাপ হয় রাস্তায়। তখন আমি বাড়িতে বসে আছি। বিকেলের দিকে সমীরণদা অফিস ফেরত সোজা আমাদের বাসায় চলে আসা শুরু করলে, সেজদি আমাকে বলল, 'আশা, তুই এবার স্কুল ভরতি হ।' সমীরণদার একটা পা ছিল ছোট, সমীরণদাই শশাঙ্কবাবুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে।

তার আগে আমাদের বৈঠকখানায় সমীরণদার মুখে শশাঙ্কবাবুর গল্প অনেক শুনেছি। গল্প কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে, 'আজ শশাঙ্কর একটা চিঠি পেলাম মাসিমা', 'শশাঙ্ক আসবে বলেছে', 'শশাঙ্কর বাবার স্ট্রোক হয়েছিল মাসিমা, মারা গেলেন।' একবার পুজোর আগে শশাঙ্কবাবু সত্যিই এসে হাজির হলেন। 'শশাঙ্ক এসেছে মাসিমা, বিকেলে নিয়ে আসব।' ভোরবেলা সাইকেলে করে এসে হন্তদন্ত সমীরণদা মাকে বলে গেল। তখন আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি।

বিকেলে আমরা সকলেই তৈরি হলাম। ফুলের ধুলো মোছা হল, কলাপাতা রঙের জর্জেটটা সেদিন সেজদি পরল। সেজদি বাদে আমরা সকলেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, রাস্তার মোড় থেকে ওঁরা বাড়ি অবদি পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল, আমরা দেখলাম ব্যস্ততাহীন মন্থর পায়ে হেঁটে আসছেন সমীরণদার বন্ধু, সমীরণদা আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, তার দিকে মুখ তুলে কথা বলতে বলতে।

হ্যারিকেনের আলোয় এই প্রথম আমরা কলকাতার লোক দেখলাম। একে একে সকলেরই সঙ্গেই তাঁর আলাপ হল। শশাঙ্কবাবু মাকে প্রণাম করলেন পা ছুঁয়ে, বাবাকে হাত তুলে নমস্কার করলেন। ওইটুকু ঘরে এত লোক আঁটে না, বাবা পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেজদি চা করে আনল। হার্মোনিয়মের সঙ্গে সেজদি একটা গান গেয়েছিল সেদিন, 'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছো, কেমনে দিই ফাঁকি...।' 'ফাঁকি' শব্দটার ওপর এমন অদ্ভুতভাবে সুর ফেলে সেজদি যে, বরাবরই আমার হাসি পায়, তখন ওর মুখ দেখলে মনে হয় যেন ফাঁকি দিতে না পেরে বেচারা

বড় মুশকিলে পড়ে গেছে। সেদিন অতিকষ্টে হাসি নি।

আমি নিজে গাইতাম পরের লাইনটা, ভালবাসতাম একা গাইতে। তখন ভয় হত। কে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে, আমার মনে হত, আমি তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। 'আধেক ধরা পড়েছি গো', তার নাগালের বাইরে দূরে, দুষ্টুর মতো ঘুরে ঘুরে আমি কেবলি গাইতাম, 'আধেক আছে বাকি।' তখন আমার চোখের তারা কালো হচ্ছে দিনে দিনে, চোখের পাতা বড় হচ্ছে। রক্তলাগা ছুরির মতো কী পাতলা ছিল তখন আমার নিচের ঠোঁট, হাসলে কী অসম্ভব চওড়া হয়ে যেত, জিভ দিয়ে দু-আঙুলে টিপে ধরেছি কতদিন।

পরদিন সমীরণদারা রাঁচি-চক্রধরপুর রোডের ওপর টেবো বলে একটা জায়গায় বেড়াতে গেলেন। চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার পথে চব্বিশ মাইল পাহাড়ের রেঞ্জ পেরতে হয়। শেষের দিকে পড়ে জায়গাটা। কাছাকাছি পাহাড়ের ওপর একটা ডাকবাঙলোয় ওঁরা দিনকয়েক থাকবেন। রাজখার্সোয়াং দিয়ে শশাঙ্কবাবু ফিরে যাবেন কলকাতা।

তিনদিন আমরা টেবো হিল-এর দিকে চেয়ে রইলাম, মেঘ জেগে উঠতে দেখলাম তার পিছন থেকে, উপত্যকার উপর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম। টেবো যাবার অন্ধকার পথ জুড়ে চাঁদ উঠতে লাগল রোজই। পূর্ণিমার চাঁদ টেবোর পথরোধ করে দাঁড়াল।

দিন চারেক পরে সমীরণদা ফিরে এল। 'শশাঙ্ক থেকে গেল মাসিমা', সমীরণদা মাকে জানাল।

গোটা শীতকালটা শশাঙ্কবাবু থেকে গেলেন। সমীরণদা থাকত নিমডিতে, ওখান থেকে বড়িবাজার দিয়ে আমাদের বাড়ি পৌঁছতে লাগে আধঘণ্টা, সমীরণদার কোয়ার্টারের পিছনেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ ভেঙে নদী পেরিয়ে এলে লাগে দশ মিনিট। মাঠ দিয়ে শশাঙ্কবাবু আগে আসেন নি। আমরাও আসি না। শ্মশানে তখন চিতা জ্বলছিল, হলকায় দপদপিয়ে উঠছিল দেবদারু গাছটা, রোরো-র শব্দ শুনে মনে হয়, যেন তা তলা দিয়ে বইছে, মাটি ভেঙে কাছে এগিয়ে আসছে।

তখনও তেমন শীত পড়ে নি। সরীসৃপহীন নির্জন মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে, আমি শশাঙ্কবাবুর গা ঘেঁষে হাঁটছিলাম, আমার গায়ে ছিল একটা ছাইরঙের কাটফ্রক। যেন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, একটা সিগারেট ধরাবার সময় শশাঙ্কবাবুর হাত আমার খোলা কাঁধে লেগে যায়।

তারপর আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার নগ্ন কাঁধের ওপর নোখসুদ্দু তাঁর নগ্ন হাত চেপে বসে যাচ্ছে, ক্রমশ ঘাড়ের কাছ দিয়ে তালু ঘুরিয়ে এনে তিনি আমার এলোচুলের গোছা এত জোরে চেপে ধরলেন যে আমার চোখে জল এসে গেল। তাঁর ডান হাতে দেশলাই কাঠিটা সম্পূর্ণ জ্বলে গেলে আমি দেখলাম, তাঁর চোয়াল নড়ছে, এই টলে-পড়া অন্ধকারে শুধু তাঁর মুখটুকুই নিষ্কাশিত পাথরের মতো একমাত্র সাদা। চুল তুলে হাত বুলিয়ে তিনি আমার খোলা পিঠ দেখলেন, চুলের গোছা ধরে তাঁর মুখে কাছে টেনে নিয়ে গেলেন আমার মুখ, তাঁর অবিরল চাহনি আমার বুকের ভিতরে গিয়ে পড়তে লাগল। সত্যিই আমার শরীরময় কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, দুই হাতে আমার মুখ তুলে ধরে যখন শশাঙ্কবাবু আমাকে...

তখন শশাঙ্কবাবুর বয়স ৩৮। তখনও আমার বয়স হয় নি।

### শশাঙ্ক

আমি সবকিছুই জেনেছিলুম। কেবল একটি বিষয়ে আমার জানার বাকি ছিল। তারই জন্যে

আমি অপেক্ষা করছিলুম, এমন সময় গোপালের সঙ্গে আমার দেখা হল।

কলেজে আমার প্রথম আলাপ হয় অমূল্যের সঙ্গে। কলেজেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে ওঠে, ইউনিভার্সিটিতে দীপান্বিতা বসুর সঙ্গে প্রেম করতে করতে আমার চোখের সামনে তার ঘাড় গর্দান হয়ে যায়। আগে ছিল দাদা, আমার ফ্রেণ্ড ও বিধবার গদাই, এখন দুটি-তিনটির বাবা, হাজব্যান্ড ও বাংলার অধ্যাপক। এখন ক্লাসে বলে, 'ইউ, জান হে, এরিউডিশন কথাটার বাংলা কী ভুলে গেছি, হেঃ, হেঃ, হেঃ', হাস্য করে।

নির্বোধতম সে আজও আমার বন্ধু, আজ আমার প্রকৃত ও একমাত্র বন্ধু। মনে পড়ে আলাপের প্রথম দিনই ওয়াই এম সি এ রেস্তোরাঁর মোগলাই পরটা খেয়ে কথাপ্রসঙ্গে অমূল্য আমাকে বলেছিল, 'ভেবে দেখেছেন, জীবনের তিনভাগের একভাগ আমরা ঘুমিয়ে কাটাব?' উইট মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে মনঃক্ষুন্ন অমূল্য ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'মানে প্রতিদিনই আট ঘণ্টা করে ঘুমতে হবে ত রোজ?' কথাটা সেদিন বলামাত্রই কেন বুঝতে পারি নি, আজ বুঝি। যদিও অনিদ্রারোগে আমি ভুগছি মাত্র বছর পাঁচেক, তখন ভালই ঘুম হত, তবু বুঝতে পারি নি। মনে হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই আমার মনে জেগে থাকার বোধ জেগে ওঠে, মাত্র ১৮-১৯ বছর বয়সেই আমি পুরো বুঝতে পারি যে, আমি জেগে আছি এবং আমি জেগে থাকতে চাই। নিতান্ত তরুণ বয়সেই আমি সংকল্প করি ও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিই, 'আমার যা কিছু ঘুমিয়ে, সে সবই একে একে জাগিয়ে আমি জেগে থাকব।' আমি ঘুমে বা ঘুমঘোরে কাটাতে চাই নি। এইজন্যেই আমি বিকেল থেকে পর্যায়ক্রমে ও জ্ঞাতসারে অন্ধকার হয়ে যেতে দেখেছি প্রতিদিন। গান শোনা শেষ করে, কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে বা ঠোঁট থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সহসা-অন্ধকার আমি কখনো দেখে নি। অপ্রত্যাশিত ঘটেনি কিছুই।

ঠিকই বলেছিল অমূল্য, বাস্তবিক আজ বিশ্বাস আছে কেবল স্টুপিড ও প্রফেটের, এ ছাড়া কার? অমানুষিক শরীর-কাঁদানোর পর, চিন্তা থেকে চৈতন্যে পৌঁছে কেউ কেউ প্রফেট হয়, কিন্তু স্টুপিড কত আগে থেকে সেই আবদ্ধ লক্ষ্যে বসে আছে। রেস্তোরাঁর কেবিনে ওয়াইল্ড উডবাইনের ধোঁয়ার ভিতর থেকে অমূল্যের মুখের মাংস ভেসে আসে।

২০ থেকে ২৫ এই কবছর আমার কিছু অপেক্ষা ছিল। এ কবছরেই আমি এ-বিষয়ে সচেতন হই যে, আমার জীবনে কোনও ঘটনা ঘটছে না। মানুষের জীবনে আর কিছুই হবার নেই। যা যা হবার সবই হয়ে গিয়েছে বলে আমার জীবনেও আর কোনও ঘটনা ঘটবে না, এই নির্ভুল ধারণা আমার জন্মায়। ইংরেজিতে আজকাল একটা নতুন শব্দ উঠেছে। আমি ছিলুম এ্যামবিভার্ট ধরনের। আমি এখানেও ছিলুম, সেখানেও ছিলুম, এ নয় যে আমি কোনোখানেই থাকি নি। যেমন মেয়েমানুষকে আমি যে ভালবাসতে পারি নি বা ঘৃণা করে দেখি নি তা নয়; কিন্তু তারা হয় কাছে এসেছে, নইলে ঘৃণা করেছে। আমি ছিলুম এ্যামবিভার্ট। আমি ভালবাসাতেও ছিলুম ঘৃণাও করেছি। পারফেকশান সম্পর্কে আমার একটা আলাদা থিওরি ছিল। যে কোনও কাজের চেয়ে তার চিন্তা আমি বেশি বাস্তব বলে ভেবেছিলুম কেননা একটা কাজ সম্পর্কে মণীষা অনেকখানি ভুলহীন, মানুষের কাছে অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। এইজন্যে আমি কেবল ধারণা করে গেছি, তাকে প্রমাণিত করে প্রত্যক্ষ করতে চাইনি। তবু ওই কবছর অপেক্ষা করেছিলুম। অপেক্ষা করা উচিত, এই বোধ আমার তখনো ছিল। যদিও আমি সেই লোকগুলির জাতের যারা যৌবনে কখনো যুবক ছিল না, যৌবন বলে আসলে কিছু নেই বলে যারা যৌবন কী জানে না, তবুও আমি ওই কবছর ভুল প্রমাণিত হবার জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। হয়ত তখনো আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি যে প্রেম কেবল স্টুপিড ও প্রফেটের জন্যে যারা অমর, পৃথিবীর মহিলা কেবল তাদের জন্যেই আলনায় কাপড় কুঁচিয়ে রাখে। কিন্তু সে যাই হোক, পাছে আমার ধারণায় অনবহিত কোনও ত্রুটি থেকে থাকে,

এইজন্যে আমি আগে থেকেই সাবধান হই, ভুল প্রমাণিত হবার জন্যে কয়েকজনকে নিয়ে একস্পেরিমেন্ট করি।

এদের নিয়ে ভেবেছিলুম : বাদল, চামেলি, চৌধুরীবাবু, রীনা, দিব্যকান্তি, মণিময় ও নৃপেন। অমূল্যর কথা আগে বলেছি। সে আমার বন্ধু।

বাদল ছিল যুবকপ্রতিম; তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি তাকে বলি নি, 'বাদল তুমি যখন এমন সুস্থ, সুস্থতার ঋণ কেন তুমি শোধ করছ না?' যখনই আমরা টু-বি বাসে দোতলায় পাশাপাশি বসে গেছি, বিশেষত ক্যানসার হাসপাতালের দিকে আমি তার দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছি, কিন্তু 'একবার হাসপাতালে যাও, দেখে এসো', কখনো বলি নি। চৌধুরীবাবু আমাকে বলেছিলেন, চামেলিকে তুমি পাবে। যে ভাবে মানুষ একটা জিনিস পেতে চায়, তুমি ওকে সেইভাবে চাও। তুমি করে গেছ অনেক কিছুই, কিন্তু কখনো কিছুর জন্যে চেষ্টা করনি। এবার একটা জিনিস পাবার জন্যে চেষ্টা কর। 'মনে রেখো', গম্ভীর ও জমকালো গলায় চৌধুরীবাবু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'একটা জিনিস তুমি চাইছ; মেয়ে নয়। নইলে সব গুলিয়ে যাবে।' রেস্তোরাঁর কেবিনের উড়ন্ত পরদার ধার থেকে চামেলি আমার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়েছিল। 'তুমি ইম্বেসিস ছাড়া কিছু নও'—সে বলেছিল, 'কি এমন প্রেশাস ছিলাম আমি? কেন তুমি জলের দামে আমাকে চাও নি?' উঠে গিয়ে আমি তার গ্রীবা জড়িয়ে ধরি নি।

চামেলি এখন হাসিমারায়। রীনার বিয়ে হয়েছে কাছেই, ভবানীপুরে। সে আমাকে বলেছিল, 'কেন যাব আমি তোমার সঙ্গে! তুমি কবি নও, অথচ তুমি রোজ দাড়ি কামাও না। সুপুরুষ নও, তবু দামি স্যুট পর না। তুমি কোনওদিন মোটরগাড়ি চড়বে না। তুমি কুৎসিত নও যে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারব না। আমি রূপসী; তোমার পাশাপাশি আমি চৌরঙ্গী দিয়ে হেঁটে যাব কী করে?' আমি তাকে বলে যেতে দিয়েছি। 'আমরা যে ভিড়ে হারিয়ে গেছি রীনা', বাধা দিয়ে তাকে আমি বলিনি, 'আমরা যে আরও বেশি মাইনে চাই না, কোনও কিছু করার জন্যে একসঙ্গে জড়ো হওয়াতে আমরা যে আর বিশ্বাস করি না। আমরা রোগা হয়ে যাচ্ছি। রীনা'... দুহাতে তার হাত চেপে ধরে এ-কথা আমি তাকে বলি নি যে, 'সঙ্গম বিনা আমাদের কারুরই আর ঘুম আসে না।' 'কারো মুখোশ কোনওদিন তার মুখের মাংস হয়ে যায় না ভাই', এই কথা বলে দিব্যকান্তির চোখের সামনে আমি কোনওদিন আমার মুখোশ টান মেরে খুলে ফেলে বলি নি, 'এই দ্যাখো প্রমাণ।' তার দু-আঙুলে চেপে-ধরা জাহাজ, গম্বুজ, সাদা সাদা ঘর ও ক্যানারি পাখি আঁকা পেন্সিলটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে মণিময় বলেছিল, 'ছেলেবেলায় আমাদের এইরকম পেন্সিল ছিল, না?' বলে সে হেসেছিল। হাসি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার কিছুই মনে পড়েনি, তবু সে বলছে, বিস্মৃতির পবিত্রতা সে কলঙ্কিত করছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রকাণ্ড টেবিলটা পার হয়ে আমি তার মুখে হাত চাপা দিই নি যখন সে তারপরেও বলেছিল—'কোথায় গেল সেইসব দিন।' 'হায়!' সে আরও বলেছিল। আমি তাকে বারণ করি নি। নৃপেন্দ্রকে আমি বলি নি, 'নইলে বাঁচার কোনও মানে হয় না বলে তোমাকে ত একটা-কিছু ভেবে নিতেই হবে নৃপেন, তাই তুমি মনে করেছিলে তুমি সৎ ও সঠিক, নিজের চরিত্রে কোনও গ্রেটনেস নেই বলে, মহত্ত্বটাকে নিজের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে বলে, মনগড়া প্রোজেকশানকে তুমি তোমার চরিত্র বলে ভাবতে শুরু করলে। সকলে বলল, 'হিপ হিপ', 'হুররা' বলে তুমি সঙ্ঘে যোগ দিলে। অফিস ফেরত নরনারীর নীরব ও নতমুখ শবানুগমন ব্যালকনি বা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তুমি দেখলে না, তোমার বন্ধুরা এল সারিবদ্ধভাবে, কেউ একা এল না। তোমরা আলাদা শোভাযাত্রা বের

করলে। মদ খাওয়া উচিত নয় মনে করেছিলে বলে তুমি চা খেয়ে গেলে, প্রেম করা উচিত মনে করলে বলে প্রেম করলে, বেশ্যাপটিতে যাওয়া উচিত নয়, গেলে না। মহিলাকে কি তুমি ঘৃণা করে দেখেছিলে নৃপেন, গণিকাকে তুমি কখনো চাঁদ দেখাও নি।

তুমি মনে করেছ তুমি এটা বিশ্বাস কর না, ওটা কর। মনে করেছ বলে বিশ্বাস করেছ, তবে ত কোনও কিছুই তুমি প্রকৃত-বিশ্বাস করনি নৃপেন? উনিশ শতক পর্যন্ত মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল; ঈশ্বর যে নেই, একথা এখন নাবালক-সাবালক সকলেই জানে। তবু কেন তুমি ভুল করলে?

'মৃত্যুর পর যেমন স্ট্যাচু তুমি চাও, কেন তুমি সেই রকম মুখ তৈরি করছ?'

এদের নিয়ে ভেবেছিলুম। চামেলি, চৌধুরীবাবু, বাদল, রীনা, মণিময়, দিব্যকান্তি ও নৃপেন—এইসব। সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছিল বাদল ও চামেলি। অমূল্য আমার বন্ধু, তার কথাও বলেছি।

মানুষ হিসেবে এইসব মানুষের কাছে সম্পর্কের বোধ প্রার্থনা করেছিলুম, কারণ শৈশব থেকে সংশোধনের অতীত মৌলিকতাগুলি নিয়ে এরা সকলেই বেড়ে উঠেছিল। ভুল প্রমাণিত হবার জন্যে আমি এদের নিয়ে পরীক্ষা করি, ২০ থেকে ২৫, ওই কবছর বোধ ও বিশ্বাসের জন্যে আমি অপেক্ষা করেছিলুম।

## শশাঙ্ক ও গোপাল

এইসময় গোপালকে আমি প্রথম দেখি। লোকে গোপালকে দেখে চিৎপুরের কবিসভায়; শুনেছি গোপাল সেদিন কবিতা পড়ে নি, বলা যায়, আগাগোড়া চিৎকার করেছিল। কেবল শেষ লাইনটি সে পড়েছিল থেমে থেমে, 'শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে মজ্জা কেশ...' তার কোমল ভ্রূ তুলে, শ্রোতাদের দিকে অবিকল চেয়ে থেকে সে পড়েছিল, গাছের ডালের মতো ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া তার শরীর, বিদ্রূপ ও ঘৃণায় বিকৃত তার মুখ, মুখের জটিল হাসি, এ-সবই আমি কল্পনা করতে পারি। সেই গোপালের শেষ কবিতা, সেই তার শেষ কাব্য পাঠ। তখন তাকে আর পাঁচজন নিষ্পাপ কবিযশপ্রার্থীদের একজন বলে মনে হয়েছিল। তখনও তার আগুন চেনা যায়নি।

বস্তুত, গোপালের সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি তার কবিতা পড়িনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুস্তফি আজকাল হাজার দেড়েক টাকা বেতন পান, কিছুকাল আগে গোপাল সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। এ-কথা সত্যি হতে পারে যে, টেবোর পথের অন্ধকারে আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল যে ডিলিরিয়াম বকেছিল, সেই তার চরম কবিতা, বা শ্রেষ্ঠ দান, কিন্তু এ-সম্পর্কে আমি তাকে কিছুই বলতে পারি নি। অত্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে গোপালের কবিতা আমি কোনওদিন ভালবাসি নি, কবিকেও না।

আমি গোপালকে প্রথম দেখি চীনেপাড়ায়, হরিণবাড়ি লেনের এক মদের দোকানে। তখন ফাল্গুন মাস। দুপুরবেলা। সেদিন ছিল দোল। রঙিন ধুলো উড়ছিল পথে পথে।

একটা লম্বা কাঠের টেবিলের ওপাশে, মদের বোতলের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে অবনত শরীরে বসেছিল বালকপ্রতিম সে, যেন তার পিছনে তার ঘাতক দাঁড়িয়ে আছে! বিদ্যুচ্চমকের মতো সেদিন, অন্তত একবার, আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, গোপালের পিছনে কে দাঁড়িয়েছিল, যে

আমি ঘরে পা দিতেই পিছন থেকে ডানাদুটি নামিয়ে নেয়। কেননা পরমুহূর্তেই বুক থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত গোপালের ঋজুতা এমন প্রকট হয়ে ওঠে যে, দেখে মনে হয়, বুঝি তার শিরচূড়ায় সাপ ফণা তুলে রয়েছে! বাস্তবিক বিষ বড় বেশি ছিল, তার শরীরে জ্বালা ছিল। গোপালের কথা মনে হলে আমার চোখের সামনে মদের বোতলটা তাই দীর্ঘতর হতে থাকে, ডালপালা ছড়ায়, পাতা গজিয়ে ওঠে। সেই ক্রমবর্ধমান অবয়বের গুঁড়ির দিকে জ্বালা জুড়োতেই মাথা নিচু করে সে বারবার এগিয়ে গেছে। গোপাল একটা কবিতাও লিখেছিল, 'বড় দীর্ঘতম বৃক্ষে বসে আছো দেবতা আমার...' সে লিখেছিল।

আমিও একবার জ্বলে উঠতে চেয়েছিলুম। পারফেকসান সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ছিল বলে অস্তিত্বকে জড় করার কাজে আমি লাগি। এ ছাড়া কোনও কাজ আমি কখনো করি নি। জড় করে, যদি জড় করা যায়, আমি সেই বিপুল জড়কে একবার স্পর্শ করতে চেয়েছিলুম। মাত্র একবার আমি জ্বলে উঠতে চেয়েছিলুম।

গোপালের সঙ্গে দেখা হলে আমি পুরো বুঝতে পারি, আমার সবই পণ্ডশ্রম হয়েছে, একদিনে সে আমাকে মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত করে। বৃথাই আমি জেগে আছি এতদিন, জেগে থেকে আমি কিছুই জানতে পারব না; আমি বুঝতে পারি, প্রবহমানতায় তাকে ছুঁতে হবে, ছোঁয়া এক সংঘর্ষ, সকল অস্তিত্বের সেই-ই এক লহমার জেগে-ওঠা, যে জাগা সাপের। মুহূর্তের জন্যে একবার আমি চেয়েছিলুম, সকল স্নায়ুর ওই আমূল জাগরণ, পিঠেএকটা খড় উড়ে এসে পড়লে গোপাল যেমন দাঁড়াতে পারে তীব্র ফণা তুলে, তার দ্বিখণ্ড জিভ দেখাতে পারে। 'কে আমাকে নিপাতিত করতে চাও, কর।' রণক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বীরের মতো এই উদাসীন নিমন্ত্রণ আমি জানাতে চেয়েছিলুম, সে ওই একবার ফণা তুলে সটান উঠে দাঁড়ানো; 'আমার আর-কিছু জানবার নেই, অব্যাহতি ছাড়া আমি কিছুই পেতে চাই না', এই অন্তিম গুণ, এই কথা বলার দীনতা আমি অর্জন করতে চাই। সেও সেই বিষধরের মাটিতে মাথা মিশিয়ে বারবার রোদ থেকে ছায়ার দিকে সরে যাওয়া। তাই আমার শরীরে বিষ-মেশানোর প্রয়োজন হয়। আমার বিষ ছিল না। গোপালের ছিল। বড় জ্বালা ছিল তার শরীরে।

প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে অপমান করে। কাঁধের ওপর আমার প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক পর্যন্ত উঁচু তার উদ্যত ছোবল তুলে ধরে। তার কাটা জিভ বের করে আমাকে দেখায়। রূপময় ডানা দুটিকেও তার পিছন থেকে নেমে যেতে একাধিকবার দেখি নি কি? বারবার সে তাই মাথা মিশিয়ে দিয়েছে টেবিলে, বড় বেশি জ্বালা ছিল তার শরীরে, জ্বালা জুড়োতেই ক্রমবর্ধমান বৃক্ষের মূলে সে কান পেতে শুয়ে থেকেছে।

প্রথম দিনেই সে আমাকে বলেছিল, 'বড় ব্যথা করে।' তলপেটে হাত রেখে বলেছিল, 'এইখানে।' পুরনো দেওয়ালে রাজা পঞ্চম জর্জের ছবি, চীনেপাড়ার সেই গভীর দোকানে, উজ্জ্বল আলোর নিচেও ঘন নীল ধোঁয়ার মাঝখানে সে বসেছিল, তার সামনে বল্গাহীন মদের বোতল; পাপ, পুণ্য, কাম, প্রেম, কলরব, বেদনা ও ব্যাভিচারের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের ধারে টেবিল জুড়ে সে বসেছিল একা শোকাকুল সৌন্দর্য। কালো ও ঠান্ডা টেবিলের উপর, কফিনের উপর যেমন এপিটাফ, তার কাটা হাত পড়েছিল। বা, জোনাকির মতো ঝরঝরে দুসারি দাঁত ও তার রঙিন ঠোঁট দেখেই আমার মনে হয়, এ ভঙ্গুর ও এ ক্ষণিকের। একে দেখা যাবে না বেশিদিন। মনে হয়, প্রতিদিনই সে আমাকে বলেছিল, 'এইখানে বড় ব্যথা করে।' শেষের দিকে তার শরীরময় সমস্ত জীবনে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। মদ খেলেই সে ঘন ঘন থুতু ফেলত। 'দে কল ইট সিরোসিস', গোপাল বলত থুতু ফেলে। 'ইচ ড্রপ হেনসফোর্থ উড মিন ডেথ ফর হিম', সোঙরার ডাকবাঙলোয় তাকে দেখে মিশনের ডাক্তার আমাকে বলেছিল।

তারপর অল্পদিন সে কলকাতায় ছিল। মাত্র একরাত্রি আমি তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকি। আমার বিস্ফারিত চাহনি সর্বত্র তাকে অনুসরণ করেছিল। চোখাচোখি হবার মুহূর্তেই সে আমার চোখ এড়াতে চেয়েছিল, তারপর আমাকে এড়াতে চায়। জল দিয়ে একটা পিঁপড়ের চতুর্দিকে গণ্ডী টেনে দিলে সে যেমন রেখার ধারে ধারে তীরবেগে ঘোরে, থেমে পড়ে, জল শোঁকে ও পালাতে চায়—গোপালও আমার পলকহীন তাকিয়ে-থাকার বাইরে বারবার পালাতে চেষ্টা করেছিল, চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেছিল, গালাগালি দিয়েছিল, অপমান করেছিল। তবু সে আমার দৃষ্টিবিদ্ধতা এড়াতে পারেনি সে আমার জেগে থাকাকে ঘৃণা করত।

নগরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। শুঁড়িখানার বাইরে এসে গোপাল দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে পড়ে গলির সেই পিছল বিকেল, মৃদু শীত, তার মলিন চলাচল মনে পড়ে। মোড় থেকে গম্ভীর পদধ্বনি তুলে হেঁটে আসে দীর্ঘ আফগান, তার কোমরে কালো কিংখাব, মহার্ঘ পোশাক থেকে জরি ঝকমক করে ওঠে। সিলিঙ থেকে ঝুলন্ত চামড়ার সারির নিচে হলুদ ফেজ-পরা মুসলমান তামাক টানে, প্রাসাদের মতো বিষণ্ণ বাড়ির অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসে অরগ্যানের এলোমেলো সুর, নানকিং-এর নিচে সুড়রে মতো একটা গলির মুখে গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে একজন নীল নাবিক দাঁড়িয়ে; তার সম্মুখ দিয়ে পিঠে বাচ্চা বেঁধে অলস চীনারমণী খড়ম পায়ে রাস্তা পার হয়ে যায়।

শূন্য ও শান্ত চোখে গোপাল সেইদিকে তাকিয়েছিল, অন্তত আমার তাই মনে হয়ছিল। তখনও বৃষ্টির ফোঁটা উড়ছিল হাওয়ায়, সাবানের ফেনার মতো কয়েকটি রঙিন গ্যাসের আলোর ভিতর উড়ে যায়। 'স্প্রিঙ রেইন!' বলে শিরছেঁড়া চিৎকার করে ওঠে গোপাল, এমন সহসা, যে, আমার মূল পর্যন্ত হকচকিয়ে যায়। প্রবলতম সংঘর্ষে সে লাফ হয়ে জ্বলে ওঠে। সুড়ঙ্গের মুখে জমা অন্ধকার দুফাঁক হয়ে সরে যায়। 'স্প্রিঙ রে ই ই ই ইন...' গলিটার ভিতর দিয়ে মাথা নিচু করে গোপাল অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই নীল নাবিক আর নেই। গলির মুখে গ্যাসলাইট জ্বলছে। ফরফর করে বৃষ্টির ফোঁটা উড়ছে আগের মতই। সুড়ঙ্গের মুখ এখন বন্ধ আবার অন্ধকার ফেঁপে উঠছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হয় ঈশ্বরপ্রীতি নেই এ নগরের। লুকনো খিড়কির পথে আজ বঁড়শি দিয়ে গেঁথে, তুলে, এই নগর গোপালকে তার অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সে সেই রাত্রে গোপালকে আমি ফের ধরি মতি শীল স্ট্রিটে। মেট্রোর সামনে দিয়ে তার চৌরঙ্গি পার হওয়া মনে পড়ে। গাড়িগুলির দিকে বাঁ-হাত তুলে রেখে রাস্তা পার হচ্ছে গোপাল, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে, পর পর জ্বলে উঠছে তাদের হেডলাইট। কেউ হর্ন বাজায় নি, নীরব হেডলাইটের অজস্র আলোয় উজ্জ্বল মাতাল গোপাল, তার সর্বস্ব ছড়াতে ছড়াতে, টলতে টলতে ষাট ফিট পার হয়ে গেল।

গোপাল অনেকগুলি রমণীর কাছে যেত। তাকে অনুসরণ করে সেদিন আমি নীলার কাছে যাই। তখন মধ্যরাত্রি। নীলার ঘরে আবার আমাদের দুজনের দেখা হয়। আরও মদ আসে, নীলার অনুরোধে আসে এক প্যাকেট উইল্‌স। মদ খেতে খেতে গোপাল অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়। আমি ও নীলা দুজনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিই। নীলা তার জ্ঞানহীন দেহ আঁকড়ে ধরে। সে যখন কোমর জড়িয়ে ধরে, তার ছড়ানো চুলে গোপালের মুখ ঢেকে যায়। গোপালর বুকে সে মাথা রাখে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় গোপালের সমস্ত বুক অচ্ছন্ন করে তার যন্ত্রণা, কাম ও স্বপ্নলোক ভেঙে পড়ছে, গোপালের বুকে মাথা রেখে, নীলা এখন ওর বুকের ভিতরের শব্দপাত, রক্তপাত ও ধ্বনিপাতের শব্দ শুনেছে। মনে হয় তার মূল্যবান হৃদয়ের দিকে হয়ত সে নারীর উদ্ধত হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জীবনে এই প্রথম আমি প্রকৃত-ঈর্ষা বোধ করি, সহ্যের অতীত ঈর্ষায় আমার স্নায়ুসকল পুড়তে থাকে। জিঘাংসা জেগে ওঠে। আমার সকল অস্তিত্ব জড় হয়। 'কে ওকে এমন কষ্ট দিচ্ছে।' গোপালের মুখ থেকে চুল সরিয়ে, আমার চোখের উপর তার সুরমাটানা চোখ মেলে ধরে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি জানেন কে?' আমি তাকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিই। আমার চোয়াল নড়ে ওঠে। জ্ঞানহীন গোপালের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে আমি টেনে আনি। কটি বেষ্টন করলে নেশার ঘোরে সে হেসে ওঠে। প্রয়োজন হবে বলে, প্যাকেট থেকে একটা উইলস আমি সরিয়ে রেখেছিলাম। 'উইলস খাবে নীলা?' আমি হেসে তাকে বলি। আমার দাঁত পেষার শব্দ সে শুনতে পায়। 'একটা উইলস খাবে নীলআ-আ-আ...' চিৎকারে তার যোনিমূল ফাটিয়ে, ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে, আমি জানতে চাই।

নীলার কাছ থেকেই আমি শরীরের ব্যাধি পাই। সে-ই ঈর্ষা জাগায়।

টেবো থেকে আমি গোপালের খবর পাই তিন বছর পরে। তখন বসন্তের শেষ।

টেবো রেঞ্জের ভিতরে একজায়গায় বন কাটা হচ্ছিল। গোপাল ছিল সেইখানে সোঙ্‌রা বলে ওরাঁওদের একটা গ্রামে। চক্রধরপুরে ডি এফ ও উপাধ্যায় আমাকে একটা কাঠ আনার ট্রাক ব্যবস্থা করে দেন। চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার পথে ২৪ মাইল পাহাড় পেরতে হয়, মাইল-ষোল গেলে পড়ে টেবো। টেবোর পর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেরাইকেলা যাবার পথ ধরে আরও ৭-৮ মাইল ভিতরে সোঙ্‌রা। সোঙরার ডাকবাঙলোর বারান্দায়, ইজিচেয়ারে, মুখশ্রী বুকের দিকে লুটিয়ে, গোপাল শুয়েছিল। তখন বিকেলবেলা, চৈত্রমাস, পর্বতশিখর থেকে সরলরেখার মতো দিন পড়ে যাচ্ছিল।

গোপালের কাছে গিয়ে আমি দেখি তার গা আগুন, মদের গন্ধ ভাপের মতো উঠছে তার গা থেকে। গোপালের জটিল হাসি দেখে পরদিন মিশনের ডাক্তার আমাকে বলেছিল, 'হি ইজ অ্যান ইনসাল্ট টু দা ব্রেইন।'

সোঙ্‌রা জায়গাটা অদ্ভুত। বাঙলো পাহাড়ের ওপরে, নিচে খেলাদেলির গ্রাম, নদীর ওপারে মাইলচারেক দূরে। পাথরের পাঁচিল দিয়ে তার একদিকে ঘেরা দেখা যায়। বাঙলোর রেজিস্টারে দেখলাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যা লোক আসে বছরে দু চারবার, নইলে গোপাল ছাড়া দীর্ঘকাল কোনও বাইরের লোক সেখানে আসে নি। চৌকিদার জোসেফ, তার মা, তাদের দুটি গরু ও কয়েকটি কুকুর ছাড়া আমাদের দুচার মাইলের মধ্যে কোনও প্রাণী দেখি নি। গরুগুলিকে পাহাড়ে চরাতে নিয়ে যেত জোসেফের মা, বিকেলে ফিরত। রাত্রে বাঘের ভয় তাড়াবার জন্যে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বালাত ওরাঁওরা, নিচে উপত্যকা জুড়ে জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে মাদলের শব্দ গড়িয়ে আসত কালো কালো বলের মতো, খেলা করবে বলে কুকুরগুলো নদী পর্যন্ত ছুটে যেত। বন-কাটার জন্যে কনট্রাকটরের তৈরি সাময়িক পথ দিয়ে দিনে দুবার ট্রাক চালিয়ে আসত ইসমাইল খাঁ, পাহাড়ের নিচে মাছির মতো একবার দেখা যেত তার ট্রাক, গুঞ্জন তখন থেকেই শোনা যেত। চক্রধরপুর থেকে সে আমাদের জিনিসপত্র এনে দিত। এগার দিন আমরা সোঙ্‌রায় ছিলুম। একদিনও সে মদ স্পর্শ করেনি। জ্বর গায়েই হেঁটে বেড়াত গোপাল। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ, সারাদিন শুধু হাওয়ার সঙ্গে ঝরাপাতার খেলা, সারাদিন পাতা ঝরত টুপটাপ। ঝরাপাতা মাড়িয়ে শালবনের ভিতর গোপালের পদশব্দ মিলিয়ে যেতে শুনেছি কতদিন। বেশিদূর সে যেতে পারত না, ফিরে আসত। পরে গোপালের একটা অপ্রকাশিত কবিতা পড়ি। 'ছুটে কে তুলিলে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে', অতি তরুণ বয়সে সে লিখেছিল।

বদগাঁও সোঙ্‌রা থেকে ১২ মাইল দূরে। সরকারি রাস্তা অবদি ট্রাকে গিয়ে, বাসে চেপে, রবিবার জোসেফকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বদগাঁও-এর হাটে যাই। হাটে দুপুর থেকেই আমরা তিনজনে প্রচণ্ড মদ্যপান শুরু করি। দিনশেষের রাঙামুকুল আলো হাটের মাঝখানে এসে পড়ে।

মদ খেতে খেতে আমি তখন সেই স্তরে এসে পৌঁছেছি, যেখানে রক্তের সব কোলাহল থামে, যখন শরীর ভাঁজে ভাঁজে খুলে যায়; যখন কামনার চেয়ে প্রেম বেশি মনে হয়, প্রেমের চেয়ে বেশি মনে হয় উদাসীনতা।... মাইল দুই দূর থেকে গুঞ্জনধ্বনি ওঠে, ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হতে হতে ইঞ্জিনির শব্দ সমস্ত উপত্যকা জুড়ে জেগে ওঠে, টেবো যাবার শেষ বাস বদগাঁও-এ এসে দাঁড়ায়। চলে যায়।

আমার চোখের সামনে ডুবলো সবকিছুই। অন্ধকার গাঢ়তর করে চলাচলের ছায়াগুলি অন্ধকারে মিশে গেল। প্রকৃতি দ্বিগুণ নিস্তব্ধ হলে দেখি অন্ধকার থেকে জোসেফ তার আকৃতি বের করে আনছে জোসেফ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। সে জানতে চায় আরও মদ খেতে চাই কিনা, তাহলে সে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। গোপাল একটা অন্ধকার গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। জোসেফ যখন তার দিকে এগিয়ে যায়, পথের উপর চাঁদের আলো এসে পড়ে। তখনই তার পিঠের কালোপাথরে ভাস্কর্যের মতো দগদগে ঘা আমি দেখি।

জোসেফ আগে যাচ্ছিল। দুধারে পাহাড়, কখনো একদিকে গভীর খাদ, চড়াই-উৎরাই-য়ে পাহাড়ি রাস্তায় ঘন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আলো পড়ে আছে। দূরে কাছে আমরা জোসেফ-এর পদশব্দ শুনতে পাই।

মাইল পাঁচেক আমাদের হাঁটতে হয়েছিল। প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থায় গোপাল আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছিল। তার গা গরম, তখন জানতাম না সেই তার শেষ ছুঁয়ে-থাকা। মাঝে মাঝে সে ভুল বকছিল বলে মনে হয়েছিল। আজ আমি জানি, শেষ জানা সে তখন উচ্চারণ করে বলছিল, তার চরম দান। যেমন, সে একবার বোধহয় বলেছিল :

এক মর্মরের সাদা বেদী
খুব উঁচু নয়
কিন্তু কী সুন্দর...

আর-একবার বলেছিল :

চোখের জ্বালা যায়
বুকের জ্বালা যায়

তখন ভাল করে শুনি নি, শুনে বুকে লাগে নি। কেননা, কবিতা আমি ভালবাসতে পারি নি কোনওদিন। কবিকেও না।

পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা বাঁ-দিকেএকটা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম।তখন আমাদের পায়ে জুতো নেই, ডালপালা সরিয়ে, কখন ভেঙে, ধুলো পায়ে আমাদের উঠতে হচ্ছিল। পায়ের তলা থেকে খসে যাচ্ছিল গরম পাথর, গায়ে গা লেগে আরও নুড়ি গড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে, হাঁ-করা শূন্যের ভিতর ছিটকে পড়ছিল।

হঠাৎ গোপাল থমলে দাঁড়ায়। পিছনে আমি ও সামনে জোসেফ, আমরাও থেমে পড়ি। জোসেফের কাঁধে ভর দিয়ে গোপাল সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকায়। তখন বুঝি নি, জোসেফের কাঁধে ভর দিয়ে সমস্ত শিকল ছিঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সর্বত্যাগী মাতাল, পাপ তাকে আর স্পর্শ করে নাই। শান্ত ফণা বাঁকিয়ে সাপ যেমন নিকটস্থ প্রাণীকে দেখে নেয়, তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে একলহমা ধরে সে পিছন পানে তাকিয়ে আছে, দেখে যাওয়া

প্রয়োজন বলে একসঙ্গে জীবনের সবটা সে একেবারে দেখে যাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে তার সকল অতীত; কারণ সেই মুহূর্তে সে তার জীবনের, তার অভিজ্ঞতার, চূড়ার উপর দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন বুঝি নি।

কেননা তারপরেই একটা সমতল চত্বর আমরা পাই। সহসাই আমরা দেখলুম চাপা আলো, সেই গোপন বাজার। তার লোক চলাচল।

গাছের গায়ে বাঁধা কেরোসিনের বড় বড় কুপি। ধোঁয়া জ্বলছে গলগল করে। জনতিরিশ নারী ও পুরুষের এই হাট, কারো ঠোঁট, কারো কপাল, হাতের রুপো ও কানের পলা, কারো বর্ণ, চুল আর চোখ, খিলানের মতো কারো-বা গ্রীবা মাঝে মাঝে দপদপ করে ওঠে। ঘন জঙ্গলের বুকের ভিতর সামান্য একটুখানি চত্বর, গোপনতম গোপন, কলঙ্কী মন্দিরের রূপ নিয়ে গোল অন্ধকার জেগে উঠছে, এ যেন তার ক্ষণিক প্রাঙ্গণ। এত অপরিসর যে গায়ে গা ঘষে যায়। রমণীর নিতম্ব গায়ে লাগে, তার আঘাত। স্তন; তার করুণা।

এদিকে জুয়া খেলা হচ্ছে। পুরুষেরা দল বেঁধে খেলছে। পর পর অনেকগুলি ছক পাতা, তার ওপর আঁকা অস্ত্র, জানোয়ার, ঘর ও মুকুট, পদ্মের মতো ফুল। ডিবার মধ্যে হাড়ের পাশা নড়ে উঠছে খরখর করে, ডিবা উলটে একজন পাশা চেপে ধরছে ছকের ওপর; ঘর, অস্ত্র, মুকুট ও পদ্মের মতো ফুলের ওপর। জানোয়ারের পিঠের ওপর থেকে তুলে নিচ্ছে। সময়ের উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়ে জয় ও পরাজয়ের কলরোল ভেসে আসে।

পুরুষেরা মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছে। ওদিকে একসার জালা। জালার পিছনে অন্ধকার রমণীরা দাঁড়িয়ে, কাঠের হাতা ডুবিয়ে মদ দিচ্ছে, রুপো ও তামা বেঁধে রাখছে আঁচলে। এইসব নারী ও পুরুষ, অস্পষ্ট এদের ধর্ম, সঙ্কেতময় চাপা এদের স্বর, এরা ব্যস্ততাহীন চলাফেরা করছে। এদের কারুকেই আগে দেখে নি, অথচ এরা সকলেই আমার চেনা। গাছপালা কি মানুষ সবই স্থির হয়ে আছে, তবু সকলেই থরথর করে কাঁপছে। আমরা মারাত্মক নিরাপদ, গাছের গুঁড়ি আমাদের দ্রুত ঘিরে ফেলছে। কেবল দীর্ঘকায় খাঁড়ার মতো একটা গাছ, একটাই কেবল, হেলে রয়েছে চত্বরের উপর, তার গুঁড়ি মটমট করছে। আমি মাথা সরিয়ে নিলুম। বুঝলুম সবই। এখানে কেউ কোনও ঋণ আনে না।

জালার পিছনে দাঁড়িয়ে একজন স্ত্রীলোক আমাদের ডাকল। যামিনীর অন্ধকারে শরীর উৎকীর্ণ করে ব্যভিচারিণী সে দাঁড়িয়ে আছে নিষিদ্ধ নিমন্ত্রণ তরল পারার মতো জ্যোৎস্নায় তার মুখ পুড়ে যাচ্ছে তার দুই কানে শোলার কাঠিও গলায় পলালমণ্ডিত নীল মালা রূপা তামা লোহা ও গালা এইসব ধাতু ধারণ করে কারুকার্যময় ভগ্নমূর্তির মতো তুলাদণ্ড হাতে সে দাঁড়িয়ে শুধু তার চিরস্থির স্তনচূড়ায় রক্তাভ চোখ ধক্‌ধকিয়ে জ্বলছে।

শাড়ির লাল পাড় পেটের নিচে নামিয়ে নাভি উন্মুক্ত করে সে আমাদের দেখায়...

স্পষ্ট হাতছানি দিয়ে সে গোপালকে ডাকল।

চৈত্র মাস। পাথর গরম। আমি দাঁড়াতে পারছিলুম না। আমার পা পুড়ে যাচ্ছিল।

আমি জুয়া খেলতে বসেছিলুম। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে, পাশ থেকে কেউ আমার হাতে ক্রমাগত পয়সা গুঁজে দিচ্ছিল। সে ফুরিয়ে গেলে দেখি, গোপাল নয়, সে একজন সাদা ওরাঁও, বৃদ্ধের মুখোশ পরে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার জীবন্ত চোখের ঘোলাটে হাসি আমার বুকের ভিতরে গিয়ে পড়ে।

প্রতিটি লোকের গায়ে হাত দিয়ে আমি দেখি সে গোপাল কিনা। মদের জালাগুলির কাছে গিয়ে দেখি সব শূন্য, চপচপে শালপাতায় জায়গাটা ভরতি, আঁচলে গিঁট বেঁধে রমণীরা অনেক আগেই চলে গেছে। জোসেফকে জুয়ার আড্ডা থেকে আমি ছিঁড়ে আনি। শূন্যে তুলে ঝাঁকি

দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'কোথায় গোপাল?'

জোসেফকে অনুসরণ করে আমি জঙ্গলের ভিতর ঢুকি। একটা ঢালের কাছে পৌঁছে জোসেফ আমার হাত চেপে ধরে। হাত তুলে দেখায়।

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যায়। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে একজন স্ত্রীলোক, তার মাথায় টুকরি, খোঁপা সে খুলে দিয়েছে। জঙ্ঘাকুন্তলস্তননিতম্ব ও গ্রীবা দুলিয়ে, বিশাল ময়ূরের মতো রূপময় ডানা তুলে সে নেমে যাচ্ছে আগে আগে, ফাঁক করে পা ফেলে দুলতে দুলতে গোপাল নেমে যাচ্ছে তার পিছু পিছু, তার সাপের মতো ফণা উঁচু করে রেখে। আরও নিচে খাদের ভিতর রোরো নদীর কালো জল চকচকে স্থির হয়ে আছে। চাঁদ গড়িয়ে? পড়েছেসেখানে। যেন পাতাল থেকে চাঁদ তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিচ্ছে।

গোপালকে আমি পিছু ডাকি নি। সেই তার শেষ চলে-যাওয়া, আর কখনো তাকে দেখিনি। এখন আমার বয়স ৩৮, তখন চৈত্রমাস, সে দশ বছর আগের কথা।

আশালতা

কবিতা তুমি কোনওদিন ভালবাস নি শশাঙ্ক, কবিকেও না। গোলাপের কাঁটা ফুটে কোনও-এক কবি মারা গিয়েছিল বলে, জানি, কালো, গোলাপই তোমার প্রাণাধিক প্রিয়।

তাই আমার গায়ে হাত পড়তে অমন চমকে উঠলে সেদিন, চুল তুলে নগ্ন করে দেখলে পিঠ, দেখলে কাঁটা, দুই হাতে আমার মুখ তুলে ধরে বললে, 'কই সে গোলাপ?'

তখনও বয়স হয়নি। 'বেলা যখন আঁধার হবে, রক্তিম ফিন্‌কির মুখে নিয়ে আসব সেই গোলাপ', বলেছিলাম, 'তুমিই লবে।'

তুমি অপেক্ষা করলে না, হায়, তুমি ছিঁড়ে নিলে।

১৯৬৩

## নলিনী শাটার নামিয়ে দেয়

আজ অতি অবেলায় ঘুম থেকে উঠে নলিনী রাসবিহারী এ্যাভিনু-র একের-পর-এক শাটারগুলি নামিয়ে দেয়; নলিনী ঘুম থেকে উঠেছে প্রমত্ত শক্তি নিয়ে, হাসি ঢোকে ঘরে, চান করে এসেছে—আজ তাহলে অফিস যায় নি হাসি? সে ম্যারেড ব্যাচেলর, প্রায় দু-সপ্তাহ পরে আজ আবার বিবাহ করবে—জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দেয় হাসিকে, প্রবল আপত্তি থেকে হাসি, অত্যল্প সময়, মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই হয়ে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত, ধস্তাধস্তি থেকে নেতিয়ে পড়ে। নলিনী শায়া তুলে ফেলে হাসির।

হাসিকে বিছানায় রেখে সে উঠে পড়ে, হাসি ততক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে আশা করে। ব্যগ্র হাতে আলমারি খোলে ও কোনায় হাতড়াতে থাকে। ব্রাশ, পেস্ট-এড, ডেটল, কালি, গঁদ, ভেসলিন, টুথপিক, এসেন্সের শূন্য শিশি ইত্যাদি সব পায়, তবু জেলিটা পায় না।... অবশেষে ওখানেই পায়। 'এতক্ষণ পাই নি কেন', এ-প্রশ্ন করে না; ভয় করে। ইতিমধ্যে হাসি উঠে পড়ে ও সম্মতিসূচকভাবে বলে,

**"বাথরুম থেকে আসছি।"**

নিশি এসে পড়ে। বিশাল, কুৎসিত, মোটা ও বলশালী নিশি তাদের ঘরজোড়া চারটে চৌকির ওপর পাতা বিছানার একাংশ জুড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। নলিনী তাকে (নিশিকে) সাবান মাখিয়ে দেবে কিনা জানতে চায়। নিশি সম্মতি দেয়। বিশেষত তার পায়ে ও পিঠে সাবান মাখিয়ে দেয় নলিনী। তার আরাম হচ্ছে দেখে নলিনী কৃতার্থ বোধ করে। একই সঙ্গে তার হাত ঘৃণা করতে থাকে নিশির এবড়োখেবড়ো পিঠ। নিশি তাকে (নলিনীকে) সাবান মাখিয়ে দেবার কথা বলে না। নলিনী চেয়েছিল নিশি এ-রকম প্রস্তাব করুক। তাহলে একটা equity হয়। যে জন্যে নলিনী সাবান-মাখানো কতকটা অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়। শুধু একটা পা ও পিঠে মাখানো হল।

তাদের দুজনের কোমর তোয়ালে-জড়ানো ছিল; বাকিটা নগ্ন। নিশি তাকে বাঁ-হাত দিয়ে কাছে টেনে নেয়। তার শরীরের ফেনায় নলিনী পিছলে যেতে থাকে। নিশি তার (নলিনীর) তোয়ালেটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে দেখে বিব্রতভাবে নলিনী বলে,

**"কেন ভাই বেশ ত হচ্ছিল?"**

কিন্তু তাকে হতচকিত করে দিয়ে নিশি তার অঙ্গ খপ করে চেপে ধরে ও হাত দিয়ে দেখে। এই প্রথম নিশি এ-রকম করল, কত বেপরোয়া হয়ে গেছে নিশিটা, কীরকম risk নিচ্ছে, আগে নলিনীর delicacy-কে সে প্রত্যহ সমীহ করত। হাত দিত না নলিনীর গায়ে...

যাহোক ভাগ্যিস খানিকটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল নলিনী, নিশি যদি ভাবে এটা তার অনুত্তেজিত অবস্থা, তাহলে তার উত্তেজনা কোনও proportion-এই খারাপ বলা চলে না বা ছোট। নিশি হাত সরিয়ে নেয়। দেখাটাই তার উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়, size-up করে রাখা। সে নিশ্চিত হতে চাইছিল বহুকাল থেকেই, আজ মরীয়া ও বেপরোয়া হয়ে তোয়ালের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল হাত, সত্যি একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে কী সামান্য না ব্যাপার—অথচ, অন্যদিকে, এটাই নিশি বছরের পর বছর ধরে নানাভাবে attempt করেও পারে নি। নলিনীর delicacy-ই তাকে বাধা দিয়ে এসেছিল এতকাল। আজ, অবশেষে, পারল। এতে নলিনীও নিশ্চিন্ত বোধ করে। যাক বাবা, এতদিনে সহজ হল সম্পর্ক, চিরস্থায়ী হল। তার কাছে এলে বা দূরে থেকে আর ছটফট করবে না নিশি।

হাসি হেসে মেজদিকে দেখায়। মুখভঙ্গি করে বলে,

**"একী করছ তোমরা? মেজদি এসেছে যে"**

বলে চৌকির পাশে ইঙ্গিত করে। বিশাল নিশি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। সে কিছুই জানে না। আর-কিছু জানার আগ্রহও তার নেই। প্রকাণ্ড বিছানার একপ্রান্ত থেকে নলিনী টেনে টেনে আসে শব্দ না করে ও তক্তাপোশের কিনারায় পৌঁছে কেবল গলাটুকু বাড়িয়ে দেখে যে নিচেই একরাশ এঁটোকাঁটার মধ্যে, মাছের কাঁটা ও মাংসের ছিবড়ে ও হাড়ের মধ্যে চোখ উলটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে তার বিবাহহারা বন্ধ্যা দিদি। নিশি ফের তাকে টানাটানি করে। সে কিছুই জানে না, হাসির নিষেধ, মেজদি,—কিছুই জানে না সে বা আর-কিছু জানার আগ্রহ তার নেই। নলিনী বাধা দিতে চায়, ভাবে বলে ওঠে, 'মেজদি', কিন্তু পারে না। কারণ নিশি আজও তার মেজদিকে দেখে নি, সে চায় না নিশিকে দেখাতে। তবুও এঁটোকাঁটার মধ্যে মেজদির

ক্ষমাহীন গম্ভীর ও অচপল মুখ তার বিবেককে পীড়িত করে, মেজদির স্থির চাউনি তার বুকের ভিতর গিয়ে পড়ে থাকে। নলিনীর দ্বিধা দেখে নিশি অধিকতর আগ্রহে তাকে কাছে টানে।

**"বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।"**

নিশি উঠে পড়ে। নলিনীর সন্দেহ হয়। সেও ওঠে। লুকিয়ে দেখে দরজা ফাঁক করে। বাথরুমে ঢুকে বাথরুম থেকে নিশি সোজা ঢোকে রান্নাঘরে। হয়ত বা ভাবছে নলিনী তা নয়, নিশি নিশ্চিয়ই একটা কিছু কথা বলার জন্যে ঢুকেছে, যেমন 'কেমন আছেন' বা 'এতক্ষণ এসেছি, একবার এলেনই না ঘরে', নলিনী কৌতূহল চাপতে পারে না, এগিয়ে যায়। রান্নাঘরে ময়লা বাল্‌বের ঠিক নিচে, ঘরের মাঝখানে হাসি ও নিশি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিশি পা ফাঁক করে ঈষৎ ঝুঁকে, কিন্তু হাসির জড়সড় ভাব নলিনীর মোটে ভাল লাগে না, যেন সে এতক্ষণ রান্নাঘরে বাঘের ভয়ে লুকিয়েছিল, সে আরও সাবলীলভাবে কেন দাঁড়িয়ে নেই?

হাসি নলিনীকে ঢুকতে দেখে! নিশি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, দেখতে পায় না। হাসি নিশিকে নলিনী-ব্যাপারে কোনও ইশারা করে না। হাসিকে দেখে মনে হয়, সে চায় নলিনী সাক্ষী থাকুক সমস্ত ব্যাপারটার—যদি নিশি কিছু বেয়াদপি করে নলিনী তা স্বচক্ষে দেখুক ও তাকে তার পৌরুষ দিয়ে উচিত শিক্ষা দিক। এজন্যেই নিশিকে সে সাবধান করে দেয় না মনে হয়। নিশিও জানে না, তার কিছু জানার আগ্রহ আর আছে বলে মনে হয় না।

স্টেজের উইংসের পিছনে একখণ্ড দেওয়ালের অন্ধকারে লাফ দিয়ে নলিনী চলে যায়—নিঃশব্দ লাফ দেয় সে। সে মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখে। তার মণিবন্ধে ঘড়ি সময়ের কাঁটা ঘোরাতে থাকে অসম্ভব ধীরে, তবুও সময় যেতে থাকে। তারপর সহসা কোনও একসময় সে feel করে চিৎকার করে ওঠার—সে,

**"হ্রার্‌রারারারারারারা..."**

বলে চিৎকার করে উঁচু থেকে গুপ্তঘাতকের মতো লাফ দিয়ে নামে নিশি ও হাসির ঠিক মাঝখানে—প্রথমেই সে হাসির মুখের দিকে চেয়ে দেখে। এখন তার (নলিনীর) মাথার ওপর বাল্‌ব জ্বলছে, এখন তার গায়ে আলখাল্লা, পর্যবেক্ষক প্রিস্টের মতো সে হাসির দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে; হাসিকে তার দিকে চেয়ে ঠোঁট চকাতে দেখা যায়। এর মানে কী? নলিনী ভাবে। তবে কি নিশি তোকে, হাসিকে, হাসি তবে কি নিশিকে, নিশিকে হাসি কি, তবে কি, নিশি কি, হাসি কি, হাসি কি নিশি, হাসিনিশি তবে কি চুমু খেয়েছিল? হাসির মুখে সে কোনও উত্তর পায় না। experession-হীন মুখ, কিন্তু ঠোঁটদুটো এখনো চকাচ্ছে হাসির, সে আবারও নিশির মুখের দিকে চায়। কিন্তু নিশির মুণ্ডু আলোর ওপরে—শেডের জন্যে তার মুখ আদপেই দেখা যায় না—তাকে এক স্কন্ধকাটা মনে হয়। নলিনী ভাবে, আ-আলিঙ্গন করেছিল কি নিশি? সে হাসির শরীরের দিকে চায়, জামাকাপড় যথাযথ, সেখানেও কোনও উত্তর নেই। দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তার বিচারের অপেক্ষায়। চুমু খেয়েছিল নিশি? জোর করে খেয়েছিল? নলিনীর সবচেয়ে বেশি জানতে ইচ্ছে হয় হাসির সম্মতি ছিল, না ছিল না? এটাই জানতে ইচ্ছে হয় সবচেয়ে বেশি। হাসির সম্মতি ছিল? না। না। না। নাঃ। ওরা চুমুই খায় নি। ওরা চুমুই খায় নি। না খাবার কী আছে? নিশ্চিত খায় নি। নিশ্চিত খেয়েছে? নিশি পারে খেতে। নাআঃ, নিশি পারে কি? অতটা সাহস নিশির হবে না? নিশি কি বেপরোয়া বা মরীয়া? নিশি কি জোর করে চুমু খেল না সম্মতি ছিল হাসির? হাসির সম্মতি ছিল? yes or no? হাসির

সম্মতি ছিল না। হ্যাঁ ছিল। না ছিল না। হ্যাঁ ছিল না। না ছিল না।

**"NO!"**

রান্নাঘরে ঢোকার সময় সে ত দেখেছিল হাসির মুখ, মুখ ভরতি নানাপ্রকার ইশারায় হাসি তাকে বলেছিল, 'দেখে রাখো। ও যদি কিছু করে তুমি নিজে দেখ। তারপর যা শাস্তি দেবার ওকে দিও।' কিন্তু তবে তার ঠোঁট চকাচ্ছিল কেন? সদ্যচুম্বিতার মতো কেন বিবর্ণ লাগছিল হাসির ঠোঁট। সে হয়ত এমনিই, তার ঠোঁট কাঁপছিল বা ভয়ে। একটা কিছু চেষ্টা নিশি করেছিল নিশ্চিত। কিন্তু পারে নি। হাঃ পারে নি। নিশি পারে নি। নিশি পারে নি।

এরপরে নলিনীকে একটা বেঁটে বামন তাড়াতে দেখা যায়। নলিনীই দেখে নলিনীকে তাড়াতে। প্রথমে সে দেখে যে নলিনী ও বামন সিঁড়ির যে-কোনও বাঁকে চিরাচরিত ধারায় দাঁড়িয়ে—বামন মাথা উঁচু করে, নলিনীর মাথা নিচু— তারা পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখছে। সে কে, নলিনী টের পেয়েছে বৈকি, তাকে বলে দিতে হয় না। তার বুক একদম ঠান্ডা ও মাথা ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে যায়। তার নাক-কান ও চোখ-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখা যায়। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী দেখে। সে বুঝতে পারে যে বামনের ওরকম সামনে সম্পূর্ণ পরাস্ত সে (নলিনী) যা বলতে চায় তা হল ভয়ার্ত, 'একী! তুমি!' কিন্তু তার মুখে ভাষা জোগাচ্ছে না, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল নলিনীর, হায় সে ভাষা ভুলে গেছে বোঝা যায়। বামন এবার তার ডান-পা তোলে। নলিনী জানে এর মানে কী। এর মানে, 'কোথায় রাখব?' দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নলিনী সব বুঝতে পারে। বামনের সামনে সে এখন চাইছে বেঁকে নিচু হয়ে যেতে, মাথা পেতে দিতে চাইছে, অথচ তার শরীর সটান চিমনির মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নত হতে পারছে না।

নলিনীর মাথা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার সামনে বামন। বামন এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে। তার মাথা উঁচু। যেন সে বলতে চায়, 'আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?' নলিনীও চায় মাথা পেতে দিতে। কিন্তু, ওহ্ হো, এ কী অদ্ভুত, তবু তার চোখে পলক পড়ে না। তবু তার হাঁটু ভাঙে না। তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী দেখে। এ জিনিস দেখা যায় না। শাস্তির পরিমাণ দেখে বোঝে পাপ কত বেশি হয়েছিল। সহ্যের অতীত অবর্ণনীয় পীড়নের মধ্যে দিতে তার শরীর বেঁকে যেতে থাকে, তবু বামনের-সামনে-নলিনীর যায় না।

এ-ভাবে সময় যায়। তারপর, সহসা, এক-সময় যে-কোনও সময়,

**"গেট আউট!"**

অবিশ্বাস্য নিচু স্বরে বামনের সামনে দাঁড়িয়ে নলিনী বলে। যত নিচু গলায় বলে, বলেই তৎক্ষণাৎ পরে তত জোরে সে চিৎকার করে ওঠে,

**"আই সে গেট্ আউট!"**

এই নীরব বিস্ফোরণ নলিনীর চোখের সামনে ফেটে টুকরো হয়ে যায় নলিনীর শরীর, তার শরীর থেকে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে অসংখ্য স্প্লিন্টার চারদিকে ঠিকরে পড়ে। ধোঁয়ার ধোঁয়াকার হয়ে যায়। আরও দু-এক বার সে ফাটে, আরও নীরবে ধোঁয়ার ভিতর থেকে আরও দু-একবার শোনা যায় অটুট ও ভাষাময় ওই নীরব বিস্ফোরণ।

ধোঁয়া কেটে গেলে নলিনী দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। 'গেটাউট, গেটাউট' বলতে বলতে এবার একটা ছড়ি হাতে বামনকে তাড়া করেছে নলিনী, সে দেখে। বামন তাড়া খেয়ে সিঁড়ির একটা করে বাঁক নামছে, তারপরেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। সে বাড়িতে থাকতে চায়। একঘেঁয়ে টানা গলায়, গেটাউটগেটাউটগেটাউটগেটাউটগেটাউট বলতে বলতে তরতর করে, ছুড়ি ঘুরিয়ে, ওই পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে নলিনী, বামনও ছুটে নেমে যাচ্ছে ও সিঁড়ির অপর বাঁকে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ছে। সে বাড়িতেই থাকতে চায়। একটানা 'গেটাউট' বলতে বলতে নলিনী আবারও তেড়ে যায়।

যাইহোক, এ-ভাবে বেশ কয়েকতলা তাড়াতে তাড়াতে নেমে, অবশেষে তাকে 'গেটাউট' বলে এমন তাড়া দেয় নলিনী যে বামনও এবার 'গেটাউট' বলে প্রতিধ্বনি করে ওঠে, ও একঘেঁয়ে টানা সুরে প্রায় বিড়বিড় করে 'গেটাউট—গেটাউট—গেটাউট—গেটাউট—গেটাউট' বলতে বলতে এবার সত্যিকারের (convincing) গতিবেগ নিয়ে ধাপে ধাপে নেমে যেতে থাকে, বস্তুত তাকে পরের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা ত যায়ই না, বরং বেশ আরও কয়েকতলা নিচের বাঁকে তাকে আরও দ্রুতগতিতে বাঁক নিতে দেখা যায় ও তখনো তার আবছা 'গেটাউট' শোনা যায়।

নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে নলিনী এবার ওপরে উঠতে থাকে। তার রাসবিহারী এ্যাভিনু-র ফ্ল্যাটের সুদূর দরজায় পৌঁছে সে দেখে সিঁড়ি আরো ওপরে উঠে গেছে। উঠে ভেঙে গেছে। নিচে তাকিয়ে দেখে বামনটাও পৌঁছে গেছে গেটে, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে 'গেটাউট গেটাউট' বলে চ্যাঁচাচ্ছে ও গায়ের জোরে ঠেলে দারোয়ান গেট খুলে তাকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে। ও চিরকালের জন্যে, ও প্রতিবেশী ও অপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে, ও পরিচিত অপরিচিত বন্ধুবান্ধব—সকলের জন্যে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঝনঝন শব্দের সেই বিশাল গেট। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী বন্ধ হয়ে যেতে দেখে।

১৯৬৭

## আত্মক্রীড়া

সুচিন্তিত, ঠান্ডা মাথায় লেখা, চেষ্টাহীন রচনা

কুণালের বাড়িতে পিয়ানো; কুণাল পিয়ানোর ডালা তুলে কিছু টাকা বের করছে—কুণাল একটা জেব্রা কিনবে বিক্রম কিনে দেবে—টুপি বগলে চেপে বিক্রম শান্ত দাঁড়িয়ে—দেখছে; কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছি না—ঈষৎ খোলা ডালার ফাঁক দিয়ে আমি লম্বা করে হাত ঢুকিয়ে দিই—পিয়ানোর একটা রিড আঙুলে লাগে—আঙুলের ডগা দিয়ে সেটা টিপলে কোনও সুর বাজল না এটা আমার মনেই পড়ে না কারণ আশ্চর্যজনক আবিষ্কার তখন আমি এই করেছি যে পিয়ানোর রিডটা নরম—সেটা শক্ত নয়—নরম এ-কারণে যে সেটা টিপলে অনেকটা বসে যায়—মনে হল এই সত্য আবিষ্কার—এর softness—(তার কারণও জানতে পেরেছি)—এ যদি ভুলে যাই চিরকালের জন্যে ভুলে যাব ও তা বিপজ্জনক—ভুলে যাব বলে এইজন্যে এটা লিখে রাখা অবশ্য প্রয়োজন; তারপরই মনে হল কাগজকলম যখন ত্রিসীমানায় নেই বিক্রমের কাছে নেই মানবেন্দ্রর কাছে নেই চৌধুরিবাবু বা কুণালের কাছে নেই—হয়ত বেচু কিছু দিতে পারে কিন্তু সে ৪০ মাইল দূরে থাকে বলে তার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারব না কোনওদিন বা এখনই আর দেরি হলে ভুলে যাব—ভুলে গেলে জঘন্য অন্যায় হবে ও অভাবনীয় ক্ষতি হবে যে-জন্যে মনে হল বিক্রম ও কুণালকে চেঁচিয়ে

বলি—আমি ছাড়া আরও দুজন জেনে রাখুক; রিডের softness তখনো আমার আঙুলের ডগায় লেগেছিল।

শ্রীমন্ত দে লেন থেকে মিশন রো-তে বেরিয়ে পড়ে আমরা তিনজনে হাঁটতে থাকি একসঙ্গে নয় এলোমেলো; বিক্রম কিছুটা দেওয়াল ঘেঁষে ও কুণাল ফুটপাত ধরে অনেকটা এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছে—আমি ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ি—মৃদু ও মেঘার্দ্র টান আমাকে রাস্তার গভীরে টেনে নিয়ে যায়।

সেখান থেকে দেখি হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত দেখা যায় ও রাস্তা অসম্ভব চওড়া—ফাঁকা বাড়িগুলিতে আলো জ্বলছে না অথচ দিনের বেলাও নয়—করকরে পিচের রাস্তা অসম্ভব চওড়া—এখনো লোক চলে নি রোদ পড়ে নি ট্রাফিক চলে নি ধুলো জমে নি—হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ও চলাচলহীন শান্তি—খটখটে শুকনো; একটু ছাড়াছাড়া ভাবে কুণাল বলল, "আমি চললুম—কফি হাউসে অপেক্ষা করছি—তোরা আস্তে আস্তে আয়"—বিক্রম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে—আমার হাত পাঞ্জাবির পকেটে ডোবানো—মুঠোয় পিয়ানোর চাবি—সহসাই রিডটা অসম্ভব pressing মনে হয়—শরীরময় সমস্ত জীবনে সহ্যের অতীত চাপ বোধ করি—উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপতে শুরু করে—ক্রমশ সাড়হীন হয়ে পড়ছে—আমার হাত একখণ্ড আমার আমা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখে রাস্তার মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আমি বিক্রমকে চেঁচিয়ে ডাকি,

"লুকহিয়ার বিক্রম!"

বিক্রম মুখ ঘোরায় কিনা আমি দেখি না—হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল—হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত পৌঁছয় এমন ভাবে আমি—পিয়ানোর রিডটা মুঠোয় ধরে আমি—হাত শরীরের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে হিন্দ-সিনেমা-পর্যন্ত-আমি একটু ঝুঁকিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিই; তবু ততটা উঁচুতে ওঠে না—তীব্র চোখে আমি ও বিক্রমতার গতি দেখি—দেখি কোথা দিয়ে কীভাবে ও কতদূরে যায়—খানিক দূরে গিয়ে সেটা রাস্তার ওপর পড়ে খরখর শব্দে গড়িয়ে যেতে থাকে।

ও ঠিক সেই সময় হিন্দ সিনেমার সামনে ৪-৫ জন যুবক দেখতে পাই; হয়ত দলে তারা আর-একটু ভারি ছিল—৪/৫ জন যুবাই আমরা দেখি; তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল—দেরি আছে মুখোমুখি হতে—ততক্ষণে আমরা একটা কিছু ঠিক করতে পারব কী করা যায়—ব্যবধান এখনো বেশ বেশি; কালো ও চৌকো চাবিটা রাস্তায় পড়েই লাফিয়ে উঠেছিল—তারপর খরখর করে সেটা দ্রুত তাদের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে; কত জোরে ছুঁড়েছিলুম জানি না—কত জোরে হাত ছুঁড়েছিল আমি টের পাই নি—চাবিটা গড়াচ্ছে; ওরা মোট কতজন ছিল জানি না—জনপাঁচেক মোটামুটি দেখতে পেয়েছিলুম—ওরাও এরকম হবে আশা করেনি—দূর থেকে রাস্তার মাঝখানে আমাকে পা ফাঁক করে পোজিশন নিতে দেখেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে আচমকা—রিডটা কাছাকাছি পৌঁছলে একজন এগিয়ে এসে সেটা তুলে নিয়েছিল—আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলুম ভালই।

তার বয়স আমাদের চেয়ে কম সে একেবারে তরুণ বয়সের; ছেঁড়া নয় ময়লা সাদা প্যান্ট পরেছিল সে ও হাফ শার্ট তাও অনেক দিন ধরে পরে আছে—তারা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, পিয়ানোর চাবিটা রাস্তা জুড়ে দীর্ঘতম বাঁক নিয়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছবার ঠিক আগে দল ছেড়ে দুকদম এগিয়ে এসে পোজিশন নিল সে—সেই ময়লা তরুণ—আ, ছোট্ট মাথাটা পার দিকে ঝুকিয়ে দুভাঁজ করে ফেলল তার শরীর—নিচু হয়ে শিকলসুদ্ধু কচি ডালপালা সমেত হাতটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে চাবিটা তুলে নিল—নিয়েই একবার লুফে দেখল;

তার অবলীলা দেখে আমাদের মনে পড়ে আমার ছোঁড়ার মধ্যে কত effort ছিল—আর তার—

আমাদের দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার লুফে দেখল সে বা বন্ধুদের দেখাল; তারপর আবার ঘুরে আমাদের প্রস্তুত হবার একটুও সুযোগ না দিয়ে চকিতে সে চাবিটা ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে—অনেক বেশি উঁচুতে উঠে গিয়ে সেটা অনেক বেশি শূন্য অতিক্রম করে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল—তীব্র ও জ্বালাভরা চোখে আমি ও বিক্রম তার গতি দেখি—তার গতিপথ অনুসরণ করে সার্চলাইটের ডোমের মতো আমাদের মাথা ঘুরে যেতে থাকে—আমরা দেখি শূন্যে বিশাল অর্ধবৃত্ত রচনা করে সেন্ট্রাল এ্যাভিনু ছাড়িয়ে সাবলীলভাবে সেটা মিশন রো ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট জাংশনে গিয়ে পড়ে—তারপর বড় বড় পাক দিয়ে গড়াতে গড়াতে টেরিটিবাজারের দিকে যেতে থাকে দেখতে পাই—যতদূর দেখা যায় তার চেয়ে বেশি দূর তাকে অনুসরণ করি—চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছিল তবু দেখতে থাকি—তারপর আর দেখতে পাই না—কিন্তু মন্থর-হয়ে-আসা তার গতি দেখে ঠিক কোথায় সেটা পড়ে আছে টের পাই; বহু দূর চলে গেছে—অনেক বেশি দূরে—আমাদের দিনের তুলনায় আজকাল মাধ্যাকর্ষণ কম।

হয়ত তখনো তারা পরস্পর কনগ্র্যাচুলেট করছিল; কিন্তু আমাদের হাতে আর সময় নেই—উত্তেজনা বড় বেশি হয়ে পড়েছিল—অত্যধিক চাপের জন্যে হাত ছিঁড়ে যায় দেখে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে আমার করতালিপ্রিয় মূঢ়তার জন্যে আমি সেটা ছুঁড়ে দিয়েছিলুম "দেখুক বিক্রম" এই ভেবে—এই আমার ভুল; অপ্রত্যাশিত ওদের সহসা দেখে আমি বুঝতে পারি যে এই তবে ছিল আমাদের অজ্ঞাত দিক? কিন্তু ওরাও ভুল করে—ওরা বা অন্তত সেই ছেলেটি—সে ভাবে আমরা ওদের স্পোর্টে ডাকছি—এই তার ভুল; এক যুবকের ভুলে এক জেনারেশনের ভুলচুক হয়ে যায়।

নগরের অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে পিয়ানোর চাবির জন্যে আমরা এবার ছুটতে থাকি লাফিয়ে; বিক্রম ছায়ার মতো আবার অবিরল পিছনে—ঠিক জায়গায় পৌঁছে একটা ল্যাম্পোস্টের নিচে গোল আলোয় হাতড়াতে থাকি—চাবিটা পেয়ে যায়—আ, হাত দিতে তার চৌকো ও নরম আবারও অনুভব করি; একটু ছড়ে গেছে—একটু অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয় নইলে সেই চাবিটাই—এবার বিক্রমও সেটি স্পর্শ করে—মুঠোয় ধরে যা বোঝার বারবার বোঝে।

আবার কুণালের বাড়ির ভিতরের ঘরে; একটা লম্বা করিডর-মতো সেটা—কোনাকুনি ভাবে পরপর টেবিল ও চারটে করে চেয়ার সাজানো টেবিলের ওপর ধুলোঝাড়া কাগজের ফুল—ব্র্যাকেটে মৃদু আলো ও উপুড়-করা গ্লাস ন্যাপকিন ইত্যাদি— একটা B A R; কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে পিয়ানোর ডালাটা তুলে ফেলি—সবটা ওঠে না—ওঠানো যায় না—আমি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নার্ভাস হাতে রিড-এর শূন্য জায়গাটা খুঁজতে থাকি—বিক্রম পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে—দেখুক—দোষ আমারই—আমি তা ক্ষালন করার জন্যে দৃঢ় চেষ্টা করছি—পাশে দাঁড়িয়ে দেখাটাই সাহায্য বা বন্ধুত্ব—এ-ছাড়া কোনও সাহায্য সে আমাকে করবে আমি আশা করি না।

উঁচু কালো বার্মা-টিকের কাউন্টার থেকে কুণালের বাবার ঘড়ঘড়ে গলা শোনা যায়; ভাষা বোঝা যায় না—বাঙলা ভাষাই হবে—কিন্তু যা বলতে দশ মিনিট লাগে তা পাঁচ-সেকেন্ডে হুড়মুড় করে বলার জন্যে আমরা বুঝতে পারি না—মনে হয় আমাদের নয় বেয়ারাকে কিছু বলছেন—কাস্টমার যারা এবার প্রবেশ করে চেয়ারগুলোয় বসবে তাদের জন্যে মনে হয় কিছু ব্যবস্থা করতে বলবেন; এটা বুঝেছিলুম আমাদের উনি দেখতে পাচ্ছেন না বা আমার

ওঁকে বা আমাদের জন্যে ওঁর বলার কিছুই নেই—"হি ইজ নট বদার্ড এ্যাবাউট আস—" বিক্রমকে আশ্বাস দিয়ে আমি জানাই কেননা গলার ঘড়ঘড় শুনে সে দু-একবার পা বদলেছিল।

কিন্তু চাবির জায়গাটা যে কিছুতে খুঁজে পাচ্ছি না; বিক্রম বুঝতে পারছে আমি খুঁজে পাচ্ছি না—সে তবুও নত মুখে দাঁড়িয়ে—তার বগলে যথাযথ টুপি—তবু সে আমাকে খুঁজতে সাহায্য করছে না যে-কারণে তার জন্যে বন্ধুত্বের অদ্ভুত আবেগ বোধ করি।

আমি পিয়ানোর ড্রয়ারগুলো দ্রুত খোলা-বন্ধ করতে থাকি; যা ভেবেছিলুম—দেখি সবগুলি ড্রয়ার গরমের জামাকাপড়ে ভরতি— চকচকে নতুন জামাকাপড় সব—কুণালের মায়ের একটা শাল—তার চিক্কণ পাড় থেকে ক্যাপ্সটান টোব্যাকোর পাউচের সোনালি ছিটকে গায়ে লাগে—খালি শীতের দিনের দামি দামি জামাকাপড় সব—সব টাকা ত কুণাল নিয়ে বেরয় নি—অর্ধেক রেখে গেছে—তাছাড়া বাড়ির টাকাও এখানেই আছে—কিন্তু কোথায়?

আমি ক্রমশ বুঝতে পারি টাকা পিয়ানোর ভেতরেই আছে কিন্তু আমি পাব না; "সর এভাবে খোলা যায়" আমি বিক্রমকে বলি, "না হয় আমি খুলছি—কিন্তু চোর এলে ত সমস্ত টাকা নিয়ে যেত।"

জেব্রা কেনার জন্যে টাকা যা বের করেছিল কুণাল সবই বিক্রমকে দিয়ে গেছে; "দ্যাখ দিকি' দুঃখিত স্বরে বিক্রম বলতে থাকে, "মিছিমিছি জেব্রার জন্যে কুণাল এত টাকা নষ্ট করছে—এ-টাকায় মদ খাওয়া উচিত—উচিত কিনা বল—এ-টাকায় মদ খেলে কী গ্রেট্ হত; নষ্ট করছে টাকা—টাকা নষ্ট হচ্ছে—কুণাল আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে—"

"কিন্তু" দৃঢ়স্বরে সে বলে, "এ টাকায় মদ খাওয়া চলে না—কুণাল ভীষণ দুঃখ পাবে—ভীষণ দুঃখ পাবে কুণাল তাহলে—"

'পোষও মানবে না কিছুই না খামকা—" বিক্রম গজগজ করতে থাকে, "জেব্রা পোষ মানে না—আমি জানি—"

চাবিটা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছি; ডালা নামিয়ে পিয়ানো ছুঁয়ে বার-এর কোনায় আমি দাঁড়িয়ে—পাশে বিক্রমের মতো বন্ধু পিয়ানো ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ক্রমে বুঝতে পারি জেব্রার টাকায় মদ খাওয়া কত প্রয়োজন—মদ খেতে আমরা বাধ্য—বা এখন হ্যাঁ-না করলেও পরে আমরা খাবই কারণ জেব্রার জন্যে টাকা খরচ করা ভুল—কোনও লাভ হবে না—কুণালের চেয়ে আমরা বেশি জানি—আমরা ঠিক জানি; সাজানো বার-এর কোনায় দাঁড়িয়ে মদ না-খেতে পারার জন্যে বিক্রমকে বজ্রাহতের মতো দেখায়—আমিও বুকে অসম্ভব কষ্ট বোধ করি; যদিও কুণালের টাকা—কিন্তু এ-টাকা মদের জন্যেই characterised আমরা বেশ বুঝতে পারি—উত্তরে ঘুমচোখে বিক্রমকে আমি বলি, "একথা আমি অন্তত-একজন মহিলাকে বুঝিয়ে যাব যে সঙ্গম বিনা আমাদের কারোরই আর কোনোপ্রকার ঘুম হয় না"

কুণালের সদর ঘরে দেখি বাসুদা দেওয়ালের দিকে মুখ করে ডিসভরতি কী-সব খাচ্ছে—মাংস পেঁয়াজ—পাশে বীরেন; "কী বীরেন বিয়ের খাওয়া খাওয়াচ্ছ বুঝি বাসুদাকে' আমি বীরেনকে বলি—বীরেন লাজুক হাসে—বাসুদাও হাসতে থাকে— বীরেন আমাকে কোনওদিন বিয়ের খাওয়া খাওয়াবে না ভেবে আমার দুঃখ থেকে রাগ হয়ে যায়—আমি বাসুদাকে বলি, "বাসুদা আপনাকে সবাই বিয়ের খাওয়া খাওয়াবার জন্যে খুঁজে বের করে অথচ আপনি একজন কবি" বলে বাসুদার মুখের দিকে না তাকিয়েও আমার অনুতাপ হয়; ছিঃ ছিঃ কেন বললুম আমি সত্যি কথা—তার ইনোসেন্ট পৌরুষে আঘাত দেওয়ার কি এতই প্রয়োজন ছিল—তাড়াতাড়ি বলুলম, "বউদি কেমন আছেন বাসুদা—মেয়েটা কেমন আছে—অনেকদিন যাইনি আপনার বাড়ি'— "রবিবার সকালে এসো না" বাসুদা আমায় বললেন, "না সামনের রবিবার কাজ আছে—তার পরের রবিবার এসো—এ্যাঁ"—যাক

বাবা সব ঠিকঠাক হয়ে গেল—বীরেনও খুব চটেছে—ওর রাগটাও মসৃণ করে দিয়ে গেলে হত—কিন্তু আজ আর সময় নেই—দিয়ে যাবার সময় হল না আজ—একটা কাজ বাকি থেকে গেল

রাস্তায় বেরিয়েই একটা পেট্রোল-পাম্প পড়ে; কুণাল দুঃখ পাবে বলে আমরা খানিকটা করে মোটরঅয়েল খাই—"এ-ভাবে খা" হাঁ করে টিনটা মুখের ওপর উপুড় করে ধরে বিক্রম—উড়ন্ত ঘোড়া-মার্কা তোবড়ানো টিন থেকে বুকবুকবুকবুকবুক বুক বুক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—বিক্রম খায় সরাসরি টাগরায় ঢেলে—"এইজন্যে আমার কোনও টেস্ট এ্যাকোয়ার করার ব্যাপার নেই" ও হেসে বলে, "জ্বলে যায় আলজিভটুকু যাবে"

ক্রমে বিক্রমের মাথা থেকে শিঙদুটো গজাতে থাকে; ওর খুরের আওয়াজ শুনতে শুনতে হাঁটি—"কুণাল আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে" যেতে যেতে বিক্রম আমাকে জানায়।

বউবাজার অবদি হেঁটে গিয়ে আমরা আমাদের লাল ও দোতলা লাস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই; "তোমাদের জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছি বিক্রম" ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে বেচু আমাদের ডাকে—"আর উই ইন ডেনজার" আমি জানতে চাই—"এ্যলেনের মতো লোক কখনো দেখি নি" ঘোরতর লাল চোখে বেচু আমাকে বলে—বুঝলে বেচু' বিক্রম জানাতে থাকে "কুণাল আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে—বেশ খরচাও করছে আজকাল—বুঝলে বেচু খুব ভাল হয়ে গেছে কুণাল—রাত্রে বাড়িতে থাকতে দেয়"

"কলকাতার সমস্ত দম্পতি যৌনপ্রেরণা পায় আমাদের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ থেকে তুমি জান"—বেচুকে আমি জিজ্ঞাসা করি; তার দ্বিধা আমার অসহ্য বোধ হয়—উরুতে থাপ্পড় মেরে আমি তাকে বলি "I can challege you on this"

"শুধু তাই নয়" আমি বলে যেতে থাকি "কমিউনিস্টকংগ্রেস বঙ্গসংস্কৃতি কালচারাল ফ্রিডাম স্বাধীন সাহিত্যসমাজ পাকভারত চিনভারত এমারজেন্সিনিরস্ত্রীকরণ কিউবাকেনেডিক্রুশ্চেভ—পৃথিবীময় এত যৌন-কনফারেন্স—এসবও আমাদের প্রতি বিদ্বেষবশতই" কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের মত সোঁঅঅওওওও করে স্টার্ট নিয়ে সহসা দ্রুততম স্পিডে বাস চলতে থাকে দুই ঋতুর মাঝখান দিয়ে বাস চলে যেতে থাকে স্টপেজহীন দ্রুত ও বেলা থেকে অবেলায় টপ স্পিডে বাস চলতে থাকে

বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে;

বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে;

বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে;

বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে; বাস চলতে থাকে...

১৯৬৭

# ঐ দিকে

পান্নালালের দেখলুম ডান-পা হাঁটুর পর থেকে প্লাস্টারের—বাঁ-পায়ের দেড়গুণ লম্বা—ডান-পা চিতিয়ে রেখে রাস্তার নর্দমায় পেচ্ছাপ করছে পান্নালাল—চারদিকে ছিটিয়ে ঘোড়ার মতো রাস্তা ভাসিয়ে হুড়হুড় করে রক্তপ্রস্রাব করছে সে—দক্ষিণের দিকে—উত্তরের দিকে—পশ্চিমের পানে; দেখে মনে হয়, দুবছর ধরে ক্রমগত রক্তপ্রস্রাব করে আজও কি শান্তি শেষ হয়নি পান্নালালের—আবার পা? পান্নালাল ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে স্মিতচক্ষে একবার তাকায়—তারপর ফিরে যেতে থাকে লিউকিস ওয়ার্ডে তার বেড-এর দিকে—বিচারের বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ নেই।

রাস্তা কিছুসময় ফাঁকা পড়ে থাকে; একটু পরে অবনতমাথা ল্যাম্পোস্টের মতো ঝুনুদিকে হেঁটে আসতে দেখি; ঝুনুদি এসেই পান্নালালের কথা জিজ্ঞেস করে—বলে, "প্রেম করে স্কুলমাস্টারকে বিয়ে করলুম, তাতে কোনও দুঃখ ছিল না, কিন্তু সেও ভুগছে—রুগী স্কুলমাস্টার, এ আমি মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই—হায়, পান্নালালের সঙ্গে কেন আমার মিলন হল না।" বিচারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ আছে দেখে ঝুনুদির জন্যে অদ্ভুত sympathy বোধ করি—তার কিছু ছুঁতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ কোনও স্পর্শ নয়—হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় কেবল পরের জিনিস—এমন সময় আশাতীতভাবে তার নগ্ন আমার নগ্নে লেগে যায়

বৃন্দাবন মল্লিক লেনের মুখে একটা ছোট দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢোকার সময় ঝুনুদি আমাকে বলে, "আমার সঙ্গে আসছ, কেউ যদি দেখে?" পিছন ফিরে দেখি ট্র্যাফিক-আইল্যান্ডে ৪-৫ জন যুবা জটলা থামিয়ে আমাদের ঢুকতে দেখছে—কিন্তু আমরা তাদের চিনি না বা তারা আমাদের

করিডরে আলো ও অন্ধকার দুই-ই রয়েছে—আলো ও অন্ধকার পেরিয়ে আমরা বাঁ-দিকের একটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে X-RAY PLANT থেকে নীল আলো জ্বলে ওঠে—প্লান্ট থেকে চাপা আলো ও ক্রূর গুঞ্জনে ঘর ভরে যেতে থাকে—ঘর কাঁপতে থাকে—প্লান্ট কাঁপতে থাকে—খবরের কাগজ-গোঁজা একটা ফুলদানি কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের এদিক থেকে ওদিকে চলে যায় ও কাৎ হয়ে কাঁপে

ডাক্তার নেই; ডাক্তারের শূন্য চেয়ারের পাশে প্লান্টের বিচ্ছুরিত শোভার মধ্যে আমরা মলিন ধুতি ও শার্ট পরা কম্পাউন্ডারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি; পেশেন্টদের দিকে ডাক্তারের স্টেথিসস্কোপ এক-হাতে দুলিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে চাপাস্বরে সে বলছে, "লিবিডো! লিবিডো! পেশেন্টস হু আর ডাইং অফ একসেসিভ মাস্টার্বেশান—" রুগীরা বিক্ষিপ্তভাবে মেঝেয় বসে—তাদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়—টিকিটের লাল-নীল কাউন্টারফয়েল হাতে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের দিক থেকে জুতো ঘসটানির শব্দ—সমবেত রুগীদের একসঙ্গে হঠাৎ দেখলে কে বিশ্বাস করবে যে এরা সকলে একই দেশের বা এক-পৃথিবীর

কেউ আমাদের লক্ষ্য করে না; একটা অন্ধকার কোণে তক্তাপোশে ঠেস দিয়ে ঝুনুদি বসে—আমি দুহাত দিয়ে তার অঙ্গ সংবাহন করতে থাকি দ্রুত—বুক পিঠ ঘাড় হাত কিছুই আমার পছন্দ মতো হয় না—ওপর-হাতটায় দেখছি মাংস নেই—শুধু সরু ও লিকলিকে একখণ্ড হাড়—সবটাই deformed—এ কী, এখানে, পিঠে, কুঁজ কেন! কিন্তু ঝুনুদিকে তবে

আমার বরাবর অত ভাল লাগত কেন— আমি নিশ্চিত জানি কিছু ভাল আছে কোথাও কিছু ভাল আছে ঝুনুদির—এমন সময় তাকে উলটে তার নিতম্ব আমি পাই; আ, যা চাইছিলুম! দুহাত দিয়ে তার নিতম্ব আমি উপভোগ করতে থাকি— তার নরম, তার গোলাকার, তার পালিস, তার firmness, তার পিছল আলো দুহাত দিয়ে ভোগ করতে করতে আমি বলি, "আমি জানতুম তোমার কিছু ভাল আছে" শুনে ঝুনুদি নারীর পরিতৃপ্ত ও গভীর নিশ্বাস ফেলে

এ-সময়—তাকে আবারো উলটে— ঘন ও কর্কশ চুলের মধ্যে সহসা তার প্রায় এক বিঘৎ পরিমাণ S-এর মতো বাঁকা যোনি আমি দেখতে পাই—যোনির মরা মাংস—এমন অশুভ যোনি আমি আগে কখনো দেখি নি কোনও রমণীর—এদিকে আমার দেরি দেখে ঝুনুদি অধৈর্য হয়ে পড়ে—অন্ধকারে পার্শ্ববর্তিনী প্রৌঢ়ার পায়ে পড়ে বলে, "ওগো শোনো—ওকে বলো—" ঝুনুদির উদ্বেগ দেখে বিমর্ষ রঙে ভরে যেতে থাকে আমার মাথা—অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরও একবার আমাকে কিছু করতে হবে আমি বুঝতে পারি

এমন সময় দেখি ওদিকে কিউবের মতো গরাদহীন বিশাল জানালার ওপাশে তিনজন রমণী করিডরের শেষে অন্য-এক দরজার সামনে ক্ষিপ্রগতিতে দাঁড়িয়ে—তারা এইমাত্র এলো—তাদের সামনের দরজাটা বন্ধ যা খুললে যে-ঘরে তাদের প্রবেশ করার কথা ছিল; তারা একজন pimp-এর সঙ্গে কথা বলছে যে তাদের এখানে এনেছে; তাদের চাঞ্চল্য দেখে বুঝি তারা বহুদূর থেকে ও অতি দ্রুতগামী যানে এসেছে—তারা কি সময়ের থেকে দ্রুতগামী কোনও যানে এসেছে অর্থাৎ কিছুটা আগে এসে গেছে যে জন্যে দরজা এখনো খোলে নি, নাকি, তাদের কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ায় দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আমি ঠিক বুঝতে পারি না—এ-পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না কিছুই—তবু তারা তাদের pimp-কে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে—উপর্যুপরি জেরা করে ওই বিষয়ে জেনে নিচ্ছে যা জানার

এই সময় সহসাই আমার মনে হয় হয়ত আমি স্বপ্ন দেখছি—এ কী, তবে ত অতি কাছাকাছি আমি এসে পড়েছি কোনও আবিষ্কারের—জানালার ওপাশে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনজনের মুখ—তিনজন রমণী ও একজন দালাল—এই প্রথম আমি স্বপ্নে তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি জাগরণে যাদের কখনো দেখি নি—তাদের অবয়ব দেখা গেছে—কিন্তু জাগরণের জীবনে অদেখা মানুষের মুখ এর আগে কেউ কখনো দেখে নি কোনও স্বপ্নে—পাশবিক অনুপ্রেরণায় আমি মাটি খুঁড়তে থাকি— তারাও মুখ ফিরিয়ে নেয় না—তাদের ভাল করে দেখে নিতে দেয় ও আমাকেও যা দেখার দেখে রাখে—তাদের মুখ এমনভাবে পুতে নিতে থাকে মনে—এমনভাবে—যেন জেগে উঠে কখনো দেখা হলে তৎক্ষণাৎ তাদের মুষ্টি চেপে ধরতে পারি—যদি তা পারি—যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি বুঝতে পারি কোনও-একটা অবিষ্কারের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছি আমি—আমার শরীর ঝুঁকে বেঁকে যেতে থাকে আবিষ্কারের দিকে

বুকের ভিতর থেকে অনেক দিনের গোটানো একটা ছোট সাদা ফ্ল্যাগ টেনে বের করে খুলে সেটা নাড়তে নাড়তে স্ত্রীলোক-তিনটির দিকে আমি এগোতে থাকি...

১৯৬৭

## রূপালি পর্দায়

পোল নদীর ওপর কিন্তু খালপোলের মতো ছোট; পোলের ওপর থামের পাশে চামেলি বাস স্টপ-এ—পোলের ওপর ঠেলাগাড়ি, রিকশা, অসম্ভব ভিড় ও জ্যাম-এর ভিতর দিয়ে ডাবলডেকার যাচ্ছে স্লো স্পিড-এ—হর্ন টিপে-থাকার একটানা ভোঁ—ঘণ্টার ওপর হাতুড়ি পড়ার শব্দ ক্রমাগত—ঠেলাগাড়ি রিকশা ভিড়—ভ্রাম্যমাণ গরুর পালের সমবেত ঘণ্টাধ্বনি—ঠেলাগাড়ি রিকশা ভিল ও স্লো ডাবলডেকার—বেহালার ছড়কে চাবুক হিসেবে ব্যবহার—লাল বাস স্টপ-এর নিচে চামেলি থামে সেঁটে দাঁড়িয়ে—"দাঁড়াও যাচ্ছি" পোলের নিচে দাঁড়িয়ে আমি বলি; সে এমন ভঙ্গি করে যেন দাঁড়াবে—তার কথা শুনতে পাই না—তবুও সে তাড়াতাড়ি তার কাছে যেতে বলে মনে হয়; উঠতে গিয়ে একটা পাহাড় অতিক্রম করতে হয়—পাহাড়ে চড়তে দ্বিধা হয় না—সন্দেহ হয় না পাহাড়কে যদিও তার অস্তিত্ব কল্পনার বাইরে ছিল—কিন্তু তা পেয়ে সন্দেহ হয় না বা আশ্চর্য হই না—কারণ পাহাড় অজানা ছিল সত্যি কিন্তু এখন দেখছি পাহাড় আছে আর আছে-কে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না—সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে চড়তে থাকি দ্রুত; ছোট পাহাড়—চূড়াটা বেশ একটা মাঠের মতো—আতা-বন সেখানে—বনের দিকে চেয়ে আমি ডাক দিই : "এএএএ কালুয়া!" বনের ভিতর গাছপালা নড়েচড়ে ওঠে— গাছ থেকে নেমে বন কেটে বেরিয়ে আসে হাজারীবাগের কালুয়া—একটা মস্ত বড় আতা—প্রকাণ্ড— বাতাবী লেবুর মতো বড়— আমাকে দেয়, আমি চামেলির জন্যে পয়সা দিয়ে কিনি; তরতর করে পাহাড় থেকে নেমে আসি—দেরি না হয়ে যায়! সব মিলিয়ে দশ মিনিটও লাগে নি—নেমে থামের পাশে গিয়ে দেখি—চামেলি নয়—একজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছে—আমি একবার দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিই—যাকে আমারএকবার মন হয় ২০ বছর আগে ৩১ বছরের চামেলির মতো দেখতে ছিল; ইতিমধ্যে ২০ বছর কেটে গেছে এমন সন্দেহ আমার একবারও হয় না; চৌধুরীবাবু ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বলেন, "হ্যাঁ চামেলিকে দেখেছিলুম"—তারপর অন্যান্য মেয়েদের গল্প দ্রুত করতে থাকেন—আমার শুনতে ভাল লাগে না অন্যান্য মেয়েদের গল্প—"অন্যান্য মেয়েদের গল্প আমি শুনতে চাই না" একথা তাঁকে বলতে পারি না—চাপে আমার বুক ফেটে যায়—তাঁর কথা শুনতে শুনতে ভিড়ের ভিতর থেকে তীব্র ও জলভরা চোখে চামেলিকে খুঁজে বার করতে থাকি—

সে চলে গিয়েছে আমার বিশ্বাস হয় না।

১৯৬৭

## একজন নিরুদ্দিষ্ট ও তিনজন এলেবেলে

"আর-এ! ঋষি না? ঈ-য়েস! দ্যাট্‌স রাইট!"—বাসে সামনের লম্বা সিটে দুজন তরুণ যুবা ঈষৎ উঁচু গলায় কথা বলছিল; আমি তাদের সামনে হ্যান্ডেল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। একটু আগে তারা যখন উত্তমকুমার-ব্যাপারে বলছিল তখন বেশ-কিছুটা শুনেছিলুম। বস্তুত বলছিল একজনই, তার কোলে বই-খাতা, তার সম্পর্কে ৩-টে জিনিস প্রথমতই চোখে পড়ে। ১, সে

ছিপছিপে। ২, তার কোমরে বেতের জালিকাটা বেল্ট, যা পীড়াদায়ক নতুন। ৩, তার গোঁফ। কম লোককেই গোঁফ মানায়। তাকে মানিয়েছিল। কথা বলার সময় তার ঠোঁট ও জিভ বেশ রীতিমত কাজে লাগে দেখছি বা সে লাগায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘন চুলের সুন্দর গোঁফ নানারকম চেহারা নেয়। যেমন হাসলে হাসির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, "সে কী!" বলার সময় অবলঙ রূপ নেয়।

"উত্তমকুমার দেখিয়ে দিল-লো, অ্যাঁ?" সে বলছিল, 'ক-তো যে ফো-ওন হয়েছে তার ঠিক নেই। খ-বোরের কাগজে ত এ-ছাড়া কোনও ফো-ওনই নেই।"

সে আস্তে আস্তে কথা বলছিল, উচ্চারণ করে করে। যেমন 'একাউন্টট্যান্ট' শব্দটা সে বলল, একা, উন্ট এবং জিভ টাগরায় কয়েক মুহূর্ত রেখে, ট্যান্ট! যেন তিনটে শব্দ। আসলে তোতলা; কিন্তু অনেকানেক তোতলার মতো হড়বড় করছে না দেখে ভালই লেগেছি তোতলামিকে সে প্রায় একটা বাচনভঙ্গিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। কস্ট-একাউন্টট্যান্ট কথাটা বলার জন্যেই তাকে একাউন্টট্যান্ট শব্দ ব্যবহার করতে হয়। সে কস্ট-একাউন্ট্যান্সি পড়ছে। সাইমন এ্যান্ড সাস্টার্স নামক ফার্মে ঢুকেছে। "এ-ছাড়া এম-কম আর ল-ও পড়ি।" এত-কিছু একসঙ্গে পড়ে কী করে, কে জানে। বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে মনে হয়। ল-কলেজে পেরিয়ে গেল, কই নামল না ত।

শ্রোতা যুবকটির পরনে সাদা ট্রাউজার্স ও শার্ট, পায়ে দানাপুরি। সে বেল্ট পরে নি। ফরসা ও মুখ লম্বাপানা, তার কবজিতে ঘড়ি ও অসম্ভব লোম। "অনেকে বলছে এটা নাকি প্রেস-এজেন্টের কাজ", সে সংক্ষেপে বলল।

"কো-ওনটা বল্ ত?"

"উত্তমকুমারের এই হার্ট-এ্যাটাকটা। পাবলিসিটি।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। একদিনের জন্যে বাঙলাদেশকে আর-কিছু ভাবতে দিলে না।" লম্বামুখের শ্রোতা-ছেলেটি বলেছিল। তাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়েছিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ঋষি বেরিয়ে এল। হাসল। তার মুখখানা কচি। সেও ট্রাউজার্স পরে আছে, তবে কেনা মনে হয়, তার মাথায় দিন-পনেরর চুল।

"আয়, আয়। বহুৎ দিন হু-য়ে। তার পর? কী করছিস এখন বল্।"

"একটা স্কুলে হেডমাস্টারি করছি।"

"হে-এড মাস-টার?"

ছোট-ছোট ভ্রূ-দুটোকে দুটো ইনভারটেড কমার মতো দুচোখের দুপাশে টাঙিয়ে রাখল সে। গুডনেস! এটাও স্টাইলাইজ করেছে দেখছি, এই তোতলামির জন্যে ওর ভ্রূ-দুটোর ওইভাবে বেঁকে যাওয়াকে। "হ্যাঁ।" ছেলেটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "একটা জুনিয়র হাই স্কুল।"

"জুনিয়র? হা-অই? স্কুল? সে ত ভাল। মাস-টাররা ত এখন অনেক পাচ্ছে", বলে সে পাশের বুদ্ধিমান বন্ধুটির দিকে চাইল। বন্ধুটি অনিশ্চিতভাবে হেসে ঘাড় নাড়ল।

"তার-পর? মাথা নেড়া কেন বল?"

"বাবা মারা গেছেন।" ঋষি বলে যাকে ডাকা হয়েছিল নিচু, ছোট গলায় সে জানাল।

"আচ্ছা?" বলে, তৎক্ষণাৎ পরে, একেবারে তখুনি যুবকটি জিজ্ঞেস করল, "তারপর? আর কী খবোর ভাই?"

আর-কী বলবে! পুরনো বন্ধুর এই মূঢ়তায় সে কি... কিন্তু এ-নিয়ে ঋষির কোনও দ্বিরুক্তি আছে বলে মনে হল না। সে কি সামান্যতম আঘাতও পেল না? ঋষি তেমনি অপ্রতিভ গলায় বলল, "আর কী।"

"তুই মায়রি ঠিক তেম্নি থেকে গেলি।" ঋষির কলেজফ্রেন্ড নড়েচড়ে বেল্টের ক্রেস্টটা দু-আঙুলে সেন্টারে আনতে আনতে বলল, "দ্বা-আরভাঙ্গা হলে সেই শেষ দেখা, অ্যাঁ? একদিন আয় না আমাদের বাড়িতে। গোবিন্দর কী খবোর রে?"

"কন? ডাক? টর?" সে উঠে পড়ল, "রোককে; চলি ভাই", বলল, "একদিন আয়, কেমন? ও, তুই ত যাস নি, না? টেবল-টেনিস খেলতে যাস নি? গো-ওবিন্দ গেছে। গোবিন্দকে জি-ইজ্ঞেস করে নিস," বলতে বলতে গ্রে-স্ট্রিটে সে নেমে পড়ল।

হেডমাস্টার ঋষি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অতি আন্তরিকভাবে চেঁচিয়ে বলল, "হোপ আই শ্যাল সি ইউ এ্যাজ দি এ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেল অব বেঙ্গল সাম ডে ইফ নট অফ ইন্ডিয়া।" ভুল ইংরেজি আমি তবু অনেক সময় টের পাই না, কিন্তু কেউ কারেক্ট খারাপ ইংরেজি বললে আমার কানে বাজবেই। ওফ্, এটা আর আমার গেল না।

স্টপে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ক্রেস্ট সেন্টারে আনতে আনতে যুবাটি উত্তর দিল, "অ-তোটা বোলো না, অ-তোটা বোলো না।" বলে সে হাসতে লাগল। বারংবার ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার গোঁফও, হাসির তালে তালে। আমি ভাবলুম, সে ও-রকম কেন করল? সে কি ধরেই নিয়েছিল যে লেডিজ সিটে কেউ না-কেউ আছেই। ওদিকে সিটগুলো কিন্তু এখন বেবাক ফাঁকা। অন্তত লেডিজ সিটে কেউ ছিল না। আমি আর বেচু কলেজে ছিলুম আসোল বন্ধু। নেবুবাগানের আড্ডা ছেড়ে, সন্ধের ঝোঁকে, আমরা দুজনে প্রায়ই মেয়ে দেখতে যেতুম রাসবিহারীতে। এক-একটা মেয়ে যেত, আর বেচু মন্তব্য করত, "৭০০ বেসিক, এ্যালাওয়েন্স নিয়ে কুল্যে হাজার।" কেউ-বা ১৫০ নম্বর পেত। মানে, এইট্টি টু টু'ফিফ্‌টি। মানে কেরানি ছাড়া তোমার আর-কিছু জুটবে না।

ঋষি ও আমি শ্যামবাজার মোড়ে নামলুম। ঋষি রাস্তা পেরিয়ে বৃন্দাবন পাল লেনে ঢুকে গেল। বাগবাজারের ছেলে।

১৯৬৭

## ধলভূমগড়ের ব্যানার্জিবাবু

সেবারের শীতে আমরা ব্যানার্জিবাবুকে পেয়ে গেলুম, "একটা মেয়েছেলে জোগাড় করে দিন না, ব্যানার্জিবাবু?"

বিকেলে ব্যানার্জিবাবু আমাদের ছেড়ে এগিয়ে যান স্টেশন ইয়ার্ডের দিকে যেখানে কিছু কুলিকামিন কাঠচেরাই-এর কাজ করছিল।

সর্দারকে ব্যানার্জিবাবু, "আঁচ্ছা, এখানে মজুর পাওয়া যায়?"

সর্দার, "কাম কুথা হোবেক বাবু?"

ব্যানার্জিবাবু, হাত তুলে, "ওই ডাকবাংলোয় কাম হবে।"

সর্দার, "কুলি দেড় রুপিয়া বাবু।"

ব্যানার্জিবাবু, গলা খাটো করে, "আর কামিন?"

সর্দার, "কামিন এক রুপিয়া বাবু।"

ব্যানার্জিবাবু, "এক রুপিয়া?" একটু ভেবে, "ঠিক আছে! কামিনই রাখব।"

সর্দার, "কী কাম করতে হোবেক বাবু?"

একেবারে অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ বিষম রেগে গেলেন ব্যানার্জিবাবু, যেন ফেটে পড়লেন রাগে।

ব্যানার্জিবাবু, কেঁপে উঠে, "সব কাম করতে হবে," চিৎকার করে, 'হাঁ, সাব কাম!" মাটিতে স্টিক ঠুকে, "সাব—সাব কাম!!"

তাঁর চড়া গলা শুনে সর্দার চমকে ওঠে; আমরা হাসি চাপি ও উপস্থিত সাঁওতাল রমণীরা মুখ তুলে তাকায়।

ব্যানার্জিবাবু, "কাল চলে যাচ্ছেন শুনলাম?"

"হ্যাঁ, কাল।"

"ভোরের গাড়িতে?"

"হ্যাঁ, ভোরের গাড়িতে। কিন্তু", আমরা জানাই, "আজ রাতটা আছি।"

ব্যানার্জিবাবু, টেবিল থেকে একটা গ্লাস ছোঁ মেরে তুলে ধরে, "দা নাইট ইজ ইয়াং।" "দা নাইট ইজ ইয়াং", "দা নাইট ইজ ইয়াং"... সমস্বরে বলতে বলতে সোনার নদীর মতো আমরা ভেসে যাই ব্যানার্জিবাবুর দিকে। সহাস্যে। চুমুক দিকে দিতে।

ডাকবাঙলো থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি, সঙ্গে ব্যানার্জিবাবু। পথে পড়ে ভাটিখানা। সেটা ছেড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে আমরা একদল উজ্জ্বল মাতাল আগে আগে যাচ্ছে দেখতে পাই।

সহসা, ব্যানার্জিবাবু, "কুতা তেন হিজুতানা, হেএই!"

তোদের গাঁ কোথায় রে।

তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। তারা যাবে বুরুডি। আমরা কদ্দূর?

আমরাও যেতে পারি বুরুডি, ব্যানার্জিবাবু তাদের বলেন। যেতে যেতে আর-একটা ভাটিখানা পড়ে। সেখানে আমরা সবাই বসি।

সেখানে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

আমরা আবার বুরুডির পথ ধরি।

ব্যানার্জিবাবু, একজনকে, "তা তোদের গাঁয়ে যে যাচ্ছি, ওখানে মুরগি পাওয়া যাবে?"

"হাঁ? কেনো যাবেক নাই বাবু?"

"বটে! আর মদ?" দুদিকে মাথা নাড়িয়ে অবিশ্বাসীর মৃদু হাসি হাসতে থাকেন ব্যানার্জিবাবু।

মদ পাওয়া যাবে।

"আর মেয়এছেলে?" হইহই করে হেসে ওঠেন ব্যানার্জিবাবু, "মেয়েছেলে, অ্যাঁ, মেয়েছেলেও পাওয়া যায় নাকি," দম ফেটে টুকরো হয়ে যেতে যেতে, "মেয়েঃ—মেয়েঃ—মেয়েছেলেও পাওয়া যায় নাকি বাবা তোদের গাঁয়ে? এর্‌রে সমারু", একজনের পেটে স্টিকের খোঁচা মেরে, "মেএচেলেও পাওয়া যায়? ওওওওহোঃহোঃ হোঃহোঃহোঃহোঃ।"

যেতে যেতে বুরুডির পথ জুড়ে বিশাল চাঁদ উঠতে থাকে। অন্ধকার হাঁ থেকে চকচকিয়ে উঠতে থাকে, তাঁর, ব্যানার্জিবাবুর, দাঁতের সোনা।

১৯৬৮

# উৎপল সম্পর্কে

পদ্মপুকুরে উৎপলের বাবার মৃত্যুর পরে-পরেই উৎপল বাড়িটা বেচে দেয়। দুসারি পামগাছের মাঝখান দিয়ে গেট থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে ঢুকতে হয় এমন অতবড় বাড়ি যে বাবার শ্রাদ্ধশান্তির পর মাথার চুল গজাবার আগেই মাসখানেকের মধ্যে কী করে হস্তান্তর করা যায় তা আমি তখন ভেবে পাইনি। পরে শুনেছিলুম লাখখানেক টাকার বাড়ি বেচে দেয় ৬০ হাজারে। তাহলে অবশ্য হতে পারে।

উৎপলদের পদ্মপুকুরের বাড়ি ছিল জিনিস-পত্তরে ঠাসা। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা ছিল অসম্ভব চওড়া, ঈষৎ ঘোরানো ও কাঠের শাহেববাড়ির ধরনের স্টেপগুলো বাঁ-দিকের সরু থেকে ডান দিকের দেওয়াল পর্যন্ত ক্রমেই চওড়া হয়ে গেছে, একটা কাগজের চিনা হাতপাখা খুলে ফেললে যেমন সিঁড়িগুলো ছিল অনেকটা তেমনি, অর্ধ-গোলাকারে ওপরে উঠে গিয়েছিল। আমি দোতলা পর্যন্ত উঠেছিলুম। সিঁড়ির রেলিং মনে পড়ে ও তার পালিশ, এ-সব রেলিং দুবেলা মোছার জন্যে চাকর থাকে। দোতলায় উঠেই সিঁড়ির মুখে ছিল ছিপছিপে কালো একটা পিয়ানো, বাঁকা ও থাবাঅলা ছিল তার পায়া, সামনে একটা লম্বাটে রোগা চেয়ার। তার পায়াগুলিতে পিতলের উজ্জ্বল শু। তিনতলায় কী ছিল জানি না, তার কারণ আমি কখনো তিনতলায় উঠি নি। পিয়ানোর ক্যাবিনেটটার গায়ে ছিল পিতলের ফলক, কোম্পানির নাম মনে থাকার কথা না, London W-10, এটা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্যাবিনেটটা ছিল ওক কাঠের, উৎপল বলেছিল। ওক, বিচ, এল্‌ম, বার্চ...'ছেলেদের ভূগোল' থেকে পরপর মনে পড়ে যায়। এ ভাবেই মনে পড়ে পারপিচুয়াল স্লোলাইন বা গর্জনকারী চল্লিশা। অরোরা বোরিএলিস।

পিয়ানো বাজাতেন উৎপলের মা। তাঁকে দেখি নি; একবার স্বপ্নে দেখেছিলুম ওই পিয়ানোর অফুরন্ত ড্রয়ার আমি খোলাবন্ধ করছি, খালি উৎপলের মার দামী দামী জামাকাপড় সব—স্টোল, শাল, শাড়ি... এ-সব টেনে বের করে দোতলার লাল মেঝের ওপর জড় করছি, আমরা টাকা খুঁজছিলুম। পাশে দাঁড়িয়ে উৎপল বলে দিচ্ছিল। এটা স্বপ্ন; ঠিক যেমন এটা স্বপ্ন নয় যে পরলোকগত বাবার ইন্‌সেট সিন্দুক থেকে বোতলের পর বোতল বের করে উৎপল আমাদের বিয়ার খাইয়েছিল।

উৎপলের মা যখন মারা যান উৎপল তখন হাফপ্যান্ট পরে, শ্রাদ্ধ হয়েছিল বহরমপুরে। মাইল-২০ দূরের একটা হাট থেকে বৃষোৎসর্গের জন্যে কেনা হয় একটা বাচ্চা ষাঁড় ও উৎপলের মামা ব্যস্ততার জন্যে তাকে ও উৎপলকে একটা লরিতে তুলে দেন। বহরমপুর পর্যন্ত তরুণ ষাঁড় ও তার গলার দড়ি ধরে নেড়ামাথার বালক উৎপল ছুটন্ত লরিতে বসে থাকে, রাস্তা ফাঁকা, হু-হু হাওয়া শীতের, ষণ্ডশাবকটি ছিল আবার অসম্ভব স্বাধীনতাপ্রিয়, ফলে শেষ পর্যন্ত খোলা ও ছুটন্ত ট্রাকে তার গলা ধরে উৎপল ঝুলে পড়ে ও শেষাবধি আহত অবস্থায় বহরমপুরে পৌঁছয়। সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন এই গল্পটি উৎপলের দাদার মুখে শুনে খুব হেসেছিলুম মনে পড়ে।

উৎপলের বাড়িত ছিল ওই-রকম জিনিসে ঠাসা। ওই সিঁড়ির ডানদিকের দেওয়াল জুড়ে নানা ট্যাক্সিডার্মি, মাঝে মাঝে বেশ বড় সাইজের কয়েকটি আয়না। সিঁড়ির আয়নাগুলোর মধ্যে শুধু একটাই ছোট আয়না ছিল, সেটা ছিল ওভাল, তুলনাহীন যৌন আবেদনে ভরা তার

ছানার জলের মতো নীল কাচ ও সাদা ফ্রেম মনে পড়ে।

দোতলার প্রশস্ত বেডরুমে প্রকাণ্ড খাটের পাদদেশ জুড়ে দেয়ালে গাঁথা আয়না। চামেলির কাকাবাবুর ঘরেও এ-রকম দেখেছিলুম, খাটের পায়ের দিকে ওই-রকম ও এপাশে-ওপাশে দেওয়াল জুড়ে আয়না। আমাদের আগেকার বাঙালি বড়লোকেরা, বিশেষত কলকাতার কায়েত ও বেনে, এঁরা বেশ কামুক ছিলেন মনে হয়, যা ভাবতে ভাল লাগে। উৎপলের বাড়ির মস্ত ও চকচকে বাথরুমে ঢুকে দীপক বলে উঠেছিল, "বাঃ, খাশা বাথরুম ত হে তোমার।" আমারও অনুরূপ মনে হয়েছিল। তবে খাশা ও হে-সহযোগে আমি তা বলতে পারি নি।

মোটকথা উৎপলের বাড়িতে ছিল ওই নীরব পিয়ানো যা ছিল ওক কাঠের, ও... লিমিটেড, লন্ডন, ডাবলিউ টেন-এ তৈরি। এ-ছাড়া ছিল অজস্র আয়না। যেমন উঁচু দেওয়ালে থাকে অসংখ্য পোস্টার। বা, চুনারে যেমন দেখেছিলুম ইতস্তত কবর; রীনা ও আমি পৌঁছই বিকেলবেলা, মথুরাপ্রসাদ কেশ্‌রীর বাড়ি পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যায়। পরদিন ভোরে উঠে দেখি বাড়িটি গঙ্গার ধারে ও তার খিড়কিতে একটি কবর, ১৯৬২ সালে ইটালিয়ান সাহেবের তৈরি কুয়ার পাশে একটি ও গেট পেরুলেই ডাইনে-বাঁয়ে একটি করে। বাঁ-দিকেরটি ছিল জিন্দা-পীরের কবর, পির সুলাইমানি, পূর্ণিমা রাতে ওই পিরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। কার্তিক-পূর্ণিমায় ওখানে ছোট মেলা হয়, যখন মধ্যরাতে এক সময়, কোনও-এক সময়, কবরের ভেতর থেকে ভেসে আসে বাজনার শব্দ

রিঙ্কিঝিনি, রিঙ্কিঝিনি
রিন্‌কঝিনি রিন্‌কঝিনি রিন্‌কঝিনি
রিঙ্কিঝিনি...

সবাই শুনেছে। বস্তুত চুনারে কবর সর্বত্র, নুড়ির মতন ছড়ানো, গদা পাহাড়ে উঠে দেখি সেখানেও কবর, গদা-বাবার। তেমনি ছিল আকস্মিকতায়-ভরা সব আয়না, উৎপলের বাড়িতে। বালুয়াঘাটে সাহেবদের গোরস্তানও দেখেছি, সেও গঙ্গার ধারে, পাঁচিলে-ঘেরা, এপিটাফে-এপিটাফে ভরতি; সে-রকম দোকানের মতন নয় ঠিক।

বাড়ি বিক্রির আগে উৎপল সব জিনিস একদিন সকালে বেচে দেয়। সকাল থেকে ৪-৫ জন লোক এল। কেউ এসেছিল আসবাবপত্র কিনতে, কেউ পাখাগুলো কিনবে বা ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র—এ-রকম। উৎপল একজন লোককে বলল, "সব-জিনিস দেখে এসে দাম বলুন।" ভদ্রলোক ২-৩ ঘণ্টা ধরে সব জিনিস দেখে এসে দাম বললেন। লিস্ট না ছুঁয়ে উৎপল তৎক্ষণাৎ ৩০০ বেশি চাইল ও ভদ্রলোকও পরমুহূর্তেই রাজি হয়ে গেলেন। কেন ৩০০, আমি তখন বুঝতে পারি নি। মোটিফ কী? পরে ফ্ল্যাটের জন্যে উৎপল ৩০০ টাকা দিয়েই একটি সোভা-কাম-বেড কেনে। এতে শক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছিল খুবই। সে রাগ করে উৎপলকে বলেছিল, 'ছ্যা ছ্যা উৎপল, তুই বাড়ি বেচে একটা বেঞ্চি কিনলি?' উৎপল কেন ঠিক ৬০ হাজারেই বাড়ি বিক্রি করেছিল, আমি তা জানি না। ক্রেতা-ভদ্রলোক অবশ্য ক্ষীরোদ মার্কেটের ওপর উৎপলকে একটি এ্যাপার্টমেন্ট দেখে দেন ও মোট ৭-মাসের ভাড়া অগ্রিম মিটিয়ে দেন। কেন ৭ মাস, ফ্রাংকলি, জানি না। উৎপল ত দেড় বছর পরে বিলাত গিয়াছিল।

হাংরি জেনারেশনের ছেলেদের সঙ্গে ফোটো তোলার অপরাধে উৎপলের চাকরি যায়। "আপনি মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করার অনুপযুক্ত", এই চিঠি উৎপলের রয়েড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ওর দাদাদের হাতে হাতে ঘুরছিল। ওঁরা বেশ এসট্যাবলিস্‌ড ও ইনফ্লুয়েনসিয়াল, দাদারা, নিউ আলিপুর-টুরে বাড়ি, গাড়ি করে এসেছিলেন। ওঁরা ছোট ভাইয়ের জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উৎপল, "এ নিয়ে আর কিছু করার নেই", বলে হেসে হাত নেড়ে দেয়। ওঁরা এক এক করে উঠে যান। ওঁরা একটু একটু করে কেরিয়ার করেছেন, একজনের

কেরিয়ার এ-ভাবে ওয়াশড-আউট হয়ে যাচ্ছে অথচ সে দ্বিরুক্তিহীন—এতে ওর দাদারা স্পষ্টতই অবাক হয়ে যান। দাদারা চলে গেলে উৎপলই এই মন্তব্য করে। সম্প্রতি 'বাংরি' জেনারেশন নিয়ে জ্যোতি একটু ব্যারিস্টারি করেছে দেখলুম। তখন করলে পারত জ্যোতি, বা আমরা উৎপলের বন্ধুরা উৎপলের জন্যে কিছু করলে পারতুম, যারা, উমম্‌ম্‌... পাখি বা আস্তাবল না, তার বর্ণনা যারা পছন্দ করি, সমুদ্রতীর সম্পর্কে ছাপা অক্ষর ভাল লাগে। সমুদ্র না।

বলা বাহুল্য এ-জন্যে উৎপলের মনে কোনও মালিন্য ছিল না, আজ আর আমাদের মনেও কিছু নেই। বন্ধুরা সকলেই জানে, চাকরি যাবার পরেই উৎপল ছোটায় সেই ফোয়ারা যার নাম ফুর্তি, সে যে এতবড় আমোদগেঁড়ে, তা চাকরি যাবার আগে আমরা জানতে পারি নি।

উৎপলের মনে কোনও হিংসা ছিল না। অভিমান ছিল না। রাগ ছিল না। কোনও গ্রাজ ছিল না। বস্তুত হয় সে নিজে মানুষ ছিল না, নইলে সে কাউকে মানুষ মনে করত না, কেননা, তার সামনে কোনও মানুষ ছিল না এটা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। শুধু একবারই দেখেছিলুম উৎপলকে রেগে যেতে। যোধপুর পার্কে মঞ্জুশ্রীর বাড়ি থেকে ফেরার সময়, হঠাৎ উৎপল ট্যাক্সি ছেড়ে তরতর করে উঠে গিয়েছিল নির্মীয়মাণ একটা স্ক্র্যাপারের ছাদে, মধ্যরাতে চাঁদের আলোয় বেল্ট খুলতে খুলতে হাউস-টপ থেকে চিৎকার করতে করতে সে বারাবার করে বলেছিল, "চারদিকে এত বড় বড় বাড়ি, এ সব কাদের? পয়সা কোথায় পেলে বো❖❖দারা?" এত জোরে চিৎকার করেছিল উৎপল যে আশপাশের বাড়িতে টকটক করে আলো জ্বলে উঠেছিল। আমাদের দম্‌দমের ফ্ল্যাট থেকে দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যেত সারি সারি হাউসিং স্কিম। অদ্ভুত, থ্যাঁতা, হিংসুটে, রক্তমাখা, চাপা গলায় উৎপল আমাকে বলেছিল, "এইসব স্কিম দেখলে আমার মনে হয় দুউম্‌ করে একদিন পুরোটা ফেটে যাবে।" "এ্যামাউন্ট অফ কোরাপসান ছাড়া কোনও সাকসেস হয় না," এটা কে বলেছিল, উৎপল না তন্ময়? আমার কথাটা মনে আছে।

বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, উৎপল গ্যারাজে থাকত। একদিন গ্যারাজ থেকে একের-পর এক বাথরুম পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে ওর বাবাকে বাথরুমে যেতে দেখেছিলুম। ভদ্রলোকের পেটে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়, দ্রুত মারা যান। দেবেন্দ্রনাথের মতো নাকি দাড়ি ছিল উৎপলের বাবার, তাঁকে চোখে দেখি নি, শুধু তাঁর কাশি শুনেছি। বায় দা ওয়্যে, কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের কাশি শুনতে চান ত মেগাফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠের বীরপুরুষ আবৃত্তি শুনবেন, পাঠ হয়ে যাবার পর দুবার ঘনঘন শোনা যায়।

১৯৬৮

## মৃত্যু সম্পর্কে

মৃত্যু-সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য এই হতে পারে যে, ১, তা এক আক্রমণ। ২, অতির্কিত বটে, তবে গোপন নয়, আগে থেকে ঘোষণা করা হয়। ৩, একসঙ্গে সকলের মৃত্যু কখনো হতে পারে না। মৃত্যু এক এক করে, একবারে মাত্র একজনকে, আক্রমণ করে। সকল মানুষকে একসঙ্গে পরাস্ত করার ক্ষমতা মৃত্যুর নেই।

এ বড় অসম যুদ্ধ, আমি বলব। অসুখ হয়; সেরে উঠে অনেকে ভাবে, 'বাঁচলুম।' হেসে

তাকে বলার, 'এটা ভুল।' মৃত্যু থেকে কেউ কখনো বেঁচে উঠে না। তবু অন্যান্য মানুষদের নিয়েই আমাদের জীবন, ভাবি আমরা একসঙ্গে বেঁচে আছি। অথচ 'কোথাও যাচ্ছি না' ভেবে বাড়ি থেকে বেরনো চলে না বলেই আমরা কোথায় যাচ্ছি ভেবে নিয়ে চিরকাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, চুপ করে গেলে আমাকে লক্ষ্য করা হবে বলে কথাবার্তা বলে গেছি। আমরা কেন একা-একা ঘুরি না? একজন লোক ভিড়ের মধ্যে পড়ে যায় বলেই সকলে ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখে। জানি, আজকাল মানুষের সম্মান-করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কেউ বলে না, 'আহা'। তবু এই দেখাটুকু কত অশ্লীল!

এই জন্যে সময় থাকতে deliberately একা হয়ে যাওয়া উচিত। বড় ও ফাঁকা মাঠ একা পেরনো উচিত প্রায়ই। সকলে যদি এইভাবে নিজেরে single-out করে নেয়, তবে কারুকেই আর ভিড়ের মাঝখান থেকে তুলে নিতে হয় না। মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছলেই ছুটে এসে ঢেকে ফেলবে ঘুরন্ত লাল, ধুলোট-এর পরে কেবল স্থানটুকু পড়ে থাকবে।

এক এক করেও একা একা সকলের মাঠে চলে যাওয়া উচিত। অনিচ্ছুক হয়ে লাভ কী? আমরা নিজেদের সজ্জিত করেছি। অতর্কিত আক্রমণ আমরা এড়াতে চেয়েছি। আমরা চাই নি কেউ আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পায়। কেবল এইজন্যে আমরা নিজেদের dignified করে রেখেছি। দাড়ি কামিয়ে গেছি প্রতিদিন। আমাদের মাঠে ডাকা হোক। আমরা ইচ্ছুক।
একতলার বাথরুম থেকে শেফালির সাবান কে মেখে গেছে? ক্ষেয়ে গেছে তার সাবান। 'ছিঃ ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ', রামবাগানের বাথরুম থেকে ঘৃণায় শেফালি থুতু ছিটোচ্ছে উত্তরে, দক্ষিণে, চতুর্দিকে। 'এ কি প্রবৃত্তি!' শেফালি চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

কেবল মুহূর্তের মৃত্যু, কেবল মুহূর্তের মৃত্যু, এই আমাদের জীবন। তবু মনে হয়, মুহূর্তগুলি প্রবালের মতো কণায় কণায় জমে উঠছে কোথাও, জলের ভিতর থেকে জল ছিঁড়ে ডুবো পাহাড়ের মতো জেগে উঠবে একদিন, বারিপাতহীন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে শুষ্ক, শূন্য রাত্রি যখন বিদ্যুতে-বিদ্যুতে দিন হয়ে যাবে, সে অলৌকিক দিনের বেলায়, আমার এ-রকম বোধ হয়, আমরা সকলেই দেখে যেতে পারব সেই চূড়া সেই মৃতমুহূর্তের পাহাড়, মৃত্যুর শিখর, আমাদের অভিজ্ঞতার অবয়ব। তার জাগরণ।

হো হো করে হেসে উঠতে কি জোরে হেঁটে যেতে আমি কখনো পারি নি। কারণ আমি তাকে ভুলে গেছি যেই, অমনি সে, কিছু করে নি, আমার চেয়ে একমাত্র পরাক্রান্ত সে, কেবল আমার কাঁধে হাত রেখেছে। আমি হয়ত চন্দ্রকোষ শুনছিলুম। 'ভাল?' কাঁধে হাত রেখেছে সেই ইয়েতি। 'যাও, এখন কী, এখন গান হচ্ছে' বা, 'চোপ্‌রও, এখন আমি চুম্বন...' মৃত্যুকে এ-কথা আমরা কোনওদিন বলতে পারি নি। মাঝে মাঝে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।
ঠিক সময়ে সাবানের বিজ্ঞাপন জ্বলে উঠলে, মাঝে মাঝে, টু-বি বাসের আপার ডেক থেকে ও হু-হু হাওয়ার মধ্যে

| চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল (Extn.) |
|---|

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করি।

অধিকাংশ লোক চায় আরও ভাল-করে বেঁচে থাকতে। মানুষের মধ্যে আজ শুধু এদেরই বলা যেতে পারে অভিজাত মানুষ—মার্কসবাদী, মালিক, পুঁজিবাদি, শ্রমিক, ভণ্ড, সাধু, মিস্টিক,

এগজিস্টেনসিয়ালিস্ট, ভীত, মদ্যপ, পরাজিত, বেশ্যাসক্ত—(মোট ৯১১-রকম)—এদের সকলকেই, এদিক থেকে, একই নিশ্বাসে অভিজাত বলা চলে। বস্তুত bar-এ যাওয়া সাহেব সেজে বল-ড্যান্সে যাওয়ার মতোই হাস্যকর তথা imperialistic মনে হয়। আমরা স্বল্পসংখ্যক লোকই শুধু চিরকাল থেকে আজও অনভিজাত থেকে গেলুম।

আমরা যারা চিরকাল গরিব, তারা গরিব শুধু এই কারণে যে, শুধু বেঁচে-আছি বা শুধু বেঁচে-থাকাতেই আমরা তাজ্জব তথা মুগ্ধ। প্রতিদিন মলত্যাগ করেই আমরা মুগ্ধ বা প্রস্রাব করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের সকল ভার নেমে যায়। যৌনতা-ব্যতিরেকে আজ আমরাই বাঁচতে পারি, স্ত্রীর পিরিয়ডের হিসেব আমরা গরিবেরা রাখি না।

এ ছাড়া আমাদের খিদে পায় ও না খেলে আমাদের চলে না এবং প্রস্রাব ও বাহ্যে অবশ্যই হওয়া চাই। অতএব জঠরের ক্ষুধা, বাহ্যে ও প্রস্রাব—এই ত্রয়ীর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা গরিবেরা পৃথিবীর অভিজাতদের স্পষ্টও নির্বিশেষভাবে চিনে থাকি। এইজন্যই আমরা প্রতিটি মলত্যাগে এত মুগ্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তিতে সুখী ও প্রতিবার প্রস্রাব করে এসে এমন নির্ভার। শেক ফোঁটাতক প্রস্রাব ঝেড়ে প্যান্টের প্রত্যেকটা বোতাম আঁটতে আঁটতে পাবলিক ইউরিনাল থেকে বেরিয়ে আসে যে পরিতৃপ্ত যুবা, তার মুখে যৌনতা দেখি না।

মৃত্যু দেখি না। মালিকশ্রেণীর এ কোন পৃথিবীব্যাপী চক্রান্তের ফলে অই প্রিয় যুবা ধরে নিচ্ছে যে সে শেষবার প্রস্রাব করে আসে নি? তার আবার প্রস্রাব হবে কি?

বহুকাল পরে উঠেছি এ-রকম শেষরাতে; ঘুম ভেঙে যেতে প্রথমেই রিনা ও মেয়ে শুয়ে আছে দেখতে পাই এতে আশ্চর্য হই না; ঘরে সবুজ আলো, আগাগোড়া সাদা মার্বেলের আধুনিক প্রাসাদ, লাল স্টিলের জানালার আর্চ দিয়ে মশারির ভেতর থেকে ঘুমঘোরে চাঁদ দেখে এও স্বাভাবিক মনে হয়; আরও ঘুমতে ইচ্ছা হয়; শুধু 'আরও প্রগাঢ় ঘুমতে পারব' এই যুক্তি বাথরুমে যেতে বলে, ঘরের দরজা খুললে বাইরে উঁচুতে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে, রাস্তার ইলেকট্রিক তারে শর্ট-সার্কিট মনে হয়... ক্রমে ছাদের দরজা সশব্দে খোলা-বন্ধ হবার শব্দ পাই, আলো জ্বালাতে জ্বালাতে একা ছাদে উঠে যাই যে-কোনও অবস্থায় সম্মুখীন হবার জন্যে, ওপরে উঠে দেখি সিঁড়ি আরও উঠে গেছে, উঠে ভেঙে গেছে ছাদের দরজা হা হা করছে, বিদ্যুতের ঘন ঘন আলোয় তার খোলাবন্ধ সহসা দেখে আজ শেষরাতে সর্বহারা মানুষের কথা মনে পড়ে যায়—প্রাণছাড়া যার হারবার কিছু নেই।

বাড়ির ওপরের আকাশ দিয়ে অদ্ভুত আঁধারের দিকে রোজই দু-এক ঝাঁক টিয়া উড়ে যায়। কলরব ঝরে পড়ে। আমাদের বাড়ির সবুজ পাখিটির উত্তেজনা ক্রমশ কমে আসছে। আজকাল সে কেবল মুখ তুলে চায়, উত্তর দেয় না। শুধু তার ঘনসবুজ পাখনাদুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, পিতলের ঘুরন্ত দাঁড়ে সে আজকাল অতি ধীরে হাঁটে। তার পায়ে উজ্জ্বল শিকল।

১৯৬৮

# কয়েকটি শিরোনামা-১

## আমার ক্ষমাহীনতা

বারীন রয়েছে হাসপাতালে, তাকে দেখতে গিয়েছিলুম। ঢোকার সময় দেখে যাই নি, আওয়ার্স শেষ হলে বাইরে বেরিয়েই দেখি আঁধার; ও জনস্রোত একসঙ্গে দেখে আমার মনে পড়ে জানাবার কিছু নেই, সকলেই জানে যা জানার, ভাল করে চেয়ে একবার দেখলেই সব জানা যায়; এ-ফুটপাত থেকে ও-ফুটপাতে চলে যাচ্ছে দলবদ্ধভাবে মানুষ, কেউ একা হাঁটছে না, তারা এত মুহুর্মুহু রাস্তা cross করছে কেন, কেন তারা ভুলেও থামে না, কেন এ-গলি দিয়ে ঢুকে পড়ে ও-গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে—গলির মুখ থেকে বেরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলিগুলি দুদিক দেখে নিয়ে কেন তবে সেন্ট্রাল এ্যাভিনুএ পা দেয়? সকলেই সকলের আগে যেতে চায়। কেন?

এ কি নয় আঁধারের অনুসরণ?

বারীনের বোনও গিয়েছিল হাসপাতালে। তাকে শেষ যখন দেখি সে ফ্রক পরত। আমি তাকে বলি [তার নাম জানি না] "চলো, তোমাকে পৌঁছে দি।" কেউ কি শুনতে পায়? নাঃ। আজকাল সকলেই কিছু না-কিছু বলছে, আমিও তাদের শুনতে পাই না। এ বয়সে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান হলে সব দেশেই মোট আয়ু দাঁড়ায় আর ৬-সপ্তাহ, বারীন আর ৩-সপ্তাহ বাঁচবে। আমি, "একটা নতুন ওষুধ এসে পড়ার কথা আছে" বললে ভর্ৎসনা করে বারীন আমাকে বলে, "সান্‌তোনা দিচ্ছিস?" বলে সে একদম চুপ মেরে যায়।

একটা রিকশা ডেকে তাকে উঠতে বলি। সে ওঠে, সব জেনে। কেউ কেউ চুলও বাঁধে, সব জেনে। শীতকাল; যুক্তিসঙ্গত পরদা ফেলে দিই। কেউ আমাদের লক্ষ্য করে না।

## চামেলিকে আমি

"দ্যাখো, তোমাকে দেখেই ত আমার ভালবাসা জন্মায় নি, প্রথম দৃষ্টিপাতেই আমরা অনুরক্ত হয়ে পড়ি নি। তবু তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি প্রেম জানাচ্ছ? আমাদের ত চেষ্টা করতে হবে পরস্পরের প্রেমে পড়তে, যদি আমরা তা পারি সেই হবে আমাদের প্রেম। আমাদের সময় লাগবে এবং সফল হব কিনা আমরা জানি না। এ-ভাবে প্রেম না হলেই ছিল ভাল, তবু আমরা দুজনে কাছাকাছি এসেছি কিছু আশা করে; আমাদের দুজনেরই তা না-হলে আর চলে না বলে। কিন্তু আমরাই পরস্পরের প্রণয়পাত্র বা পাত্রী কিনা আমরা জানি না। হয়ত আমরা নই। তবু একথা সত্য কিনা জানার চেষ্টা করব বলেই আমরা কাছাকাছি এলুম। তবে কেন তুমি এত passionately এগিয়ে আসছ, দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছ কেন? আমাকে এমনভাবে চুম্বন করতে দাও যা হবে কিছু মৃতদেরও... Let me kiss my own", এই বলে তাকে আমি— তার রূঢ় ঠোঁট!

## সুধা ও অন্যান্য বেশ্যা, ও চামেলি

একদিন বিকেলবেলা জেঁকে বৃষ্টি এসে গেল। সুধা শার্শিগুলো বন্ধ করে লেপের মধ্যে এলে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। সুধা কাঁপতে ভালবাসত। সুড়সুড়ি দিতে বলত পিঠে।

বলল, "বেশ ত হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন পিঠে। কী হল?"

লজ্জা হয় তাকে বলতে, সেই নির্লজ্জাকে। তবু আপত্তি সে করতে পারে না। হায়, তার

অধিকার নেই।...

চামেলির বিয়ে হয়েছিল কাছেই, তখন স্কুলমাস্টারি করত আলমবাজারে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গরম চাতালে বসে দুপুরবেলায় তাকে প্রেম-নিবেদন করতেও খুবই লজ্জা হয়েছিল, ও ৮-বছর সময় লেগেছিল। মানুষের এ-রকম সময় লাগে বা লজ্জা হয়। দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দিরের ভিতরে গিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে বিগ্রহের সামনে নত হবার সময়ই সহসা তার বিশাল পাছার উত্থান আমি দেখি, তার জঙ্ঘা ও কুন্তল ও স্তন ও নিতম্ব ও গ্রীবা মুহূর্তে একাকার হয়ে যায়, তার জঙ্ঘাকুন্তলস্তননিতম্বগ্রীবা ও আমার ধর্মাধর্মবোধের বিপুল ধাক্কা ও উপর্যুপরি ফাটার শব্দে আমার শরীরময় সমস্ত জীবন বিধ্বস্ত হতে থাকে, তার জঙ্ঘা ও তার কুন্তল ও আমার ধর্ম ও আমার অধর্ম ও তার স্তন ও তার নিতম্ব ও আমার যৌনবোধ ও তার গ্রীবা—আমার এতদিনের এইসব আমার চোখের সামনে একাকার হয়ে যেতে দেখে নতজানু হয়ে ভেঙে পড়ে তার বিস্তীর্ণ শ্রোণি আমি দুহাতে জড়িয়ে ধরি, উজ্জ্বল প্রদীপের চচ্চড় শব্দের মধ্যে আমাদের প্রগাঢ় যৌনচুম্বন তাকে টেনে তোলে, ঠোঁট ছিঁড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার বুকে সেও উপর্যুপরি চুম্বন করতে থাকে, তার জঙ্ঘা কুন্তন স্তন নিতম্ব ও গ্রীবা আমার বুকের ওপর সমূলে ভাঙতে থাকে। শাস্তির পরিমাণ দেখে আজ বুঝি একদিনে পাপ কত বেশি হয়েছিল, পুলিসে পিছু নিয়েছিল বলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করা কি ঠিক হয়েছিল?

ঠিক হয় নি, ঠিক হয় নি, ঠিক হয় নি। পাপ হয়েছিল।

...সুধার অঙ্গে হাত দিয়ে আজ চামেলির অঙ্গের কর্কশ চুলগুলি মনে পড়ে। সুধার একতাল মোটা কোমর আমি ভাল করে জড়িয়ে ধরি। দর্শকের মতো সে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। আমার চোখের ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ ক্রমশ আর শোনা যায় না। তার কষ্ট হচ্ছিল। যৌনকষ্ট তার পাবার কথা না, তার অভ্যাস আছে। অপমানিতও সে হতে পারে না। তবে?

সে এক-একবার বলছিল, "উঃ, কী হাড় আপনার গায়ে। ফুটছে, মাংসর ভিতর বিঁধে যাচ্ছে। কী গরম, জ্বর হয় নাকি আপনার?" অবশেষে বলেছিল, "খাওয়া হয় নি কিছু—দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তারপর আপনি এলেন—উঃ—খাওয়া হল না—উঃ—আমার খাওয়া হয় নি—উঃ—" এইসব সে বলছিল। অনেকদিন পরে জানতে পারি সে তখন গর্ভবতী ছিল।

একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মাঝে একদিন ওপাড়া ঘুরে এলুম। সকলের সঙ্গে দেখা করে এলুম—কার্টসি কল। দেখলুম সকলেই বেঁচে আছে বহালতবিয়তে। অসুখবিসুখ করে নি কারুরই এ দুবছরে বা করলেও বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সকলেই চিনতে পারল এমনকি শান্তাও। প্রথমটা চিনতে পারে নি।

শান্তাকে আমরা প্রথম ধরি কলিন লেনের এক অবৈধ ব্রথেল-এ, সে যে ফোকলা তা কে জানত। তার সামনের দুটো দাঁত ছিল বাঁধানো, আমরা বুঝতে পারি নি। ভেনিশিয়ান রেড কোট ও আমার হাওয়াই চপ্পল পায়ে সে গিয়েছিল পেচ্ছাপ করতে। বাথরুমে তার বমি পায়। কমোডের ভেতর দাঁত-দুটো পড়ে গেল। ভাস্করের হাত ধরে তার সে কী কান্না। সেদিন রাতটা তার বাড়িতেই কাটানো গেল। প্রচেত বাড়ি চলে গিয়েছিল, পরদিন বেলা করে সে এল। শান্তা সারা সকাল ঠোঁট ফাঁক করে কথা বলে নি, ঘণ্টাকতক খুব ঝামেলায় ফেলেছিল যাহোক। অন্যসময় ওর গাম্ভীর্য ভান মনে হত, সেদিনই ওর ভানহীন গাম্ভীর্য আমি প্রথম দেখি। আজ সোনা-বাঁধানো হাসি হেসে সে বলল, "ও! বুঝতে পেরেছি। তারপর—কী খবোর—আসো

না কেন আর?" বীণারও অবস্থা ফিরে গেছে, তার বিছানায় কাশ্মীরি সুজনি, ঘরে উজ্জ্বল আলো। সে উপহার পেতে ভালবাসত, তাকে একখণ্ড শারদীয় উল্টোরথ উপহার দিয়েছিলুম। সে কথা মনে করিয়ে দিতে মুহূর্তে তার সবই মনে পড়ল। সে উল্টোরথ খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিল।

নীলিমা গুপ্তাকে হার্লট বলব কিনা জানি না, কারণ জানি না অন্যান্য যে-সব ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরচিয় হয়েছিল তাদের তাহলে কী বলব। নীলিমা গুপ্তার দরকার হয়েছিল টাকার। ১০০ টাকার দরকার হয়েছিল নীলিমা গুপ্তার। হাঃ হাঃ, বলেছিলুম, দোব। যাহোক আজ বার-এ বেরুবে বলে তৈরি হচ্ছিল, গা ধুচ্ছিল বাথরুমে। একজন হেঁকে বলল, "ও নীলিমা, তোর ঘরে একজন বাবু এয়েচে রে।" বাথরুমের ভেতর থেকে অবিশ্বাসিনী বসে উঠল, "যাঃ!" বুঝলুম ওর বাজার পড়ে গেছে, আজকাল কেউ আসে না, বার্ থেকে মাতাল হয়ে-পড়া যাদের কেবল আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে ও আনে, তারা ছাড়া। তাদের কাছে স্ত্রীলোক কিছু না, মধ্যরাত্রির সজ্ঞান মাতালেরা একটা ঘরে গিয়ে ঘুমুতে চায়। তবুও পরদিন বাড়ির সবাই জানবে নীলিমার ঘরে লোক এসেছিল, দালালে শেয়ার চাইবে, মাংসঅলা গুনে নেবে পয়সা। নীলিমা মদ আনাতো দুপুরে। একে বসে খেত। ভালবাসত একা খেতে।

শান্তা সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে ফেলেছে, বীণার অবস্থা ফিরে গেছে। ৩।।০ টাকার বেডকাভার নীলিমা কাচাতে পারে নি হপ্তা-দুই, ছেঁড়া, অনেক দাগ এখানে সেখানে।

আলমারি থেকে বাসি করা একটা কাপড় বের করে আমার দিকে পিছন ফিরে সে পরল। দেখলুম, তার বয়স হয়েছে। দেখলুম, তার আলমারিটা ফাঁকা, এ-রকম ফাঁকা আলমারি আমি আগে কখনো দেখি নি কোনও বেশ্যার, যদিও তাড়াতাড়িই সে পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছিল।

## ভালবাসাবাসি

মীরা লিখেছে, "তুমি আমার জীবনে আগে এলে না কেন!"

এলুম এটা ধরেই নিয়েছে। ভাল। আমি তার ভুল ভাঙাব না। আমি তার চিঠি পেয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিলুম। এই হাসি ভয়াবহ একথা মনে করিয়েও হাসি থামাতে পারি নি। থামাতে পারে নি বলে সুনীল রায় এখন লুম্বিনীতে।—"আগে এলে না কেন?" হা হা, আমার ফের হাসি পাচ্ছে, কে কাকে, কী-প্রশ্ন করছে!!

## পুরীতে ঝড়বৃষ্টি

বজ্র ও বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমুদ্রের এমন অদ্ভুত চেহারা মনে হয় স্বপ্নে দেখেছিলুম। শত্রুপক্ষের আলোয় সমস্ত দিগন্ত কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে সমুদ্র তার ত্রিশূল তুলে ধরে। দণ্ডায়মান [perpendicular] বিদ্যুৎ আমি আগে দেখি নি। মাঝে মাঝে হাওয়া পড়ে যায়, শব্দ থেমে থাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর অদূরে প্রথম ব্রেকারের কাছে ঢেউ ফেটে পড়ে—সমুদ্রের কামানের শব্দ হয়। ওরা জলে পেট্রোল ছড়িয়ে দিয়েছে, একমাত্র আঁধারে রূপালি আগুনের স্রোত বারংবার ছড়িয়ে পড়ে।

যুদ্ধের শব্দ—এইসব। আগুন জ্বলে ওঠার শব্দ, কামান দাগার শব্দ, শিঙাভেরিকাড়ানাকাড়া বেজে ওঠার শব্দ;

আমাদের কোনারক থেকে করতালের শব্দ ভেসে আসে।

এখানে-সেখানে যে বলি "ঈশ্বর বিশ্বাস করি", এটা কি ঠিক বলি? ক্ষমাহীন থাপ্পড় একদিন কি খাব না গালে যে, "এই লোকটার আস্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে ছিল, এ লোকটা ড্যামড লায়ার, আহাম্মক আমার সম্পর্কেও মিথ্যে কথা বলে গেছে?"

নাস্তিক তার ক্ষমা পাবে, চামেলি পাবে। আমিও ঈশ্বর হলে তাকে ক্ষমা করতুম। মানুষ বলে পারি না। সে বলে সে আমাকে বোঝে না, স্পষ্ট তার কথা, বাস্তবিক সত্য এ-রকমই, তার ওই স্পষ্টতা। "আমি বুঝি না"—একথা বলায় দোষ নেই। কিন্তু আমি বলি, "আমি বুঝি", বুঝি-না এ-কথা আমি বলতে পারি নি। আমি নির্বোধ এ-কথা জেনে বিনীত না হয়ে পড়ে আমি কপট হয়েছি।

যোনিহীন নারী হলে বড় ভাল হত। শুধুই আদর করার জিনিস হলে। কিন্তু এ যে আরও মারাত্মক!

এ-ও ভাবি, জীবনে নারীসংক্রান্ত সমস্ত দাবি ছেড়ে দেব কী করে?

মা। এত বাড় ভাল নয়, দ্যাখো না কী হয়।

আমি। কী আবার হবে, তোমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, আমি তার ওপর...

মা। [চেঁচিয়ে] ওঃ

আমি। [চাপা স্বরে] নিচু গলায় কথা বলো।

মা। [ফল্‌স দাঁত চেপে] ভগবান, যেন কুঠ হয়... যেন প্রাণে না মরে।

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে মার মুখের দিকে জল ছুঁড়ে দিই। গ্লাসে জল ছিল না। মা মুখ সরিয়ে নেয়।

তবুও মূল অসুবিধে মনে হয় আমার এই হাত দুটি নিয়ে। কী ফাংশান এদের; হাত দুটি নিয়ে কী করব কিছুই বুঝতে পারি না; শরীরময় সমস্ত জীবনের মধ্যে হাত দুটিই শুধু স্ট্রেঞ্জ লাগে।

শরীরের কথা মনে পড়ে, যেন কত দূরের কথা। কোথায় আছ তুমি শরীর, ভাল নেই জানি, শান্ত হয়ে আছ এত, কতটা পচেছ?

## স্মৃতিচিত্র

দমদম রোড দিয়ে একটা মস্ত সিনেমার ব্যানার নিয়ে যাচ্ছে দুজন কুলি; ব্যানারের ওপর, দুর্গের পাঁচিলে অসিযুদ্ধ, পাহাড়, ঝরনা ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার ও সমবেত নাচের ওপর, মেঘ ও চাঁদের ওপর ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে কলকাতার আঞ্চলিক বৃষ্টি—বসন্তপঞ্চমীর দিনে হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরে একটি ফুটফুটে কিশোরী ও খুব সম্ভব তার ভাই, তারা ব্যানারের নিচে ঢুকে পড়েছে অনুমতিবিনা—কুলিদের সঙ্গে মার্চ করে হেঁটে যাচ্ছে... তাদের মাথার ওপর এ-প্রান্ত থেকে আলুলায়িতা নায়িকা অবিরল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ও-প্রান্তের নায়কের দিকে হাসতে হাসতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে ছুটে যাচ্ছে।

*কৃত্তিবাস, ১৯৬৮*

## পরিচারিকার নাম আশা

সারা দিনে নানা জিনিস চাই, নানা জিনিস দরকার হয়। রাগ, অভিমান, খিদে ইত্যাদি হয়, কখনো-বা বেশ লাগে। অসহায় বোধ করি....চেয়ে দেখি কোনও Defence নেই। বিপদের মধ্যে পড়ে যাব মনে হয়। গেলে কিছুই করা যাবে না—কোনও ব্যবস্থা নেই। বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি মনে হয়। মুণ্ডু ঘুরিয়ে বারবার করে দেখি কেউ আসছে কিনা, মুক্তিটেলিগ্রাম বা কোন সাহায্য।

'কুকুরের মতো।' দুঃখ ও অপমানবোধ চুপ করে থাকি।

নইলে নানা কথা বলি, নানা জিনিস প্রয়োজন হয়। "একগ্লাস জল নিয়ে আয়", বলি। "এতদিন রইলি, অথচ, তোকে যদি বলি দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো নিয়ে আয়, পারবি না, হয়ত টিউব বা কাঁচি আনতে ভুলে যাবি, কিংবা ফেনা রাখার জন্যে দেশলাইয়ের খালি বাক্স।"

"যদি ধুয়ে ঠিক মতো তুলে রাখতে পারতিস কত ভাল হত;"—বলি।

কাঁধের কাছটা টিপে দিতে বা শুতে যেতে বলি।

"তোর দ্বারা আমার কাজ হবে না। তোকে ছাড়িয়ে দেবো। এতদিন হয়ে গেল এখনো তোকে সব বলে দিতে হয়।" রেগে বলি, "বল্লে তবে করিস, নইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস।"

সারা দিনে নানা জিনিস চাই। এটা-ওটা দরকার হয়। প্রতিটি চাওয়ার মধ্যে আশা থাকে, যে পাব। যেমন, "একগ্লাস জল দে রে আশা", বা "রাত হয়েছে, আশা শুতে যা"।

১৯৬৮

## কাল দেখা হবে

মানুষ নুয়ে পড়ে। "কী রে, কেমন আছিস?" এর উত্তরে অনেককাল পরে কাল দেখা হলে অংশু ভেবেছিল বেচুকে বলবে যে, "এখন একটু নুয়ে পড়েছি, বুঝলি?" বুঝবে কি বেচু? কথাটার সত্য কিছু পাবে কি? বেচুও কি কাটায় নি তারই মতো ৩৫-বছর, তবে কেন বুঝবে না, বেচু কেন কথার-কথা হিসেবে নেবে, নেবে না মনে হয়। অবশ্য সে এটা খুবই স্পৃহাহীন গলায় বলবে। ইচ্ছে করে যে স্পৃহাহীন, তা না। ৩৫-বছরে তার কণ্ঠস্বর যে-রকম তা-ছাড়া অন্য কোনওভাবে কথা বলার তার উপায় নেই, এই জন্যে। সে কেনই-বা বলতে যাবে খামোকা, তার দায়িত্বটা কীসের, সে ত কোনও নাটকের চরিত্রের অভিনয় করছে না। সে বলে গেলেই হবে, নাটক হবে কিনা বলা যায় না, কিন্তু চরিত্র না হয়ে যাবে কোথা, হতে বাধ্য, কেননা, অংশুর চরিত্রে সে ছাড়া আর কে রূপদান করবে?

"একটু নুয়ে পড়েছি", এই কথাই সে বলবে। তখুনি না। পরে বলবে, "বুঝলি?" বেচু বুঝবে না? যদি না বোঝে, তাতেও অংশুর কথা মিথ্যে হয়ে যাবে কি? যাবে না। বুঝলে বড়

বেশ হত, বেচু বুঝলে। কিন্তু অংশুর সত্য তবুও কিছু আছে যা কিনা, বেচুনিরপেক্ষ। "আমি একটু নুয়ে পড়েছি", এই হচ্ছে অংশু বা নিরপেক্ষসত্য বা তার চরিত্র। (এখানে অংশুর চরিত্রের শারীরিক নুয়ে-পড়ার কথা বলা হচ্ছে।)

এরপর, অংশু আরো বলবে। বেচু আরো জানতে চায় ভাল—না চাইলেও সে বলবে। তার কাজ পুরোটা বলা, এইজন্যে সে আর-একটু বলবে। (ঈষৎ হেসে বলবে জানা কথা।)

"কিন্তু মজা কী জানিস?" অংশু বলবে (হেসে), "শুধু এইটুকু বলে যদি আর-কিছু না-বলার থাকত! এখনো, বুঝলি বেচু, ওই যে নুয়ে-পড়ার কথা বললুম না, ওটা সোজা হতে চাইছে। মানে, আগের মতো হতে চাইছে। অথচ দ্যাখ, নুয়ে ত পড়েছি—এ্যাঁ? আর....একবার নুয়ে-পড়লে ওই নুয়েই ত থেকে যেতে হয়, কিছুতেই আর সোজা হওয়া যায় নাকি, কেউ কি হতে পেরেছে সোজা, এ্যাঁ, তুই বল না? এই হয়েছে মুস্কিল, বুঝলি ভাই! আবারও সোজা হওয়া যায় না—জানি; হয়ত আরো নুয়ে-পড়া ঠেকাতে পারি, হয়ত পারি না। এটা জানি না বটে। চেষ্টা ত করছি খুব যাতে অন্তত আর নুয়ে না পড়তে হয়। কারণ একবার নুয়ে পড়লে, যতটা নুয়ে পড়লে ততটা নুয়েই থেকে যেতে হয়, সোজা হওয়া আর যায় নাক', এই আর কী। এটা জেনেছি। বেশ ত তা না হয় হল যে জেনেছি যে, জানি। কিন্তু জানি যখন তখন অবস্থাটা মেনে নেব না কেন? নেব ত? ওই...যেটুকু একবার নুয়ে পড়েছি—সেইটুকু মেনে নেব ত। যে, যা হবার হয়ে গিয়েছে, তার ত আর চারা নেই, আর যেন নুইতে না হয় এ-রকম, এ-রকম একটা attitude নেব ত? কিন্তু মজা কী জানিস, যা প্রথমেই বলেছিলুম তোকে...ওই ওই-টুকু নুয়ে-পড়া সোজা হতে চায়, আবার ঠিক অবিকল-আগের মতন সোজা। সম্ভব না। জানি; জেনেছি। তবু ওই tension থেকে যায়। কষ্ট এই...আর কী...উম্‌ম্‌ম্‌ম্‌, আর কিছু নাঃ।"

এত বলে, বেচুর মুখের দিকে না তাকিয়ে, বোধহয় চশমার কাচ মুছতে মুছতে অংশু বলবে, "আমি এইরকম আছি বেচু।"

১৯৬৮

## চাইবাসা চাইবাসা

প্রিয় সন্দীপন নিশ্চিত ভাল আছিস। সুনীলকে একটা চিঠি দিয়েছি। তুই ও সুনীল উভয়ে কেমন আছিস জানাস। ইতিমধ্যে কাশী গিয়েছিলি কি? আমার ওপর বিরক্ত হবার সত্যিই কিছু নাই। শীলার বিষয় সম্পূর্ণ আমার এক নতুন খেয়াল। ও নিয়ে আমার ব্যস্ততা যত পরিদৃশ্যমান, অন্তর্গত ঘনশূন্য বুঝতে পারা তোর উচিত ছিল। মোটের উপর ব্যাপারটার মধ্যে লক্ষনীয়তা যা তোরা দেখে গিয়েছিস তা অভিসন্ধিমূলক। অভিসন্ধি যদি আমায় ভবিষ্যতে বাঁধে, বাঁধতে পারে, তাতে ক্ষতি কার? প্রেম আমার নাই, আমাদের কারুরই নাই, সুনীলের আছে। এত কথা তোকে বলতেই আমার লজ্জা করছে। ভেবে দ্যাখ, চাইবাসায় তোর ব্যবহার আমার প্রতি তত পীতিজনক ছিল না। তোর প্রীতি না পেলে কষ্ট হয়, হয়ত ভবিষ্যতেও হবে। তুই যদি নিজেকে না বোঝাতে পারিস তবে আমায় চিঠি দিস না। তোর নির্ভরতা বা বন্ধুতা আমার ভীষণ মূল্যবান জিনিশ। আংশিকভাবে কোলকাতার একমাত্র। নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে আমি যেমনভাবে চলাফেরা করতাম, তেমনিভাবে আর চলব না, সামান্য বদলাতে হবে—

একটু জানাস। গত কয়েকদিন ধরে সারা কোলকাতা শূন্য মনে হচ্ছে। চাইবাসাও পূর্ণ নয়। যেতে ইচ্ছে করছে না বলে রয়ে যাচ্ছি কেবল, দিনের পর দিন। আমি বেশ দুর্বল।

তুই চিঠি দিস নি বলে ধরেই নিচ্ছি তোর জানাবার বা সংবাদ নেবার কোনও লোভ নাই। সমীর ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে কোলকাতা যাবে, ওর সঙ্গে যাব, যাওয়া-থাকা সমান। পরীক্ষার জন্যে একবার যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু কিছুই ভাবতে ভাল লাগছে না। তোকে বিরক্ত করবার জন্যে বলছি না, অবস্থা আমার ন্যক্কারজনক। ভালই আছি।

শক্তি

চাইবাসা, ২৬।৮।৬০

প্রিয় সন্দীপন, যাবার ঠিক আগে তোকে চিঠি লিখছি, হয়ত আমি পৌঁছানোর পরে তুই চিঠি পাবি। ইতিমধ্যে একটি পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম, সুনীলকে দিয়েছি। কৃত্তিবাসের কী সংবাদ? তুই লেখার দিকে সামান্যতম এগিয়েছিস কি।

আমার গত রবিবার যাবার কথা ছিল, কিন্তু নানাকারণেই যেতে পারলাম না। এই সোমবার নিশ্চয়ই পৌঁছাব। এখানে এসে বড় কাব্যনাটক একটা শেষ করেছি; না ঠিক শেষ হয় নি, আজই করব। মাঝে রাউরকেলা গিয়েছিলাম। আজ সমীর রাঁচি গেল কাজে, আমার যেতে মোটেই ভাল লাগল না। আমি অনেক পদ্য লিখেছি। আমার পদ্য তোর আজকাল ভাল লাগে না। আমার জীবনযাত্রাও তোর আজকাল ভাল লাগে না। হয়ত আমিই ভুল। কিন্তু সবকিছু দেখতে দে। তোর জন্যে প্রতিদিনই কষ্ট হয়। শীলার জন্যেও। পৃথিবীর সবার জন্যেই কষ্ট অথবা লক্ষ্য আমার তারও কম। অনুভব করতে পারলে ভাল, না পারলেও কোনও ক্ষতি নাই। কোলকাতায় গিয়ে স্থির করব অদ্ভুত বিস্ময়কর প্রস্তাব একটি, আমি যে-কোনও উপায়ে এ-বছরেই বিলাত যেতে চাই। এ-দিকের কোনও অসুবিধে হবে না, তুই তোর ভাইকে লিখে দে। গিয়ে বিস্তারিত বলব। তুই অবাক হয়ে যাবি।

কৃত্তিবাস-সম্পর্কে এখানে ভাবতে ভাল লাগছে না। গিয়ে দেখব। তুই কেমন আছিস? দীপেন কেমন! আর সবাই?

তোর শক্তি

সেন্ডার্স নেম অ্যাড্রেসের ঘর ফাঁকা, আপনার চিঠি দেখে প্রথমটা আমি চমকে উঠেছিলুম, সন্দীপনবাবু। আপনার ইংরেজি হাতের লেখার সঙ্গে আমি ততটা পরিচিত নই, এবং খুলে পড়বার আগেই ডাকছাপ দেখে শখের গোয়েন্দাগিরি না করেই বুঝতে পেরেছিলুম আপনার চিঠি। খুলে দেখলুম যতটা কঠিন চিঠি আমি আশা করেছিলুম তার চেয়ে অনেক কঠিন, নিষ্ঠুর চিঠি আপনি লিখেছেন।

আপনাকে যে-যে বিষয়ে আহত করেছি সেগুলি চিঠিতে কেন উল্লেখ করতে গেলেন। আমি কি জানি না? যে-সময় ওই ব্যবহারগুলো করেছিলুম তখন থেকে জানতুম। আপনাকে ওইগুলি কতটা আঘাত করেছে তা বুঝতে পেরেছিলুম কাশী যাবার আগের দিন বিকেলে কফি হাউসে যখন আপনি আমার উপস্থিতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা এবং অপমানজনক ভাবে অবহেলা করছিলেন। অথচ ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম বলেই আমি একটুও অপমানিত বোধ করি নি। আপনি আরও দু--একদিন কলকাতায় থাকলে আপনাকে আরও কিছু আঘাত করে আপনার কাছ থেকে আমার প্রতি আরও কিছু অপমান ব্যবহার আদায় করে নিতুম।

আপনার চিঠিতে দেবেশের নাম দেখে আমি সব বুঝতে পারলুম এবং বিরক্ত বোধ করলুম। আসলে তার আগের দিন বাজারের চায়ের দোকানে আমি যে চিৎকার করে করে আপনার নিন্দে করছিলুম, সেখানে দেবেশ-দীপেন উপস্থিত ছিল বলেই আপনার গায়ে

আঘাত লেগেছে। দেবেশকে অত মূল্য দিচ্ছেন কেন? না হলে আমার গলার লঘু সুর আপনার কানে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। এ কথা কি এতদিনে বুঝতে পারলেন না যে বন্ধু হিসেবে যাকে যেটুকু শ্রদ্ধা করবার করি—এ ছাড়া যে ঠিক বন্ধু নয়—মানুষ হিসেবে তাকে আমি কখনোই গ্রাহ্য করি না। দেবেশের দুটি গল্প আমার খুইব ভাল লেগেছে— কিন্তু দেবেশ রায় নামে যে ছেলেটি সেদিন বসেছিল আমার কাছে তার মূল্য অমুক-তমুকের চেয়ে বেশি নয়। দেবেশের উপস্থিতিকে বেশি মূল্য দিয়েছেন বলেই আপনি রজ্জুস্পর্শে সর্পবিষ যন্ত্রণা বোধ করেছেন। আমার মনে হয় দেবেশের গল্পের যখন আমি প্রশংসা করি তখনও আপনি, গল্পলেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, আহত বোধ করেন।

বোধ করাই উচিত। অন্তত আমি ত এ-দিক দিয়ে ভীষণ স্বার্থপর—আপনি যখন অন্য কারুর, সমবয়সির, কোনও প্রশংসা করেন—তখন আমার অসহ্য বোধ হয়, আমার ক্রোধ আমার শরীরের সমস্ত রন্ধ্রে নীলরঙে জ্বলে ওঠে। কিন্তু তার কোনো একস্প্রেশন কখনো প্রকাশ পায় নি। তার কারণ, আমি ভেবেছি, আমি যা পছন্দ করব, যা আমার মনোমুগ্ধকর, আমার বন্ধুরা শুধু সে-রকম ব্যবহারই করে যাবে এ ভাবা নিতান্ত পাগলামি।

ফেরার ট্রেনের রাত সম্বন্ধে আমার সত্যিই কিছু বলবার আছে—সেদিন যা বলেছি সবই উলটো—নিজেকে ঢেকে আপনাকে আঘাত করার চেষ্টা। কিন্তু সত্যিকারের ভাবনাটা বললেই হয়ত আপনি যথার্থ আঘাত পাবেন আজ, এমনকি সারা জীবনে আর বাক্যালাপ পর্যন্ত করবেন না। এ-ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে।

আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলো বেসিক আইডিয়ায় তফাৎ আছে—এ জন্যই আপনার সঙ্গে কথা বলবার, দেখা করবার জন্য এত আন্তরিক টান বোধ করি। মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার এবং আমার ধারণার পার্থক্যটা ঠিক বুঝতে পারলুম এবার চাইবাসায়। অবশ্য এটা আপনার সত্যিকারের ধারণা কিনা জানি না, অন্তত আমার মনে হল। আগে আমি আমার বন্ধুদের বলতুম যে মেয়েদের দিনের সাড়ে-তেইশ ঘন্টাই পছন্দ করি না। আগে কথাটা না ভেবে বলতুম—এবার বুঝতে পারলুম, দিনের অনেকক্ষণ কোনও রমনী-ভোগের চিন্তায় কাটানোর মতো প্যাশান আমার নেই। তা ছাড়া একটি মেয়েকে ভোগ করার চেয়ে—তার কাছে পুরুষের শিভাল্‌রির পরিচয় দেওয়াটা বড় বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ একটি মেয়েকে যদি টাকা দিয়ে ভাড়া করেন আপনি, তবে আপনি হয়ত যথার্থ প্রেমিক পুরুষের মতোই তার কাছ থেকে যেটুকু নেবার নেবেন। আর আমি টাকা দিলেও তার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে তার কৃপা ভিক্ষা করব (মাতাল না হয়ে, ঠাণ্ডা মাথাতেই!) অর্থাৎ কোনও মেয়ে হয়ত আপনার কাছে শুধু রক্তমাংস, অথবা সৌন্দর্যের আধার অথবা অনুভবের প্রতিমূর্তি— আমার কাছে এর কোনওটাই তেমন আকর্ষণীয় নয়—সমস্ত মিলিয়ে তার উওম্যানহুড। কথাটা পরিষ্কার করতে গেলে অনেক বলতে হবে—বরং ফেরার ট্রেনের রাত্রির কথা বলি। সেরকম অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনোই হয় নি।

ট্রেনে, আপনার পদতলে, আদিবাসী যুবতীটিকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলুম—ভেবেছিলুম আপনার রাত্রিটা আনন্দে কাটবে, বাসে ছোট মেয়েগুলির কাছ থেকে আমি যে তৃপ্তি পেয়েছি—আপনিও সে-রকম কিছু পাবেন। বাঙ্কে উঠে দুবার উঁকি দিয়ে দেখলুম—আপনি অত্যন্ত গোপনে মেয়েটির শরীর স্পর্শ করবার চেষ্টা করছেন। এরকমই হয়, এর বেশি আর কী হবে—আমার মজা লাগতে লাগল। আপনি ঠিক হয়ে বসতে পারছেন না, ছটফট করছেন, আপনার যাবার পথের ঘুম ফেরার পথে কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি ঘুমবার জন্য বাঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে আমার পিতাকে পরলোকগত মনে করে বাড়ির কথা ভাবতে লাগলুম। চোখের উপর আলোটা পড়েছিল, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করতে চেষ্টা করলুম। আমার আঙুলগুলো লাল দেখাতে লাগল, খুব কাছ থেকে আলো পড়লে আঙুলগুলো

লাল দেখায়। হঠাৎ আমার মনে হল আমার হাতের আঙুলে আমার বাবার রক্ত লেগে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে-হওয়াটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিলুম না। বুঝতে পারলুম, আধুনিক গল্প-উপন্যাসে এরকম বিষয় থাকে বলেই সুযোগ পেয়ে আমার মন একবার এরকম ভেবে নিল। নচেৎ, কেন আমি, কেন...এই সময় আমি দেখতে পেলুম আপনার পদতল থেকে মেয়েটি সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার একপাশে আপনি, অন্যদিকে একটি কালো রঙের পুরুষ, সামনে একটি কুৎসিত বৃদ্ধা, পিছনে দেয়াল। এর মধ্যে থেকে সে সোজা উঠে দাঁড়াল, কোথাও গেল না, শুধু শরীরের গ্রন্থিগুলি একটু সহজ করে নিতে চাইল। তখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভীষণভাবে চমকে উঠেছি। মনে হল, কি অদ্ভুত, অসহ্যরকমের কাতর তার চোখ—সে সমস্ত রাত্রির কাছে একটু ঘুম প্রার্থনা করছে। একটু নিরুদ্বেগ, শান্ত ঘুম।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রতি আমার সর্বপ্রকার যৌন বাসনা অবসিত হল। শিভাল্‌রি দেখা দিল। মনে হল, মেয়েটিকে একটু ঘুম কি এখন কোনও প্রকারেই উপহার দেওয়া যায় না। মনে হল, সন্দীপনের কি উচিত নয় লঘু হাত দুটি শান্ত করা, মেয়েটিকে তার বুকেমাথার রেখে ঘুমুতে দেওয়া উচিত। সেটা সম্ভবও ছিল। খানিক পরে মাঝে মাঝে মেয়েটি ঈষৎ ক্রুদ্ধ-অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল, ওর মা কি বলবার চেষ্টা করল। আমার অস্বস্তি লাগছিল। মেয়েটি যখন দ্বিতীয়বার উঠে দাঁড়াল, তখন তার চোখ আরও কাতর, অসহায়। তখনই প্রচণ্ড ক্রোধে আমি জ্বলে উঠলুম, যে রকম ক্রোধ আমার কদাচিৎ আসে, তিনচার দিনের আগের কমে না। আমার মনে হল (ক্ষমা করবেন সন্দীপন আমার রূঢ়তা, এগুলো আমার তখনই শুধু মনে হয়েছিল, এখন মিলিয়ে গেছে, আপনাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, পুরনো চাইবাসায় কোনও লোক অথবা আমাদের বাড়ির কামিন মেয়েটির প্রণয়ী যদি আপনাকে মারবার জন্য টাঙ্গি তুলত—আমি আমার কাঁধ দিয়ে তা প্রতিরোধ করতুম, তবু ট্রেনের কামরায় আমার মনে হয়েছিল, আমার শরীরে তখন যেন অসুরিক শক্তি) আমি সন্দীপনকে দুই হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে খানিকটা জল ঢেলে দিই মাথায়, মেয়েটিকে ওর স্থানটুকু উপহার দিই। তার চেয়েও ভয়ংকর, আমার মনে হয়েছিল, যদি মেয়েটি চিৎকার করে, যদি কম্পার্টমেন্টের সমস্ত লোক সন্দীপনকে অপমান করতে আসে, তবে কি, আমি আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে এগোব? হয়ত না।

এই যে 'না' ভেবেছিলুম—এর ফলে আমার কষ্ট হয়েছিল। তার তুলনায় আপনাকে কীই-বা আহত করেছি। তিনদিন পরে আমি স্বাভাবিক হলুম, আবার লেখক-হিসেবে আপনার ভালমন্দ বুঝতে পারলুম। শনিবার আপনার কথা ভীষণভাবেই অনুভব করলুম—ফলে তাস খেললুম না, শনিবারে পড়াতে গেলুম না। আপনি তখন বড়-দীপেনের সঙ্গে গল্প করেছিলেন। কারণ আমি জানি। সোমবার দেখা হল, আপনি সেই প্রথম, আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর এই প্রথম, আমাকে একটু-একটু অপমান জ্ঞানত করবার চেষ্টা করলেন। অথচ আমার খারাপ লাগল না, অপমানিত হলুম না, ভালই ত লাগল। কারণ তখন কিছু প্রতি-ব্যবহার পাওয়া আমার প্রয়োজন ছিল। চাইবাসায় কাছাকাছি থেকে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা যদি একটু নিচু হয়, কর্কশ হয়, আমি খুশি হব খুব। কারণ আমার সম্বন্ধে আপনার অতিশয়োক্তি শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা কোনও ব্যবহার কিংবা আপনার কোনও কথাবার্তায় বদলাবার সম্ভাবনা নেই। এ-বিষয়ে তাহলে আবার অনেক বলতে হয়। ছেঁড়া কাগজের উপমা দিয়ে যা বলেছেন ওটা একেবারেই ছেলেমানুষকে বোঝাবার মতো।

শক্তি কোলকাতায় ফেরে নি। আমি চাইবাসায় একটি চিঠি দিয়েছি—কোনও উত্তর নেই। আপনি কেমন আছেন। জনসেবকের চাকরি আমি এখনো নিই নি, ভাবছি। কলকাতায় শীত

আত্মহত্যা করেছে—এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বসন্তকে তার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে। ভালবাসা নেবেন।

সুনীল
১৩।১।৬০

শক্তির পোস্টকার্ড দুটো চাইবাসা থেকে লেখা। ডাকঘরের ছাপ ২৩।১।৬০ ও ২৬।৮।৬০, যথাক্রমে ১৮ সারদা চ্যাটার্জি লেন হাওড়া ও ৯।২ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা এই ঠিকানায় আমি চিঠি দুটো পাই। সুনীলের চিঠির তারিখ ১৩।১।৬০, লেখে ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রিট থেকে, পাই ২৪।১৬ পাঁড়ে হৌলিতে। কাশীর পাঁড়ে হৌলি। এবার বাড়ি-পালটানোর সময় এগুলো পেয়ে গেলুম।

শক্তি ও আমি ডিসেম্বর ৫৯-এর গোড়ার দিকে চাইবাসায় প্রথম যাই। কোনও-এক সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আগের দিন শক্তির আলাপ হয় কৃত্তিবাস পত্রিকার তৎকালীন সান্ধ্য অফিস দেশবন্ধু পার্ক, যে চাইবাসায় ইন্সপেক্টর অব ফিসারিজ ও সুনীলের বন্ধু। পরদিন বিকেলে, কফি-হাউসে, তাকে হাওড়া স্টেশনে সি-অফ করতে যাবার প্রস্তাব শক্তি সহসা আমাদের দেয়, আমাকে ও সুনীল পাল নামে একটি ছেলেকে, যার সঙ্গে ১৫ মিনিট আগে আলাপ করিয়ে দেবার শক্তি আমাকে বলে যে সে কয়েক বছর আগে ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট হয়েছিল ও তখন অধ্যাপক। সেদিন নভেম্বর ১৯৫৯-এর মাইনের পুরোটাই তার পকেটে ছিল। আমরা তিনজনে স্টেশনে গিয়েছিলুম। সম্বলপুর প্যাসেঞ্জারে সমীরকে পাওয়া গেল না। ক্রমে সবুজ আলো জ্বলে উঠলে শক্তি তার দ্বিতীয় প্রস্তাব আমাদের দেয়। আমরা সেটিও মেনে নিই।

পরদিন ভোরে রাজাখার্সোয়াং পৌঁছে খুব শীত পায় আমাদের, কারো গায়েই সোয়েটার ছিল না। রাজাখার্সোয়াং-এর মিস্টি রোদে দাঁড়িয়ে গরম জিলিপি খেতে খেতে (জিভে লেগে আছে...) এবার রাজাখার্সোয়াং-টু-চাইবাসার দুটি টিকিট আমরা কিনি, ।০ আনা করে বেশ পৌঁছে যাই চাইবাসা। আমি ২০ দিন ছিলুম। শক্তি থেকে যায় ৯ মাস, ডাকঘরের ছাপ-অনুযায়ী অন্তত ২৬।৮।৬০ পর্যন্ত।

ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যে কিছুটা বিশ্বস্তসূত্রেই এই উড়োখবর আমি পাই যে শক্তি চাইবাসার সেন্ট্রাল জেলে রয়েছে। তছরুপের কথাই আমি শুনি। এটা শুনে, তখন আমরা ছেলেমানুষ ছিলুম বলে, আমার ও সুনীলের খুব মনোকষ্ট হয়। আমি ও সুনীল, শক্তির দুই বন্ধু, আমরা সেদিন রাত্রেই আবার সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার ধরি। এটা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। আমি নিই হাওড়ার চেনা দোকান থেকে ৩টে খালি সোডার বোতল, চাইবাসায় এক্সচেঞ্জ করার কথা ভেবে, এটা সুনীলও যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। সুনীল একটি ক্যাপস্টানের টিন নিয়েছিল, যা গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ডোরাকাটা শক্তির হাতে ওর দেবার ইচ্ছে ছিল। টিনটা আমরা ট্রেনে খুলি নি। মাইরি।

চাইবাসায় গিয়ে এবারেও সমীরকে পেলুম না, ট্যুরে। কিন্তু শক্তি? পরদিন জেলে গিয়ে খবর নিলেই হবে এ-রকম ভেবে, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে টিনটা ও ওপরে ৩-টে শূন্য শোডার বোতল রেখে, ডাকবাঙলো ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম নদীর দিকে, চাইবাসার শ্মশানের দিকে শীতের রাত্তিরে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলুম গান গাইতে গাইতে। মধুটোলার কাছে ফটাস করে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল, "এত রাত্তিরে চাইবাসায় রবীন্দ্রসংগীত গায় কে রে", বলতে বলতে শক্তি বেরিয়ে এল।.... এখানে হঠাৎই মনে পড়ল, এই মধুটোলার রাস্তাতেই, "সাইকেল কি সাঁতার কেউ কখনো ভোলে ভাই", বলে তড়াক করে সাইকেলে লাফিয়ে উঠে এই বাড়ির ৫-বোন ও ৩-বন্ধুর সামনে সুনীল

উলটে দাড়াম করে রাস্তায় পড়ে যায়। যাই হোক, সেদিন রাত্রে, নভেলে পড়া যায় এমন মধ্যবিত্ত প্রবাসী বাঙালির লালটালির বাড়ির মধ্যে বসে আমরা দুজনে আধঘন্টার মধ্যে বুঝতে পারি যে শক্তি জেলে নেই। ক্যাপস্টানের টিন খুলতে আমরা ডাকবাঙলোয় ফিরে যাই।

ওই বাড়ির দুটি মেয়ে সমীরের ও শক্তির বান্ধবী (একজন পরে সমীরের স্ত্রী) এটা বুঝতে আমাদের পুরো দুদিন সময় লেগে যায়। এটা বুঝে মধুটোলায় ওরা সান্ধ্য চা-পান করতে গেলে, আমি ও সুনীল শোডার বোতলগুলো (তখন ভরতি) একের পর এক জ্বলন্ত হ্যারিকেন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারি। সমীরের লেপ, তোশক ও মশারিতে আগুন লেগে যায়। আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রোরো নদীর ওপারে গিয়ে আমাদের জীবনের প্রথম আদিবাসী রমণীর কাছ থেকে জীবনের প্রথম মহুয়া খাই। তার শারীরিক সৌন্দর্য ছিল।

চাইবাসা থেকে ফিরেই আমি মায়ের কাছে কাশীতে চলে গেলুম। সম্ভবত একই ট্রেনে, ডুন এক্সপ্রেসে, সুনীলের চিঠিটাও আমার সঙ্গে যায়, কারণ হিসেব মতো ১৪।১।৬০ তারিখে আমি সেবার কাশী পৌঁছেছিলুম। যাই হোক ওই চাইবাসা পরে আমাদের তিনজনের লেখাতেই বেশ একটা ভূমিকা নিয়েছিল বলতে হবে। আমি সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী নামে গল্পটা লিখি, সুনীল যুবক-যুবতীরা ও অন্যান্য। শক্তির লেখার এক-অংশে চাইবাসা হাহাকারের মতো ছড়িয়ে রয়েছে।

চাইবাসা থেকে অদূরে পাহাড়ের ওপর হেসাডির ডাকবাঙলোয় বড় প্যাঁচে পড়েই কবি তথা লেখক হিসেবে আমাদের ডি এফ ও শ্রীকমলাকান্ত উপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। প্রমাণ-স্বরূপ শক্তি ওঁর সামনে একটি ছোট-কবিতা রচনা করে, যার মধ্যে 'ছুটে কে তুলিলে শালবন বাহুবন্ধন চারিধারে', এ-রকম একটা লাইন ছিল। বস্তুত ছোট ও বড় দলে চাইবাসায় আমাদের একাধিকবার যেতে হয়েছিল। শক্তি বারংবার গেছে। চাইবাসায় যাওয়ার জের আমাদের পরবর্তী জীবনেও বেশ কয়েকবছর ধরে চলে, ওখানে না গেলে আমরা হয়ত এ-রকম হতুম না। কী হতুম? রাজা হতুম, আবার কী। কিংবা ঘোড়া ওড়াতুম? 'ঘোড়া ওড়াতুম' কথার কথা। এতটা প্যাঁচে পড়তুম না।

১৯৬৮

## কয়েকটি শিরোনামা-২

### বেশ্যা

বেশ্যার ঘরে আয়না থাকবেই, দেওয়াল-জোড়া আয়না, ছোটবড়, নানা সাইজের দামী বা সস্তা আয়না, এক-একটা কারুকার্য-করা। খাদ্যদ্রব্য কদাচিৎ দেখেছি, তবে বাসন থাকে। কাচের, কলাই-এর, কাঁসা ও পিতলের বাসন। বেশ্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কটি তথ্য এই হতে পারে যে—১. সে উপহার পেতে ভালবাসে। ২. তার soul আছে। ৩. তার লজ্জাহীনতা সত্যের মতো। ৪. সে মৌলিক নির্বোধ। ৫. সামনে কোনও সময় নেই এমন মানুষ যদি ভাবা যায়, সে তাই।

তার সম্পর্কে একটি কথাই গভীরতরভাবে ভেবে দেখার। তার শরীর যখন একজন ভোগ করে, কী মানসিক অবস্থায় সে থাকে। 'লোক' এলে সে সুখী হয়, বিরক্ত হয়, তাকে ঘৃণাও করে। লোককে হিংসা সে কখনো করে না। যখন লোক তাকে উলঙ্গ করে, সে বিরক্ত হয়, একবার উলঙ্গ হলে স্বস্তিবোধ করে, তার সহজ লাগে। কিন্তু বেশির-ভাগ লোক একসঙ্গে

উলঙ্গ হয় না, আলো নেবাবার আগে অন্তত আণ্ডারউয়্যার বা গেঞ্জি পরে থাকে। বেশ্যার নগ্নতা সে দ্যাখে, তাকে দেখতে দেয় না। তারপর কতকগুলি নিয়মকানুন তারা মানে, বেশ্যারা, সে-সময় শয়তান তাদের সাহায্য করেন বা ঈশ্বর, যেজন্য তারা কদাচিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

### পাপ

পুলিসে পিছু নিয়েছিল বলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করা ঠিক হয় নি, ঠিক হয় নি, ঠিক হয় নি, পাপ হয়েছিল।

### ভালবাসা

ভালবাসা জেগে উঠলে নিবুর্দ্ধিতা স্তূপাকার হতে থাকে। আজ সেই পরিত্রাতা নির্বোধ আর নেই, আজ সিংহাসন জুড়ে বসে আছে ভারি ও বৃহৎ মস্তিষ্ক, হৃদয়ের সাধ্য নেই তাকে টেনে নামায়। আজ কে করো আসনে বসে আছে!

### ভয়

'তুমি কি তোমার জাহাজ তৈরি করেছ, ওগো তুমি কি তোমার জাহাজ....ওগো তুমি তোমার জাহাজ তৈরি করো, কেননা তোমার জাহাজের দরকার হবে।'

### বন্ধুবান্ধব

বিক্রমের জাহাজ ডুবে গেছে। দড়িদড়া ছিঁড়ে গেছে। বেচু হাঁটছে টর্চ ফেলে। প্রচেত আমার কুকুর, আমি প্রচেতর। ছিল ডুন এক্সপ্রেসের পুরোপুরি টিকিট, কুণাল নেমে গেল ডগমগপুরে, যা শালা। ভাস্কর সবকিছু কব্জা করে ফেলছে, হোঃ হোঃ, জলিফলি ছাড়া চৌধুরীবাবুর আর কিছু ভাল লাগে না।

অন্ধকারে বেচুকে দেখা যায় না। সে টর্চ ফেলে হাঁটছে। কেতকী ও ভবতোষ কেবল এরা দুজনেই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। বিক্রম ভয়াবহভাবে জলে লাফিয়ে পড়ে, এখন একটা বয়া আঁকড়ে ধরে ভাসছে। একই জায়গায় দুলছে তার বয়া, ভেসে যাচ্ছে না। কড়া রোদে মানব একটা লাস ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেবল কেতকী ও ভবতোষ....ভালবাসা পেলে আশা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। জলের ভিতর ওদের জড়াজড়ি শিকড় স্পষ্ট দেখা যায়। ভেসে যাচ্ছে কেবল ও কেতকী ও ভবতোষ। কোথায় যায় তারা? ভাসতে ভাসতে তারা যায় চৌরঙ্গিতে, ডানলপ ব্রিজে, তিলজলায়, শ্যামবাজারে, চেতলায়; যায় ব্যাণ্ডেলে। নর্দমার থেকে শূন্য ওভার ব্রিজে উঠে, নর্দমায় নেমে যায়।

ভাস্কর, বিক্রম, চৌধুরীবাবু ও বেচু এরা চারজনে চুরোট পেল কোথা থেকে! এরা চারজনেই ধরিয়েছে চুরোট। কেতকী ও ভবতোষের মুণ্ডু ভাসতে ভাসতে চৌরঙ্গি দিয়ে চলে যায়। যায় চেতলায়, উল্টোডাঙ্গায়, বেহালায়, ব্যাণ্ডেলে, বরাহনগরে চলে যায়। তাদের স্বচ্ছ ও উন্মূল জড়াজড়ি বিক্রম, চৌধুরীবাবু, বেচু ও ভাস্কর....ও চুরোটহারা আমার নাকের ডগা দিয়ে দুলতে দুলতে চলে যায়।

### শাস্তি

প্রায় ১২ বছর পরে ও ৩ বছর আগে হাওড়া স্টেশনে স্কুলের বন্ধু মন্মথর সঙ্গে দেখা। প্রথমে ১২ বছর পরের কথাটা বলি। "হ্যাঁরে, তোর মনে পড়ে", সে হাসতে-হাসতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের মর্নিং-স্কুল যাবার পথে একটা দেবদারু গাছ ছিল?" এমন অপ্রত্যাশিত ছিল তার প্রশ্ন যে আমার মর্ম পর্যন্ত চমকে উঠেছিল যেন সে আমার আইডেনটিটি চ্যালেঞ্জ করছে। আমি বুঝতে পেরেছিলুম সে তার সত্য স্মৃতি কথা বলছে এবং এর যথার্থ উত্তর আমাকে দিতে হবে। মনে পড়ে....মনে পড়ে....মনে পড়ে....মনে পড়ে পাশবিক নখে আঁচড়ে আমি আমার সমস্ত মন তছনছ করে ফেলি। মর্নিং-স্কুলের কথায় আমার একবার মনে হয় কুয়াশা, মনে

হল ক্ষণেকের জন্যে কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা মরুপথ ও পথের ধারে এক একাকী বৃক্ষের অবয়ব একবার দেখতে পেলুম, তারপর আবার কুয়াশা। মন্মথ দুঃখ করে বলে গেল, "ভুলে গেছিস?"

আজ ৩ বছর পরে মন্থথর সেই স্বর আবার আমাকে হানা দিচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিযুক্ত করছে, "ভুলে গেছিস?"

আমার সংশয় ছিল, মিথ্যা উত্তর আমি তাকে দিতে পারি নি। বস্তুত, যে দেবদারু গাছ আমার মনে পড়েছিল, তা আমি কল্পনা করে নিয়েছিলুম। স্কুল-যাবার পথ, ভোর, কুয়াশা—এর কোনওটাই আমার প্রকৃত স্মৃতি থেকে আসে নি।

মন্মথর সঙ্গে দেখা হবে না, হয়ত কোনওদিনই দেখা হবে না। উত্তরের জন্যে সে ৩ বছর সেখানে অপেক্ষা করতে পারে নি, তার ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে হন-হন করে চলে যায়। কিন্তু আজ, ৩ বছর পরে, তাকে আমি অকপটে বলতে পারি, "কী শাস্তি তুমি আমাকে দেবে দাও মন্মথ, হ্যাঁ, আমি দোষী। আমার কিছু মনে নেই, আমি সব ভুলে গেছি।"

## কে রবীন্দ্রনাথ

সোহো স্কোয়ারে এক প্রস্টিটিউট আমার বন্ধু ভাস্করকে জিজ্ঞেস করেছিল, "সো ইউ কাম ফ্রম দা ল্যাণ্ড অব টেগোঅর?" ভাস্কর বাও করে বলেছিল, "বেগ ইঅর পার্ডন?"

"সো ইউ..." সে আবার পুরোটা বলে। "টেগোঅর?" মাথা নিচু করে কপালে গুনে দশটা টোকা মেরে তারপর ঝট করে মাথা তুলে ভাস্কর জিজ্ঞেস করেছিল, "ওয়েল? হু ইজ হী?" বজ্জাতি করেছিল। গত বছর একজন প্রগতিশীল বা সাম্যবাদী কবির সঙ্গে দক্ষিণমুখী টু-বি বাসের আপার-ডেকে একদিন দেখা। উনি বললেন, "সাজ্জাদ জাহির আসছেন অমুক দিন, রণজির ইনডোরে। আসছ ত?" কে সাজ্জাদ জাহির? আমি জিজ্ঞেস করি নি। হয়ত ভাবতেন বজ্জাতি করছি। সাজ্জাদ জাহির কিন্তু একজন নামকরা লোক, পরে জানতে চাওয়ামাত্র জানতে পারলুম, উনি একজন সাম্যবাদী বা প্রগতিশীল লেখক। মস্কোয় ভারতীয় লেখকদলের নেতৃত্ব করেছিলেন। যেমন, পি লাল আর কী। পি লাল-কে আবার জিজ্ঞেস করবেন না যেন।

ভাস্কর ইয়ার্কি করেছিল। ইয়ার্কিরই সম্পর্ক! কেননা কোন শালা বলতে পারে কে উত্তমকুমার? ফিল্মিণ্ডিয়া কাগজে নার্গিসের পদ্মশ্রী-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল। ইনট্রোডিউস করে দেবার সময় আন্ডার-সেক্রেটারি শুধু নাম করেই চুপ করে গিয়েছিলেন। নেহেরু তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। অর্থাৎ, কে? আরও বল! ভদ্রলোক তখন বাকিটা বলেন। তারপর নার্গিস বলেন, "পণ্ডিতজি আমাকে চিনতে পারলেন না, কিন্তু আপনার বাবা, লেট মতিলাল নেহরু আমার মা জদ্দনবাঈকে ভালই চিনতেন।"

তেমনি রবীন্দ্রনাথ। সবাই জানে কে।

কিন্তু কর্ণপুর কী? বা কে? কেউ জানে না। অথচ এক প্রফেসর-দম্পতি দেখেছিলুম। স্বামী আমাকে একটা থান ইট দিলেন, উপহার, 'কবি কর্ণপুর ও তৎকালীন বাঙলা কাব্য', যা লিখে উনি ডক্টরেট পেয়েছেন। বইটাতে খালি ফুলস্টপ দেখলুম—কমা, সেমিকোলন, লিডার (...), ড্যাস এ-সব নেই বললেই চলে, সম্ভবত তার বদলে রয়েছে তথ্যাশ্রয়ী, তত্ত্বাশ্রয়ী, চৈতন্য, সত্তা, নিরঞ্জন, সূর্য, অভিব্যঞ্জনা, উচ্চকোটি—এইসব। খবরের কাগজে যেমন থাকে সমষ্টিউন্নয়ন, ত্রিপাক্ষিক কমিটি, জাতীয় সংকট বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। এঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছিলুম। ইনি "রূপনারানের কুলে জেগে উঠিলাম"- কে কবিতা বলে মনে করেন না ("পিওর প্রোজ!"), রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর অন্ধকার দিককে তুলে ধরে বলে মনে করেন, পঁচিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকোয় যান। ভোরে ভৈরবী ও সন্ধের ঝোঁকে পূরবী শোনেন।

'সো মোই কান্তা, দূর দিগন্তা' সম্পর্কে ইনি লিখেছেন দেখলুম 'অবিনাশী কবিত্ব।' আমার

বন্ধু সুনীল খুব স্মার্ট লেখে। 'গোটা চর্যাপদে গোয়েন্দা লাগিয়েও কবিতা খুঁজে পাই নি', সে লিখেছিল।

ডক্টর এটা পড়েন নি মনে হয়, এইসব। পড়লেও ইগনোর করেছিলেন। কেননা, তাহলে ত, যদি চর্যাপদ তথা কর্ণপুরে কোনও কবিতা না থেকে থাকে, তা হলে কিছু অপরিচিত লোক এসে একদিন, "কর্ণপুর যখন কবিই নয় তখন আর এ-সব কেন," বলে তাঁর ফ্রিজ, টেলিফোন, বাথরুম, বেডরুম, উড়ন্ত-পরদা এ-সবই খুলে নিয়ে যেতে পারে। ট্যাঙ্ক থেকে পেঁপের ডাঁটা দিয়ে চুষে নিতে পারে পেট্রল। 'নারীকেও নিয়ে যায়....' সুনীলের কবিতায় পড়েছিলুম ও হো।

কিংবা কে জানে হয়ত সংবিধানগত কারণে তা পারে না। তবে একটা কথা ঠিকই, 'কর্ণপুর কোনও কবি নয়, আসলে কানপুর', এটা স্বীকার করা ওঁর পক্ষে বড় ব্যয়সাধ্য। কারণ, তাহলে,

এই
র বা
ডা ড়ি
বা সা + নারী
এ্যাম এই
ন 'এ স ব ঘু
বো আ মা ম
বু ড়ো র' বা থ রু
ই ম
আ + বে
ন + ড
ফো রু
লি ম
টে

অন্তত এই বোধ নিশ্চিত তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। প্রফেসরকে।

তুলনামূলকভাবে যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা করে চলেছেন তাঁরা খানিক নিশ্চিন্ত।

১৯৬৮

## কাউন্টার পয়েন্ট

মানুষে করতে পারে না এমন কোনও কাজ নেই, মানুষ মানে অবশ্য মানুষের মাথা; মাথা, মাথা, মানুষের অপরিত্যাজ্য শত্রু। মানুষের মাথাই সৃষ্টি করেছিল ঈশ্বর, অমরতা, জীবনের মানে প্রেম—হেবর্থারের দুঃখ বা ক্ষুদিরামের মাতৃভক্তি—সে যাই হোক। কিন্তু মানুষের মাথা একটি মাত্র জিনিস সৃষ্টি করে নি, তা হল মৃত্যু। তবুও, 'সমস্ত ব্যক্তিগত কনসাসনেশ-এর যে, মৃত্যু', 'সন্দেহহীন ধ্রুবসত্য' বা 'একমাত্র রিয়্যাল' এই-ই, এ-রকম মনে করে নিতে গেলেই শরীরে সুদূর অন্তঃপুরে, রৌদ্রে, দপ করে ভেসে ওঠে একরাশ মাছি, তৎক্ষণাৎ গুঞ্জন শোনা যায়, অচিরে বুক ও মাথার চারিপাশ তারা উড়ে আসে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত মাংস ও হাড়ের যে শরীর, নিছক শরীরময় যে সমগ্র জীবন, তার মূলে মূলে একটা নড়াচড়া টের

পাওয়া যায়—তাই কী? তাই ত? ঠিক ত? 'যে চতুর্ভূজের বাহুগুলি পরস্পর সমান কিন্তু একটি কোণও সমকোণ নহে তাহাকে বিষমকোণী সমচতুর্ভূজ বা রম্বস বলে' বললে সমস্ত বুঝে ক্লাস সিক্স-এর ছাত্রও প্রশ্ন করে, 'তাহলে তাই ত?' 'এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,' বলে, হত্যার একমাত্র সাক্ষীকে আদলতে দাঁড়িয়ে পরমুহূর্তেই বলতে হয়, 'জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।' এতে করে আদালতের অবমাননা করা হয়।

ওই জিজ্ঞাসাচিহ্ন, ওই মনস্ট্রসিটির হাত থেকে জীবন পরিত্রাণ চায় কারণ মনে পড়েই যে জীবন একটা। ও পরবর্তী জীবন বলে কিছু নেই! সিদ্ধান্ত নেওয়া এই জন্যেই প্রয়োজন—যেটা হবে স্টাটিং পয়েন্ট। স্ত্রীলোক-সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে-কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে — যেমন আমরা বিবাহ করব না রক্ষিতা রাখব, সোনাগাছি যাব না হর্টিকালচার-উদ্যানে যেতে ডাকব প্রেমিকাকে, আমরা কি আগে প্রেম করে পরে সঙ্গম করব, না প্রথমে সঙ্গম করে পরে প্রেম.... এ-সকল চিন্তাতেই উত্তেজিত হয়েছিল আমাদের পুরুষার্থ, এ-ভাবেই নষ্ট হয়েছে আমাদের চায়ের সময়, কারণ ওই, পূর্বে বলা হয়েছে, জীবন একটা এবং এটাই কি একমাত্র রিয়্যাল নয় যে মৃত্যুতেই জীবনের শেষ? শরীরের সুদূর থেকে আবার কাছে চলে আসে উড়ন্ত চাকি, খোলা জানালা দিয়ে এই অক্ষরগুলির উপর এসে পড়ে একপশলা বৃষ্টি, উঠে জানালা বন্ধ করে দিতে হয়, উড়ন্ত চাকি বুকের চারিপাশে ও মাথার চারিপাশে ঘুরতে থাকে—ঠিক ত? তাই কী? কোনওই সন্দেহ নেই, কোনো সম্ভাবনা নেই? ছায়ার প্রতিচ্ছায়ার মতও নেই কোনও সম্ভাবনা? 'তাহলে তাই ত?'

কে না কেঁপে উঠেছে সন্দেহে? কাকে না কখনো না কখনো, ধরাশায়ী করেছিল সন্দেহ? যারা এ দেশের সাধারণ মানুষ, কবি, কেরানী, প্রফেসর, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, পলিটিশিয়ান বা এ্যালোপাথিক ডাক্তার—তাদের সমস্যা ছিল অন্য, তারা সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেছিল তাদের আন্তরিকতাকে, তারা ছিল হাফ-উইটেড, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে উভয়ত। এরা সব এদেশের সাধারণ লোক। কোথাও এদের শান্তি ছিল না, না মস্তিষ্কে না হৃদয়ে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অবিরাম যুদ্ধ—এটাই প্রকৃত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যাতে মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়পক্ষই পরাজিত হয়। এটা বুঝতে ২০ শতাব্দীর মধ্যসময় পর্যন্ত সময় লেগেছিল। আজ আর কোনও সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই। আজ পরাজিত হবার মতো কিছু নেই। 'সর্বস্বতার কিছু আজ পড়ে নেই শৃঙ্খল ছাড়া।'

হায় ও হোঃ হোঃ হোঃ, আমাদের কেউ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বলে নি। কে বলবে? বলা বাহুল্য, "তুমি তোমার বাবার ছেলে ও তোমার ছেলের বাবা, বাছা, তুমি তোমার সন্তানের জন্যে কিছু করে যাও", এসব আমাদের বলা বৃথা, আমাদের কেউ বলে না। দেশরক্ষা, ভিয়েতনামের মুক্তি, স্ত্রী, জওয়ান, প্রেমিকা, কারো জন্যে স্যাক্রিফাইস করতে আমাদের কেউ বলে না, এতবড় মিটিং হয়ে গেল বুদ্ধিজীবীদের, আমাদের ডাকে নি ত কেউ। আমাদের পোজিশান এই যে আমরা কখনো ভুল করি নি, আমাদের, অতএব, কখনো ভুল ভেঙে যায় নি। কোনোরূপ স্যাক্রিফাইস আমরা করি নি। রবীন্দ্রনাথ আমরা অদৌ পড়ে উঠতে পারি নি, বুঝি একবার রবীন্দ্রসংগীতে বিশ্বাস হয়েছিল, ভুল তখুনি ভেঙে গেল। আজ আধুনিক গান ও রবীন্দ্রসংগীত আমাদের কাছে ৫২ ও ৫৩, বলা বাহুল্য যে আমরাও মনে করি যে যাঁহা-৫২, তাঁহা-৫৩, যাঁহা সত্যজিৎ রায় তাঁহা ক্রুফো। আমরা রূপকে কখনো রূপান্তরিত করে দেখি নি। রূপ আমরা মানি, রূপান্তর মানি না। যেমন, আবার, আমরা মৃত্যু মানি। আত্মা, অমরতা, ঈশ্বর, পরবর্তী জীবন, এগুলো রূপান্তর, এগুলো মানি না। এইজন্যেই আমাদের গল্পের সব চরিত্র শেষকালে মরে যায় বা মাঝখানেও আমরা অনেক সময় তাদের ছেড়ে দিই যে, "এই পর্যন্ত লিখলুম তারপর তারা যে-যার অসুখে মরে গেল।"

কত অসুখ আছে টি বি, ডায়াবিটিস, আর্থারাইটিস, হেপাটাইটিস, সিফিলিশ, গনোরিয়া, নানারকম ম্যানেনজাইটিস, নানারকম আলসার, রিউমার্টিজম অফ দা হার্ট, কত রকমের অসুখ আছে এবং এগুলোর একটাও সম্পূর্ণ সারে না। একজন ডাক্তার আমাকে একবার বলেছিল, "আরে মশায়, জুতোয় একবার তাপ্পি লাগালে তা কি আর নতুন জুতো হয়?" নতুন জুতো কিনে প্রত্যেকটা ডাক্তারকে জুতোতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, যে-কোনও দুটি ইনকিওরেবেল অসুখ বিবেচনা করে দেখা যাক। এনকেফেলাইটিস; একরকমের ভাইরাস, ব্রেন আক্রমণ করে, চারদিন ১০৬° বা তার বেশি। সারভাইবাল শূন্য। আফ্রিকায় একরকম পোকার কামড় থেকে হয়। কিন্তু আমেরিকায় কেন হয়? কেউ জানে না। ক্যানসার অফ দা কিডনি; প্রথমে রক্তপ্রস্রাব হয়। মৃত্যুর আগে গলা দিয়ে বেরয় রক্তের ডেলা ও প্রস্রাব। প্রত্যেকটি রুগী মৃত্যুর আগে জেনে যায় যে সে তার নিজের প্রস্রাব বমি করতে করতে মরে যাচ্ছে। সারভাইবাল শূন্য। রবীন্দ্রনাথের, মনে হয়, এনলার্জড প্রস্টেট হয়েছিল, ও কিছু না, অপারেশন করালে আজকাল সবাই সেরে যায়। শেষ পর্যন্ত হয়ত ইউরেমিয়া হয়েছিল তাঁর, আহা, কেউটের বিষ, বড় কষ্ট, রক্ত, মাংস ও হাড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর কোনও প্রিমোনিশন ছিল না কেন? তাঁর চরিত্রদের কে কোন স্পেসিফিক অসুখে মারা গেল? "অসীম, আমার অসীম" বলতে বলতে শচীশ ছুটে চলে গেল নদীতীরে, যেখানে, জ্যোৎস্নায়, দামিনীর চোখের মতো বালি ঝকঝক করছিল। তারপর তার কী হল? কী অসুখ করে সে মরল? তবে কি সে আদৌ মরল না নাকি? অবশ্য পৃথিবীতে ২৫ ভাগ লোকের মৃত্যুর কারণ কেউ জানতে পারে না, তা জানে স্তব্ধতা, কিন্তু তারাও মরে যায়।

অথচ এই ভয়, এনকেফেলাইটিস বা ক্যাসার অফ দা কিডনি সে যাই হোক, ভয় থেকেই অতি-আধুনিক কলকাতা জন্ম নিচ্ছে। ভয় একই সঙ্গে ট্রানসেনডেন্টাল ও অতিজটিল, ভয় সর্বত্র, কোনও সমাধান নেই, কোনও পরিত্রাণ নেই বলেই তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা না করে মানুষ আজ এমন নিশ্চেষ্ট, তাই সে কিছু করার পরিবর্তে, বাড়ি ফিরে রেডিও সিলোন খুলে দেয় ও রাত পৌনে-১১টা পর্যন্ত, "আব শিউকুমার সরোজকো আঁজ্ঞা দিজিয়ে, জয় হিন্দ" পর্যন্ত শোনে। বিপদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাবার পর, আজ আর আমরা কোনওরকম কাজ করি না, বিশেষত এমন কাজগুলি আদপেই করি না বা তার ধারকাছ দিয়েও যাই না যা নাকি আমাদের স্নায়ুর উপর বিন্দুমাত্র বা কোনোরূপ উৎপীড়ন করতে পারে। পেনে কালি ভরতে খারাপ লাগে, নিজে ভরি না, সপ্তাহে দাড়ি কামাই না তিনবার, একসঙ্গে পর্যাপ্ত জামাকাপড় করিয়ে নিয়ে সেগুলো ডাইংক্লিনিঙে দেয়া-নেয়া করতে থাকি এমন ভাবে যাতে নিজে ইস্ত্রি করে নেবার কোনোরূপ প্রয়োজন না দেখা দেয়। বস্তুত এইসব সুবিবেচনা বা স্নায়ুর প্রতি এ-রকম সৌম্য ব্যবহারের জন্যেই অনেকের তুলনায় আজ আমরা এমন সুখী। ঘুম কেবল আমাদেরই আসে অবলীলায়। এই কারণে আমাদের বন্ধুবান্ধব কখনো ভিটামিনের অভাবে মারা যায় না বা গাড়ি চাপা পড়ে না বা সুইসাইড করে না। বা সচরাচর পাগল হয়ে যায় না।

বাকি থাকে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক-ব্যাপারেও আমরা সবরকম করে দেখেছি। তাকে ভালবেসে দেখেছি, উপেক্ষা করে দেখেছি, ঘৃণা করে দেখেছি। সেও আমাকে উপেক্ষা করেছে, রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে বলেছে, "রাস্‌কেল।" "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে", হি-হি করে হাসতে হাসতে সে বলেছে, "তোমার গেঞ্জিতে আমার ব্লাউজের..." আরও হাসতে থাকে, "একসঙ্গে কেচেছিলাম" গেঞ্জি আলোর নিচে দুহাতে তুলে ধরে, "দেখা যাচ্ছে, উঁ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?" হালকা হলুদ দাগ, বাঁ-দিকে, গেঞ্জিতে, বুকের কাছে, আলোর নিচে, "এই

গেঞ্জিগুলোর কী-রকম দাম?" সে তারপরেও বলে, "দাগ লাগিয়ে দিলাম তোমার গেঞ্জিতে", মাথা নিচু করে সে বলেছিল। এ-রকম কথাবার্তা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদেরও হয়েছিল। বস্তুত, পাঠক, আপনি যেই হোন, পুলিস-কমিশনার, মন্ত্রী, ক্রীড়া-সমালোচক, সৎকবি বা কেরানি, অধ্যাপিকা, নক্সালপন্থী বা ফিলম্-ডিরেক্টার যেই হোন আপনি, কী আপনি পেয়েছেন যা আমরা পাই নি, কী আপনি করেছেন যা আমি করতে পারি নি?

হৃদয়ের দিকে ৬॥০ ইঞ্চির বেশি কেউ এগোতে পারে না, কোনও মানুষ, সেখান থেকেই সে চিরকাল ছুঁড়ে যাচ্ছে তার গোলাবারুদ। আমরাও ওই একই কাজ করেছি। কমিউনিস্টকংগ্রেস বঙ্গসংস্কৃতি কালচালার ফ্রিডম রাষ্ট্রভাষা এমারজেন্সি পুলিস সিসটেম পাক ভারত চিন ভারত আফ্রোএশিয়া মেগাটনভিয়েতনাম কোনোকিছুর দিকেই এগোনো যায় না ৬॥০ ইঞ্চির বেশি, অতএব, আমরা পৃথিবীময় এই যৌনসভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ অবশ্যই করছি, দেখা যাক আমাদের কী হয়।

বাকি থাকে স্ত্রীলোক কিংবা স্ত্রীলোকও বাকি থাকে না। একমাত্র জিনিস যা স্ত্রীলোককেও ভুলিয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে ভয়। সুপারস্টিশান জেগে উঠেছে, একটা দুর্ভাগ্য আশা করছি সবসময় যা সাক্ষাৎমাত্র আমাকে ভেঙে মুচড়ে ফেলবে, চিৎ করে পেড়ে ফেলবে মাটিতে। আমি জানি এ-সবই আমার ইনওয়ার্ড সিকনেস যা আমি বাইরে প্রোজেক্ট করছি। কিন্তু ভয়ে আমার শিকড় সরসর করছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত, মাংস ও হাড়ের এই শরীর, এই আমার সমস্ত জীবন এবং যতটুকু জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এই আমার সমগ্র পৃথিবী। কোনওরকম টাইম-সেন্স নেই, কিছু আমি জানি, বাকি জানে নিস্তব্ধতা, আগে বলেছি। যে যার পৃথিবী ছেড়ে, শরীরময় সমস্ত জীবন নিয়ে আমরাও গেছি উদ্ধারের শেষ আশা বিশ্ববিশ্রুত স্ত্রীলোকের কাছে, এই ভয়কে পেনিট্রেট করার জন্যে জানু ভেঙে বসেছি।

আমরা দেখেছি মহিলারা আমাদের জন্যে নয়। পৃথিবীর মহিলারা আলনায় ধুতি কুঁচিয়ে রাখে কেবল হাফ-উইটেডের জন্যে যারা অমর, কিন্তু আমরা যারা....যারা অমানুষিক ও সম্পূর্ণ গাড়োল, যারা মরণশীল ও কাওয়ার্ড—যারা ভীতু মানুষ—আমাদের পরিত্রাণ সেখানে নেই, কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারে না, আমরা বিবেচনা ও পুনঃপুনঃ বিবেচনা করে অবশেষে ওই ভয়ের ভিতর ঢুকে যেতে চাই—পৃথিবীর ভীতু মানুষরা নিজেদের জয়ধ্বনি করতে করতে দুহাত তুলে ভয়ের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, ওই দেখুন।

১৯৬৮

## নিদ্রিত রাজমোহন

ওই ঘুমুচ্ছে রাজমোহন। না, না! মরে যায় নি। কাল সকালেই আবার জেগে উঠবে। অবশ্য ঠিক কখন, ভোরের দিকে না বেলা-করে তা আমি বলতে পারি না! জানি না সে ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠবে, নাকি জেগে উঠে বহুসময় লেপ্টে থাকবে বিছানায়। এতে তার কোনও হাত নেই। এ-টুকুও আগে থেকে জানার উপায় নেই। রাজমোহন জানে না। তবে, একটা কথা, মানুষমাত্রেই ঘুমুতে ভালবাসে। রাজমোহন তাই ঘুমুচ্ছে। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে তার মেয়ে ও বউ। এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময় রাজমোহনের-কথা বলার; সে এখন ঘুমুচ্ছে বলে। এবং, বিশেষত, সে আজকাল এ-ঘরে একা ঘুমুচ্ছে।

আজ বেশ তাড়াতাড়ি রাত ১০টা নাগাদ মশারির ভেতর এ্যাশট্রে ও সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সে ঢুকে পড়ে ও মাত্র প্রথমটি আধাআধি পৌঁছবার আগেই ঘুমে ছিঁড়ে যায় তার মাথা;

সেই থেকে ঘুমুচ্ছে। তার আগে অফিসফেরত সে গিয়েছিল রমার দাদার কাছে। উনি তখন সারিবদ্ধ আইনের আলমারির মাঝখানে অ্যাডজাস্টেবল টেবল-ল্যাম্পটা টেনে কাছাকাছি নামিয়ে খোলা ব্রিফের ওপর রেখে পেরি ম্যাশন পড়ছিলেন। তখনও মক্কেলদের আওয়ার্স শুরু হতে দেরি, কেউ কেউ বাইরে বসেছিল। গরমকালে খালি গায়েই মক্কেলদের সঙ্গে আলাপ করা ওঁর রেওয়াজ। স্নান করে আসার জন্যে সেই সোনালি-ফরসা সম্ভ্রান্ত চামড়া আজও রাজমোহনের চোখে পড়ে । প্রথম-প্রথম এর মাহাত্ম্য সে বুঝত। চাঁচা ঝুলপির ওপর লাইব্রেরি-ফ্রেম চোখে পড়ত। আজ গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে ৭ বছরে দুহাতের অধিকাংশ আঙুলে নানান ধাতুর আংটি, আজ দু-একটি আঙুলে একাধিক করে, সে দেখে। রাজমোহনকে দেখে মুখ তুলে বরাবরের মতো বিশ্বাসযোগ্য আন্তরিক গলায় উনি বলে উঠলেন, "আরে! এসো, এসো", চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, "তারপর...খবর কী তোমাদের, এ্যাঁ? টুকিসোনার খবর কী? রমা স্কুলে যাচ্ছে? চ্চঃ, চ্চঃ," আপশোস করলেন, "একটা ফোওন পর্যন্ত তোমরা কর না। আর আমিও—মানে এ্যাত্তো ব্রিফ নিয়ে ফেলেছে—" বলে হেসে পেরি ম্যাশন তুলে ব্রিফ দেখালেন। ওঁর এই ভরাট গলা, প্রতি শব্দে তার প্রয়োজনীয় ওঠা-নামা, একদিন ছিল যখন এ-সব লক্ষ্য করে রাজমোহন না ভেবে পারত না যে তার এ-রকম একটা গলা নেই। বাস্তবিক, দুপুরের ঘুম সন্ধে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারলে তারপর নিজের গলা শুনে তারও একসময় কত না ভাল লাগত। বাসে উঠে পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ঘুম-জাগা গলায় শুধু 'টেরিটি বাজার' শব্দটা পর্যন্ত ছিল শোনার মতো। দিব্বি কয়েক ঘণ্টা থাকত ও-রকম, গলার আওয়াজ, অবশ্য ক্রমেই মিইয়ে আসত তার দার্ঢ্য—কৃত্রিম বই কিছু তো আর নয়। রমার দাদার গলা কিন্তু সারাদিন এরকম, রোজ, প্রায় প্রতি শব্দে। এ-সব আগে খুব লক্ষ্য করত রাজমোহন।

সত্যি, বেশ কয়েকমাস খবরাখবর নেই, শেষ এসেছিল রমার দাদার বিবাহের রজতজয়ন্তীতে। ফ্ল্যাট থেকে রাস্তায় নেমেই, ২৫ গোলাপের তোড়া ও টুকিকে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, 'দাঁড়াও, একমিনিট' বলে, বিয়ের আগে তার কিনে-দেওয়া চান্দেরি পরে রমা এগিয়ে গিয়েছিল ডাস্টবিন অবদি ও তার মধ্যে আলতো করে ছুঁড়ে দিয়েছিল খবরের-কাগজ দিয়ে নিট্‌লি প্যাক-করা একটা প্যাকেট। বিয়ের প্রথমদিকে কিছুই বুঝতে পারত না, বাথরুমে একের পর এক জমে উঠত ছোট ছোট গম্ভীর প্যাকেট, তারপর হঠাৎ আর দেখতে পেত না। তখন রমা তার অবর্তমানেই কাজ সেরে রাখত। অথচ, সন্ধের ঝোঁকে ফেলে দিতে প্যাকেট-হাতে রমাকে ডাস্টবিন পর্যন্ত যেতে দেখে প্রথমদিন একনজরেই সে বুঝেছিল কী; রাজমোহন বুদ্ধিমান। তাদের সাউথ কুলিয়া রোডের লোয়ার মিডলক্লাস পরিবারের সঙ্গে নেবুবাগানের প্রসিদ্ধ ঘোষ পরিবারের সে তফাত করতে পেরেছিল। পেরে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিল।

যাই হোক রমার দাদার সঙ্গে কিছু উত্তর-প্রত্যুত্তর শেষ করে আজ রাজমোহন তার অবিকল অফিসফেরত গলাতেই। যার পর নেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রথমে বলল, "দেখুন মেজদা, আমি আজ শেষদিন বাড়ি ফিরছি এবং কাল থেকে ভবিষ্যতে কোনওদিন-আর বাড়ি ফিরব না।" বলে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজমোহন। আমি ভাবলুম, ব্যাস, খেলা খতম, এই বুঝি বুকের ওপর ঝুলে পড়ল তার মুণ্ডু, আর বোধহয় মুখ খুলতে পারবে না। কিন্তু সাবাস রাজমোহনকে, চেয়ার ছেড়ে ওঠার শুধু ভঙ্গিটুকু করা মাত্র, "ক্কী বোওল—" পর্যন্ত বলতে গিয়ে তর্জনী তুলে তাকে বাধা দিতে দেখলুম, "না!" রাজমোহন উঁচু গলায় জানাল। "না, আজ কিছুই হয় নি", বলতে বলতে শক্ত হয়ে গেল তার পড়-পড় ঘাড়, নম্র হয়ে এল গলা, একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস প্রচণ্ড-জটিল দাড়ি ছুঁয়ে তার বোতাম-খোলা বুকে এসে লাগল।

রাজমোহন বলল, "অন্তত, আজ, কিছুই হয় নি। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি বা এ-ধরনের।... দেখুন মেজদা, আমি সব ভেবেছি। মেয়ে, রমা, ভবিষ্যৎ—আমাদের গুরুজন বা আত্মীয়স্বজনের কথা—দাঁড়ান, আমাকে বলতে দিন—এএএ, কী বলছিলুম, হ্যাঁ, বিশেষ করে আপনার কথা। কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার চেয়ে দুজনের আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। সর্বনাশ বলতে ধরুন খুন বা আত্মহত্যা? আমরা প্রতিমুহূর্তে তিল তিল করে নিজেদের খুন করছি এটা কেমন নাটুকে শোনায় যদিও আমরা তাই করছি। কিন্তু খুন বলতে আমি বলছি আর-একবার যদি আমি রমার গলা টিপে ধরি, মানে ধরলে, এবার হয়ত আমি ছাড়তে পারব না। আগে দু-একবার ধরেছি (হেসে) জানেন তো আপনি? সেও তো কেলেঙ্কারি, আমাদের বংশে কলঙ্ক, আপনাদের লোকাল প্রেসটিজ, লোক জানাজানি। বা আত্মহত্যা! সি শ্যাল অ্যাটেমপ্ট (মাথা নেড়ে) নো ডাউট! এক্ষেত্রে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া কী উচিত নয়, আলাদাভাবে হলেও অন্তত দুজনে বাঁচব তো। প্লিঈজ, এটা বুঝুন। টুকিও বাঁচবে, রমার অবলম্বন হতে পারবে। তার কাছে, আপনারা যদ্দিন আছেন আপনাদের কাছে, মানুষ হতে পারবে। এছাড়া," এই নিয়ে তৃতীয়বার রাজমোহন ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে রাখল ও কথা বলতে দিল না, "এছাড়া আমার মুখের কথার দাম দিতে হবে না। আপনি একটা ডিড তৈরি করুন। আমি যদ্দিন চাকরি করব বা বেঁচে থাকব আমার আয়ের অর্ধেক আমি, রমার যদি নিতে প্রেসটিজে লাগে, মেয়েকে দিয়ে যাব। রমাও চাকরি করে। আমি শিগগিরই এফিসিয়েন্সি বার ক্রশ করব। আমার আর কোনও উন্নতি না হলেও, এই পে-স্কেলে রমা আমার কাছ থেকে ২৪০ থেকে ৮৪০ পর্যন্ত মাসে মাসে পেয়ে যাবে।"

আমি ভেবেছিলুম রাজমোহন পারবে না। ধন্যবাদ রাজমোহনকে যে সে কোনও অ্যাডভাইস চায় নি। ভাগ্যিস রাজমোহন রমার দাদাকে সস্নেহ "আবার ঝগড়া করেছ তোমরা", বা হতভম্ব "প্রবলেম কী তোমাদের" গোছের কোনও প্রশ্ন করতে দেয়নি! ধরা যাক, 'গ্রিনিং গোরিলা'র মলাটের ওপর চশমা নামিয়ে রেখে যদি উনি জিজ্ঞেস করতেন, "তাহলে তোমরা বিয়ে করেছিলে কেন?" ভাবা যায়। কী উত্তর দিত রাজমোহন? "এ কী বলছেন আপনি? এ তো যে মরে যাচ্ছে তাকে 'তবে জন্মেছিলে কেন', জিজ্ঞাসা করার মতো, ভুল" বলতে পারত কি সে? না। তার সব গুলিয়ে যেত। আর, তার গুলিয়ে গেলে যা হয়, সে চুপ করে যেত। চিনি তো আমি রাজমোহনকে। কিংবা, ধর, উত্তরে যদি তাকে বলতে হত, গেল-বছরে আমরা একটাও চুমু খাই নি অথচ যৌনাঙ্গদুটি ব্যবহার করে গেছি, এই আমাদের প্রবলেম, তাহলে? সন্দেহ নেই যে তাহলে রমার দাদা বিনা পারিশ্রমিকে তাও সল্‌ভ করে দিতেন। খাও নি কেন? কেন যৌনাঙ্গদুটি শুধু? কে দায়ী? দুজনেই সমানভাবে? বেশ—কিন্তু কে শুরু করেছিল? সামলাও! রাজমোহন, আমি জানি, সামলাতে পারত না। ওদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ির দরজার ছিটকিনি নিচের দিকে। রাজমোহন চটি থেকে বের করে পা দিয়ে তা খোলে। দেখেছি তো, কখনো নিচু হয় না। খামে ৬ মাস ধরে ঠিকানা লেখা, চিঠি লেখে না। এর মধ্যে রাইটিং-প্যাড নিয়ে তাকে কখনো বসতে দেখি নি কী? তা নয়, 'গত শীতেই তুষের চাদর মুড়ি দিয়ে তাকে মধ্যরাতে আধ ঘণ্টাটাক বসে থাকতে দেখেছি যার মধ্যে দ্বিতীয় সিগারেটের আগুন থেকে সে ধরিয়ে নিয়েছিল তৃতীয়টি, ও, সত্যের খাতির, ডানহাতের রিস্টের ওপর, কলম নামিয়ে রেখে, মেরেছিল বাঁ-হাত দিয়ে একটা মশা। এ-ভাবেই স্নান করতে ঢুকে বাথরুমে টুলে বসে থাকতে তাকে কত দেখা গেছে। নগ্ন শরীর থেকে ঝুলে রয়েছে তার লম্বালম্বি হাত, হাতে ঝুলছে টিনের তোবড়ানো মগ, মাথা ভরতি চৌবাচ্চার পাড়ে নামানো। উপচে জল বহে গেছে কত। রাজমোহন এ-রকম। সে আজকাল হাত বুলোয়, বই পড়ে না। হাতের নাগালের একটু বাইরে সিগারেটের প্যাকেট, শুয়ে শুয়ে রাজমোহন মেয়ে বা ঝি-কে

ডাকে, রমাকেও ডাকত। শীতকালে খাটের সামনে চটিজোড়া রেখে তবে সে বিছানায় ঢোকে, ভোরে তার প্রয়োজন হয়। শীত শেষে যখন কয়েকদিন আবহাওয়ার ঠিক থাকে না, রাজমোহন লেপ ও কাঁথা দুই-ই নিয়ে শোয়। অর্থাৎ, রাত্রে কাঁথা ও ভোরে লেপ। এতটা বয়স হয়ে গেল আজও নিজের পেনে নিজে কালি ভরা তার অভ্যাস হল না, ব্রাশে পেস্ট তাকে নিজে লাগিয়ে নিতে হয়। এমনি রাজমোহন। মশারি খাটাতে গিয়ে বা নিজে দাড়ি কামাতে বসে তার অন্তর-আত্মা হায় হায় করে ওঠে, তার অস্তিত্ব প্রতিবারেই অতি বিপদজনকভাবে টলে যেতে দেখেছি। বছর ঘুরতে চলল সে আর দাড়ি কাটে না। দাড়ি কাটা সে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে মশারি, যা আজকাল সে নিজেই খাটিয়ে নিচ্ছিল, এই মশারি খাটানো নিয়ে বহু ব্যাপার আমার জানা আছে। এ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র রচনা হয়। উদাহরণস্বরূপ একটা বলি? এই যে মশারি, এর ৪টে দড়ির প্রত্যেকটিতে ঠিক জায়গায় একটা করে গিঁট দেওয়া আছে। রাজমোহন মশারির আঙটায় স্রেফ দড়ি গলিয়ে দেয়, তারপর গিঁট অবদি পৌঁছে দাও চোখ বুজে ফাঁস। মশারির সঠিক উচ্চতা নিয়ে প্রতিদিন উৎপীড়িত হওয়ার হাত থেকে এ-ভাবেই সে নিজেকে চিরতরে মুক্তি দিয়েছে। এ রাজমোহনেরই বুদ্ধি। গত বছরে মাত্র একবার মাইনের দিন স্ট্যাম্প নিয়ে যেতে সে ভুলে যায়। দেখলুম ব্যস্ত হল না। ইতিউতি চেষ্টা করল না। কাজ করে গেল। পরে বাথরুম যাবার পথে বসে দেখল একটা বেঞ্চে একঝাঁক বেয়ারা বসে আছে। তা জনপনেরো হবে। দাঁড়িয়ে পড়ে সে ওই একঝাঁক-বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, "স্ট্যাম্প আছে নাকি?" ২-১ জন বলল, "না।" কেউ, "হ্যাঁ" বলল না। দ্বারিক বেশি চেনা, "দ্বারিক তোমার কাছেও নেই বলো কী হে", বলে সে হাসল। একসঙ্গে অন্তত ১৫ জন লোকের কাছ থেকে খবর পাওয়া আলাদা-আলাদা করে জিজ্ঞেস করার পরিশ্রম বাঁচানো, এও রাজমোহনের বুদ্ধি। সে কুঁড়ে, এই জন্যেই বাধ্যত বুদ্ধিমান। প্রায় ৩৬ বছর এভাবেই তো কাবার করে আনল, হিসেবমতো প্রায় আধাআধি মেরে এনেছে—নয় কী? অলস অথচ বোকা, এ হলে আর এ্যাদ্দিন টিকতে হত না। তো, এই হচ্ছে রাজমোহন। অন্তত এই হচ্ছে তার একটা দিক, কিংবা কে জানে তার ৩৬ বছরের জীবনের এই-ই ফলাফল। রমার দাদার সঙ্গে সে পারবে কেন, পারে কখনো! তাই ধন্যবাদ রাজমোহনকে যে সে রমার দাদাকে, "সমস্যা কী", এটা জিজ্ঞেস করতে দেয়নি। বস্তুত সে কোনও কথাই বলতে দেয় নি। তাঁকে যা আরও ক্রেডিটেবল। সে যা জানিয়েছে তা হল শেষ, বা উপসংহার। শেষ থেকে শুরু হয় কি? সত্যতই, রাজমোহনের দিক থেকে অন্তত, তার ও রমার মধ্যে আর-কোনও সমস্যা নেই। কেননা, সমস্যা কী? যার একটা-নাএকটা সমাধান আছে তাই-ই সমস্যা। রমার দাদা পারেন সমস্যা মাত্রেরই সমাধান করে দিতে যদি তা প্রতীয়মান হয়। রাজমোহন তাই ভাল করেছে গড়গড় করে শুধু উপসংহারটুকু বলে গিয়ে, যা সমস্যা নয়। আমি রাজমোহনকে জানি। তাই বলছি।

সে অপর কোনও মহিলার সঙ্গে প্রেম করে না এটা মেজদাকে খুলে বলে নি বলে কোনও ভুল করেছে রাজমোহন এ-রকম আমি মনে করি না। কারণ, আর অফিসফেরত গলা একবারও পরিষ্কার করার প্রয়োজন না বোধ করে, ঈষৎ ঝুঁকে এমন অহংহারা গলায় কথাগুলো সে বলে যায় যে গোটাটা শোনাচ্ছিল স্বীকারোক্তির মতো সরল, এতে ভুল-বোঝাবুঝির কোনও সুযোগ থাকতে পারে না। সত্যি, অদ্ভুত শোনাচ্ছিল তার গলা। ঠিক, অবিকল, রাজমোহনের গলার মতো শুনতে লাগছিল।

যাই হোক; এখন ওই ঘুমুচ্ছে রাজমোহন। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে তার ৭ বছরের বউ ও ৬ বছরের মেয়ে। আজ তার মশারিতে একটাও মশা নেই। আজ বাড়ি ফিরে, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সে চলে গিয়েছিল অদূরে—লেভেল ক্রশিং-এর ওপারে। সম্পূর্ণ অচেনা সেলুনে সহসা ঢুকে শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে সে কামিয়ে নিয়েছে তার শেষ কয়েকমাসের সর্বনাশা

দাড়ি। ইদানীং দ্রুত পাকতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘুমে ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে তার পরিতৃপ্ত ও চকচকে মুখ। না-জানি কাল ঘুম-জাগা গম্ভীর 'টেরিটি বাজার' তার গলায় কত জমকালো শোনাবে। জানি না কাল কখন উঠবে রাজমোহন। কীভাবে উঠবে। তবে কাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে আর বাড়ি ফিরবে না। শুধু, যদি রমা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে, ডিডটা করার জন্যে মাঝে মেজদার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে।

কনগ্র্যাচুলেশানস, রাজমোহন রায়চৌধুরী। সাবাস!

*দেশ*, ১৯৬৯

## বিপ্লব ও রাজমোহন

রাজমোহন যে এতদিন সুইসাইড করে নি তার কারণ মাত্র একটা। কারণ এই যে, সে একটা রিভলবার সংগ্রহ করতে পারেনি। সংগ্রহ করতে পারে নি বললে ঠিক বলা হয় না। বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। একটা রিভলবার, বলা উচিত, তার হাতে উঠে আসেনি। যার-পর-নেই এফটলেশ ছিল তার জীবন, বিনা চেষ্টায় সে এতকাল বেঁচে থেকেছে—অসুখে, অ্যাকসিডেন্টে বা ভিটামিনের অভাবে ৬০/৬১ নাগাদ মরে যাবার আগে পর্যন্ত সে বিনা চেষ্টায় বেঁচেও থাকবে, মানে, ততদিন পর্যন্ত চেষ্টা বিনা যদি না একটা রিভলবার তার হাতে উঠে আসে। এন এন কুণ্ডুর দোকানে সে একবার নিশ্চয়ই যাবে, যদি যেতে হয়। এটা ক্যাজুয়াল ব্যাপার, কেন পারবে না যেতে? যদি রিভলবার পায়, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে লোড করার। লোডেড পাবে এতটা আশা করা তার পক্ষেও অন্যায়। এই যে সেবার সাপ বেরুল বাগানে, না ঠিক বেরোয় নি, সরু ডালে লেজ আটকে দোল খাচ্ছিল সাপটা। শীতের রোদে লালা হয়ে উঠেছিল মাথা, নাকি, অন্নি রাঙাই ছিল সেটা আজ আর রাজমোহন বলতে পারে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেদিন একটা লাঠি পাওয়া গেল না তাদের বাড়িতে, তা যদি লাঠিই না থাকে তো রাজমোহন করবেটা কী। অগত্যা সে ও রমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজের নাড়ায় গাছ থেকে শেষক'টি শিউলি ঝরে পড়তে দেখল। আ, গাছতলা ভরে গিয়েছিল ফুলে।

সে চায় শুধু ঘোড়াটা টিপতে, রাজমোহন। সে দাঁড়িয়ে করবে, মুণ্ডু পাদ্রিদের 'আমেন' বলার সময় যেমন, ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, কপালে নলটা ঠেকিয়ে রাখবে, নল ঠাণ্ডা, ৪ থেকে ৬ মুহূর্তের মধ্যে সে সটান মেঝেয় পড়ে যাবে আশা করে। পিস্তলের শব্দ শুনতে পাবে, দূরত্বকে শব্দের গতি দিয়ে ভাগ করে দেখেছে রাজমোহন। আশা তো করে ততক্ষণ চেতনা থাকবে ও মাথায় কোনও আঘাত পাবে না। তবে মাথা, বিশেষত মাথাটা তার খুব জোরে ঠুকে যাবে মেঝেয়, নিশ্চিত একটু ফুলেও থাকবে সেখানটা, যেমন এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ফুলে থাকে? না, দরজায় সে খিল দিয়ে রাখবে না। ধাক্কাধাক্কি...সে বড় বিশ্রী।

তো, ঐ কপালে রিভলবার, এটা একটা ফিক্সেশানের মতো হয়ে গেছে রাজমোহনের, 'অনন্যোপায়' শব্দটা তার ক্ষেত্রেই এখন প্রযোজ্য। কেননা, অন্য উপায় নেই যার, সে-ই তো অনন্যোপায়? রাজমোহনের অন্য উপায় নেই।

এ নয় যে বিলিতি ছবি দেখে দেখে বা বয়স হবার পর থেকে বাঙলার তুলনায় ইংলিশ কেতাব বহু বেশি পড়ার জন্যেই রাজমোহন উপায়-ব্যাপার এমন নাচার। রোহিনী এ্যাটেমপ্ট করেছিল হরিদ্রাগ্রামের বারুণি পুকুরে, ১৬ বছর বয়সে প্রথম পাঠের সময় স্বয়ং গোবিন্দলাল হয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে সর্বশেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে, রাজমোহন, স্বচক্ষে দেখেছিল,

জল কাচের মতো স্বচ্ছ। জলের তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। স্ফটিকমণ্ডিত, হৈম প্রতিমার মতো রোহিণী জলতলে শুয়ে আছে। সন্ধ্যার জলে তার কলসী ভেসে যাচ্ছে। আরও ১৬ বছর পরে সহসা একদিন, কোনও একদিন, শুধু-ঐ, কেবল ঐ-অংশটুকু পুনরায় পাঠ করার প্রথম প্রয়োজন হয় রাজমোহনের। তখন মাঝরাত। তখনো টুকুন রমার পেটে নড়ত, গলা থেকে খুলে সন্তর্পণে রমার হাত নামিয়ে রেখে সে উঠে পড়ে ও পাশের ঘরে তার ছোট্ট কালো উরুসমান বুককেসটির দিকে এগিয়ে যায়। উপিন্দর নামে এক ছুঁতোর তাদের পৈতৃক বাড়ির সামনে রোজ র‍্যাঁদা ঘষত। তাকে দিয়ে সেল্‌ফটি করিয়েছিল রাজমোহন। সমস্ত মাপ বলে দিয়েছিল ও ডিজাইন এঁকে দিয়েছিল। এটি ছিল উপিন্দরের তৈরি প্রথম আসবাব। সে পারিশ্রমিক নিতে চায় নি। পায়াগুলিতে রাজমোহন লাগয়ে দিয়েছিল পিতলের উজ্জ্বল শু।

সেই শুরু। ১৬ বছর পরে টেবিল ল্যাম্পের নীচে প্রয়োজনীয় অংশটুকু পুনরায় পাঠ করতে গিয়ে এবারো রাজমোহন দ্যাখে, রোহিণী সেই একইভাবে জলের নীচে জল আলো করে শুয়ে আছে। তফাৎ শুধু এই যে, হায়, এবার সে পরবর্তী ষোড়শ পরিচ্ছেদ পড়ে দেখার কোনওরূপ বা বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করে না যেখানে রোহিণীর রক্তকুসুমকান্তি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে, বড় বড় ফুঁ দিয়ে গোবিন্দলাল মুহূর্যুর হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বরং ভাসমান কলসী দেখে এবার তার অত্যন্ত ভোঁতাভাবে বিষ্ণু দে'র 'ছত্তিশগড়ী গান'-এর দুটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যায়, মনে না-পড়ে যাবে কোথা, সে, ইতিমধ্যে, ঐ ১৬ বছরে, বিষ্ণু দে পড়েছিল।

এ-রকমভাবে প্রতিটি পদ্ধতিই সে বিবেচনা ও পুনর্বিবেচনা করে দেখেছে, পটাসিয়াম থেকে শুরু করে রিস্টের শিরা কুচ্ করে কেটে গরম জলে ডুবিয়ে রাখা কটা বা। কী যেন নাম ছিল মুদিটার...আলব্রেশট গ্রেফ! হ্যাঁ গ্রেফই তো। সেও প্রায় ১০/১২ বছর হতে চলল, যখন দোকানি নেই অথচ থরেথরে সাজানো জিনিস এমন দোকানে বালক অস্কারের হাত ধরে ২৪ বছরের যুবক রাজমোহন নীরবে প্রবেশ করে ও দরজা ঠেলে সংলগ্ন গুদামে প্রথম ঢোকে। পাল্লা-খোলা আলো আয়তাকারে গিয়ে পড়েছিল প্রায়ান্ধকার গুদামের মাঝ বরাবর খালি ফলের বাক্স পর্যন্ত, আলো বাক্সর ওপর গ্রেফের বুটসুদ্দু গোড়ালি জড়িয়ে ধরেছিল। বালক অস্কার মনে করেছিল, গ্রেফ বুঝি বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে লেংচে তাক থেকে কিছু পাড়ছে। কাছাকাছি গিয়ে প্রথমে সে দ্যাখে বাক্সর ওপর বিছিয়ে-রাখা খালি পেঁয়াজের ক'টি থলে; তারপরেই বস্তা ও জুতোর ডগার মধ্যে ফাঁকটুকু তার চোখে পড়ে। আপাদমাথা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ঐটুকু ছেলেটার, মুখ শুকিয়ে এতটুকু, গোড়ালি থেকে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে তারা, সে ও অস্কার, একসঙ্গেই তো ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। যুদ্ধপূর্ব জার্মানির ডেনজিগ শহরের মুদি আলব্রেশট গ্রেফ-এর অন্ধকার অবয়ব অনুভব করেছিল।

এক যুগ পরে একদিন র‍্যাক থেকে বইটি আবারো টেনে বের করার তার প্রয়োজন হল। কাঁপা ব্যগ্র হাতে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ ওল্টাতে-পাল্টাতে থাকে, পাতায় পাতায় তার সে কী খোঁজাখুঁজি। অবশেষে প্রায়। ৩১৪ পাতায় আজো, ১০ বছর পরে, সব অবিকল তেমনি, শরতের অতিরিক্ত আলো জড়িয়ে ধরে আছে গ্রেফের পা দু'খানি। হাঁটু পর্যন্ত কালচে সবুজ মোজা, গ্রেফ যাতে গার্টার লাগাতে ভোলেনি। ডানহাতে বুকের কাছে বাগিয়ে ধরে আছে তার ধুলিমলিন ফেল্টের হ্যাট, সে দ্যাখে। কিন্তু হায়, এখন সেই বালক অস্কার আর নেই। এখন সে একা। এবার পড়ে তার কিছুই মনে হয় না। ৩১৪ পাতায় আজো ঝুলছে, একদিন ছিল যখন যা দেখে সে ভয় পেয়েছিল। আজ ভয় পায়, আর ভয় পায় না এই দেখে। আজ কান্না পায়।

রেলবাঁধের ওপর মর্নিং-স্কুল যাবার পথে অতি প্রত্যূষে দূর থেকে তারা, সে ও বেচু,

দেখতে পেয়েছিল অস্ফুট ভিড়, শুনতে পেয়েছিল তার আবছা কোলাহল। তখনো পুলিস আসে নি। তবু ভিড় ঠেলে লাইনের ধারে ধড় ও কাটামুণ্ডু দেখার সাহস তাদের হয় নি। তারা স্কুলের পথ ধরে এগিয়ে যায়। স্লিপারের ওপর ঘন রক্তের ফোঁটা পড়ে থাকতে দেখে সে ভেবেছিল রাতের মালগাড়ি থেকে চালানি ভেড়া কি শুয়োরের মাংসের রক্ত, বস্তুত, অনেকটা দূরে লাইনের ধারে মেজদার কনুই-থেকে-কাটা নীল ও কর্কশ হাত দেখেও সে চিনতে পারে নি। "কিছু বুঝতে পারছি না মাইরি", এডেন বন্দরে কেনা মহার্ঘ রিস্টওয়াচের রক্তাক্ত কাচে কান পেতে রেখে বেচু বলেছিল; অর্থাৎ এখনও চলছে কিনা। আজ আর জানার উপায় নেই। রাজমোহনও ছুঁয়ে দেখেছিল বৈকি। হ্যাঁ রাজমোহন রাজমোহনই তো। রাজমোহন ছুঁয়েছিল! সে যে প্রায় মিনিট-দুই ধরে কিছু না-জেনে অবুঝ সে চেপে ধরে বসেছিল তার দাদা লেফটেন্যান্ট কিশোরীমোহনের কাটা হাত, মূলে মূলে টের পেয়েছিল শট-সার্কিটের শিউরানি, যে হাড়গুলো নরম হয়ে এসেছিল, সে তো তারই। সেইদিনর সেই মুহুর্মুহু ও উপর্যুপর হৃদস্পন্দনগুলির একটি, মাত্র একটির জন্যে আজ সে কিনা দাম দিতে পারে। ওওও রাজমোহন!

৩১৪ পৃষ্ঠায় গ্রেফ আজো তেমনি মানানসই ঝুলে আছে, অবশ্য মেজদা আর তেমনভাবে লাইনের ধারে পড়ে নেই। পনের পরিচ্ছেদে রোহিণী কিন্তু জল আলো করে শুয়ে আছে। জলের তলায় তাকে মানায় না, রাজমোহনকে, সে ভেবে দেখেছে। সে রোহিণী নয়। রোহিণীকে মানায়। সে গ্রেফ নয়। সে রাজমোহন। আত্মহত্যার উপায়-ব্যাপারে তার আর কোনও অনুসন্ধান নেই। নাআ!

বিশেষত, এই ব্যাপারটায় তো নিঃসংশয় রাজমোহন যে, আর-যে যেভাবেই করুক, করলে, অন্তত তাকে করতে হবে সেফ্‌টি খুলে কপালে নল রেখে কিছুক্ষণ, তারপর স্রেফ ঘোড়াটা টিপে দিয়ে। আজ কেবল ঘোড়া টিপে দেওয়াতেই তার একমাত্র বিশ্বাস, আহা, 'বিশ্বাস' কথাটা আজ, অবশেষে, রাজমোহনের ক্ষেত্রে কত সত্যি! রাজমোহন, কপালে নল রেখে, ঘোড়া টিপে দেওয়াতে— কী? না, বিশ্বাস করে। তবে বুঝি একেবারে বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়নি রাজমোহন, ভ্রষ্ট হয়ে হারায় নি জীবনের একাগ্রতা, রাজমোহনের বিশ্বাস আছে। রাজমোহন বিশ্বাস করে।

মাত্র বছর পাঁচেক আগেও রাজমোহন এ-রকম ছিল না। তারপর গত ৫ বছরে সে অনেক পাল্টে গেছে। আগে কেমন টানা সুরে ডাকতে পারত, 'ট্যাক্‌সিঈঈঈ।" প্রতিটি ক্ষেত্রে মোটা ও গম্ভীর গলা বেরত। সোজা উঠে ভেতরে গিয়ে ব'সে সে কতবার বলেছে, "বালি চলো।" গেছে। নিউ মার্কেটে ফেরৎ দিতে গেছে টিনের স্যুটকেশ। নিয়েছে। এখন পারে না। এখন, পাল্টে গেছে। মানুষ পাল্টায়। পাল্টে যাওয়া বলতে কী বোঝায়, সে এখন বোঝে বৈকি। 'চেতনাধারার ছাপ জীবনকে গড়ে না, জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে'— এটা কোথায় পড়েছিল রাজমোহন? পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে এখন শুধু ঝাপসা অক্ষরগুলো দেখতে পায়। কবিতাটি ছিল বাঙলা অক্ষরে।

একদিন ছিল যখন রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে রমা তাকে বলেছিল, "রাসকেল!" "আমি অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ব। গুণ্ডা লাগাব। তারা প্রাণে মারবে না। হাত-পা ভেঙে আমার কাছে দিয়ে যাবে।" রমা বলেছিল। কত অলীক রিহার্সালই না সে দিয়েছিল রমাকে নিয়ে। অফিসে সিটে বসে কলম বন্ধ করতে করতে, না করে, একটানে হড়হড় করে খুলে ফেলেছে রমার গা থেকে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ও অন্তর্বাস, জড়ো করে হতচকিত রমার চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে পরিমাণ মতো স্পিরিট, তারপর ফস্ করে জ্বেলে, জ্বলতে দিয়ে, দূর থেকে দুটি কাঠি একসঙ্গে নিক্ষেপ করেছে। রমার জামাকাপড়ের স্তূপে জ্বলতে জ্বলতে কাঠি পড়তে দেখেছে। তারপর ধীরে বন্ধ করেছে পেনের ক্যাপ। ট্রামের জানালার রডে মাথা এলিয়ে দিতে

দিতে সহসা দু'হাতে কেবিনের পাল্লা খুলে সে ডেকেছে, "লাহিড়ি!" ঠক্ করে টেবিলে মদের গ্লাস নামিয়ে রেখে লাহিড়ি উঠে এসেছে জুতোর শব্দ তুলে, যেন পদক্ষেপ গুণে, তারা বাইরে এসেছে। তারপর লাহিড়ির দিকে তার সে কি অপরাজেয় আক্রমণ, আক্রমণ পরের পর, আছাড়ের পরমুহূর্তে আছাড়, নখে-নখ, দাঁতে-দাঁত, রক্তারক্তি, জাপ্টাজাপ্টি, ছেঁড়াছিঁড়ি—তার ধড় রাস্তায় ও মুণ্ডু ফুটপাতের ওপর রেখে পয়েন্টেড শু-র হিল দিয়ে রাজমোহনকে থ্যাঁতলাতে দেখে তবে রাজমোহন রড থেকে টেনে তুলেছে তার ভারি মাথা। রক্তচাপবৃদ্ধি কাকে বলে সে এ-ভাবেই জানতে পেরেছে।

এখন আর লাহিড়ির বিরুদ্ধে তার কিছু নেই। লাহিড়ি এখন সর্বত্র তার প্রশংসা করে বেড়ায়। "রাজমোহনের মতো ব্রিলিয়ান্ট সোল হয় না", লাহিড়ি বলে, "এত সম্ভাবনা ছিল রাজমোহনের।" "কত উন্নতি করতে পারত", লাহিড়ি আরও বলে। আজ তার ৪০ বছর বয়সে রমা অবশেষে তাকে আদর করে। তার সেই গাঁট-ওঠা মেরুদাঁড়া আর নেই, মেদে ভরে গেছে। বিছানার অন্ধকারে রমা এখন রাজমোহনের হাত খুঁজে বেড়ায় ও রোজই পায়। চুমু খাওয়া থামিয়ে রমা আজকাল তার সঙ্গে দু'কথা বলে, বলে আবার চুমু খায়। "তোমার মাছের রক্ত," প্রীত, গাঢ়স্বরে রমা তাকে বলে।

আজ, এখন, অফিস থেকে অন্যান্য দিনের মতো সে টানা চলে এসেছে বাড়িতে, বিশেষত গত মাসখানেক ধরে এই করছে, বরং ছুটির একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে। রমা গেছে মামার-বাড়ি জলপাইগুড়িতে, রমার স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল। অফিস থেকে ফিরে স্নান করে কোলের ওপর হাতদুটি জড়ো করে সে বসে আছে টেবিলের সামনে, টেবিলে ল্যাম্পের গোল আলোর নীচে পড়ে রয়েছে টেবিলের গোলাকার, আরও দূরে আবছা অন্ধকারে তার পরিকল্পনা কোনাকুনিভাবে দেখা যায়। অর্থাৎ বুকসেল্‌ফটি।

ল্যাম্পের নিচে বই খুলে বসে থাকে না সে বহুদিন হল। ডাকে তার কোনও চিঠি আসে না আর। গত একমাস ধরে তো সন্ধেবেলা রোজই বসে আছে, কই, কেউ ডাকতে আসে নি তো। শুধু একদিন এসেছিল। সেই যেদিন ভারতবর্ষের একটি রাস্তা দিয়ে কুয়াশার মধ্যে 'নিপাত যাক্!' 'নিপাত যাক্!' ধ্বনি দিতে দিতে মিলিয়ে গিয়েছিল একটি দ্রুত-মিছিল, বাড়ির সামনেই সে তখন, তাতেই অল্প সময়ের জন্যে আটকা পড়ে যায়। সেই সময় সে এসেছিল। ৪নং ফ্ল্যাটের টুবলু তাকে পরদিন বলে। নাম বলে যায় নি। "কিছু বলার দরকার নেই, থাকে তো সন্ধেবেলা", সে জেনে গেছে। বলে গেছে "আমি আবার আসব।" তারপর থেকে রাজমোহন আর চা খেতে বেরোয় নি। তার গলায় ছিল টাই। সে নাকি ছিল লম্বাপানা। "ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন মেসোমশাই", টুবলু তাকে বলেছিল।

এখন ঐ জ্বলে যাচ্ছে। হু-হু করে জ্বলছে! ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসের চাপে বুক ফেটে যায় দেখে রাজমোহন তাড়াতাড়ি পশ্চিমের মাঠের দিকের জানালাটি খুলে দেয়। মেঘ ডাকাডাকি হচ্ছিল সেই সন্ধে থেকেই, তারপর তুমুল বৃষ্টি, ওদিকের প্রতিবেশী জানালাগুলো এখন শেষরাতে সব বন্ধ। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চোখ বুঝেও দম বন্ধ করে বোর্ডের দিকে অতিকষ্টে এগুতে থাকে রাজমোহন, আন্দাজে সুইচ টিপে সে রেগুলেটারটি ডান দিকের চরমে ঠেলে দেয়। হাওয়ায় দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে ওঠে ও জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে থাকে গলগল করে।

বাকি আসবাবপত্র মায় ছবিটবি সবই পাশের ঘরে সরিয়ে রেখেছিল। সে একটি র‍্যাপ-অ্যারাউন্ড গগল্‌স পরে নেয় ও হিটপ্রুফ গ্লাভ্‌স। তারপর শিশি থেকে পরিমাণ মতো স্পিরিট বেশ করে ছড়িয়ে দেয় উপিন্দর সিং-এর তৈরি সেল্‌ফ-এর চারদিকে, বইগুলাতেও লাগে

এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দেয় কাঠি যা জ্বলছে জ্বলছে উরুসমান তার একমাত্র বুক সেল্‌ফের ওপর গিয়ে পড়ে। প্রথমেই ভক্ করে স্পিরিটের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগে, তারপর রং-পোড়ার। প্রায় প্রতি বছরেই নিজের হাতে এককোট করে কালো, ভার্নিশ পেন্ট লাগিয়ে আসছে রাজমোহন।

নিচে থেকে পুড়ছে। নিচের ৯"×৯" ছোট চৌখুপিটিতে ধরত খানদশেক বই—পেপার-ব্যাকের জন্যেই করান—এটার ডানদিকের অষ্টম বইটি ছিল আলবার্ট ফন শামিসোর পিটার শ্লেমিল নামে ৯৮ পাতার বইটি। বইটাতে একটা সমুদ্রের বর্ণনা ছিল যার ঢেউসংখ্যা একটিমাত্র, তীরের দিকে এগিয়ে আসছে; ওখানে মার্জিনে 'হৃদয়ের শোক' কথাদুটি লিখে রেখেছিল রাজমোহন, এখন তাতে আগুন ধরেছে। এ ছাড়া ছিল তাদের বিবাহ উপলক্ষে পাওয়া দা ট্র্যাজিক সেন্স অফ লাইফ নামে বইটি, নিকুঞ্জ ছাড়া এত রসবোধ আর কার। বইটা পড়ে উপহারদাতাকে সে দুলাইন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, তার মনে পড়ে। দেখতে দেখতে চচ্চড় শব্দে দ্বিতীয় তাকে ধরে গেল আগুন, এত তাড়াতাড়ি, মাত্র দুটো বই ভালো করে পুড়তে লক্ষ্য করার আগেই! এই তাকটি ছিল সবচেয়ে বড়, লম্বায় সেল্‌ফের এ-প্রান্তর থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, বাঙলা বই-এর মাপে এর প্রস্থের মাপ দিয়েছিল। টিলা থেকে দেখা শরীর সূর্যাস্তে আগুন ধরে গেল, লবটুলিয়ার জঙ্গলে জ্যোৎস্না রাতে আগুন, 'হাওয়ার রাতে'র অগ্নিদগ্ধ মশারি কুয়াশায় দীর্ঘ বল্লম হাতে রূপসীদের ভেতর দিয়ে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে উড়ে যাচ্ছে। গগল্‌সটা চোখে চেপে বসিয়ে কাছে এগিয়ে যায় রাজমোহন। ওটা সেই আর্কটিক অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী, নো পাসপোর্ট টু আর্কটিক, ফুটপাতে এক-আধুলি দিয়ে কিনেছিল। বরফ খুঁড়ে জল বের করে স্নানরত সাহেব ট্রাভেলার এখন পুড়ে যাচ্ছে।, ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের বাঙ্কারে কাটসিন্‌স্কির ব্যারেলের ওপর ক্লাসিক প্রজাপতিটার ডানায় আগুন—একই সঙ্গে আগুন লেগেছে গীত-বিতানের ভেতর ঝাউপাতাটায়, যা রমা তাকে দিয়েছিল তাদের পরিচয়ের প্রথম দিকে। ঝাউপাতা দিয়ে ভাগ-করা পাতা দুটিতে ছিল মোট ৫টি গান, ডান দিকের পাতার শেষ গানের শেষ লাইনটা ছিল—'টেনে নিয়ে যেও না সর্বনাশায়।' সে-সময় রমার সব কাজই ছিল ডেলিবারেট। যাই হোক, দেখতে দেখতে ৩ ও ৪ তাকের ছোটবড় সব খুপড়িগুলোয় একসঙ্গে ধরে গেল আগুন, এখন গোটা সেল্‌ফ জ্বলছে, ধোঁয়ার মধ্যে রুমালে নাক চেপে জ্বালাভরা চোখে এখন আর বিশেষ-কিছু দেখতে পাচ্ছে না রাজমোহন, রাজমোহনের শরীর বেঁকে যেতে থাকে, সে আরও ঝুঁকে পড়ে। মিল্ক এ্যাজ এ মিরাক্‌ল ড্রাগ নামে বইটা ছিল, একটা পাখির বই ছিল, কাকাতুয়া-পায়রা ছিল অনেক, গোরা ছিল। গোরা? হ্যাঁ, গোরা। নষ্টনীড় ছিল। ভূপতি ফিরে এসে হাত চেপে ধরে বলল, 'আচ্ছা, চলো।' চারুলতা বলিল, 'না থাক।' 'শ্রেষ্ঠ জার্মান ছোট উপন্যাস' বইটা চক্রধরপুর থেকে অদূরে হেসাডির ডাকবাংলোয় কী-একটা ঝোড়ো তর্কে হেরে গিয়ে পরদিন ফেরার ট্রেনে ভবানী তাকে দিয়েছিল। মডার্ন লাইব্রেরির আলোকবর্তিকা-হাতে লোকটি এখন আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটছে। ভূদেববাবুর ছেলে মুকুন্দর বইটা ছিল কি?

এ সময় তৃতীয় পায়াটি একদম পুড়ে যায়, সেল্‌ফটা একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে, গেল-গেল, ভেঙে পড়ার অগের মুহূর্তে আগুনের মধ্যে সহসা রাজমোহন তার বাল্যবন্ধু বেচুকে দেখতে পায়। দেখতে পায় বললে ঠিক বলা হয় না,বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। সরস্বতী পুজোর দিন সকালে হলুদ-ছাপানো ধুতি পরেছিল বেচু, অঞ্জলি দেবে, মায়ের উনুন থেকে কাপড়ে আগুন ধরে যায়। একমাত্র ছেলের চারদিকে এভাবে মাটি ফুঁড়ে জ্বলে উঠতে দেখে আগুন, তার বিধবা মা প্রথমটা কিছুই করতে পারেন নি। পরে কাশীতে দেখা হয়েছিল। "কী করব বাবা, মনে হয়েছিল আগুনের মধ্যে ব্রহ্মাকে দেখেছি", বলেছিলেন। শেষকালে উনি অবশ্য এক

বালতি জল ছুঁড়ে দেন। বেচু তাতেই মারা যায়।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘর ভরে গেছে ছাই এ। উড়ন্ত পোড়া কাগজের টুকরো বড় সুড়সুড়ি দিচ্ছে মুখে চোখে। রাজমোহন পাখাটা নিবিয়ে দেয়। বিদ্যুতের মুহুর্মুহু আলো ছাইগাদার মধ্যে বারংবার প্রতিভাত করে তোলে একটি বই-এর কোণা। এবার উবু হয়ে বসে পড়ে রাজমোহন। গ্লাভ্‌স-হাতে ছাই ও কাঠের পোড়া টুকরো সরিয়ে বইটা তুলে নেয়। চারটির মধ্যে অগ্নিদগ্ধ দু'টি শু ওখানেই পেয়ে যায়, শু-গুলি ছিল পিতলের, পায়াগুলোতে নিজের হাতে পরিয়েছিল রাজমোহন। গনগনে আঁচের কাছে ধরে সে মলাটের পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে। পারে না। বিদ্যুতের জন্যে অপেক্ষা করে। ক্ষণকালের মধ্যে জ্বলে ওঠে ক্রমান্বয় ও ঘনঘন বিদ্যুৎ, বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে রাজমোহন অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, "এ কী!" তারপর গ্লাভ্‌সের চামড়া দিয়ে রগড়ে নিজের মুখ থেকে গ্রন্থের ছাই তুলতে তুলতে পাশের ঘরে চলে যায়। স্পিরিটের বোতল থেকে ছিটিয়ে এবার বেশ করে ভিজিয়ে নেয় দা ট্রাজিক সেন্স অফ লাইফ নামে বইটি, সহজে পোড়ে কখনো, কী বাঁধাই! তারপর দুটো কাঠি একসঙ্গে জ্বেলে ছুঁড়ে দেয়। এটা শিখেছিল ভবানীর কাছে, পুরীর সমুদ্রের ধারে এ-ভাবেই সিগারেট ধরাত ভবানী, একসঙ্গে দুটি কাঠি জ্বালিয়ে। ভবানীও জোনাথান কেপ প্রকাশিত বইটার ছাপা ও বাঁধাই-এর মাহাত্ম্য বরাবর স্বীকার করত।

রাজমোহন সব জানালাগুলি একে একে খুলে দেয়। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। ঘরটা রাতারাতিই সাফ করে ফেলতে হবে। ঘরের আর কিছুই পোড়ে নি, আগে থেকে এমন সুবিবেচনা করে সেল্‌ফটি রেখেছিল সে। শুধু একটা দেওয়ালে শিলিঙ পর্যন্ত কাঁচা একস্রে-প্লেটের হাড়পাঁজরের মত আগুনের হল্কা...বাড়িঅলার নামে একপোঁচ কলি করিয়ে ফেলবে নাকি রাজমোহন? রমা আর ২/১ দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

*মিনিবুক, ১৯৬৯*

## অংশু সম্পর্কে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি

আমার ও অংশুর জন্ম হয়েছিল ২১ নভেম্বর, ১৯৩৪ সালে, ৪টে ৩৫ মিনিটে। শুরুতেই কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারেন, আমার জন্ম হয় আরও কবছর পরে। হেসে তাকে বলার, এটা ভুল। নবজাত শিশু বাড়তে থাকে বটে, হ্যাঁ, সে তার হাত-পা। দৃশ্যত, মাথাও বড় হয়। কিন্তু তার মস্তিষ্কে জন্মমুহূর্তের নিউরন-সংখ্যা একই থেকে যায়, শেষের দিকে কমে বই বাড়ে না। যাই হোক, এ-নিয়ে তর্কাতর্কির মধ্যে আমি যাব না।

বস্তুত, জন্মতারিখটি অংশু জানতে পেরেছে এই সেদিন। গেল বছর, বিজয়া করতে সে গিয়েছিল বেলেঘাটায়, রাঙাবউদির ওখানে। রাঙাদার কাগজপত্রের মধ্যে এতকাল পরে খুঁজে পেয়ে তার বাবার একটা ডায়েরি বউদি সেদিন তাকে দেয়। না, ঠিক ডায়েরি নয়, প্রাক্তন জার্ডিন-হেন্ডারসন কোম্পানির এয়ারোপ্লেন-মার্ক স্টেনোগ্রাফির খাতা একখানা, মাত্র পক্ষকালের দিনপঞ্জিই তাতে রয়েছে। বাবার হাতে ইংরেজিতে '২১ নভেম্বর, ১৯৩৪'-এর নিচে লেখা ঃ 'টো-ডে, অ্যাট ফাইভ থার্টিফাইভ এ এম, প্রতিমা গেভ বার্থ টু মাই ফার্স্ট চাইল্ড—আ বয়। শি সাফার্ড মাচ ট্রাব্‌ল অ্যান্ড পেন টু ডেলিভার দা চাইল্ড।' প্রায় দুই যুগ পরে ওই ভাষায়, বা হতে-পারে জে বি ডি কালিতে লেখা মৃত মানুষের বিবর্ণ অক্ষরের টান-

টোনের মধ্যে পরলোকগতা সুন্দরী স্ত্রীকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি আমার দিকে বাবার উদ্যত তর্জনী দেখতে পাই। শরীরের তুলনায় আমার মাথাটা হয়েছিল ভারী ও বড়, কষ্ট সেইজন্যেই হয়। তাকে জন্ম দিতে গিয়ে মা-র কষ্টের কথা অংশু আগেও শুনেছে, যা সে স্রেফ ভুলে মেরে দেয়। তবুও একথা সত্যি যে, জেনেছে যখন, তার জন্মতারিখটি অংশু কখনো ভুলতে পারবে না।

সেটা হেমন্তকাল। ঠিক হেমন্ত নয়, হেমন্ত ও শীত এই দুই ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে সেদিন শেষ রাতে বেনেটোলায় ২২নং অভয় মিত্র স্ট্রিটে তাদের অধুনালুপ্ত পৈতৃক বাড়ির দোতলার নতুন ঘরে অংশুর জন্ম। মা-র গর্ভসঞ্চার হবার প্রায় সমসাময়িককালে বাড়িটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রয়োজন হয় এবং তার জন্মের ৬ মাসের মধ্যে প্রথম ও শেষাবধি একমাত্র সন্তান অংশুকে কোলে নিয়ে, প্রপিতামহের তৈরি সাদামাটা ছোট্ট বাড়িটি ছেড়ে তার বাবাকে সপরিবারে গঙ্গার অপর-পারে শিবপুরে চলে আসতে হয়। পশ্চাৎগণনা করে অবিশ্যি সেদিন শেষরাতে গ্রহতারকার অবস্থান জানা যেতে পারে, কৃষ্ণপক্ষ না শুক্ল জানা গেলে তখনো আকাশে চাঁদ থাকার কথা ছিল কি ছিল না, থাকলে তার আকার কী ছিল, ষাঁড়ের জোড়া শিং -এর মতন, না...বা, সেদিন, পৃথিবীতে তার প্রবেশমুহূর্তে, ভারতবর্ষসহ সমগ্র পূর্ব ভূখণ্ড জুড়ে তখন সূর্যোদয় হচ্ছিল না হচ্ছিল-না, এ-সবই জানা যেতে পারে। বাস্তবিক, পরবর্তীকালে এই অংশুকে, দুই ঋতুর মাঝবরাবর অকাল বর্ষার সূচনায় ব্যগ্র হয়ে উঠতে কত দেখেছি, আমি জানি কেন, অংশু জানে না। ২১ নভেম্বর, ১৯৩৪, শেষ রাতে, যখন হেমন্তের শেষ ও শীতের শুরু, সেদিন আবহাওয়া কেমন ছিল? কেঁপে-ওঠা হাওয়ার সঙ্গে নবজাত বৃষ্টির ফোঁটা দারুণ ও আবেগময়, শীতার্ত মরণ-খেলায়? মেতে উঠেছেন নাকি? অংশুর অতশত জানা নেই, সে কিছুই বলতে পারবে না। ২২ নং অভয় মিত্র স্ট্রিটের দোতলার আঁতুলঘরে, যখন, যে-সময়, পৃথিবীর এই পূর্ব ভূখণ্ডে সে ঢোকে, সেই তার জন্মক্ষণে ঘরের বাইরে বাবার সঙ্গে রাঙাদাও দাঁড়িয়েছিল কিনা তা জানার জন্যে অংশুর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কোনওরূপ কৌতূহল কখনো দেখি নি। ঘরটির মেঝে সাদা-কালো টালির বড় বড় বরফি দিয়ে বাঁধানো ছিল কী? ধ্যাৎ, অংশু তাও জানে না।

অথচ এই জন্মদিন তথা জন্মক্ষণটি মানুষ মাত্রেরই জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেটা হল এ-পৃথিবীতে তার অবতারণার মুহূর্তটি, মৃত্যু-পর্যন্ত পরবর্তী জীবনে সেটাই তো প্রবেশমুহূর্ত, নয় কী? সে-সম্পর্কে অণুমাত্র ধারণা না-রেখে জীবন নামে গোলকধাঁধায়? ঘুরে-মরার কথা ভাবা যায় কী? আমি পারি না ভাবতে। কিন্তু অংশু তো তাই পারছে। পুরাণবর্ণিত থিসিউস, বহুতলা ল্যাবিরিন্থ-এর ৩৫০০ অবিকল একরকম কক্ষ থেকে কক্ষান্তরের কেন্দ্রে উৎকর্ণ ও অপেক্ষামাণ ষণ্ডদানবের দিকে ধোঁয়া ও দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে তার সেই রোমহর্ষক অবতরণ, চিহ্ন না রেখে গেলে, সূত্রবিনা, সে কখনোই ফিরে আসতে পারত না। এগিয়েই যেত, এগিয়েই যেত ঘুরেই মরত শুধু। ১৮ বছর বয়সে গল্পটি প্রথম পাঠের সময় উদ্বেগে ভরে গিয়েছিল তার মাথা, বাস্তবিক হত্যার পর থেকে প্রবেশপথ অবধি ওই ফিরে-আসাটুকু ছিল গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ, শেষ পাতাকটির মধ্যে আঠার বছরের তরুণ অংশু তখন স্বয়ং নেমে পড়েছিল বলা চলে। বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট, বইটির কথা অংশু একদম ভুলে গেছে ও গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে, তরবারি ছুঁড়ে ফেলে, একটা লাটাই হাতে, সুতো গুটিয়ে, থিসিউসের উঠে-আসার ব্যাকুল ও ছুটন্ত ছবিটি। আজ আর বইটির নাম অংশুর মনে পড়ে না। মনেও পড়ে না যে মনে পড়ে না। ছবিটি ছিল সাদায়-কালোয়।

এই তো, মাসদুই আগের কথা; একদিন সক্কালবেলায় তড়িৎ এসে হাজির। পাড়ার অবস্থা ভাল

নয় দেখে রাঙাবউদি পাঠিয়ে দিয়েছে, বন্ধ খামে জানিয়েছে কদিন জোর করে রাখতে। তড়িৎ-এর মুখে পাড়ার অবস্থা শুনে অংশু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পরশু বেলেঘাটায় একজন এস আই কে রিকশা থেকে নামিয়ে... ছেলেকে স্কুল থেকে আনছিলেন ভদ্রলোক, নিশ্চিত কিন্ডারগার্টেন, ছেলেটা নাকি পালায়নি, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, তবু, খবরের কাগজে পড়তে গিয়ে, স্কুলড্রেস পরা পিঠে কিটসব্যাগ ও কাঁধে ওয়াটার-বট্‌ল আনুমানিক শিশুটির জন্যে অংশু বিশেষত কষ্ট পেয়েছিল বল্লে ডাহা মিথ্যে বলা হবে, হায় অংশু। কষ্ট পাওয়াই তো কবিপ্রসিদ্ধি, পেতও, কিন্তু হত্যার একমাত্র সাক্ষী ঐ ছেলেটিকে মনস্থ করা, ওহ, তা কী অমানুষিক শ্রম দাবি করে। হ্যাঁ, অমানুষিক, যা মানুষে পারে না, আমি জানি। ও-সব কষ্ট-টস্‌টো ইলাসট্রেটেড ছোটগল্পেই জমে ভাল। কাগজ মুড়ে রেখে রেবাকে ডেকে অংশু বলেছিল, 'আদা দিও, বুঝলে।' অর্থাৎ চা-এ। 'তারপর' তড়িৎ বাকিটা বলে, 'কাল ৫টা ছেলেকে হাত বেঁধে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে পুলিস দুপুরবেলায় রিভলবার উঁচিয়ে বন্ধ করিয়েছে পাড়ার সমস্ত খোলা জানালা, খড়খড়ি তুলে দেখেছে অনেকেই, পরপর ৮টা গুলির শব্দ সবাই শুনেছে। ৩৪ জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ২৬ জনকে ছেলে, বাকি ৮জন সম্পর্কে পুলিসের ভূত বলছে', ঘৃণায় মুখ ভেঙে যায় তড়িৎ-এর, 'আমি তো জানিনাআ।' 'তুই কদিন থাক এখানে', সব শুনে পাংশুমুখে অংশু বলেছিল। বলেই জানতে চায়, 'তোকে ফলো করে নি তো, হ্যাঁরে।' ছেলে অবশ্য পরদিন সকালেই হাওয়া। বেশ জড়িয়ে পড়েছে, অংশু বোঝে। যাই হোক, সেদিন সব শুনে, বাজার করতে রাস্তায় বেরিয়ে পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা' ছবিটির কথা অংশুর সহসা মনে পড়ে যায় ও থলি-হাতে, বহুকালের মধ্যে সেই যা একদিন, উলটোদিকে, পিকাসোর গোয়ের্নিকার দিকে, সিঁথির অশোকবাবুর বাড়িতে তাকে যেতে দেখি।

তো অংশুর ছেলেবেলার কথা, যা বলছিলুম। তার পিসতুতো দাদা রাঙাদার বিয়ে হয় তাদের শিবপুরের বাড়িতে। কখনো-বা অংশু মনে করে এটাই তার প্রথমতম স্মৃতি যখন রাঙা-বউদিকে নিয়ে নিচে মা খুব ব্যস্ত, দোতলায় সদ্য-বিবাহিতার ঘরে ঢুকে প্রথমেই বিছানা থেকে এসেন্সের উগ্র গন্ধ অংশুর নাকে এসে লাগে, তারপর ফুলের গন্ধ পায়। মূলত রজনীগন্ধা, যা খাটের বাজুতে তখনও জড়ানো; ছত্‌রি থেকে তোড়া ঝুলছে। গোলাপে কাঁটা থাকে সে-জন্যে অথচ ফুলের মধ্যে তাই-ই সবচেয়ে নরম বলে, রাতের বিছানায় অজস্র পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাঁটার তুলনায় তাও কম পীড়া নাকি, যে-জন্যে নিপুণভাবে ঝাঁট দিয়ে গভীরতর রাতে তা মেঝেয় ফেলে দেওয়া হয়। সুজনির জঙ্‌লি-সবুজের ওপর অজস্র সাদা বুটি, বেলকুঁড়িগুলি বিছানায় থেকে গেলে ও-রকমই দেখাত, বা, সবুজ মাঠের ওপর শীতল বরফকুচি যেন, আজ অংশু এ-রকম মনে হয়। দুটি কানের ফুল ওদিকে পড়ে ও একটা বোতাম, নিশ্চিত বউদির ব্রা থেকে। দৃশ্যটা ২৩ বছর পরে পুনর্নির্মাণ করতে যাওয়া, আজ, ফেরা-নেই এমন নিরস্ত্র এতদূরে এসে পড়ে, একপ্রকার বোকামি তা আমি মানি। আমাকে অবাক করে দিয়ে অংশু তবু তাই করে। এবং আশ্চর্য এই যে, সুজনিটি ছিল প্রকৃতই সবুজ ও তার ওপর অজস্র সাদা বুটি ছিল, এও ঠিক, বরফকুচির উপমাটিও তাই অনেকখানি যথার্থ হতে পেরেছে, যে-জন্যে আমি অংশুকে বারবার চিয়ার্স জানাই।

এ-রকম নির্মাণ-কাজে অংশুর ব্যস্ততা তবু আশানুরূপ নয়। তাদের ৭২ পাতার পারিবারিক অ্যালবামটি আজ অংশুর কাছে অটুট থেকে গেছে। কিছু ছবি খুলে গেছে যা আর লাগানো হয় নি, কর্নারের দাগ দেখে সেগুলো সবই যথাস্থানে লাগানো সম্ভব, শেষের পাতাকটির ফাঁকে ফাঁকে ক্রমাগত জড়ো হয়ে মরক্কো-বাঁধাই অ্যালবামটি এতদিনে বেঢপ করে তুলেছে। মাঝেসাঝে অ্যালবাম খুলে বসে না অংশু এমন নয়, কিন্তু ভারী আপসোসের কথা, পাতার পর পাতা উলটে খালি আমার একক ছবিগুলোর দিকেই বারবারে আকৃষ্ট হতে তাকে

দেখি। অবশ্য অ্যালবামের সকলকেই সে চেনে তা আমি বলছি না।...মস্ত বলের দিকে উপুড় হয়ে ৩ মাসেই আমি, তে-চাকার সাইকেলে ফুলের টবের পাশে অংশু, পুরীর সমুদ্রতীরে আমি, ততদিনে সিঁড়ি ও গুহাসহ বালির পাহাড় তৈরি করতে শিখেছি। পুকুরপাড়ে সদ্যধরা ছিন্নভিন্ন ঘুড়ি বুকে আঁকড়ে, আমি, আ, সেই একবারই অংশু, যখন তার হাতে কাটিম-কাটিম সুতো-ভরা লাটাই, গায়ে দো-বোনা হাইনেক পুলোভার, অবিকল ঠাকুমার মতন তার নীলাভ কটা চোখে নির্ভীক ও দৃঢ় অভিব্যক্তি, হাওয়ায় উড়ে মাথার চুল আক্রমণোদ্যত খাড়া—লাটাই থেকে উপচে সুতো লুটোচ্ছে মাটিতে। পাশেই, একই পাতায়, একটি ছোট্ট কোয়ার্টার-সাইজ ছবিতে পড়ার টেবিলে খোলা কলম-হাতে আমি, আমার গায়ে ঢাউস মিলিটারি ইউনিফর্ম, রাঙাদা কি তখন ছুটিতে না যুদ্ধের মাঝামাঝি রিব ভেঙে ডিসচার্জড হয়ে একেবারে দেশে ফিরে এসেছে? এমন সুন্দর এসেছে ছবিটা যে, সেটা এডেন বন্দরে কেনা মহার্ঘ ক্যামেরায় রাঙাদার তোলা না-হয়েই পারে না। অংশুর চোখে ঝুলে-পড়া ওই মোটা লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমাটিও তবে নিশ্চিত রাঙাদার, পুরু লেন্সের নিচে রাঙাদার চোখের মতন অবিকল ততদিনে তার চোখদুটিও। তাদের বংশে ঠাকুমা ছাড়া কেবল রাঙাদার চোখে তারাতেই ছিল নীলাভা। ঠাকুমার ছবিও রয়েছে, লরির ওপর খাটে শোয়ানো, টানা বহরমপুর থেকে এসে তাদের শিবপুরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। ছিপছিপে বৃষ্টির মধ্যে ও অলোবিনা এমন উৎকৃষ্ট ছবি রাঙাদা ছাড়া কে তুলবে? ছবিটি তোলা হয় গ্লসি-পেপারে ও সিপিয়ায়, আউট-অফ-ফোকাস আমরা তখন প্রায়ান্ধকার বারান্দা থেকে ঝুঁকে।

নেকড়ের থাবাঅলা হাই-চেয়ারে বসে মা; একটা ত্রিভুজ যেন। পিছনে, বাঁদিকে, মা-র কাঁধে হাত রেখে বাবা দাঁড়িয়ে, ত্রিভুজের দক্ষিণবাহুতে রাঙাদা। রাঙাদা কিন্তু হাতদুটি চেয়ারের ওপর রেখেই সন্তুষ্ট। বাবা রাসভারী হাসছেন, হাসছে রাঙাদাও, দুজনেরই মাড়ি দেখা যায়। আরও পিছনে দেখা যায় রামধনু, পাহাড় ও ঝরনা। কোনও মেলাটেলার মধ্যে স্টুডিওয় তোলা নিঃসন্দেহে। কালো তাফ্‌তা থেকে বেরিয়ে পড়ে নৃত্যপর হাতের অস্থি শাটার তুলে যখন শেষ নির্দেশ দিচ্ছে, মা তখনও তাঁর ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত অভিপ্রেত হাসিটি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি বোঝা যায়, যুবতীর ঠোঁটদুটিতে তবু হাসি একটু যেন লেগেই আছে, রহস্য যা, যা অনুধাবন করলে অর্থাৎ প্রিন্ট থেকে নেগেটিভ হয়ে ওরিজিনালের দিকে কিছুদূর—এবং ভ্রমণ বলতে তো এই একটাই যা এপিক— খানিকটা ফিরে গেলেই অংশু একটি স্মারক খুঁজে পেত কিনা কে জানে। তার জন্মের আগের দিনগুলির কথা অংশুর জানার কথা নয়? বেশ তো, যুদ্ধের জন্যে বহরমপুরে দেশের বাড়িতে তারা যখন, বাবা কলকাতায় থেকে অফিস করছেন, মাঝে মাঝে যাতায়াত করছেন, তাদের দেখাশোনা করার ভার রাঙাদার ওপর, ডিসচার্জড হয়ে একেবারে ফিরে রাঙাদা তখন ওখানেই। অংশু তো তখন বেশ বড়সড়ই, তা ৭-৮ বছরের হবে। এই বহরমপুরেই সে, অংশু, মধ্যরাত্রির বিছানা ছেড়ে মাকে উঠে যেতে প্রথম দেখে। তারপর অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে, সে ফের ঘুমিয়ে পড়ে এবং রাত তখন কত সে জানে না যখন জেগে উঠে অংশু টের পায় মা-র হাতের তেলো তখও ভিজে, উরু কাঁপছে, চুল বিস্রস্ত... গরম ও দীর্ঘস্থায়ী, এলোমেলো নিশ্বাস এসে পড়ছে তাঁর মুখেচোখে, বুকে। অ্যালবামের ছবিতে মা-র মুখে, মুখে নয়, ঠোঁটে, হাসিটি আজও তেমনি, অর্থাৎ যার কোনও মানে হয় না, গোয়েন্দা লাগিয়েও বোঝা যাবে না হাসিটি আছে, ছিল না থাকবে। তবু মা-র ওই ঠোঁটে-লেগে থাকা আপাত-অদৃশ্য হাসির সঙ্গে তার বাবা ও রাঙাদার উদ্ভাসিত মুখের একটা প্রতিতুলনা করে সে দেখলে পারত। চ্যুত ছবিগুলি পরপম্পরা মেনে যথাস্থানে মাপসই বসিয়ে পরপর দেখে গেলে পারত অংশু, যে, কী ছিল তাদের মনে যা তাদের, মা ও রাঙাদাকে, দিনে দিনে উজ্জ্বল করে তুলছে, অথচ, অন্যদিকে, ছবির পর ছবিতে বাবা কত

রোগা হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর চওড়া হাসি ক্রমেই লীন হয়ে এল। তার চোখদুটির সঙ্গে রাঙাদার চোখের ওই অনির্বচনীয় নীলাভায়-মিল এভাবে, সময়ের ক্রম মেনে অনুসরণ করে গেলে একদিন হয়ত সে নিজে-নিজেই বুঝে পেত, কেন দিনে-দিনে অমন সোনালি স্বাস্থ্যে ভরে উঠছে তার মার নারীশরীর, ছবিটির ত্রিভুজের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে ফোকাসের বাইরে সে সেই ওরিজিনালে মিলিয়ে যেতে পারত কিনা, যেখানে পা গুটিয়ে, পাশ ফিরে ও চোখ বুজে, বুকের ওপর দুহাত জড়ো করে জননীর গর্ভ-আঁধারে সে বা আমি অভিসন্ধিহীন শুয়ে—আমি, জানি, না।

বিস্মৃতির সঙ্গে মিশে নেই, অন্তত এমন স্মৃতি বলতে অংশুর আর বিশেষ-কিছু অবশিষ্ট নেই। বাস্তবিক, বিমূর্ততা বলে যদি কিছু থাকে তবে এই একটা ব্যাপারে অংশুকে 'চিরভিখারী' আমি বলি। সাদা বুটি-ছড়ানো রাঙাদার ফুলশয্যার সবুজ সুজনিটির সত্যতা সম্পর্কে আগে বলেছি, যার ওপর বউদির জামা থেকে একটা বোতাম ও কানের দুটি সোনার যুঁই ছাড়া একটিও পাপড়ি পড়ে নেই। এটা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়। কেননা ওই-সব স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়েও যা বেশি, অংশুর যা মনে নেই যে তার মনে নেই যে তার মনে নেই, তা হল, তারপর খাটের নিচে থেকে অতি সন্তর্পণ সে টেনে এনেছিল কৌমার্যহারা তার রাঙাবউদির বিবাহের ট্রাঙ্ক, আঙটা খুলতেই চাপে লাফিয়ে ওঠে ডালাটি এবং ঠাসা জামা-কাপড়ের ওপর বিছানো বিবাহের জোড়ের ওপর কয়েকটি চকচকে বই তার চোখে পড়ে। যার মধ্যে, কিছু না-বুঝে, ক্লাস-নাইনের ফার্স্ট-বয় অংশু অতি অবোধভাবে তুলে নেয় মারি স্টোপ্‌স-এর 'বিবাহ ও জীবন' নামে অনূদিত বইটি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাঙাদা এসে কান মুলে বইটা তার হাত থেকে কেড়ে নেয় এবং পুনরায় ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে এবার চাবি দিয়ে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই বইটা আন্দাজে খুলে বিনা আয়াসে অংশু পেয়ে গিয়েছিল প্রয়োজনীয় পাতাটি, সত্যত, বইটির শেষাশেষি বাঁদিকের পাতার মাঝ বরাবর অবশ্যম্ভাবী কটি পঙ্‌ক্তিই কেবল টেনে নিয়েছিল তার চোখের তারা যা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে অবিলম্বে পড়ে ফ্যালে 'সঙ্গমের পর পুরুষের উচিত,' সে পড়েছিল, 'তার পুরুষাঙ্গ নারী-শরীরের মধ্যে রেখে এবং নারীর উচিত পুরুষাঙ্গ তার শরীরের অভ্যন্তরে নিয়ে ও রেখে, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঘুমিয়ে-পড়া।' এতে করে, শ্রীমতী স্টোপ্‌স দেখেছেন, 'গভীরতর রাতে তাদের একসঙ্গে নিঃশ্বাস নিতেও প্রশ্বাস ফেলতে দেখা যায়।' এটুকু পড়েই ঝপ করে অংশু বইটি বন্ধ করে ফেলে। এর মানে কী? ভাল করে কিছু বুঝে-পাবার আগে পঙ্‌ক্তিটির সর্বগ্রাসী ঘূর্ণি তাকে টেনে নেয়, রাঙাদা এসে কেড়ে নেবার পরেও বেশ কিছু সময় ধরে বিবাহের শূন্য ঘরে গ্রন্থ-হারা নিশ্চুপ বসে থেকে এ-ভাবেই সে, অংশু, জীবনে প্রথম নারীকে ভালবাসার ও তার ভালাবাসা পাবার প্লেটনিক প্রয়োজন মূলে মূলে টের পায় ও আমাকে পাওয়ায়। আমাদের বাকি জীবনের জন্যে চেতনাধারার অববাহিকা সেখানেই একরকম ঠিক হয়ে যায়।

তা, কখনো-কখনো তুমি যাঁকে এখনও মনে কর তোমার 'প্রথমতম স্মৃতি'; অংশু, তুমি সেটাই ভুলে মেরে দিলে এ্যাঁ? ভুলে যেতে সে পারল কী করে, আমি অবাক হয়ে ভাবি। কেননা, ওই বোধই হচ্ছে সেই বড়শি, রাতের প্রখর জলে গেঁথে তুলে যা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল খরতর জলে, জাল ছিঁড়ে, জলের অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে, ফেরার পথ না রেখে, বাধা না দিয়ে, অংশু চলে গেল অতদূর? চিহ্ন-বিনা? একটিও স্মারক না রেখে? নিয়তির দিকে এভাবে কি বহে যেতে দিতে আছে, অংশু একদিন তোমারও হাতে উঠে এসেছিল কাটিম-কাটিম সুতোয় ভরাভরতি লাটাই। সুতো ছাড়তে ছাড়তে তুমিও গেলে পারতে।

সপ্তাখানেক আগে বেলেঘাটায় গিয়ে অংশু দেখে, 'এ-রকম কোরও না বাবা বুঝলে, এ-

রকম কোরও না বাবা, সোনা আমার,' বলে দামড়া ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে রাঙাবউদি বোঝাচ্ছে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়। তড়িৎ-এর মুখচোখ দেখে অংশু বোঝে, এভাবে হবে না। তড়িৎ-কে শনিবার সকালে সে তাদের বাসায় আসতে বলে। 'শনিবার?' মা-র ভূজবন্ধন ছাড়িয়ে তড়িৎ উঠে দাঁড়ায়। খালি গা, খোলা বেল্টট্রাউজারের আঙটায় আটকে সামনের দিকে ক্রেস্টসহ ঝুলে রয়েছে। ঘনকালো জোড়া-ভূর চোখদুটো পেয়েছে, মায়ের থেকে, সবসময় সজল, চোখের নিচে নীলচে কালি, কোলে আঁচড়। ইতিমধ্যেই, আমার অজ্ঞাতসারে, ওর শরীরটা বেশ গড়ন পেয়ে গেছে দেখছি। তবে মুখখানা তুলনায় রোগাই থেকে গেছে। মুখশ্রী বুকের দিকে কিছুটা লুটিয়ে সে দাঁড়িয়ে, বুকের পাটা ইচ্ছে করেই একটু চিতিয়ে রেখেছে। তড়িৎ এই স্বাস্থ্য পেয়েছে বউদির কাছ থেকে; কিন্তু সৌন্দর্য...রাঙাদা চিল বরাবরের রোগা ও লম্বাপানা, বাট হি ওয়জ মোর দ্যান হ্যান্ডসাম, হি ওয়জ বিউটিফুল! এবং ঐ রোগা সৌন্দর্যকে নারীর স্বাস্থ্যের ওপর চাবুক হিসেবে ব্যবহার, এ-ছাড়া কিছু, কোনও অভিলাষ, তার কখনো ছিল না।

'শনিবার?' ও বলে, 'কেন?'

'দরকার আছে। আয় না। রোববারই ছেড়ে দোব।'

তড়িৎ-এর জন্যে অংশু সত্যিই আবার বই খুলে বসে। এককালে তারাও পার্টি করত, মেয়েরা যেমন চুড়িসুদ্ধু ঝনাৎ করে আগে একবার ঝেড়ে নিয়ে মুখে পাফ বুলোয়, তেমনি, কিছু পড়াশোনাও করেছিল। সে-বাবদে লেনিনের ৩-ভল্যুম সিলেক্টেড ওয়র্কস থেকে যাবার কথা, ৩টির জায়গায়, একযুগ পরে, মাত্র একটি পায়। প্রয়োজনীয় লাইনগুলির জন্যে এতকাল পরে তার সে কী খোঁজাখুঁজি। 'লার্ন!' সে পেয়ে যায়। 'আই মাস্ট সে দ্যা টাস্কস অফ দা উইথ ইন জেনারেল মে বি সাম্‌ড-আপ ইন ওয়ান ওয়র্ড : লার্ন।' 'যদিও ওল্ড স্কুল থেকে যা শিখবে তার টু-থার্ড আর ব্যবহার্য নয় এবং বাকি ওয়ান-থার্ড বিকৃত'—এই অংশটা দাগাবার সময় কী-ভেবে অংশু বাদ দিয়ে যায়। এভাবে শনিবার তড়িৎ-এর সম্মুখীন হবার জন্যে তৈরি হয় সে, পেজমার্ক দিতে দিতে।

'Partisan warfare is an inevitable form of struggle', এক জায়গায় পায়, 'at a time when the mass movement has actually reached the point of insurrection. The argument that the partisan warfare, which is engendered by powerful political & economic casuses, disorganises the mass-movement must be regarded critically. Every new from of struggle, accompanied as it is by new dangers & new sacrifices, inevitadly 'disorganises' organisations which are unprepared for this new from of struggle. Every military action in any war, to a certin extent, disorganises the ranks of the fighters. But this does not mean than one must not fight. It means that one must learn to fight. That is all'. গুডনেস্! তড়িৎ পড়েছে নাকি এ-সব! অংশু তাড়াতাড়ি পাতাগুলো উলটে যায়।

শনিবার তড়িৎ এল না। রবিবারও না। সোমবার সকালেই হেমন্ত বসুর খুন হবার খবর পাওয়া গিয়েছিল। তখন থেকেই ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে অফিসের হলগুলো। সর্বত্র থেকে নানান গুজব এসে জড়ো হতে থাকে। 'তুমি এখনো অফিসে?' ১২টা নাগাদ ফাঁকা হলে কাচের ঘরে একা, হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে শ্রীকান্তদা জানতে চাইলেন, 'খবর শুনেছ? রাত্তিরেই মিলিটারি নেমে যাচ্ছে। আজ রাত ৮টায় বি বি ঘোষ এনাউন্স করছে।' আমি বলতে চাই,

না তো। রেডিও বার-বার করে বলছে বটে, শ্রী বি বি ঘোষ স্পেশাল অ্যাডভাইসার টু দা গভর্নার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল উইল স্পিক, টু দা পিপল অফ... বিষয়বস্তু তো বলে নি। সে তো 'আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ দিবস' ব্যাপারেও হতে পারে। কিন্তু অংশু ঘাড় নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ।' সে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

অফিস থেকে পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে আসতে হয়। এ-সব দিকে যুবতীর উরু বরাবর দেখা গেছে, সন ১৯৭২-এর মাঝমাঝি আজকাল নাভি ও তলপেটের খানিকটা করে দেখা যাচ্ছে। তার তাড়া ছিল এবং এ তো নতুন কিছু নয়, মোড় বেঁকেই লিপটন-বিজ্ঞপ্তির ঠিক নিচে কমদামী ছাপা-পরা একজন বিবাহিতা যুবতী দেখে অংশু ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, বধূটি। সে ছোটখাট। পাশে তার রঙ-ওঠা সোয়েটার ও কটনের ক্রিজহীন প্যান্ট-পরা গড়পড়তা স্বামী, মুখে অন্তত একদিনের দাড়ি। 'নখের ময়লা ঢোকাও বেশ ঠেসেঠুসে, আর ঝাল দিয়ো আঁচ্ছা করে', এক ছোকরা তার ফুচকা-সম্পর্কে এরকম বলে বধূটির দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে পারলেও, অবোধভাবে হেসে, হাসি সে গলাধঃকরণ করে নেয় ফুচকার ঝোলের সঙ্গেই, বধূটি।

ওই মেয়েটিকে পেলে ভাল হত; প্রেম হত। বা, ও-রকম আরও-কত চেতলা, আহিরীটোলা, ক্বচিৎ-লেকটেরাস বা আলমবাজারের মেয়েদের, একসঙ্গে নয়, একবারে একটি-করে মেয়ে পেতে থাকলে ঠিক হত, মানেএ, যতদিন না সঠিক মেয়েটি নগরীর লোহার সিঁড়ি ঘুরে ফুটপাথে উঠে আসে।

আমি ভাবলুম, ছি-ছি, যাকে মনে-থাকা বলে সে-ভাবে অংশুর কি আমাদের মাকেও মনে নেই? অন্তত, দশ বছর অবদি তো দেখেছিলি? বেচারা।

বাসট্রাম বন্ধ। বহু কসরৎ করে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে ৯-টা হয়ে যায়। মোড় থেকে বাড়ি অবদি আজ রাত ৯টা নাগাদ অংশু হেঁটে আসতে পারে না। তার ভয় করে। একটা পানবিড়ির দোকান পর্যন্ত খোলা নেই। শুধু সাইনেবোর্ডগুলো আলোকিত করে কর্পরেশনের নিয়ন জ্বলছে। এমন প্রাণহীন ফাঁকা যে বোর্ডগুলো যেন একটু দূরে দূরে মনে হয়। অংশু একটা রিকশা নেয়। রিকশাঅলার কাছে পাড়ার অবস্থা জানতে চাওয়ার সাহস হয় না, মানেও হয় না। রাস্তায় চেহারা দেখেই বোঝা যায়, একটু আগে স্ট্রিট-ফাইটিং হয়ে গেছে। বরং ভাড়াটা আগে থেকে বের করে এই শীতে সে রিকশাঅলাকে জোরে চালাতে বলে, যাতে, তাদের হাউসিং এস্টেটের সামনে থামামাত্র ভাড়া গুঁজে দিয়ে অংশু নেমে পড়তে পারে। সে চালায়। আকাশে চাঁদ আছে কি নেই কে আর লক্ষ্য করে। অংশু করে না। রিকশাঅলার মুখও ছিল তেমনই বাহুল্য। ৩০ পয়সা ভাড়া দিতে গিয়ে ১টি সিকি ও ২টি ৩ পয়সা দেবার সময় অংশু ১ পয়সা বেশি দিচ্ছে, এটা লক্ষ্য না করে আমি পারি না।

হাউসিং এস্টেটের ভেতরে ঢুকে ফাঁকা সুরকির রাস্তা ধরে ৫টি ব্লক পেরিয়ে এফ-ব্লকের কাছ থেকে তাদের কে-ব্লকের চারতলার ফ্ল্যাটটি প্রথম দেখা যায়। আলো জ্বলতে দেখে গত ৫ বছরের প্রতিদিনের অভ্যাসমতন অংশু একটা ছোট নিঃশ্বাস ফ্যালে অর্থাৎ, আছে।

তিনটি ছেলের মধ্যে দুজন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে।

'কে? ও, কাকাবাবু। আমরা মনে করেছিলুম...এত রাত হল?'

অংশু ছেলেটিকে চিনতে পারে। 'আপনি কি কিছু শুনেছেন?' রবি বলল, 'আমাদের এস্টেটে আজ একটা বোমা পড়েছে।'

'কারা ছুঁড়ল?'

'না, ছোঁড়ে নি কেউ।' কর্কশ স্বরে একজন অন্ধকার থেকে বলল।

'মানে, আমাদের দলের কেউ নয়।' রবি বিনীতভাবে জানায়, 'এখানে এম-এল পার্টির ছেলে রয়েছে। কথা হচ্ছে, তারা কারা। আমরা তাদের খুঁজে বের করবই।

'এটা আমাদের লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন।' কর্কশ গলা জানায়। রবি বলল, 'এই এস্টেটের মধ্যে অন্য দলের ছেলে আমরা থাকতে দিতে পারি না।' চারতলায় উঠে ফ্ল্যাটে বেল বাজার সময়টুকু জুড়ে অংশুর মনে হয় বাড়ি থেকে তার শান্ত বেরনো এবং যার-চেয়ে-ছোটা-ভাল এমনভাবে হেঁটে ফেরার তারতম্য এতদিনে নিশ্চিত অনেকেই লক্ষ্য করেছে।

তড়িৎ-এর জন্যে 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ্‌স ব্যাক' পড়ে শেষ করতে বেশ রাত হয়ে যায়। জানালায় দাঁড়িয়ে আজকের মতো শেষ সিগারেট ধরাতে গিয়ে অংশু দেখে হোয়াইট-ওয়াশ শেষ, তিনজন গেটের দিকে মুখ করে চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিচে তাদের কম্পাউন্ডের দেওয়ালের সামনে একজন আলকাতরার টিনে ব্রাস ডোবাচ্ছে। এবার লিখবে।

অংশু তাড়াতাড়ি এ-ঘরে চলে আসে। 'এই, এই, নকশাল দেখবে?' বলে রেবাকে তোলে। চোখ রগড়ে ভাল করে দেখে রেবা বলে, 'ও তো সুবোধবাবুর ছেলে। মনা!' মনা 'হিংসার উত্তর আমরা হিংসা দিয়েই দেব' পর্যন্ত লেখার সময় জুড়ে রেবার ব্লাউজ ও আলগা শায়ার ফাঁকে তার বাহুল্য-বর্জিত কোমরের ওপর আমার হাতের কাজ চলতে থাকে।'

'ইস। মাংস খেয়েছ?'

'হুঁ। শ্রীকান্তদা খাওয়াল।'

'মুরগি?'

'না।'

'উঁউঁউঁ। না বইকি। কদিন মুরগি খাওয়াও নি।' ছাতি ইঞ্চি-দুই ফুলিয়ে বোধহয় তো মুরগির কারণেই রেবা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাস টানে।

'যাই বলো, মুরগি-মাটন-এর বয়সে আর পোষায় না। তাই ওই একটা মাংসই খাই যাতে ছিবড়ে লাগে না।'

'?'

পাছাসহ রেবার উন্মুক্ত কোমর টেনে নিতে নিতে অংশু রেবার কানে চুম্বন করে। 'মাগীর মাংস', ওখানে বলে।

হেমন্তের বেলাবেলি দিন। সামান্য মেঘ করেছে। সমস্ত খড়খড়ি খুলে রেবা শার্শি বন্ধ করে দিয়েছে। জলভরা অ্যাকোয়ারিয়মের মতো মেঘলাভাঙা আলোয় ফ্ল্যাট ভরে গেছে, অংশুর সামনে রেবা কিলোখানেক কড়াইশুঁটি ঝুড়িভরতি নামিয়ে রেখে যায়। কচুরি করবে। ইতিমধ্যেই স্নান সেরে ও চুল খুলে ফ্ল্যাটময় রেবা খেলে বেড়াচ্ছে, অধেঃ নেমে কখনো-বা উর্ধ্বেও উঠে যাচ্ছে যেন। কে বলবে এই মহিলা, এই প্রিয় অভিভাবিকা, সকালবেলায় এই মারি ম্যাগদালিন, কাল রাতে শানানোর সময়সহ অন্তত আধঘণ্টা ধরে, পড়ে পড়ে, মোটামুটি শান্তভাবে, অংশুর চাক্কু খেয়েছে।

অংশুর সামনে টেবিলের ওপর সকাল থেকে আজকের আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে আছে। প্রথম পাতায়, হাসপাতালের বন্ধ দরজায়, কলেরা-আক্রান্ত শিশু কোলে ক্রন্দনরতা মা-র একটি সেন্টার-স্প্রেড ছবি বেরিয়েছে—খোলা বুক মরণপণে চুষে শিশুটি ঢলে পড়তে চাইছে জীবনেরই দিকে। অংশু না-দেখলেও, মানুষের ইতিহাসচেতনা থেকে ৪ কালামব্যাপী ধূসর ছবিটি, একটিও পাতা না কাঁপিয়ে, তার লক্ষ লক্ষ কালো গ্রেন মেলে ধরে, সেই কোন ভোরবেলা থেকে অংশুকে দেখছে, আমি জানি। স্বর্গস্থ পিতঃ ঈশ্বরই কেবল একমাত্র চক্ষুষ্মান

নন, আমি জানি, এক একটি ছবিও কিছু দেখে। মানুষের চেয়ে বেশি স্মৃতিধর কিছু কিছু ছবির বিষাক্ত উদাহরণ তো মিউজিয়মগুলিতে থেকে গেছে, নয় কী, যা পোকারা চেনে ও কখনো কাটে না? সংবাদপত্রের লক্ষ লক্ষ কপিতে ছড়িয়ে পড়ে আজ যা শ্রেষ্ঠ তামাশা, নিদারুণ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে একদিন যা ভারতবর্ষ পোড়াবে, সেদিকে এতটুকু এগবার চেষ্টা না করে ৪ কালামব্যাপীর ওই নিদ্রিত আগ্নেয়গিরির মুখে উপুড় করে ঢেলে অংশুকে এককিলো ফ্রিজের শিশির-মাখা কড়াইশুঁটি ছাড়তে দেখে, সত্যি কথা বলতে কী, হেসে না ফেলে আমি পারি না।

এই অংশুর ভবিতব্য, এ-ছাড়া আমি জানি, অংশুর জীবনে হবার কিছু নেই। শুনতে ৩৭, আসলে কিন্তু ৫০ থেকে অংশুর আর মাত্র ১৩ বছর দূরে। তার বয়স ৩৭, এটা বলার আর কোনও মানে হয় না, আমি ভেবে দেখেছি। এর মানে কী, এই জন্ম থেকে ৩৭? জাস্ট, স্রেফ-একটা, কিছু-নাঃ—তাছাড়া কী। উলটোদিকে ৫০-এর পরে কিছু নেই।

আমি মানি এবং অংশুর টু-থার্ড এটা মানে। কিন্তু তার বাকি ওয়ান থার্ড মনে করে এখনও ১৩ বছর থেকে গেছে এবং মৃত্যু ছাড়া ইতিমধ্যে যদি কিছু হয় তো আগামী ১৩-বছরেই সেটা হবে—এ-রকম একটা আশা ছেড়েও অংশু ছাড়তে পারে না, এই হয়েছে অংশুকে নিয়ে আমার মুশকিল। বুঝি আমিও। অর্ধশতবৎসরের একটা গোটাগুটি জীবনে আর কিছু হবার নেই এটা কেমন-যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আগামী ১৩ টা বছর সে তাই কারো ওপর, কিছুর ওপর, আর ভরসা করে না। আজ তাকে ফাঁকি দিয়ে, ৫০-এর এই আসন্ন বছরগুলোয় অন্তত, কিছু ঘটে-যাওয়া দুঃসাধ্য। সে এত এলার্ট, সে মনে করে। ভালো! কিন্তু তার আজ ভোরবেলার কাণ্ড দেখে আমার মনে হয় এমন তো হয় নি যে তার আর-সব একে-একে ডুবে গিয়ে আজ ভেসে আছে শুধু চোখদুটো?

শিবপুরে বটানিক্যাল বাগানের লাগোয়া শ্রমিকদের জন্যে তৈরি শস্তা ফ্ল্যাটে সুবল বাসা বদলেছে। এই তো, মাসছয়েকেও হয়নি, সে গিয়েছিল সেখানে। সুবল বাড়ি নেই। এটা আমি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে আজকাল বাড়ি বা অফিস যেখানেই হোক, গিয়ে অংশু কাউকেই আর তেমন পাচ্ছে না। যেন যে যার ঘরে আর নেই! মীনাক্ষীর বাড়ি তো বরাবর হুট করেই চলে গেছে এবং ১২ বছর ধরে সময়ে-অসময়ে ঠিকই বাড়িতে পেয়েছে বা একটু পরেই পেয়ে গেছে। তারপর পরপর দুদিন মীনাক্ষী বাড়ি নেই! একদিন তো একবেলা অপেক্ষা করেও ফিরল না। গত দোলের দিন দুপুরবেলা তাদের দমদম পার্কের এ-প্রান্ত থেকে যাত্রা করে, শ্যামবাজারে বাস পালটে, ট্রাম ধরে গোটা সার্কুলার রোড ঘুরে, নানারঙের রাস্তা অনেকটা মাড়িয়ে, সে পৌঁছয় ও-প্রান্তে ল্যান্সডাউন রোডে মনোজদের বাড়ি। সেই ফার্স্ট-ইয়ার থেকে আসা-যাওয়া, মনোজদের বাড়ি কখনও বেল দিতে হয় না। সদর বরাবর খোলা থাকে। এই সেদিন পর্যন্ত অংশু রাস্তা থেকেই ডাকাডাকি করেছে। এই সেদিন, ভাবতেও অবাক লাগে। নামেই বয়স ২০ পেরিয়ে ২৫, ২৫ থেকে ৩০ হয়, আসলে কিছুই না, কিছু পালটায় না। অন্তত প্রথম পাকাচুলটি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়বেই, একথা সত্যি নয়। তারপর হঠাৎ একদিন বয়স বাড়ে।

যা বলছিলুম। ভেজানো দরজা ঠেলে করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগে অংশু বাঁদিকে বাথরুমে ঢুকে পেচ্ছাপ করে নেয়, সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে গলা জমকালো করে তারপর ডাকে, 'মনোওওজ?' দ্বিতীয়বার ডাকার সময় উত্তীর্ণ না-হওয়া সত্ত্বেও, এর আগে উত্তরের জন্যে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে এ-রকম অপেক্ষা তাকে আগে কখনও করতে দেখিনি। আবারো ডাকার দরকারও হয় না। তার আগেই দালানের মুখে দাঁড়িয়ে মনোজের মা সাড়া দেন, 'কেএ?' অবশ্য তাঁকে দেখা যায় না।

'আমি মাসিমা।' অংশু বলে।

'কে অংশু? মনোজ তো নেই বাবা।'

নেই! অপ্রত্যাশিত কিছু নেই তবু।

'গেল কোথায়?' অংশু নিচে থেকে জানতে চায়।

'তা তো জানি না বাবা। দুপুরে কাকে যেন ফোন করছিল। খুরুটের তোমাদের চেনা কেউ থাকে তুমি জানো? হয়ত খুরুট গেছে।'

হয়ত-খুরুট? মনোজ সহসা বলে ফেলে, 'না! চলি মাসিমা। বলবেন মনোজকে।' বলে বেরিয়ে আসে।

ও-রকম দুম করে 'না' না-বলে ব্যাপারটা আর-একটু পারস্যু করলে পারত অংশু। মনোজ এখন ঠিক কোথায়? সে ভেবে দেখলে পারত। মনোজকে কোথাও প্লেস করার চেষ্টা করলে পারত—এবং শুরু-করা তো একেই বলে। অংশুর চেষ্টা নেই।

অন্তত ৬ মাস আগে সুবলের বাসায় একটা কাণ্ড তো ঘটতই।

সুবলের মেয়ে তার জন্যে দুটো পরটা আনে। মলিনা চা নিয়ে ঢোকে। নামিয়ে রাখে ও চলে যায় না। সুবলের বউ অসম্ভব রোগা। চোখ তার হিম, অংশু জানে।

জানালার পাশেই একটা অন্য ধরনের পাম গাছ। ওদিকে আরও একটা। 'কী ব্যাপার!' অংশু অবাক, 'ভারি অদ্ভুত তো গাছগুলো?'

মলিনা বলল, 'হ্যাঁ! বাগানের খানিকটা কেটে নিয়েই এই কোয়ার্টারগুলো হয়েছে তো, আসলে এগুলো বাগানেরই গাছ। আপনি পরদা তুলে দেখুন। দেখুন না!'

বেশ ছোঁয়াচে মেয়েটির উৎসাহ, মলিনার। সুবলদের আগের বাসায় যখন সে, তখনও অংশু বিয়ে করেনি, খালি গলায় অবিকল ছোটবেলার যূথিকা রায়ের গায়কীতে মলিনা একদিন গেয়েছিল, 'ঝর্-ানো পাত-ারো পঅঅথে—কুসুম-ো দল-িয়া পা-া-ায়—', সেই থেকে অংশুর চোখে সে গায়িকা। তখন সুবল তাকে বাঁজা মনে করত, যদিও তাকে সন্তান উপহার দিতে মলিনা সামান্যই দেরি করে ফেলে। এই নিয়ে তিনবার এবোর্সান করাল, সুবল তাকে শেষ পর্যন্ত একটি হার্মোনিয়ম কিনে দিয়েছিল কিনা কে জানে। মলিনা চেয়েছিল।

পরদা তুলে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের কাঁটাতারের ওপাশে বেশ খানিকটা বাগান মলিনা অংশুকে দেখায়। শেষ দুপুরে ঝাউ-এর সারির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ঝরা-পাতায় ভরা ছায়াবীথি...দূরে অর্কিড-হাউসসহ একটা পোল অবধি দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া হয়ত ওরই নিচে? মলিনার জাগ্রত কণ্ঠা ও উড়ন্ত মধুরঙা চুলের ফাঁক দিয়ে ওই ঘন ছায়া ও পথ মূল ধরে ভীষণ টানে অংশুকে টানে। সেই কোন ছেলেবেলায় সে, খেলা ফেলে,দাদার সাইকেল নিয়ে প্রায়ই চলে আসত এই বাগানে, তখন একা ঘুরে বেড়াত। তখন প্রতিটি নুড়ি ও প্রত্যেকটি ঘাস চিনত। পরটা ফেলে, কই গেল না তো অংশু? কত চিহ্ন পড়ে আছে, গেলে কিছু পেত কিনা কে বলবে। বা, মলিনার পাশেই সে তখন—দূরে ছায়াবীথি, পোল, পোলের নিচে হয়ত-ভিক্টোরিয়া-রিজিয়া, আরো দূরে অর্কিড-হাউস—চুল তুলে গায়িকার ঘাড়ে একটি চুমু খেলে সেটাই ত হত তখন সবচেয়ে স্বাভাবিক। 'পার্ক থেকে ঘুরে আসছি মা', বলে মালিনার মেয়েও বেরিয়ে গিয়েছিল। অংশুকে আমাকে সংযত করল কেন? একবার যখন তার দুহাত একসঙ্গে কেঁপে উঠল, বড় আশা করে স্নায়ুর অন্ধকার গ্যালারি থেকে একা-দর্শক আমি চিৎকার করে উঠেছিলুম, তার বাহুমালা এই বুঝি সে পরিয়ে দিল যূথিকা রায়ের গ্রীবায়, আমি ভেবেছিলুম, দিনে দিনে বেড়ে উঠে যা এতবছর মলিনার মুখখানা অংশুর জন্যে তুলে ধরে রেখেছে। তার বদলে, রাঙাদার আজানুলম্বিত কাঁপা হাতে সিগারেট বের করে অংশু কিনা বলল, 'দেশলাই

আছে?' তারপর স্বয়ং দাঁড়ায় জানালার রড ধরে। দূরে ছায়াবীথি, পোল, ভিক্টোরিয়া-রিজিয়া বোধহয় তো ওখানেই, অর্কিড-হাউস পর্যন্ত দেখা যায়—কিন্তু যে-দেওয়ালে দরজা নেই তার জানালার রড ধরে আমৃত্যু থাকলেও কি অংশু কখনও বেরুতে পারবে? চোখদুটির পক্ষেও তার আয়ুষ্মান দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভবপর হবে কি? কী জানি।

১৯৬৪-র গোড়ায় দিকে বিয়ে করে সুবল বাগবাজারে বাসা নেয়। বেশ কয়েক মাস লুকিয়ে দেখা করেছিল মলিনা। আমার খুব মনে পড়ে, একদিন সেই-ই বোধহয় শেষদিন, বাগবাজার জেটিতে বাঁধা একটা গাধাবোটের অন্ধকারে আমরা বসি। সেদিন চৈত্রমাস, ১০৮° গরম পড়েছিল। হঠাৎ-ঝড়ে মলিনার মুখের আঁচল উড়ে গেলে, আমি তাকে তখুনি চিনে ফেলি। সেই উড়ন্ত আঁচল ধরে টেনে ওর রিস্টলেসসুদ্দু শুভ্র কবজি চেপে ধরে ও কাছে টেনে আনতে আনতে অংশু জীবনে প্রথম ভয়ও সর্বনাশ টের পায়, আমি নয়। আমি বুঝে পাই, এই সেই নারীর দক্ষিণবাহু যার নগ্নে অশ্রুপাত ও রক্তপাত করার জন্য যা-পাচ্ছে তার ওপরেই হাত রেখে সকল যুবক একেই আবহমান খুঁজছে। যেন, অবিকল পদ্যের সেই, 'রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে!' ঠোঁটে তর্জনী রেখে সেই প্রথম হিমচোখে মলিনা আ-মা-র চোখে চোখ রেখে ক্ষণকাল তাকায়।

তারপর হঠাৎ কুলকুল করে হাসতে থাকে সে; চৈত্রের ঝড় ও ঘনঘন বিদ্যুৎ ও বোটের দেলানির মধ্যে, 'ভাল হচ্ছে তো— ঠিক হয়েছে তো—ঠিক আছে—বলছি, বলছি—সত্যি—এ ভীষণ অন্যায় কিন্তু—' বলতে বলতে সরে যেতে থাকে হাসতে হাসতে। কী যে হল অংশুর, আর আমারও কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মনে হল, মন নয়, শরীর নয়, ওই হাসিটাই আ-মা-দে-র আগে ধরা উচিত। অংশু ওর হাত ছেড়ে দিল, আঁচল গলে গেল আমার তালুর ফাঁক দিয়ে। 'ইশ্‌শ! কটা মাথা আছে ঘাড়ে?' বুকে আঁচল তুলে মলিনা এবার সরাসরি ডাক দেয়।

সেই যে আমরা পারি নি, আমি তখুনি জানতুম, অংশু বাকি জীবনে আর কিছুই পারবে না। কাজেই, অংশু এখন 'দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না।', এইসব বলছে।

'দিদিমণি! দিদিমণি!'

খুব ভোরে চাঁপির-মা ছাদে গিয়ে আগুন ধরায়। তারপর চা করে রেবাকে ডাকে। ৮॥০টায় অংশুকে বেরুতে হয়। বেস্পতিবার ভোরে দরজায় ঘুসির পর ঘুসি মেরে সে রেবাকে তোলে, 'দিদিমণি শিগগির আসুন। দাদাবাবুকে তুলুন।'

ওরা তিনজনে ছাদে যায়। ভোর হচ্ছে, কুয়াশা ভেদ করে লাল আলো এসে পড়েছে ওর মুখেচোখে, মুখ এদিকেই ফেরানো, মুখের আঁশটে রঙ তবু মোছে নি। 'সি' ব্লকের সুবোধবাবুর ছেলে মনাকে দেখে চেনা যায়। অলিভ গ্রিন টাউজার পরে মুখ ফিরিয়ে চিৎ হয়ে সে শুয়ে, কোমরের কাছে বেরিয়ে রয়েছে আন্ডার-উয়্যার, গায়ে জাম্পার। ডুব দিয়ে ওঠার পর যেমন হয়, হিমে-ভেজা চুল লেপটে রয়েছে কপালে—হাতদুটো মুঠি-করা—রগের কাছে গড়িয়ে এসে ক্ষীণ রক্তরেখা গালেই শুকিয়ে গেছে। শীতল জল থেকে তুলে-আনা ঝরঝরে নুড়ির মতন চোখদুটো এখনো খোলা।

রেবা গোঁ-গোঁ করে ফিট হয়ে পড়ে। কোলে করে অংশু তাকে নিচে নামিয়ে আনে। চাঁপির-মা পরামর্শ দেয় : তারা প্রথম দেখেছে এটা জানাজানি হওয়া ঠিক হবে না। একসময়-কৌতূহলবশত কেনা কয়েকটি সাপ্তাহিক 'দেশব্রতী' অংশু বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। 'দি অ্যানালেক্টস অফ কনফুসিয়াস' বইটা এমনিতে পোড়াত না, প্রচ্ছদের চিনা-হরফ তথা

বইটি বাই-লিংগুয়াল হওয়ার দরুন সেটিও পোড়াতে গিয়ে তার হাত দস্তুর মতো পুড়ে যায়।

শুক্রবার দিন দাড়ি কাটতে গিয়ে সেলুনের আয়নায় একবার দেখা দিয়েই সে আয়নার বাইরে চলে যায়। একটু পরে আয়নায় আরও দুটি ছেলে, কে জানে মোট ৪জন কিনা তারা, চারজনের কথাই তো থরোথরো অক্ষরে বারংবার ছাপা হয়। আরো-একজনের প্রতিফলন আমার কামানো ডানগালের পাশাপাশি ভেসে ওঠে। তার চোয়াল বিধ্বস্ত, আয়নার বুক পর্যন্ত ভাসিয়ে একটুও না-এগিয়ে সে এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। আয়নায় ওই লম্বালম্বি ক্র্যাকটি আগে ছিল কী?

তড়িৎ শনিবার আসেনি। পরের শনিবার তার খবর এল। ওরা তখন বিছানায়। উঠে টেলিফোন রেবাই ধরেছিল। 'বেলেঘাটা থেকে', বলে রিসিভারের মুখ চেপে ব্যাকুল হাতছানি দিয়ে সে অংশুকে ডাকে। রেবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রিসিভার তুলেই অংশু রাঙাবউদির ফোঁপানি শুনতে পায়। তারপর থেকে সারারাত—এই এখন রবিবার রাত ১২টা নাগাদ প্রথম অবসর। হাসপাতালে একবারটির জন্যে যেতে পেরেছিল, পুলিস হ্যাঙ্গাম পোয়াতেই সময়ের সবটাই চলে গেল।

মৃতবৎ তাকে হাসপাতালের গেটে পাওয়া যায়। তার জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ফুলে রাক্ষসের মতন ঠোঁট, পাঁজরার রিব ভেঙেছে কিনা কাল জানা যাবে। তার জ্ঞান রয়েছে। তার অতিকরুণ মুখে সরল শান্তি, অংশু যতক্ষণ ছিল সে একবারও 'উঃ'-'আঃ' করেনি। 'গায়ে একটা মাছি বসলে লাগছে', এই হচ্ছে একদিকে বাধ্যত কাত হয়ে শুয়ে, তার অভিব্যক্তি।

রাতের খাবার নাড়াচাড়া করে এসে অংশু চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে। রান্নাঘরে কফির পেয়ালায় রেবার চামচ-ঘোরানোর শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ-ই অংশুর স্পষ্ট মনে পড়ে যায়, এই তো বছর দুই আগেও, আমি যখন একদিন রেবার ভাইঝি জুলিকে উপেন্দ্রকিশোরের 'কুঁজো আর ভুতো' পড়ে শোনাচ্ছি বাচ্চা মেয়েটাকে টেক্কা দিয়ে দম ফাটিয়ে হাসতে হাসতে তড়িৎ-কে এই বিছানাতেই লুটোপুটি খেতে সে দেখে; গল্পের মধ্যে ভূতদের 'লুন হ্যায় ইম্‌লি হ্যায়' শীর্ষক গানটিতে তার সেই ইনস্ট্যান্ট সুরারোপ—এই সেদিনের কথা, তড়িৎ তখন রীতিমতন কলেজিয়ান। হায়, এর বেশি অংশু আর বিশেষ কিছু মনে করতে পারে না। এইটুকু স্মৃতির তৃণসম অবিরাম, অবিরাম ভাবেই তার শরীরময় ৩৬ বছর ঘুমের দিকে নত হয়ে পড়ে...অত বড় ছেলে, শেষ যেদিন এসেছিল, আঃ, কতবার অম্লানমুখে সিগারেট এনে দিয়েছে—কফির পেয়ালার চামচ-ঘোরানোর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমের দ্রুততর দ্রুততর ঘূর্ণির ভেতর ঢলে পড়ে শরীরময় শ্লথ ও নীবিবন্ধহারা ঘুম, অংশু চট করে ঘুমিয়ে পড়ে।

...সমুদ্র সরে গেছে। সরে গিয়ে উন্মেচিত করে রেখে গেছে তার ক্ষণকালব্যাপী তলদেশ, কেননা, অন্ধকার পটভূমি জুড়ে সমুদ্রের কলরোল কখনো থামে নি। বিরতিহীন বিদ্যুচ্চমকে তৈরি অলৌকিক দিনের বেলায় তলদেশে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে একটি জনপদ—সারি সারি কোয়ার্টার—শুকনো, খটখটে বাড়ি সব—অধিকাংশ একতলা। ছাদের তারে জামাকাপড় শুকোতে দেখা যায়। যে-কোনও শহর থেকে মানুষ বের করে নিলে যেমন, এবং মানুষের বাড়ি হোরাইজন্টাল হয়ে থাকে এ-কারণে, তীরে দাঁড়িয়ে এত উঁচু থেকে বাড়িগুলো এক-

একটা সমাধিফলকের মতন দেখায়।

ক্রমাগত ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁক নেওয়া মধ্যবর্তী প্যাসেজগুলির ভেতর থেকে দ্রুততর বেগে বেরিয়ে আসছে একটি সাইকেল। শরীর দুভাঁজ করে হ্যান্ডেলে মাথা রেখে, ঢালু উপত্যকা উৎরে এগিয়ে আসছে সে, তড়িৎ তার গতি অবরুদ্ধ, চাকা থেকে বালি উড়ছে ফরফর করে, তবু, তীরবেগেই সে ছুটে আসছে। এ-সময় অনিশ্চিত পটভূমি জুড়ে আবারো সমুদ্রগর্জন শোনা যায়।

এত জোরে আসছে সাইকেলটি যে মনে হয় সমুদ্রের চেয়ে তা ঈষৎ দ্রুতগামীই; তবু, সমুদ্রের আসন্ন আছাড়ের ঠিক প্রাকমুহূর্তে, সাইকেলটি তীরে এসে উঠতে পারবে কী? পারে কি পারে না দেখতে গিয়ে, তীরে দাঁড়িয়ে, প্রকাণ্ড বাঁকে অংশুর শরীরময় সমস্ত জীবন তার দিকে বেঁকে যেতে থাকে।

শেষরাতে অংশুর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে প্রথমেই জেগে ওঠে সাঁ-সাঁ উত্তুরে হাওয়া, এত আগে! এই তো সবে হেমন্তের শেষ ও শীতের শুরু। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি নিয়ে হাওয়া মেতে উঠেছে মরণখেলায়, ফোঁটাগুলো প্রায় আভূমি নামিয়ে এনে হুঁশ করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

জানালার আর্চ দিয়ে মশারির ভেতর থেকে ঘুমঘোরে ষাঁড়ের শিং-এর মত প্রতিপদের চাঁদ দেখে নিজেরই অজ্ঞাতসারে কেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে অংশু? পাশেই প্রিয় অভিভাবিকার মতো রেবা ঘুমিয়ে। হাওয়ায় উড়ে একগাছি চুল পড়ে রয়েছে তার উসুখুসু ঠোঁটে। 'আর একবার...তাহলে আরও প্রগাঢ় ঘুমুতে পারব', এই যুক্তি অংশুকে বাথরুম সেরে আসতে বলে।

করিডোরে বেরিয়ে ছাদের দরজা সশব্দে খোলাবন্ধ হবার শব্দ সে পায়। ছাদের দরজা কাজ বন্ধ হয়নি? একের পর এক আলো জ্বালতে জ্বালতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে অংশু দেখে দরজা হা-হা করছে খোলা। এত হাওয়া যে দু-হাতে পাল্লা চেপে ধরতে হয়, এবং—বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছাদ উজলে দিয়ে, উঁচুতে, একবারমাত্র বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে।

ছাদের মাঝখানে মনার রক্তের চাপ অংশু দেখতে পায়। দিনচারেক আগের শুকনো রক্ত ফোঁটা ফোঁটা জল পেয়ে ইতিমধ্যেই বজকে উঠেছে। যেকোনও অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য অংশু রক্তের কাছে যায়। প্রকাণ্ড ক্ষতমুখের মতন, সাদা সাদা চাপ রক্তে কিলবিল করছে। এই সামান্য বৃষ্টিতে পিঁপড়েরা এখনও বিব্রত নয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর চেয়ে ঢের বেশি শৃঙ্খলার সঙ্গে, প্রকাণ্ড ছাদ পেরিয়ে, মনার রক্তের কিনারা পর্যন্ত তাদের অবিচলিত যাতায়াত আজ ৪ দিন ধরে অব্যাহত। এটা দেখতে দেখতে গ্যয়টে থেকে একটি পঙ্‌ক্তি আমার মনে পড়ে যায়। অংশুর পড়ে না।

সিল্কের লুঙি ঈষৎ তুলে অংশু উবু হয়ে বসে।

'মনা!' সে ডাকে।

উত্তর নেই।

'মনা?'

সাড়া নেই।

মেঘলা-ভাঙা চাঁদের ঈষৎ আলোয় অংশু বসে থাকে। বৃষ্টি দু-চার ফোঁটা, তবে ফোঁটাগুলো মস্ত, সোজা বুকে এসে লাগছে। সহসা, ওদিক থেকে আর-একটি বিদ্যুৎ...তড়িৎ বেঁচে আছিস?

'তড়িৎ!' প্রায় মনে মনে, মনার রক্তের দিকে আরও ঝুঁকি, ফিসফিসিয়ে অংশু ডাকে, 'তড়িৎ!'

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বজবজিয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটা ডেঁয়োপিঁপড়ে রক্তের চাপে আটকে রয়েছে। রক্তের দানা-বেঁধা দাঁড়া বিস্মৃত করে খুলে কয়েকটা পিঁপড়ে তারই দিকে পলকহীন রক্তাক্ত চোখে তাকিয়ে, অংশু সভয়ে লক্ষ্য করে।

চাঁদ ডুবে গেছে। জেগে-ওঠা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর ঝুঁকে, অন্ধকারে, হাওয়ায়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে, দুই ঋতুর মাঝখান থেকে তার মা-র প্রেমিকের ছেলে অংশু, বিমাতার সন্তানকে আবার ডাকে, 'তড়িৎ!' 'তড়িৎ!'

*শারদীয় এক্ষণ, ১৯৭২*

## বড় দুঃসময়

অন্যান্য দিনের সঙ্গে আজকের দিনটারও কোনও তফাত ছিল না। বারান্দায় রোদ এখনো সোনার জলের মতো ছড়িয়ে, নীল নাইলন মশারির ভেতর থেকে আরও মিঠে লাগে। দেখে মহেন্দ্র বোঝে, আজ তত বেলা হয় নি। অন্য দিনের তুলনায় আজ বরং একটু আগেই উঠে পড়েছে, আটটা হবে, শরীরের কোথাও কোনও গ্লানি নেই, না একটু মাথা-ধরা না গা-ব্যথা, কিছু না। পেটের আভ্যন্তরীণ অবস্থা টের পেয়ে 'বেশ ভালো পায়খানা হবে আজ', সে বোঝে।

মহেন্দ্র বিছানা ছাড়ে না। বিয়ের কিছুকাল পর থেকে বুচুর বছর-চার হবার সময়কাল থেকে, মহেন্দ্র এঘরে একা শোয়। পূরবী ও বুচু ও-ঘরে। বেডরুম ওটাই, ঘরটা বড়, খাট আছে বড়সড়, জানালা দিয়ে অনেক আকাশ দেখা যায়। মহেন্দ্র করিডরের দিকে দরজা বন্ধ করে রাখে। গত মাসখানেক থেকে তাদের পাড়ার অবস্থা যে-কোনও-মুহূর্তে-স্ট্রোক-হতে-পারে এমন প্রেসারের রুগী যেন। আর কার বাড়িতে কী করে মহেন্দ্র জানে না। কোনও বাড়িতেই লোকজন আর বিশেষ নেই, গত এক মাসে পাড়া খুবই পাতলা হয়ে এসেছে। বিশেষত, এখনো বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ যৌনআবেদন আছে এমন মেয়ে ও নারীরা অন্যত্র চলে গেছে। পুরুষরা বিকেল-বিকেল বাড়ি ঢুকে পড়ে। সন্ধের পর রাস্তা খাঁ-খাঁ করে, দোকান-পাটও বিশেষ খোলা থাকে না। অবশ্য দোকানগুলো নির্দেশ মতো বন্ধ দরজার সামনে একটি সমুজ্জ্বল ডুম সারারাত জ্বালিয়ে রাখে। সারি সারি ঘুমন্ত দোকানের সামনে সাইনবোর্ডগুলো জেগে থাকে সারারাত।

পাড়ার একমাত্র বাসরুট বদলে গেছে। মাঝে মাঝে দ্রুত সাইকেল রিক্সা যায় ও পড়বি-তো-পড় মহেন্দ্রদের ফ্ল্যাটের সামনেই একটি গর্তে পড়ে ঝান্‌ঝান্‌ করে বেজে ওঠে।

পূরবী থেকে গেছে। সে-ও তাই করে, তার ঘরেরও দরজা-বন্ধ, তবে তার ভয়ডর কমই। থাকবে কেন, কেউ এলে কৃত্য যা সে তো মহেন্দ্রকেই করতে হবে। পূরবীর ভূমিকা তো নিষ্ক্রিয় বা দর্শকের। মহেন্দ্রই তাই পূববীকে ভালো করে দরজায় খিল এঁটে, অধিকন্তু, ছিটকিনি লাগিয়ে শুতে শিখিয়েছে। খিল শক্ত করার জন্যে মাঝখানে যে মাপসই খোঁটাটা গোঁজা হয়, মানে পূরবীর ঘরে পূরবী গোঁজে, সেও মহেন্দ্ররই সংগ্রহ। ধরা যাক, বাথরুম দিয়ে কোনোক্রমে সে এল। নিঃশব্দে দরজাও ভাঙল। তারপর করিডোরে ঢুকে যথাক্রমে পূরবী ও মহেন্দ্রর দরজা দুটি তার পক্ষে দ্বিতীয় বাধা। এই দরজা দুটো না ভেঙে খোলা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। যত সন্তর্পণেই ভাঙা হোক না কেন, অন্তত সেটুকু শব্দ হবেই যাতে করে তাদের কারো

না-কারো ঘুম ভাঙবেই।

শক্ত গ্রিল দিয়ে পুরোপুরি মোড়া দক্ষিণের বারান্দায় যাবার জন্য দুটি ঘরের দরজাই অবশ্য ভেজানো থাকে। মাসে চার-পাঁচ দিন যা বাদ যায়, নইলে বারান্দার খোলা দরজা দুটো দু-একদিন অন্তর সপ্তাহে অন্তত বারদুই পূরবী এঘরে আসেই, শাড়ি ছাড়ে ও ব্লাউজ খোলে; তারপর পেটিকোট ও ব্রেসিয়ার গায়ে মশারি ছোট্ট করে তুলে স্মার্টলি ঢুকে পড়ে। মহেন্দ্রকে ডিঙিয়ে বাঁ দিকে শোয়। ডান হাতে পাকড়ালে মহেন্দ্রর জোর বাড়ে।

তো সোজা বারান্দায় চলে গিয়ে চেঁচামেচি করার পথ সম্পূর্ণ মুক্ত ও বাধাহীন। একে অন্যকে চুপি চুপি ডাকো; সে জাগিয়ে তোলো অন্যকে, যার ঘুম আগে ভেঙেছে। তারপর ছুটে বারান্দায় গিয়ে দুজনে চ্যাঁচাও। বুচুও যোগ দেবে। চেঁচালেই যে কেল্লা ফতে তা না, নিজের মাথা নিজেই দুদিকে নাড়িয়ে মহেন্দ্র ভাবে, আজকালকার দিনে চ্যাঁচালে আসবেটা কে? নিচের ফ্ল্যাটের ননীবাবু? ওঃ হো, তিনি তো হাওয়া। ওপরের ফ্ল্যাটের মৌলিক মশাই বা রাস্তার ওপারের বদ্যিনাথ গাঙ্গুলি সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ, ছোঃ। ভুটে, নন্তু, অশোক, বাবু—পাড়ার মস্তানদের ওপরেও ভরসা কই, হয়তো তাদেরই কেউ স্বয়ং এসে পড়েছে! মহেন্দ্রর ঘরে অবশ্য যার-পর-নেই ব্যবহারযোগ্য একটি লাঠি আছে। ভারি পোক্ত আর হাল্কা এবং এটা দিয়ে একটা বিছে মারা কি কাক-টাক তাড়ানো সম্ভবও হয়েছে। কিন্তু মানুষ? ধরা যাক, রাতের সেই মানুষটি খুবই রোগা-পাতলা এবং হাতেও তার ছুরি-পিস্তল কিছুই নেই। কিন্তু মানুষ? মানুষকে মারবে কোথায়? ঘাড়ে, হাতে, না পায়ে? মাথায়! আ, ভাবা যায় না। মহেন্দ্র পারে না ভাবতে। মুখোমুখি সেই নিশিমানুষের সামনে উদ্যত লাঠি হাতে শতটুকরো হয়ে পড়ছে সে, মহেন্দ্র আগেভাগেই বুঝতে পারে। মানুষকে কোথায় মারতে হয় মহেন্দ্র জানে না। সে, মহেন্দ্র, এমন একজন মানুষ, যাকে, আজ ৪০ বছরে কেউ একটা ঘুষি মারে নি। সেও পারে নি মারতে। একটি মাত্রও ঘুষি না খেয়ে সে জীবনের তিন ভাগ কাটিয়ে দিল, মহেন্দ্র আয়ু ধরে রেখেছে ৬০ বছর। বাকি ২০ বছর একটি ঘুষি না মেরেই যদি কাটিয়ে দেওয়া যায়—মানে কোনও মানুষকে—তবে তাকে 'চূড়ান্ত সফল' বা 'চরমতম ব্যর্থ' একজন, যা হয় একটা কিছু বলা যাবে।

বাকি রইল আশা। আশা শোয় করিডোর সংলগ্ন ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরে। হাওয়ার জন্যে চাপা, দমবন্ধ ছোট্ট ঘরটার দরজা খুলেই তাকে শুতে হয়। এ-ঘর থেকে বাথরুম যাতায়াতের পথে আশাকে মহেন্দ্র কখনো চিৎ, কখনো পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে। এ বাড়িতে তেমন নিরাপত্তা নেই। বুঝে তার একটা অনির্দিষ্ট কষ্ট হয়। সে অনেকবার পূরবীকে বলেছে, 'শুক না আশা তোমার ঘরের মেঝেয়, তুমি তো এঘরে রাত করে আসো, কতটুকু শব্দ পাবে যদি তখনও জেগেই থাকে। তাছাড়া,', মহেন্দ্র আর বলে 'বস্তিতে ওদের তো একটাই ঘর আর ওর বাপ-মা এখনো ইয়াং। ওর অভ্যেস আছে।' পূরবীর এক কথা, না, ও বড় হয়েছে। কত বড়। কী-রকম বড়...পূরবীর সায়ার দড়ি টানতে গিয়ে, না-টেনে ক-মুহূর্ত চুপ করে না ভেবে পারে না মহেন্দ্র। কিছু ভেবে পায় না। তার মন নেই, তার হঠাৎ মনে হয়। সে দড়ি খোলে। তারপর বাস্তিল আক্রমণ করে।

স্টোররুমে আলো জ্বালাতে গিয়ে সুইচে হাত রেখে মহেন্দ্র কতদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কখনো ও-দিকের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে, কখনো মশারির ছেঁড়া-খোঁড়ার ভেতর দিয়ে আসল জ্যোৎস্না ঢুকে পড়েছে মশার সঙ্গে, গ্রীষ্ম-হাওয়ায় ফুলন্ত মশারীর ভেতর আশা ঘুমে কাদা, শীতে কুঁকড়ে এতটুকু কখনো-বা। গা থেকে চাপা খসে গেছে। মহেন্দ্র কতদিন নিজে টেনে দিয়েছে ওর ছেঁড়া র‍্যাপার, ডেকে তুলেছে, 'আশা, আশা! জানালাটা বন্ধ করে শো। এই আশা। ঠিক গায়ে হাত দিয়ে যে, তা না, মাথার বালিশ ধরে টানাটানি করে ঘুম ভাঙিয়েছে।

'ও কীভাবে শুয়ে আছিস, ধিঙ্গি মেয়ে। পাশ ফিরে শো!'—বলেছে। সেই ছোটবেলা থেকে রয়েছে আশা, এতদিনে ঠিক কত বা কীরকম বড় হয়েছে মহেন্দ্র তা জানে না। অনুমানও করতে পারে না। এ বছর পুজো থেকেই পূরবী ওকে শাড়ি, সায়া ও অন্তর্বাস পরাচ্ছে।

যতদূর সম্ভব খোঁজ-খবর নিয়েই মহেন্দ্র এ-দিকে আসে। দক্ষিণ খোলা, গ্রিলে-মোড়া বারান্দাসহ ফ্ল্যাটটি তার খুবই পছন্দ হয়, তিন বছরের কামিনীলতা গ্রিলের ওপর তৈরি করেছে ঘন সবুজ জাফরি। বাড়িটিও ছোট্ট, একহারা, ওপরে ও নিচে একটি ক'রে দুকামরা ফ্ল্যাট। পূব দিক জুড়ে প্রকাণ্ড স্কুল-কম্পাউন্ড, দক্ষিণে মাঠের পরে রাস্তা, পিছনে পানায় ভরা বিল।

ডাইনে পশ্চিম দিক থেকে পাড়ার শুরু। তারপর আধ-মাইলটাক দূরে গঙ্গা। ঠিক তিন বছর আগে, অনেক ভেবেচিন্তে, মহেন্দ্র এ-পাড়ায় উঠে আসে। সত্যি, যা চেয়েছিল, শুধু উত্তর শহরতলীতে কেন, সারা কলকাতায় এমন নিরিবিলি, শান্ত ও ভদ্রপাড়া আজ আর কটা আছে বলা শক্ত। খুব বেশি নেই।

অফিসগুলো তো সব এক-একটা জ্যান্ত নিউজ-পেপার আজকাল। বিশেষত, তাদের রেভিনিউ-ডিপার্টমেন্টটি 'শেষ সংস্করণ' যেন। শহর ও শহরতলীর চতুর্দিক থেকে তো বটেই, সোদপুর, ব্যারাকপুর, উলুবেড়ে, সোনারপুর মায় ক্যানিং লাইনের চম্পাহাটি থেকে পর্যন্ত তাদের অফিসের একজন বেয়ারা, দ্বারিকানাথ মণ্ডল, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। সর্বত্র থেকে আবার তাদের ডিপার্টমেন্টেই জড়ো হয় যত রাজ্যের গুজব, যার মোটামুটি অংশের সমর্থনও পরদিন কাগজে মেলে।

শুধু মহেন্দ্রদের পাড়াই এতদিন কাগজে ওঠে নি। অতি সম্প্রতি অবশ্য একটা ছোট্ট খবর তাদের পাড়া সম্পর্কে বেরিয়েছে। আর কেউ পাত্তা না দিলেও, মহেন্দ্র লক্ষ্য করেছে খবরটি। ভেবেছে; ভাবতে ভাবতে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ে পড়েছিল। দরজা-টরজা এত ভালো করে বন্ধ করে শোবার প্রয়োজন ওর আগে কখনো হয় নি। লাঠিটা যে সরে এসেছে নাগালের মধ্যে—মাথার কাছেই থাকে মহেন্দ্রর—সেও ঐ খবরটার পর থেকেই।

মাস তিনেক আগের কথা। সেদিন শেষরাতে বান আসবার কথা ছিল। বান এসেছিল। ভোরের স্নানার্থীরা সেদিনই প্রথম সারবন্দি ও দূরবিস্তৃত খুরের ছাপ পলির ওপর দেখতে পায়। যদিও কুকুরের পদছাপ ঠিক অত গভীর হয় না এবং আকারেও বড়সড়, তবু কেউ তা লক্ষ্য করে নি। কেবল যতীনবাবুর খটকা লেগেছিল। বাজারের ঠেলাঠেলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শিঙমাছের ঝাপটানো থলি হাতে মহেন্দ্রকে উনিই প্রথম খবরটা দেন। সন্ধের মধ্যে আরও কিছু লোক খবরটা জেনেও ফ্যালে। খবরটি অবশ্য কাগজে বেরোবার মতন নয়, এবং বেরোয়ওনি। 'মস্ত কাঁঠালিচাঁপার মতো মোশায় এক-একটা' বলতে বলতে ঠিক অবিচলিত ছিল না যতীনবাবুর মুখ, আর তাঁর হাতের থলিতে জ্যন্ত শিঙ-মাছগুলোও দারুণ ছটফট করছিল, 'গঙ্গার তীর থেকে উঠে এসে আবার গঙ্গার জল পর্যন্ত সমানে নেমে গেছে।'

তারপর মাস না ঘুরতেই বেস্পতিবার সারারাত বৃষ্টি। বাজারের পিছনে হরিনায়ারণ ব্যানার্জি লেনের মুখেই দুধের বুথ, এ অঞ্চলের মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হলেই ওখানটা নাব্য হয়ে ওঠে। অন্তত ছেলেপিলেরা কাগজের নৌকো ছাড়েই। ভোরে, হাঁটুজলে ঠিক দুধের বুথের সামনে, নৌকোর বদলে সেদিনই প্রথম, একটি শব উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। শবটি যে পাড়ার হাবা পাগলির তা কেউ পুলিস এসে উল্টে দেবার আগে কল্পনাও করে নি। কুণ্ডুদের রকে ঋতু-রক্তে ভিজে শাড়ি পরে কতদিন তাকে হেসে খুন হতে দেখা গেছে। অর্ধ-নগ্ন ও ভিজে ঐ নারী-শরীর কুণ্ডুদের উঁচু রকে কতদিন শুয়ে। দারোগা মন্তব্য করেন,

পাড়ার কোন একটি ষাঁড়েরই এই কীর্তি। বস্তুত, হাবা পাগলির সারা গায়ে গর্ত, ফোলা কালসিটে ও রক্ত। গর্তগুলো প্রায় চার-পাঁচ ইঞ্চি গভীর। কারোনার বলেন, তীক্ষ্ণমুখ শাবল দিয়েই ঐ সব গহ্বর তৈরি। অথচ, অপরপক্ষে, পাড়ার যে তিনটি ষাঁড়কে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের মধ্যে ভোলা ও ধরমবীরের শিঙ-ভাঙা এবং অপরটি নেহাতই বাচ্ছা। এখনো নামকরণই হয় নি।

যদিও ঐ কারণেই, ইদানীংকালের মধ্যে সেই প্রথম, তাদের পাড়ার নাম খবরের কাগজে ওঠে। কিন্তু খবরটাতে আজকালকার তুলনায় তেমন বৈশিষ্ট্য ছিল না বোধহয়, অন্তত সেদিন অফিসে কেউ এনিয়ে কোনও কথা বলে নি।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকলেই লাইন দিয়ে দুধ দেয়। মহেন্দ্ররা সরকারি দুধ নেয় না। নইলে, আর সকলের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা প্রায় আধ-ঘণ্টাটাক ধরে, তাকেও শবটি দেখতে হত। এরপর অবশ্য মাস-খানেকের মধ্যে কিছুই ঘটে নি।

ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি হল বলে মনে হয়।

মাত্র গত মাসের গোড়াতেই বলতে গেলে নতুন বিপদের প্রথম সঙ্কেত দেখা দেয়। পরপর তিনটি ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে দ্বিতীয়টি গুজব বলে প্রমাণিতও হয় : বেশি রাতে রমানাথবাবুর দশ বছরের মেয়ে মনুর ঘুম ভেঙে যায়। একটু বড় হবার পর থেকে এ-রকম রাতে ঘুম ভাঙলে সে আজকাল মাঝে-মাঝেই মাকে বিছানায় পেত না। বাথরুম থেকে ফিরে এসে, সে তাই ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন ভোরেও রমাদার স্ত্রীর খোঁজ নেই! রমানাথবাবুর এক বেকার ভাগ্নে মামার সঙ্গে থাকত। সেটা অবশ্য, ওঁর ভাগ্নের সঙ্গে স্ত্রীর গৃহত্যাগের ঘটনা বলে দিন-কয়েকের মধ্যেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রথম ঘটনাটি?

জেলে-পাড়ার রানীর-মা তার সদ্যবিধবা যুবতী মেয়েকে বুকে আঁকড়ে শেষরাতে ঘরের চাল আঁচড়ানো ও খোঁড়ার শব্দ ঠিকই শুনেছিল, পরদিন সকালে তার চাক্ষুষ প্রমাণও পাওয়া যায়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। বস্তুত, আগস্ট মাসের এই ঘটনাটি দিয়েই নতুন বিপদের অবিবাহিকা সূচিত হয় বলা চলে। এ-পাড়ার বিপদ যে অতি-অজ্ঞাত ও যার-পর-নেই অশ্রুতপূর্ব দিক থেকে ঘনিয়ে আসছে, তার কোনও সূত্র এর আগে গোয়েন্দা লাগিয়েও পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ নারীকেন্দ্রিকতার দিক থেকে। বলা বাহুল্য, এ-খবরটি আদৌ কাগজে বেরোয় নি।

তবু সেপ্টেম্বর মাসের এই তৃতীয় ঘটনাটির আগে কেউ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এমনটা শোনা যায় নি : ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে উঠোন পেরিয়ে মাঝরাতে রানী গিয়েছিল বাথরুমে। খুব ভোরে মা তার খোঁজ শুরু করে। শোনা গেল গঙ্গার ধারে নদীঘাটের চাতালে রানীর বিবস্ত্র দেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আজ তার একমাত্র অটুট স্তন দেখে অবশেষে বোঝা যায়, বিধবা মেয়েটি কতখানি যুবতী ছিল। অপর স্তনটি? নেই! নিতম্বের অংশ নেই। সারা শরীর অ-মানবিক বলশালী কেউ যেন উন্মত্ত গুঁতিয়েছে। বিশেষত মুখ একেবারে বিধ্বস্ত। চাতাল সংলগ্ন ভাঙা পাঁচিলটাও নাড়া খেয়েছিল বেশ, যার ফলে পাঁচিলের মস্ত ফাটল থেকে বেরনো কচি শিউলি গাছটি রক্তাক্ত শরীরের ওপর সব ফুল ঝরিয়ে সকালেই একদম ন্যাড়া। গঙ্গা থেকে উঠে আসা চতুস্পদ খুরের দাগের সঙ্গে হত্যার সুস্পষ্ট প্রমাণও সেই প্রথম পাওয়া গেল। রক্তে ভেজা চাতাল থেকে নেমে খুরের দাগ সিঁড়ি ভেঙে পলিমাটির ওপর দিয়ে নদীতীর পর্যন্ত হেঁটে গেছে। গিয়ে মিলিয়ে গেছে। সেই সারবন্দি রক্ত-চাঁপাগুলোর একটিতে মাত্র একবার নাক রেখেই পুলিসের কুকুর মুখ তুলে ঘাতক ও নিহতের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ ও বিলাপ জানায়। তারপর দৌড়ে নদীতীর পর্যন্ত গিয়ে, বারবার জলে নেমে

ও লাফিয়ে তীরে উঠে বিরাট সোরগোল শুরু করে। উঁচু তীরে তখন কয়েক শ' লোক দাঁড়িয়ে।

এবারের ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ (অধিকপক্ষে ১০ লাইন) প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে ছাপা হয় এবং তারপরেই ক্রমে পাড়া ভাঙতে থাকে। মহেন্দ্রদের ফ্ল্যাটের নিচে একতলায় থাকতেন ননীবাবুরা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সপরিবারে ওঁর স্ত্রী চলে গেলেন দুর্গাপুর। ননীবাবু সাহসী লোক। থেকে যাচ্ছেন বলে মনে হল। তারপর সেই যে একদিন সকালে বেরলেন, তারপর আর কোনও খবর নেই। দুর্গাপুর থেকে দুবার ভাড়া মানি অর্ডার করেছেন। খুব ফাঁকার ওপর একহারা ছোট্ট বাড়িতে মহেন্দ্ররা এভাবে থেকে গেল।

দুমাস চুপচাপ। তারপর একদিন সে এল।

সেটা ছিল ছুটির দিন, তখন সবে সন্ধে হয়েছে। চালতাবাগানে পূরবীর দিদির বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল, সেখান থেকে উঠতে বিকেল হয়ে গেল। বুচু মাসির কাছেই থেকে গেল।

বাড়ি থেকে আধ-মাইলটাক দূরে বি.টি রোড দিয়ে 'এল' বাসগুলো যায়। মহেন্দ্র সেখানে নেমে বাকি পথটুকু একটা সিগারেট ধরিয়ে আনমনে হেঁটে আসছিল। ভাল লাগছিল হেমন্তের বিকেলবেলায় হাঁটতে।

একটু এগিয়েই তার প্রথম খটকা লাগে। কিছু লোক কেমন যেন দলবদ্ধভাবে পিছন দিকে চাইতে চাইতে তার পাশ দিয়ে, উল্টোদিকে, বি. টি. রোডের দিকে, হেঁটে চলে গেল। হাঁটছিল তারা ঠিকই, তবু কী অস্বাভাবিক তাদের হাঁটা! আসলে, সেই হাঁটায় ছিল ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটার দ্রুততা।

মহেন্দ্র তার সন্দেহের সত্যতা মিনিট খানেকের মধ্যেই বুঝতে পারল। হঠাৎ, দু-পাশে দোকানগুলোর শাটার হুড়হুড় করে নেমে পড়তে লাগল। তাদের পাড়ার দিক থেকে অমনিভাবে, ছোটার-চেয়ে-দ্রুত, হেঁটে আসছে দলবদ্ধভাবে মানুষ, সঙ্গে নারী ও শিশুও হাঁটছে। হঠাৎ রাস্তার আলো গেল নিবে এবং সেই সঙ্গে 'হা-আ' করে দূরে-কাছে মাত্র একবার উঠল বা পড়ল মানুষের সমবেত আর্তস্বর, তারপরই সব স্তব্ধ। এখন শুধু অগণন মনুষ্যমূর্তি আসছে, দলে দলে মানুষ, তারা এখন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসছে। নির্জনতর তীরে, বাজি রেখে, মহেন্দ্র একবার পুরীর অন্ধকার সমুদ্রে নেমে পড়েছিল। আকাশে চাঁদ ছিল, আর ফসফরাসে ভরা উজ্জ্বল ফেনাসহ এগিয়ে আসছিল ঢেউ-এর পর ঢেউ—ঢেউ-সংঘর্ষের অব্যর্থ মুহূর্তে হঠাৎ লাফিয়ে কাত হয়ে গিয়ে, মহেন্দ্র সে-রাতের সেই প্রচণ্ড ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মোকাবিলা করেছিল। আজও অমনই একের পর একদল করে মানুষ ছুটে আসছে আর মহেন্দ্র লাফিয়ে উঠে কাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যাতে করে ধাক্কা কম লাগে। এভাবে ঢেউ কেটে মহেন্দ্র বাড়ির দিকে এগোবার চেষ্টা করে। যত চেষ্টা করে, ততই পিছিয়ে পড়তে থাকে। একসময় দেখা যায়, মহেন্দ্রও ঢেউ-এর সঙ্গে ছুটে চলেছে বাড়ি থেকে ক্রমাগত দূরে।

শেষ পর্যন্ত এটুকু রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে তার দেরি হয়ে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে। মহেন্দ্রর বাড়ির ঠিক আগে ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচিলের মতো লম্বা একটানা দেওয়াল—সেটা পেরোলেই তাদের দোতলা। অন্যান্য দিনের মতো পাঁচিল পেরিয়েই মহেন্দ্র মুখ তোলে ও আজ আলো জ্বলছে না দেখে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফ্যালে। তারপর পশ্চিমে গঙ্গার দিকে তাকায়। দূরে একটা বাঁক। বাঁকের পরেই নদী। রাস্তা কী বিলকুল ফাঁকা! একটা কুকুর তো দূরের কথা, দেখে মনে হয় এই রাস্তায় এখন কীটপতঙ্গও নেই। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার

ও স্তব্ধ। শুধু হঠাৎ-ওঠা জোরালো হাওয়ায় একটা শালপাতার ঠোঙা গঙ্গার দিকে হু-হু উড়ে যাচ্ছে। ঐ বাদামি ঠোঙার সঙ্গে মহেন্দ্রর মধ্যে থেকে মহেন্দ্রর এক খণ্ডও উড়ে যাচ্ছে গঙ্গারই দিকে, মহেন্দ্র টের পায়। বাড়ি থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে, পূরবী নয়, হঠাৎ আশার কথা ভেবে মহেন্দ্র আমর্ম কামনায় কেঁপে ওঠে। রহমানদা একদিন খুব মাতাল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাদের বাড়িতে রাতের আশ্রয় নেয়। পূরবী শোবার ঘর থেকে বেরোয় নি। আশাই সেদিন খেতে-টেতে দেয়। একসময় মহেন্দ্র দ্যাখে, রহমানদার চোখ দুটো দুখণ্ড সাদা পাথর হয়ে গেছে। মণিহারা চোখে রহমানদা আশাকে দেখছে। আশাও অনড়। 'এই মেয়েটাকে তুমি নার্স করো মহেন্দ্র—একটা লাভ-এ্যাফেয়ার তৈরি করো এর সঙ্গে—তার বেশি-কিছু এখন নয়। দুচার বছর পরে এ তোমাকে তা দেবে যা, তুমি মেয়েদের মধ্যে এতকাল খুঁজে বেড়িয়েছ।' মহেন্দ্র তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে। আশার জন্য কামনায় সে আজ থরথর করে কাঁপছে, সে দেখে।

আশা? দৌড়ে বাড়ির দরজায় এসে সে দ্যাখে, দরজা ভেঙে পড়ে আছে। আশা আছে তো? মহেন্দ্র আবার আমূল কেঁপে ওঠে। সে বেল টেপে।

'আশা!'

শব্দ নেই।

'আশা!' সিঁড়ির নিচে থেকে মহেন্দ্র ডাকে।

সাড়া নেই।

'আশা!' মহেন্দ্র আবার ডাকে। শব্দ নয়, এবার তার গলা দিয়ে অস্ফুট ভয়ার্ত স্বর বের হয়।

সিঁড়ির মুখে আশা এসে দাঁড়ায়।

তার হাতে মোমবাতি। সে একটি ধনেখালি ডুরে শাড়ি পরে আছে।

কাঁধ থেকে আঁচল খসে গেছে।

মাত্র এক বছরও হয় নি শাড়ি পরছে—এরই মধ্যে স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ছে তার ব্লাউজ। মহেন্দ্র আশার মুখের দিকে তাকায়। আশা তাকে ডাকে। ডেকে ছাদে নিয়ে যায়।

ছাদ থেকে পূর্ণিমার গঙ্গা পর্যন্ত দেখা যায়।

আশা শুরু করে :

তখনও সন্ধে হয় নি। চাঁদ উঠছিল। প্রথমে, ছাদে দাঁড়িয়ে, পূরবী ও আশা গঙ্গার জল থেকে এক খণ্ড মেঘ ভেসে উঠতে দ্যাখে। তারপরই শুরু হয় সেই শব্দহীন চিত্রর্পিত ঢেউ-এর পর ঢেউ, যার ধাক্কা কাটিয়ে মহেন্দ্র এদিকে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে আসে। তার ভারি খুরের শব্দ শোনা যায়। সে যখন তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, ওরা তখনও ছাদে। সে কি ওদের দেখতে পেয়েই বাড়িটি নির্বাচন করেছিল, নাকি, এ-রকমই ছিল পূর্ব-নির্দিষ্ট, যা সে আগেই জানত? ধীর ও নিশ্চিত পদক্ষেপে, যেন গুনতে জানে, পদক্ষেপ গুনে সে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ও ঘাড় থেকে মুণ্ডু তুলে ও চারদিকে ঘুরিয়ে মুখ ব্যাদান করে সে দুবার গর্জন করে। যেন সে প্রতিবেশী সমাজকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে, যদি কেউ থাকে। কে আসবে? তেমন কেউ নেই বুঝে আরও নিশ্চিতভাবে সে এক পা তুলে দরজায় আঘাত করে। মাত্র একটি আঘাতেই হুমড়ি খেয়ে দরজা ভেঙে পড়ে।

ওপরের দরজার ছিটকিনি খুলে পূরবী বেরয়। তার পরণে ছিল মুর্শিদাবাদি সিল্কের লাল-পাড় শাড়ি। একটু আগেই গা ধুয়ে বৈকালি প্রসাধন সেরেছে, চুল আশা বেঁধে দিয়েছিল। পাড়া

জুড়ে লোডশেডিং। পূরবীর হাতের মোমবাতির আলো সিঁড়ি ভেঙে পিছলে তার গায়ে গিয়ে পড়ে। অবর্ণনীয় দৃশ্য! বলার মতো ভাষা কই, যে আশা বলবে! কালো শাটিনের মতো তার চামড়া, তরুণ ও নমনীয় তার পেশি, তার চোখ পূরবীকে দেখে নরম ও ছলছলে হয়ে আসে। সে গা থেকে জল ঝাড়া দেয়।

তারপর উঠে আসে।

চারটি সিঁড়ির ব্যবধান রেখে সে ঐখানে নতজানু বসে পড়ে। আশার হাতে মোমবাতি ধরিয়ে দিয়ে পূরবী দুটি সিঁড়ি নেমে যায়। আশা সেই থেকে মোম ধরে আছে। আঙুলের ডগা দিয়ে পূরবী তার পুরু ঠোঁট ছোঁয়। নাকের পাটা কাঁপিয়ে সে ফোঁস করে একটি নিঃশ্বাস ফ্যালে। তার নিঃশ্বাস থেকে নেবুফুল ও মধু মেশানো এক তীব্র কামনাময় সুগন্ধ ভেসে আসে। আশার মনে হয়, সে তার দিদিমণির হাত চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদানে পূরবী তার ককুদে হাত বুলিয়ে দেয়। তার গলা দিয়ে তৃপ্ত, সুখী, মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ বেরুতে থাকে।

ঈদের দুটি চাঁদের মতো রূপালি, বাঁকানো শিং দুটি বাঁকিয়ে সে পূরবীর উদ্দেশে তার পিঠের দিকে ঈঙ্গিত করে। তারপর তার প্রশ্নময় ছলোছলো চোখদুটি তুলে পূরবীর দিকে তাকায়। মোমের আলোয় দুই চাঁদের মাঝখানে একটি রূপালি তারা চিকচিক করতে থাকে।

পূরবী একবার আশাকে ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখে। সেই শেষবার। আশার মাধ্যমে সে বিদায় নেয় তার ৩০ বছরের অবুঝ, তৃপ্তিহীন জীবন থেকে। তারপর ওর চওড়া পিঠে উঠে বসে। শায়ার লেসে ধুলো লাগতে পারে ভেবে ওঠার আগে সে শাড়ি ও শায়া একটু তুলেও নেয়। ওঠার সময় দিদিমণিকে লাগে একটি হাল্কা পালকের মতো।

ট্রফি হাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ীর মতো ষাঁড়টি এবার উঠে দাঁড়ায়। তারপর সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে নামে। তারপর রাস্তায় নেমে প্রতিবেশী সমাজের উদ্দেশে আহ্বানে ভরা তৃতীয় হুঙ্কার ছাড়ে। যে, কোঈ হ্যায়? কেউ আসে না। তারপর ভালো করে কিছু বোঝার আগেই সামনে খুর গেঁথে, আঁচড়ে, কিছু ধুলো উড়িয়ে, অশ্বের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে গঙ্গার দিকে দৌড়ে যায়। তার ককুদ আঁকড়ে ধরে, তার ওপর মাথা পেতে, পূরবীকে শুয়ে থাকতে দেখা যায় সেই শেষবার। আশা ছাদ থেকে দ্যাখে।

সেই থেকে সে ছাদে দাঁড়িয়ে। একা।

এখন, ঐ দেখা যাচ্ছে জলের ওপর ধোঁয়া। হাতের তালুর মতো এক টুকরো মেঘ এখনো দেখা যাচ্ছে। ঐখানে।

মহেন্দ্র ডাকল, 'আশা! চল্, আমরা পূরবীকে খুঁজতে যাই।'

আশা ও মহেন্দ্র পথে বেরুল। আশা হাত ধরল, মহেন্দ্র এগিয়ে চলল গঙ্গার দিকে। সে নিরস্ত্র, তার হাতে তাদের বাড়ির সেই একমাত্র হাল্কা ও পোক্ত লাঠিটাও নেই। সে কেবল আশার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে নদীর দিকে। আশার অপর হাতে মোমবাতি। রাস্তা কীটপতঙ্গহীন। শালপাতার ঠোঙাটাও এখন নেই।

এখন হাওয়া নেই।

*প্রতিবিম্ব*, ১৯৭২

# আলমারি

আজ সকালে উমার আলমারি আসবে।

পাখির ডাকে রোজদিনের মতো জেগে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আজ পুষ্পেন একটা স্বপ্ন দেখছিল। ঘুম ভাঙতে, না তখনও ঠিক ভাঙে নি, সে তখনও আধেক-ঘুমে—তার প্রথমেই মনে পড়ল, আজ আলমারি আসবে।

পাখি বলতে মাত্র দুটি। ধূসর-সাদা ও মূলত বেগুনি দুটি বদ্‌রি। ভোর হতে না হতেই এই দুই হারামজাদে মিলে একদিন দুশো পাখির মতো চেল্লাবে, আগে জানলে, উঃ, কোন শালা এদের ঘরে আনত।

কী যেন ছিল স্বপ্নটা? পুষ্পেনের মনে পড়ল না। 'যাঃ, এই তো দেখছিলুম, এর মধ্যেই'...এইরকম একটা ফোঁপরা পরাজয়বোধের সঙ্গে, 'যাআকগে, না পড়ল, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ছাড়া তো আজকাল কিছুই দেখি না'—এ-রূপ অভিমান মিশে, উড়ে-যাওয়া পাখির ছায়ার মতো, শেষপর্যন্ত হরেদরে তার চেতনায় যা পড়ে রইল তা হল, 'আফটার অল, মনে তো পড়ল না!' মনে পড়লে কী বা ক্ষতি হতো, হোক না দুঃস্বপ্ন, স্বপ্ন বৈ কিছু তো নয়।

উমার একটি স্বপ্ন কিন্তু আজ সার্থক হবে। আজ সকালেই। স্বপ্নের আগে যে অব্যর্থ শব্দটি এসে বরাবর গেড়ে বসে, তা হল 'রঙিন'। বড্ড বিমূর্ত! কী রঙ, কোন রঙ? জানতে ইচ্ছে করেই। উমার ক্ষেত্রে এখন বলে দেওয়া যায় যে, তার স্বপ্নের রঙ নীল। সে স্বয়ং কারখানায় গিয়ে, গ্রহণ-বর্জন, গ্রহণ-বর্জন, বর্জন ও গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শেষাবধি পাউডার-ব্লু রঙ পছন্দ করে এসেছে। কারখানায়, গতকাল সন্ধ্যায়, মালিক সুবোধবাবু যখন স্বহস্তে উমার স্বপ্নে দ্বিতীয় কোট নীল স্প্রে করছিলেন, তখন তারা, স্বামী-স্ত্রী, দুজনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। বহুদিনের মধ্যে কোনও-কিছুই তাদের এত কাছাকাছি টেনে আনতে পারে নি, আর এতক্ষণ ধরে। যেমন, যৌনতা।

রঙ-করার পর আয়না ফিট হবে। সে জন্যে চার-বায়-এক ফিট ফ্রেমের স্পেস ছাড়া রয়েছে। হ্যান্ডেলের পাশে চাবির স্লট। চাবির দাগ যাতে না লাগে সে-জন্যে স্লটের নীচে একটি বেকোলাইট প্লেট লাগানো। এ দুটি জিনিস প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া। স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে স্লটের ওপর কোম্পানির নাম স্পষ্ট পড়া যায়।

পুষ্পেন হেসে সে-দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ করে।

'দেখেছ?'

'কী?'

'ঐ যে। নামটা?' সৎসাহসের সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে সে উমার উন্মুক্ত কোমরে একবার তর্জনী বুলিয়ে নেয়, 'মন্ আমি?'

উত্তরে লিপস্টিকের ওপর উমা শুধু ঠোঁটটুকুতে হাসি মাখায়। বোঝা যায়, সে জানে।

পুষ্পেন তবু বলে, 'মাই লাভার। তাই না?'

মূল প্রশ্নের প্রতি উমার হাসি-হাসি উপেক্ষা দেখে বোঝা যায় খুব-একটা ভুল হয় নি। উচ্চারণ ঠিক হয়েছে কী?

'উই মসিয়ো।' সামনের সারিতে একটার ওপর উঠে পড়া জোড়া-দাঁত দেখিয়ে সে এবার বিশদভাবে হাসে।

'আই সী।' পুষ্পেন এবার উমার মাথার পিছনে চালচিত্রের মতো তার লেখা-পড়ার

কনভেন্ট-ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পায়। অ্যানিমিক, প্রায় ফ্রিজিড। বাঁজা? তবু, অতি অননুমেয়ভাবে দুলে উঠে, অই পটভূমিকা তাকে যখন-তখন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফ্যালে। ঝাড়া পাঁচটি বছর কাঠখড় পুড়িয়ে রিচি রোডের এই সফিস্ট্রিকেই সে বিবাহ করেছে।

তাদের বাড়ি থেকে কারখানাটি আধমাইলটাক দূরে। ডেলিভারি গতকাল বিকেলেই নেওয়া যেত। এ-জন্যে রঙে খুব বেশি ড্রাই দেওয়া হয়েছিল। রিক্সায় ফেরার পথে এ নিয়ে তাদের মধ্যে রীতিমতো কথা-কাটাকাটিও হয়ে যায়। বেশ খানিকটা তর্কাতর্কির পর ঠিক হয় যে, আজ সকালে আলমারিটি আসবে। পুষ্পেন প্রথমটা কিছুতেই রাজি হয় নি। সে চেয়েছিল দুপুরে আসুক। না হয় সে ক্যাজুয়াল নেবে? তার যুক্তি ছিল, তাদের মধ্যবিত্ত তথা নিম্নবিত্ত পাড়া। এ-রকম জায়গায় বড় রাস্তা দিয়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে, একটি নতুন স্টিল আলমারি ঠেলা-গাড়িতে চেপে ধীর ও নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে, এ-দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে; কিন্তু তাদের পাড়ায় পৌঁছে গাড়িটি রুখে গেল, এটা সচরাচর ঘটে কি? রাস্তার মোড়ে 'ওয়েসিস' নামে একটি দোকান হয়েছে। কত রকমের কুক্‌ড ফুড পাওয়া যায় সেখানে। সালামি, হট-ডগ, সসেজ—কত কী। দোকানটিতে কি ভিড় হয় না? বরং আজকাল বেশি ভিড় হয়। প্লাস্টিকের থলেয় ভরে ডীপ-ফ্রিজের মুর্গি দুলিয়ে যারা রাস্তা দিয়ে যায়, তারা কি ব্রীফ-কেসের মধ্যে মুর্গিটি লুকিয়ে নিয়ে যায়? উমা তীব্রস্বরে জানতে চেয়েছিল। অসতর্কভাবে হাসলে যে ঠোঁটের রক্তাভ পাউটিং আন-কথা মনে পড়ায় ও যা জানে বলে সে-সময় মুখে আঁচল চাপা দিতে উমা কখনো ভোলে না, সামান্য মতবিরোধে তা কত বিবর্ণ-রূঢ় হয়ে ওঠে! 'বড় এফিমিনেট তুমি', বলে ঈষৎ পৌরুষ-আক্রান্ত করে দিয়ে উমা এককথায় সমস্যাটির সমাধান করে দিয়েছিল বটে। কিন্তু, উঁহু, বিষয়টি আরও জটিল বলেই তাকে এত সরল দেখাচ্ছে—পুষ্পেন টের পেয়েছিল। সে আর কথা বাড়ায় নি।

'কাল সকালেই আমার আলমারি চাই! একটা আলমারির জন্যে আপিস কামাই? হাসালে!' বলে, ঘুঘুর মতো কুহর কেটে কেটে, উমা সত্যিই হাসতে শুরু করে।

পাখির ডাকে যদিও রোজই ঘুম ভাঙে, জেগে উঠে কিন্তু তিনদিকে দেওয়াল ছাড়া শহরের আর কিছুই পুষ্পেন দেখতে পায় না। পাখি বলতে দুটি বদরি, নিউ মার্কেট থেকে কিনে-আনা দোলনা ও ফুটো-অলা মাটির ভাঁড়ের ঘর সহ বড়সড় কাঠের খাঁচায় তারা দুটিতে দুশো পাখির মতো চেঁচাচ্ছে। দেওয়াল পেরিয়ে ওপারে বড় রাস্তার বুথে দুধের বোতলের খাঁচা নামছে। যে বাসটি এইমাত্র গীয়ার পাল্টালো সেটা একটা ডাবল ডেকার এবং নিঃসন্দেহে প্রথম বা দ্বিতীয় বাস, সে টের পায়, হয়ত এখনো বাসটিতে আলো জ্বলছে। কী করে টের পায় কে জানে, কিন্তু পায়। এই শহরে দেখতে দেখতে তিন যুগ কেটে গেল।

বাসটির গীয়ার পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পেনের মনে পড়ে গেল, বিবাহের প্রথম বার্ষিকীর দিন, মুগা-ডুরে শাড়িটি কেনার পর, বিলিতি কটেজের স্থাপত্য-ধাঁচে তৈরি দুটি পাখিসহ রাঙা খাঁচাটি দেখেই—বিশেষত তারা দম্পতি শুনে—উমার জন্য অনির্বচনীয় সারপ্রাইজ হিসেবে দরদাম না করে সে খাঁচাটি কিনে ফ্যালে ও ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফেরে। দোলনায় উমা একটি মিনি ঘণ্টা ফিট করে দিয়েছে। টিং-টিং-টিং-টিং করে সেটা সমানে বেজে চলেছে। কী ভয়াবহভাবে বিশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ নিরর্থক ওদের এই উত্তেজনা! ইনসিয়েশান সব সময় মাদি পাখিটার, পুষ্পেন লক্ষ করে দেখেছে, পুরুষ-পাখিটা যদি এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়েছে, অমনি—ফুড়ুৎ। ঝাঁপিয়ে পড়ল দোলনায়—টিং করে ঘণ্টার শব্দ—কি ভাঁড়ের গর্ত দিয়ে ঢুকে গেল গোঁসা-ঘরে। নাও, ঠ্যালা সামলাও। ভোরবেলার নব-উন্মোচিত মাথায় পক্ষীদম্পতির চরিত্র-ছকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে একটা জটিল বিষয় তার কাছে জলবৎ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। সে হঠাৎ তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পেল।

তার সহসা মনে পড়ে গেল পাখি-আসার পরদিনই, 'কী ব্রাদার, এত কিচির-মিচির কীসের', বলে ঢুকে ঐ জানালার ধারে গিয়ে বসেছিলেন রাস্তার ওপারের তিনতলার ফ্ল্যাটের শৈলবাবু। ভদ্রলোক উমাকে 'বৌমা' বলেন। শো-উইনডোর ম্যানিকিনের মতো, বিপত্নীক ভদ্রলোকের পাট-করা কাঁচাপাকা চুলে এসে পড়েছিল সকালবেলার শারদীয় আলো—তাঁর হার্ট-শেপের লাবণ্য-মাখা মুখটা কী অসম্ভব কালো দেখিয়েছিল, যখন, পাখি দেখে, উনি বলেছিলেন, 'তোমার ভাই স্পেয়ার মানি আছে, ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড। চাকরিটিও ভালো'—একটি বড়সড় প্রশ্বাস নেবেন বলে ফুলে উঠেছিল নাকের পাটা, 'আই হ্যাভ সেভেন মাউথ্‌স টু ফীড। নামেই গেজেটেড অফিসার, মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তো সর্বস্বান্ত...।' 'চাকরিটিও ভালো' বাক্যবন্ধটি ক্ষীণ হাসিসহ ঠোঁট থেকে উড়ে যাবার আগে একটুখানি তির্যক বিষ্ঠাত্যাগ করে যায় নি কী? অর্থাৎ, ঘুষ? পুষ্পেনের পে-স্কেলে অমন কত লোক শৈলবাবুর আন্ডারে কাজ করে।

শাড়ি তো বটেই, মায় পাখিদুটিও সে কিনেছিল প্রথম ঘুষের টাকায়। বিয়ের প্রথম বছর, অথচ হাতে টাকা নেই এবং একটা পার্টিও ঘুরঘুর করছে কদিন—তার সঙ্গে বেরোবার মুখে অফিস গেটেই সে টাকা নিয়েছিল। ওঃ, শালা, কী ভয় করেছিল রে সেদিন। দুজন লোককে একসঙ্গে দেখলেই মনে হচ্ছিল ভিজিলেন্সের, দুজনই থাকে। হাতে-নাতে ধরার পর, কানকোয় আঙুল গুঁজে মাছের মতো ঝুলিয়ে দুজন লোকই আনোয়ারুলকে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছিল। ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরল যখন, সে তখনও ভয়ে একাকার। আরও অধিকরাতে, মুগা-ডুরে টান মেরে খুলে, তুলনাবিহীনভাবে বেশি বলশালী কাম দিয়ে সেই একাকার ভয়কে সম্পূর্ণ ধ্বস্ত করা গিয়েছিল।

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে পুষ্পেনের। পাশের জোড়া খাটে নীল নাইলন মশারির মধ্যে উমা চিৎ হয়ে হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে—আহা-রে। তার গা থেকে চাপা সরে গেছে। কীভাবে টের পেয়ে উমা সেটা বুকে টেনে নিচ্ছে, সে দ্যাখে। পীরিয়ড। আজ নিশ্চিত শেষ দিন। আজ আসবে। আজ উমার নীল আলমারি আসবে। আবার মনে পড়ল পুষ্পেনের, পাখি দুটির মতোই, আলমারি আসছে রামপুরিয়ার টাকায়। পুষ্পেনের পেটের মধ্যে হজম হবার গুরুগুরু ধ্বনি। যার হয়, সে ছাড়া এই ধ্বনি নাকি আর কেউ শুনতে পায় না?

আবার ঘুম পাচ্ছে পুষ্পেনের। পাখির ডাক স্তিমিত হয়ে আসছে।

'এই, শুনছ?'

আলমারি আনার সময়-নির্বাচনের ব্যাপারটা এমন সরল দেখাচ্ছে বলেই বিষয়টি রীতিমতো সন্দেহজনক, পুষ্পেন আগেই টের পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন অভূতপূর্ব দিক থেকে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে এটা সে কল্পনাও করতে পারে নি। মৃদু নাড়া দিয়ে, ঘণ্টাখানেক পরে উমা তার ঘুম ভাঙাচ্ছে সে দেখল।

'একবার যেতে হবে।' উমা নম্রস্বরে বলছে, সে শুনল।

'কোথায়?'

'শৈলবাবুদের ফ্ল্যাটে।'

'কেন?'

'শৈলবাবু ভোরবেলা মারা গেছেন। ওঠো, একবার যা-আও!' মিনতি-মাখা সুরে উমা আবেদন করে।

আলমারি আসার কথা সকাল ৯টা নাগাদ। এ কে ভাবতে পারবে, এত তাড়াতাড়ি, আলমারি এসে পড়ার ঠিক অব্যর্থ সময়টিতেই রাস্তায় খাট সাজানো শুরু হবে। পুষ্পেনদের

জানালা থেকে ও-বাড়ির চারতলা দেখা যায়। চারতলার ছেলেবুড়ো সবাই বারান্দায় ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, দেখে, উমা পাঁচির-মাকে পাঠিয়েছিল তদন্ত করতে। হ্যাঁ, খাট সাজানো শুরু হয়েছে।

পুষ্পেন তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে। উমা পাশে এসে দাঁড়াল। 'যাও, বারণ করে এসো।' অর্থাৎ, আলমারি। 'কেমন-বলেছিলাম-কিনা' চোখে পুষ্পেন উমার দিকে তাকায়। একই সঙ্গে সে বেশ ঝরঝরে বোধ করে। যাক বাবা, সেই তাহলে দুপুরেই...বাঃ, নিঃসন্দেহে কম-ভারি লাগছে তার নিজেকে।

রাস্তায়, তার সাইকেল-রিক্সা থেকে নেমে, শূন্য খাটের একধারে, পায়ের দিকে, আকবর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। রিক্সা-ব্যাপারে উমার হাবভাব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতন, এক সন্তান প্রসব ছাড়া সবই সে রিক্সায় চেপে করে এসেছে এবং বেশির ভাগ এই সদানন্দ মাসকুলার ছোকরার গাড়িতে। আকবর জানে না, এ শুধু পুষ্পেন জানে যে, একদিন তার নাতিপ্রশস্ত বুকে সহাস্য মুখও স্ফুরিত নাসা ঘসে উমা স্বীকার করেছে যে, বুদ্ধপূর্ণিমার আলোর ওর ঘর্মাক্ত কাঁধের মাস্‌লস-এর কাজ দেখবে বলে, সিনেমা-ফেরৎ গলির শর্টকাট ছেলে একদিন সে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছিল ও অনেক ঘুরে বাড়ি ফেরে। তার জোলো-গোলাপি সাদা পোর্সিলিন মুখের পিছনে যে অপর-নারী, তার সম্পর্কে উমা তাকে এ-যাবৎ এই একটি মাত্র তথ্য জানতে দিয়েছে। স্বীকারোক্তির সময় সে নিখুঁত উচ্চারণে 'ওয়ার্কিং অফ দ্য মাস্‌লস্' ফ্রেজটি ব্যবহার করেছিল, পুষ্পেনের মনে পড়ে।

খাট-সাজানো সম্পূর্ণ। বোকের মধ্যে গোঁজা গোছা গোছা ধূপ ধোঁয়া ছাড়ছে। বালিশের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে মায় জগদীশবাবুর গীতাটিও। একটি কীর্তনের দলও হাজির। খোলে চাঁটি পড়ল বলে। আর দেরি নয়। 'জোরে চালাও আকবর', বলে পুষ্পেন রিক্সায় উঠে পড়ে।

কারখানা পর্যন্ত তাকে আর যেতে হয় না। একটানা ঋজু গলিটিতে প্রবেশ করেই এ-প্রান্ত থেকে সে দেখতে পায়, যা হবার তা হয়ে গেছে। ঠেলাগাড়িতে পাতা পুরু খড়ের গদির ওপর মহারাজকে ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে। দড়িদড়া দিয়ে বাঁধাছাঁদির কাজও সম্পূর্ণ। সে একটু এগোতেই, নড়ে-চড়ে উঠে ঠেলাটি যাত্রা শুরু করে দেয়। 'দুর্গা! দুর্গা!' পুষ্পেন মনে মনে বলে ওঠে।

পিছনে ঠেলাঅলাদের হারে-রেরে, গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠে, ঢালু রাস্তা দিয়ে গড়গড়িয়ে বিকট-নীল জন্তুর মতো, কখনো মুখ উঁচিয়ে, কী আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটে আসছে ঠেলাটা—আরে, আরে, ধাক্কা মারবে নাকি— সরে দাঁড়াবার জায়গাও যে নেই! 'আকবর, রিক্সা ঘোরাও', পুষ্পেন সন্ত্রস্তভাবে বলে ওঠে। কাছাকাছি এসে ঠেলার গতি শ্লথ হয়ে আসে। চট ও প্লাসটিক মোড়কের ফাঁকফোঁক দিয়ে আলমারির যে-টুকু দেখা যায়, পুষ্পেন তাতেই চমৎকৃত হয়। আ, রং পছন্দ করেছে বটে উমা। কী যেন নাম রঙটার? বাড়িতে বসে সুবোধবাবুকে দিয়ে অভ্যন্তরের তা অন্তত দশ-বারোটি স্কেচ করাবার পর তবে একটি তার মনোনয়ন পায়। ডালা খুললে প্রথমেই, ওপরে, দুধারে দুটি বন্ধ তাক, মধ্যস্থলে প্রখর নবদুটি টিপে ধরলে যা স্বয়ংসিদ্ধভাবে খুলে যায়। মাঝখানে লকার। লকারের পিছন দিকে কিন্তু আর-একটি খুদে লকার আছে, বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না। একেবারে নীচের তাকে হাত বুলিয়ে পাওয়া যাবে যে স্লটটি, তা এই আলমারির গোপনতম গোপন—চাবি ঘোরালেই সেই অনির্বচনীয় গুপ্ত-তাক দুদিকে ফাঁক হয়ে যাবে। এবং, নির্মাতা ও মালিক ছাড়া তার অস্তিত্বের হদিশ কেউ কোনওদিন পাবে না। মাঝ-বরাবর বাঁ-দিকে আধাআধি জুড়ে পুষ্পেনের ওয়াড্রোব, বাকি অর্ধেক স্পেসে অর্ধ-তাকগুলো শেষাবধি দুটি না তিনটিতে দাঁড়ালো তা সে এখনো জানে না।

ঠেলার সঙ্গে চলেছে কারখানার আরও জনাচারেক লোক। এরা আলমারি তুলবে। দলপতি ঠাকুর সিংহকে পথনির্দেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয় পুষ্পেন, 'হ্যাঁ! ঐ মন্দির পর্যন্ত যাবে। তার পরেই দেখবে রাস্তায় একটা মড়া খাটে শোয়ানো...'

'মুর্দা বাবুজি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' সে এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, 'ঐ মড়ার সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তোমাদের দেখে ঠিক উল্টোদিকের যে প্যাসেজটাতে আমি ঢুকে পড়ব, তোমরাও সেটাতেই—'

'আপ সাথ সাথ চলিয়ে না বাবুজি।'

'নেই, নেই।' দড়ির খ্যাঁচে পুতুলের মতো হাত-পা ঝাঁকিয়ে পুষ্পেন উত্তেজনা কমায়, 'হাম আগাড়ি যাতা হ্যায়। দূর সে মুর্দাকা পাশ হামকো দেখ্ কর্—ম্যায় যো গল্লিমে ঘুসেগা ওহিমে—কিসিকো পুছতাছ করনেকা কোঈ জরুরৎ নেই হ্যায়, সমঝা?' এত বলে পুষ্পেন হাঁপিয়ে পড়ে। সে আগ্রহভরে ঠাকুর সিং-এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে।

ব্যাটা, বুঝেছে নিঃসন্দেহে। কেন যে এই অশিক্ষিত লোকগুলো একটু বেশি বুঝে ফ্যালে। তার হাসি দেখে তাই তো মনে হয়। 'কোঈ বাৎ নেই বাবুজি,' সে হেসে বলে। আর দ্বিরুক্তি না করে পুষ্পেন চাপা গলায় আকবরকে বলে, 'জোরে চালাও আকবর'। বোধ হয় তার ব্যস্ততায় সংক্রামিত হয়েই হৈ-হৈ করে ঠেলা তাকে তাড়া করে। 'কোঈ জলদি নেহি। তুমলোগ ধীরসে আও,' পিছনের পর্দা তুলে পুষ্পেন ঠাকুর সিং-এর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে।

সে পৌঁছে দেখল, শৈলবাবুকে খাটে শোয়ানো শেষ, উন্মুক্ত বলতে শুধু মুখখানি—অবশ্য এ-রকমটা না হলেও মুখটাই প্রথমে চোখে পড়ত। মৃত্যু-পূর্বের শেষ জীবিত অভিব্যক্তিটি এখনো মুখে লেগে আছে। কাল সকালেও তো বাসের লাইনে দেখা হয়েছে। রোজ যেমন, উনি ছিলেন পুরোভাগে। ডগায় চুনসহ পানের বোঁটা তুলে দূর থেকে ওয়েভ করেছিলেন। ভাই-বোনটোন মিলিয়ে আত্মীয়-স্বজন তা খুব মন্দ ছিল না দেখা যাচ্ছে শৈলবাবুর, শোকোচ্ছ্বাসে ছেলে-মেয়েদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। ফোটো তোলার সময় শুধু জড়বুদ্ধি মেজো ছেলেটা ছাড়া সবাই মুখ তুলল, পুষ্পেন দেখল। সে রিক্সা থেকে নেমে মৃতের পাদদেশে দাঁড়াল।

এবং সব মিলিয়ে হয়তো মিনিট পাঁচেকও হয় নি, যার মধ্যে গত বছর সপ্তমী পুজোর দিন লোডশেডিং-এর সন্ধ্যার মাত্র একটি দৃশ্য কোনওমতে টায়েটায়ে ফোটাতে পেরেছে পুষ্পেন, যেদিন, যখন, তাঁর নগ্ননির্জন ফ্ল্যাটে শৈলবাবু একা—মোমবাতি হাতে আলমারির লকারের ভেতর থেকে একটি যশোরের চিরুনি বের করে, তা থেকে ফুটদেড়েক একটা লম্বা চুল কাঁপা হাতে খুলতে খুলতে, মাঝে মাঝে হাত তুলে নিয়ে—যেন তাতে বিদ্যুৎ রয়েছে—হঠাৎ উনি হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, টেবিলে মাথা ঠুকে ঠুকে বলছিলেন, 'আমি তাকে ভালোবাসতাম', 'আমি তাকে ভালোবাসতাম'—আর, যার অনুবাদ 'সে আমাকে ভালোবাসত', 'সে আমাকে ভালোবাসত'—করে নিচ্ছিল পুষ্পেন—এই একটি-মাত্র দৃশ্য কোনওমতে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করাবার আগেই—মাত্র পাঁচ মিনিটও হয়ত হয় নি—হঠাৎ ঠেলাটি মোড় নিল এবং পুষ্পেনকে দেখতে পেয়ে, মাত্র দশ গজ দূর থেকে, ঠাকুর সিং তার বিশুদ্ধ ভোজপুরিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাউন গল্লি—এ বাবু—কিদ্ধর?'

ঘাড়ের ওপর পুষ্পেনের মুণ্ডু শক্ত হয়ে থাকে। সাড়াশব্দ না দিয়ে, রিক্সা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে সুট করে তাদের প্যাসেজে ঢুকে পড়ে। কার আলমারি, কে তার বাবু, কে জানে।

প্রথম হরিধ্বনি দিয়ে খাট মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল।

'জয় রামজীকি' বলে দোতলার ফ্ল্যাটের সামনে আলমারিটা লম্বা করে দাঁড় করাতেই, একটু চমকে, পুষ্পেন উমার দিকে তাকিয়েছিল। গুডনেস! দরজার চেয়ে আলমারিটা

ইঞ্চিছয়েক লম্বা হয়ে গেল কী করে? সে ছ'ফিট অর্ডার দিয়েছিল! উত্তরের জন্য সে উমার মুখে তাকায়।

'আমি ছ-ইঞ্চি বড় করতে বলেছি,' উমার চোখে চিক্কুর, প্রাসাদের সিঁড়ি-শ্রেণীর মুখে দাঁড়িয়ে সম্রাজ্ঞীর মুখে কৃষক রমণীর হাসি। 'আলমারি যদি ঘরে নিতেই হয় তো জায়ান্ট সাইজ নেব। ছোট জিনিস নেব কেন?' সে হেসে জানায়। সত্যি কামনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে এই সব 'কৃ্য' বা ছোট-অভ্যুত্থানের সময় তার ডেলিবারেট ওষ্ঠ-লীলা দেখবার জিনিস।

'কিন্তু...এ কি ঢুকবে?'

গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল ঠাকুর সিং।

'হামি ঘুষিয়ে দেবে', সে হৈ-হৈ করে ওঠে, 'সাইজ দেখে আপনি কুছু ঘাবড়াবেন না মাঈজি', হাত তুলে সে বরাভয় দেয়, 'এ্যায়সা শওয়া-শওয়া আলমারি ঠাকুর সিং ঘুষিয়ে দিয়েছে।'

তা দিয়ে থাকতে পারে। এক্সপার্ট লোক বটে ঠাকুর সিং : সুবোধবাবুও তাই বলে দিয়েছেন!

'বলো তো বাবুকে।' কী ভেবে, আরক্ত মুখ-ঝামটা দিয়ে উমা সরে যায়।

'হাঁ বাবুজি।' ঠাকুর সিং বলল, 'বেনিয়াপাড়ার দাত্তোবাবুকে চিনেন তো—একদম এহি সাইজ—শাল্‌হা কুছুতেই ঘুষবে না। দাত্তোগিন্নির আঁখমে পানি এসে গেলো। বললো কী, ঠাকুর সিং, কিসি ওজরসে ইসকো ঘুষা দেও। পাঁচ কেজি মাংসোকা দাম বকশিস মিললো বাবুজি, হাঁ! এ ভেইয়া, হাত লাগাও!'

'জয় রামজীকি' ধ্বনি দিয়ে তারা মাটি থেকে আলমারি শূন্যে তুলে ধরে।

হয়ত ঢুকে যেত। কিন্তু ভেতরের করিডর প্রস্থে মাত্র সওয়া তিন ফিট। পাড়ার ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে দরজার একটি পাল্লা খুলে ফেলেও কিছু হল না। প্লাসটিক শিট দু'ফাল হয়ে ছিঁড়ে আলমারির গা ছড়ে গেল, অপর পাল্লা মটমট করে উঠল, তবু ঢোকানো গেল না। উমার চোখে জল এসে গেল। 'ছিঃ-ছিঃ, এ কী করলে তুমি' বলে পুষ্পেন গেল সুবোধবাবুকে ডেকে আনতে।

আধঘণ্টা পরে সুবোধবাবুর সঙ্গে ফিরে পুষ্পেন দেখল, আলমারি পূর্ববৎ দরজা জুড়ে শুয়ে আছে। তার ওপর একটি বেডশীট ভাঁজ করে পেতে উমা কুলিদের সিঙাড়া-কচুরি পরিবেশন করছে। পাঁচির মা-র হাতে মস্ত চাঙাড়ি। ভিতরে ঝির-ঝিরে বৃষ্টির শব্দ, স্টোভ জ্বলছে। কেটলি চেপেছে নিঃসন্দেহে। দস্তুরমতো পিকনিকের আবহাওয়া। পাড়ার ফুটবল প্লেয়ার দুলু গাঙ্গুলিও জুটে গেছে। ভালোই হল, একটা হাত বাড়ল, যদিও ভারি অসময়ে বেরসিকের মতো দুলু জানতে চাইল, 'দাদা, আমার চাকরির কদ্দূর কী হল?'

চা-সিঙাড়া খেয়ে সুবোধবাবু মাপজোক করতে বসলেন। দরজা, আলমারি ও করিডরের দৈর্ঘ-প্রস্থের মাপ নিয়ে, মেঝেয় খড়ি দিয়ে নানারকম জ্যামিতি কষে, তারপর তিনি মাথা নাড়লেন, উঁহু। এ জিনিস এ দরজা দিয়ে ঢোকার নয়। করিডরটা যদি অন্তত পুরোপুরি তিনফিট চওড়াও হত, তাহলেও...

তাহলে? বাকি দিন এবং সারারাত কি আলমারিটা এ-ভাবেই এক-পাল্লা দরজা জুড়ে পড়ে থাকবে নাকি? ওপারে থাকবে উমা...এপারে পুষ্পেন...রাত হলে তো সবাই চলে যাবে। তারপর খালি হাতে সারারাত খোলা দরজা পাহারা দেবে নাকি পুষ্পেন? বাড়িতে তো একটা বেড়াবার ছড়িও নেই!

এখনো রঙে পাক ধরে নি। টপকে যাওয়া যাবে? হঠাৎ মনে হল পুষ্পেনের বুড়ো ভাম বিকট এক জুরো ভাল্লুক মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়েছে তাদের প্রবেশপথ জুড়ে। সে মৃত না মটকা মেরে আছে, বোঝার উপায় নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো বিপজ্জনকও

আর কিছু হতে পারে না।

টুল-ব্যাগ থেকে একটা বেঁটে করাত বের করলেন সুবোধবাবু। ছ ইঞ্চি করে পায়া চারটি কেটে ফেলা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই।

কাটা পায়াগুলো উমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, সুবোধবাবু জানালেন, দু-এক দিনের মধ্যেই উনি আরমারির মাপে একটি ছ-ইঞ্চি স্টিলের চৌকি পাঠিয়ে দেবেন। ঠাকুর সিং লোকজন এনে তার ওপর আলমারি বসিয়ে দিয়ে যাবে। বাইরে থেকে দেখে এই জোড়া-তালি একদম বোঝাই যাবে না। হরেদরে, ঘরের মধ্যে সেই জায়ান্ট সাইজই দাঁড়াবে। রঙচঙ যেখানে যা চটেছে মিলিয়ে দেওয়া হবে। এবং এ-জন্যে টাকাকড়ি কিছুই লাগবে না।

চার-চারটি পা কেটে ঠাকুর সিং ও তার দলবলসহ সুবোধবাবুকে বিদায় দিতে বেলা দুটো বেজে গেল।

'বলিহরি হরিবোল...'

শ্মশানযাত্রীরা ও-বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল।

রাত্রে, বিনা আমন্ত্রণে উমা এল সেই মুগা-ডুরে পরে। কী না-ভেবে যে! কল্পনাশক্তিহীন অন্ধকার নারীশরীরের চেয়ে কাম্য আর কী। এই ক'ঘণ্টায় সে কত সাফসুফ, ঝরঝরে আর হাল্কা হয়ে গেছে। বিয়ের আগে ফ্লার্ট করার দিনগুলোয়—কবেকার সেই একদিন সন্ধ্যায়—উমা গলি থেকে বেরুতেই হু-হু কালবোশেখি, পূর্বদিক থেকে এত জোরে ছুটে আসছে, গলিতে বোঝাই যায় নি। একটু পিছিয়ে পড়া পুষ্পেন গলির মুখে দাঁড়িয়ে উমাকে দেখেছিল লোকজনের ছুটোছুটির মধ্যে হাওয়ার দিকে চকিতে ঘুরে দাঁড়াতে; তার আঁচল উড়ছে, বব-করা চুল উড়ছে, সাদা লিনেনের শাড়ি লেপ্টে গিয়ে রেখায়িত করে তুলেছে তার বাহুল্যবর্জিত তলপেট, স্তনদুটি বায়ুচাপে একটু বসে গিয়ে আবার ফুলে উঠছে যেন। ঋতুসম্মত বৃষ্টি-ফোঁটায় ধুয়ে স্মিত মুখের ওপর চকচক করছে তার ছোটখাটো তীক্ষ্ণ নাক। এমন কি, সেদিনের মতো আজও, তার কানের রিঙগুলি টিংটিং করে সমানে বেজে চলেছে। আজ সন্ধ্যা থেকে যেমন, সেদিন তারা একটাও কথা বলে নি। শুধু হেঁটেছিল।

পাখি দুটো বারান্দায় ঝটপট করে ওঠে। তিনতলায় শৈলবাবুর ফ্ল্যাটে এখনো আলো জ্বলছে। যত্রতত্র চিকিয়ে উঠে ভোরের শার্সির মতো নীল দেখাচ্ছে আলমারিটা। আয়না জুড়ে সাদা অন্ধকার। আজ চার বছরে সন্তানবতী হতে না-পারলেও পুষ্পেনের ঔরসে উমা ঐ নীল আলমারি প্রসব করেছে। তুল্যমূল্যে, অন্তত প্রসব-বেদনার দিক থেকে, এই বা কম কী, সে ভেবে দেখল।

যান্ত্রিকভাবে একটি সিগারেট ধরিয়ে, না টেনে, গোঁজার জন্যে অ্যাসট্রের বদলে অন্ধকারে একটি পিকদানি টেনে এনে পুষ্পেন টের পায়—ভুল! কিন্তু এখন কোনো মানে হয় না-গোঁজার? সে পিকদানিতে অগ্নিমুণ্ড চেপে ধরে।

*শারীদয় এক্ষণ, ১৯৭৮*

## দোলনা

বিয়াল্লিশটা বছর একটানা, কর্মবীরের মতো কাটিয়ে মহেন্দ্র যখন গত এক বছর ধরে কিছুই করতে পারছে না, যখন তার কাছে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সে এ-জীবনে আর কিছুই করে উঠতে পারবে না, এ-রকম অসময়ে সে একটা কাজে হাত দিল।

তার ছেলে এসে বলল, 'বাপি, একটা দোলনা করে দাও।'

মহেন্দ্র ঘুম ভেঙেছে বেলা করে। আজ থেকে নাইট শিফ্‌ট। পূরবী তাই কাল রাতে এবং ভোরের দিকে, দুবারে এক সপ্তাহের খোরাকি দিয়ে দিয়েছে। একটু আগে চা দিয়ে যাবার সময় পাঁচির-মা জানিয়ে গেছে, আজ বাজার যেতে হবে না। ছাদের রান্নাঘরে আধ কেজি চিংড়ি নিয়ে পূরবী ব্যতিব্যস্ত, বুঝি আজ ফ্রায়েড রাইস হবে। সামনে পড়ে আছে একটা গোটা দিন। মহেন্দ্রর শরীরময় আরামখেগো ছুটির দিনের মনোভাব। এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময় যখন ছেলেটার যত আবদার।

আজ কাগজে সি.পি.এম-এর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার খবর বেরিয়েছে। কাগজের আড়াল দিয়ে, শুয়ে শুয়ে, আন্ডারউয়্যারহীন পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে মহেন্দ্র টের পায়, শুধু বিধিবদ্ধ র‍্যাশনিং-এ সীমাবদ্ধ না থেকে পূরবীর দূরদর্শিতা রাতারাতি তাকে একটি আস্ত বাবাও বানিয়ে দিয়েছে। ছেলের আবেদনে সাড়া দিতে তার শরীর ও মন একযোগে উৎসুক, সে দ্যাখে।

মহেন্দ্র হেসে বলল, 'দোলনা? সে কী রে। টাঙাবি কোথায়?' বলে সে ছেলেকে কাছে টেনে আনে। বিছানায় অবধারিত বাঁ-দিকে শুইয়ে পূরবীকে সে কাছে টেনে আনে এ-ভাবেই অর্থাৎ বাঁ-হাত গলা ঘুরিয়ে কাঁধের ডানায় এবং ডান হাত মেরুদাঁড়ার প্রারম্ভে রেখে। এর অন্যথা কখনো হয় না।

'ঐ তো।' বলে মুখ তুলে ছেলে ঠোঁট ফোলায়, 'ঐখানে?'

মহেন্দ্র দেখল, সিলিঙে কংক্রীটের সঙ্গে গাঁথা পাখার হুকটা সে দেখাচ্ছে।

পাখাটা?

এটা বসার ঘর। ছেলে বড় না বেয়াড়া কী যেন হচ্ছে, তাই মহেন্দ্রকে আজকাল এ-ঘরে শুতে হয়। এও দূরদর্শিনীরই ব্যবস্থা। এখনো তত গরম পড়ে নি, পূরবী প্রায় সারারাত ছিল, তবু কাল রাতে পাখা চালাতে হয় নি। মিস্ত্রি ডেকে, পূরবী তাহলে, গতকাল বিকেলের দিকেই পাখাটা তৈলাক্ত করতে পাঠিয়েছে? কাল সকালে বেরুবার আগেও দেখে গেছে।

গত গরমটা ঘুরেছিল ঠিকই, কিন্তু পাখাটা স্টার্ট নিচ্ছিল এমন একটা বিকট 'ঘড়ঙ' শব্দে যে আঁতকে উঠতে হত। বাইরে লোকের সামনে পাখা চালাতে হলে, সে ভারি অপ্রস্তুত অবস্থা। বহুদিন পরে এসেছে এমন কেউ বা নবাগতর উপস্থিতিতে পূরবীকে পাখা চালাতে সুইচ বোর্ডের দিকে অগ্রসর হতে দেখলেই মহেন্দ্র প্রতিবারেই একটু নড়েচড়ে বসত, গলা ঝেড়ে নেবার প্রয়োজন দেখা দিতই। ঝাড়া একটি বছর জুড়ে শিশুবৃদ্ধনির্বিশেষে অভ্যাগতদের এক-একটি পুরো দলকে চমকে উঠতে কম দ্যাখেনি তো মহেন্দ্র।

হয়েছিল কী, পরশু দিন অরুণ এসেছিল গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন করতে। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রইল, বেশ বড়লোক হয়ে গেছে অরুণ, গত দশ বছরে। কলেজ লাইফের পর বিচ্ছেদ কিছুকাল, তারপর বাপের কয়লার ডিপো বেচে বজবজে কী-একটা ছোটখাটো কারখানা করল এই তো সেদিন। গত বছরদশেক ধরে মহেন্দ্রদের ফ্যাক্টরিতে নাগাড়ে এসেছে। 'চল্ চা খাওয়া যাক' বলে ধরে নিয়ে গিয়ে কথার ফাঁকে প্রায়ই 'আজ তোদের অমুককে সী-অফ করতে গেসলুম—একটা টেপ-রেকর্ডার দিলুম', 'অমুকের মেয়ের বিয়ে ছিল—নেকলেশ', 'অমুকের ইনকাম-ট্যাক্স ঝামেলা মিটিয়ে এলুম আজ—পাঁচশো গেল মাইরি', এ-সব বলত বটে। প্রায়ই হেঁকে উঠত, 'ব্যয়! এখানে একটি ভেজিটেবল চপ' ও মহেন্দ্রকে কখনোই পে করতে দিত না। তাদেরই ফ্যাক্টরির অফিসারগুলোকে নিয়ে রগড়ে যাচ্ছে, অথচ, এর মধ্যে যে সিঙ্কিং সিঙ্কিং এত ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, তা মহেন্দ্র বুঝবে কী করে। এ তো রীতিমতন দুর্বোধ্য, নয় কি? বুঝ্ দিতে এল কিনা এক্কেবারে বাড়িটাড়ি

হাঁকিয়ে—বাব্‌বাঃ!

এখনো ঠিক গরম পড়ে নি। এটা ছিল বছরের সেই সতর্ক, ছলনাময় দিনকটি, যখন পাতা-ঝরা সম্পূর্ণ, অথচ নতুন পাতারও দেখা নেই। আসলে বসন্তকাল, কিন্তু গায়ে অনুপ্রবেশকারীর ছদ্মবেশ, মুখে শীতের মুখোশ। এমন যে, ওরা চা খাবে না শুনে, পাঁচির-মাকে ফান্টা আনতে পাঠিয়ে অরুণের বউ রমাকে পূরবী জিজ্ঞেস করেছিল, 'গরম না ঠান্ডা?'

'না-না, ঠান্ডা,' রমা ও অরুণ সমস্বরে বলে উঠেছিল।

পরশু ছিল মহেন্দ্রর অফ-ডে। হোক না দুপুরবেলা, এখনো ভোরে লেপ লাগছে, কে জানত একটু পরেই রমা বলে উঠবে, 'বেশ গরম পড়ে গেছে না?' বলে পাখার দিকে সতৃষ্ণ তাকাবে? দিব্যি চালাচ্ছিল এতক্ষণ পূরবী। বারান্দা থেকে ট্যাক্সি থামতে দেখেই, 'অরুণ এসেছে' বলে ঘুমন্ত মহেন্দ্রর নেয়াপাতিটি এক হাতে নাড়া দিতে দিতে সে অপর হাতে খুলে ফেলেছিল আলমারির ডালা এবং ওরা ওপরে ওঠার আগে টক্ করে একটা ধনেখালিই শুধু পরে নেয় নি, বিছানার চাদর টেনেটুনে একটু প্রসাধনও সেরে নিয়েছিল। প্লেট ভর্তি করে সাজিয়ে দিয়েছিল তুলতুলে নরম ওমলেট, ভেতরে নিস্পিষ্ট টোমাটো, একপাশে সন্দেশ দুটি করে। সত্যি, স্পটলেশ সাদা কোয়ার্টার-প্লেটের ওপর পাট না-করে বিছিয়ে দেওয়া হরিদ্রাভ ওমলেট, ভিতরে টোমাটো-কুচির আকর্ষণীয় উঁকিঝুঁকি, এত নরম আর তুলতুলে যে মুখে দিলে অন্যরকম লাগবেই—এতে পূরবীর মননকেও বুঝি পাওয়া যাবে অনেকটা। মশলা এগিয়ে দিয়েছিল কারুকার্যময় পাথুরে ডিশে।

সেই চালাতে হল শেষ পর্যন্ত। 'ঘড়ঙ্' করে সেই বিকট শব্দ। এক যোগে চমকে-ওঠা অরুণ ও রমা। বিস্মিত চাউনি। মাত্র একটি হাস্যকর শব্দে পূরবীর এত চেষ্টা একটানে ফেঁসে গেল। আজ এক বছরে যা সম্ভব হয় নি, মাত্র একটি শব্দে, অবশেষে তাই ঘটল। গতকালই বিকেলের দিকে মিস্ত্রি ডেকে খুলিয়ে, পূরবী পাখাটা মেরামত করতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নব-উন্মোচিত হুকটির দিকে একবার তাকিয়ে বুকে-লগ্ন ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মহেন্দ্র বলল, 'কিন্তু হুক তো একটা। একটায় কী করে হবে বাবা?'

'কেন! ঐ তো আরেকটা?'

আর-এ! আর-একটা সত্যিই রয়েছে তো। ছিল নাকি এতদিন, নাকি, কংক্রিট ফুঁড়ে? আজ আট বছর হতে চলল এই কোর্য়াটারে, কই, লক্ষ্য করে নি তো মহেন্দ্র? কখনো লক্ষ্য করে নি এ অবশ্য হতেই পারে না, গোড়ার দিকে চোখে পড়েছিল ঠিকই। মহেন্দ্র বুঝতে পারল, আসলে এই এক-চিলতে ঘরে দু'দুটি হুক কেন, সে বুঝে উঠতে পারে নি। কী কাজে লাগতে পারে, দ্বিতীয়টি? আলো-টালো সবই তো দেওয়ালে। কী ভেবে যে রাজমিস্ত্রিরা কংক্রিট ফাটিয়ে ঐ দ্বিতীয় হুকটা...সে যাই হোক, জীবনে দুর্বোধ্য জিনিসগুলির অস্তিত্ব নিয়ে মহেন্দ্র কোনওদিনই মাথা ঘামায় নি। বা, আঃ, সে আর পারে না ঘামাতে। কেন নেকলেশ, কেন টেপরেকর্ডার, কেন 'পাঁচশো গেল'—জীবনের এ-সব খুচখাচ বুঝে-ওঠা কি চাট্টিখানি কথা? তা-ছাড়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়ও বটে—পণ্ডশ্রম ছাড়া কী? সে তাই বেমালুম ভুলে যায়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় হুকটি।

এখন, ঐ, সিলিঙে দু'দুটি হুক দেখা দিয়েছে।

বাকি রইল দড়ি। তাদের দমদমের বাসায় ছিল পাতকুয়া। মহেন্দ্রর নতুন চাকরির সঙ্গে পাওয়া এই নতুন কোয়ার্টারে আসার সময় পূরবী দড়িটা আনতে ছাড়ে নি। 'দড়িটা কী হবে নিয়ে, ধ্যাৎ', বলে বাঁধাছাঁদায় নাকাল মহেন্দ্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দড়িটা, 'ও বাড়িতে তো পাম্প', বলে অনেক নিরস্ত করার চেষ্টা করে পূরবীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নিলই, কেন

যে, সত্যি; এ সেই জাতের আর-এক দুর্বোধ্য যা নিয়ে মহেন্দ্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না।

বেশ শক্তপোক্ত দড়িটা, একটা ভাঙা বেসিনের মধ্যে, ব্যবহৃত হবে বলে, তার এই তক্তপোশের নিচেই বেশ নীট্‌লি কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে—মহেন্দ্রর মনে পড়ে গেল। পূরবীর লাফালাফি ও সনির্বন্ধ অনুরোধে, তাদের দাম্পত্যের তেষট্টি আরসোলা হত্যা করতে গিয়ে এই সেদিনই দড়িটা চোখে পড়েছে। বিগত আট বছর ধরে ঋতু থেকে ঋতুতে ধুলো আর ছ্যাৎলা পড়ে পড়ে এমন চেহারা হয়েছে যে, প্রথমটা ফোঁস করে উঠবে ভেবে সে সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠিয়ে নিয়েছিল। লাঠি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে নিঃসন্দেহে হতে হয়।

হত্যাকাণ্ডের দিন, স্নায়ু-চাপে ফেটে, দড়িটা আবারও টান মেরে ফেলে দিতে যায় মহেন্দ্র। বাধাদানের ভঙ্গিমায় অজ্ঞাত প্রতিমার মতো দু-বাহু বাড়ায়ে পূরবী ফের রুখে দাঁড়ায়। সত্যি, পূরবীর অব্যর্থ দূরদৃষ্টি ছাড়া এ কী করে বোঝা যাবে যে একদিন, আট বছর পরে কোনও-একদিন, দড়িটা এমন অননুমেয়ভাবে কাজে লাগবে।

তা, একটা পিঁড়ে এনে বসিয়ে দিলে এখন একটা খেলাদেলির দোলনা হতে পারে বটে।

'বাথরুম থেকে পিঁড়িটা আনব বাপি?'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠে মহেন্দ্র ছেলেকে ছেড়ে দেয়। দিয়ে, ছেলের শরীরে সে আপাদমাথা চোখ বোলায়। থট-রীডিং জানে নাকি?

এই ছেলের নামে কত-কী যে বলে পূরবী। একটা কথা শুনে মাঝে তো মূক হয়ে গিয়েছিল মহেন্দ্র। সবে পাঁচে পড়ল, অ্যাঁ, বলে কী পূরবী, মা হয়ে?

পূরবীর বোন মলিনা টিচার। বিয়ের কথা চলছে। এবার পূজোয় বহরমপুরে মামার বাড়িতে গিয়ে ছেলেটা নাকি মাসির জামা-টামার মধ্যে একদিন হাত দেয়, তা দিক গে। বাচ্চা ছেলেরা এ-বয়সে অমন...কিন্তু তার শিশুসুলভ মুঠিতে এমন একটা বয়স্ক ব্যাপার নাকি ছিলই, অন্তত মলিনার মতে, যে, সে তাকে ওখানে আর কোলেই নেয় নি। 'হুঁঃ, যত্তসব রিপ্রেসড্ ওল্ড মেয়ড্-এর কারবার। এবারে ধরে-বেঁধে একখানা বিয়ে দিয়ে দাও দিকি মেয়েটার। বয়েস তো পেরিয়ে যাচ্ছে', বলে হাত নেড়ে মহেন্দ্র মাছি উড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকই, পূরবী কিন্তু ঐ বহরমপুর থেকে ফিরেই এ-ঘরে মহেন্দ্রর আলাদা বিছানা করে দিয়েছে। তার চহিদা বুঝে, বারান্দা দিয়ে, শহীদ হতে রাতে সে এ-ঘরে আসে বটে, প্রয়োজনমতো থেকেও যায় অনেকটা সময়। কিন্তু কোনও কোনও রাতে ঘুম ভেঙে গেলে জড়াবার জন্যে চেনা-শোনা নারী-পাশবালিশটি না পেয়ে মহেন্দ্রর অন্তত তখনকার মতো, কেমন ব্যর্থ ও পরাস্ত লাগে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, বদলি হিসেবে, নতুন তুলো ভরে পাশবালিশটি কি খারাপ দিয়েছে পূরবী? চিৎ হয়ে শুয়ে মহেন্দ্র ভাবে। সে কথা নয়। পাশ ফিরে সে বালিশটাকে কামময় আলিঙ্গন করে। তবু শূন্য মনে হয়। কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত একজন শ্রমদাস—ঠেলা-অলা একটি—সারারাত-নারী থেকে সেও বঞ্চিত নয়...একটি নিঃশ্বাস মোচন করে মহেন্দ্র ভাবে, এ-সবই ঐ রাস্কেল ছেলেটার বহরমপুর-অধ্যায়ের জন্যে।

পূরবী চলে গেলে, বারান্দায় বেঁটে-খাটো ইজিচেয়ারটিতে সিগারেট প্যাকেট নিয়ে মহেন্দ্র মাঝে মাঝে এসে বসে। তাদের কোয়ার্টারের পাশ থেকেই বস্তির শুরু। একেবারে এ-প্রান্তের ঘরটিতে গৌর থাকত। গৌর আর গৌরের বিধবা মা মেনকা থাকত। ঐ ঘরটির কাছে মহেন্দ্র নানা কারণে ঋণী। তার খুব ছোটবেলার সায়গল কি অতি-তরুণ পঙ্কজের 'এখনি উঠিবে চাঁদ', 'ও কেন গেল চলে' কি 'আমারে ভালোবেসে আমারি লাগিয়া' প্রমুখ উত্তর-কলকাতা-ভাবাবেগে-ভরা গানগুলি, মাতালের গলায়, যুগান্ত পেরিয়ে ঐ ঘর থেকেই তার কাছে আবারও ভেসে এসেছে। দেখতে এলেই, বিশেষত, দ্বিতীয়টি গেয়ে দিতে দিতেই তো বড়দির একদিন এক হিস্ট্রির প্রফেসরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

কাল শেষ রাতে মহেন্দ্রর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল বললে অবশ্য ঠিক বলা হবে না। বেশ ভুল বলা হয়ে যাবে। না, ঠিক ভেঙে যায় নি। কোথাও কোনও শব্দ হয় নি। স্বপ্ন-টপ্ন দ্যাখে নি। কাল রাতে, ফাল্গুনের রাতের আঁধারে, মহেন্দ্র হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল যে, সে আর ঘুমুচ্ছে না।

মহেন্দ্র বারান্দায় এসে বসল। ভোর হতে এখনো ঢের দেরি আছে। পশ্চিম দিগন্ত থেকে, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ ধরে, অসময়ে, দুই ঋতুর ফাঁক দিয়ে হু-হূ করে ভেসে আসছে জলভারাতুর মেঘের পরে মেঘ, ফ্যাক্টরির ওপর দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে যাবার সময় বারবার লাল হয়ে উঠছে। বারবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। জোলো হাওয়ায় ভরা আকাশে বারবার জেগে উঠছে অ-মানবিক নক্ষত্ররাজি ও ভূতে-পাওয়া একখানা চকচকে চাঁদ।

পূরবী ও-ঘরে চলে গেলে, এ-ভাবে বারান্দায় বসে, কোনও-কোনও রাতে মহেন্দ্রর নিজেকে ধুমপানরত একটি রবারের শূওর বলে মনে হয়, রোজই কী আর! সেই যে ব্যাঙ্ক থেকে বাচ্ছাদের আজকাল এক রকম খেলনা উপহার দেয় না, যাতে গুহ্যদ্বারের বদলে থাকে পয়সা ফেলার স্লট, কাল অবিকল সেই টয় শূওরটার মতন লাগছিল, যখন, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সিগারেটটি ধরিয়ে নেবার সময় পূরবী তার পাশে এসে বসে। এত সাবধানে চেয়ার টানল, তবু ঘুম ভেঙে গেল পূরবীর?

'আচ্ছা পূরবী', মেনকার বন্ধ জানালার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মহেন্দ্র বলেছিল, 'বাইরে বেরুলে এখানে কেউ কেমন-আছেন বলে না, জানতে চায়, কটার-শিফ্‌ট —তুমি লক্ষ্য করেছ?

মেনকার ঘর থেকে চোখ না সরিয়ে ও উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে মহেন্দ্র আরও বলেছিল, 'আচ্ছা পূরবী, এই যে তুমি আমাকে খুশি করে গেলে আর আমি তোমাকে, অ্যাঁ, এতেই কেমন বেশ কেটে গেল আমাদের—ভালোবাসার একদম দরকারই হল না, দেখলে!' সীরিয়াসলি শুরু করলেও শেষের দিকটা তাকে স্থানচ্যুত করল তার স্বাধীনতাপ্রিয় লঘু গলা, 'ভালো-টালো বোধহয় বুড়ো আর ইমপোটেন্টরা বাসে, কী বলো!' বলে সে, সাদরে পূরবীর কাঁধের ডানায় বাঁ-হাত রাখে। পূরবী ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

এখন আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু, ঐ, আবার মেঘ উড়ে আসছে। ফ্যাক্টরির ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আবারও লাল হয়ে উঠবে কি?

'আমিও বুঝি না', পূরবীর মেরুদাঁড়ার প্রারম্ভে হাত রেখে মহেন্দ্র বলেছিল, 'চলো, দুজনে মিলে আর-একবার বোঝার চেষ্টা করি।'

'বাপি পিঁড়িটা আনব?'

হ্যাঁ, অতি-স্নায়বিক একটা পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ছেলেটার আছেই।,মহেন্দ্র নিজেও কিছু-কিছু লক্ষ্য করেছে। আরও-ছোটবেলায় ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিয়েছিল সে একদিন, কিন্তু সে কি সত্যিই আছাড় মারবে বলে? ছিঃ, পূরবী তাকে ভাবেটা কী? পূরবী 'ও কী করছ' চোখে আঁতকে উঠেছিল। দু'বার শূনে দুলিয়েই মার কোলে ছেলে তুলে দিয়েছিল মহেন্দ্র।

তখন মোটে বছর-তিন। হয়েছিল কী, কারখানায় যাবার আগে চৌকাঠ ডিঙোবার অব্যর্থ মুহূর্তটাকে ছেলে একদিন গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল, 'বাবা?'

মহেন্দ্র রোজ দাড়ি ছুঁয়ে ছেলেকে চুমু খেয়ে ডিউটিতে যায়। আজ কি ভুলে গেছে? না তো।

এত আকস্মিক ও আমর্ম চমকে-দেওয়া ছিল তার ঐ চাপা পিছুডাক, বিশেষ করে সেই অটুট মুহূর্তে—যখন তার পায়ের ফাঁকে চৌকাঠ—এক ডাকে মহেন্দ্রর পৃথিবীকে দাঁড় করিয়ে

দিয়েছিল ছেলেটা—যে, সে বাইরের পা-টা তড়িৎগতিতে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল।

'কী?' যার-পর-নেই সংহত গলায় মহেন্দ্র জানতে চেয়েছিল।

'আপিস যাচ্চো?'

হাঁটু ভেঙে নিচু হওয়ার জন্যে মহেন্দ্রর টাই ছেলের কপাল ছুঁয়ে। বাইরে ফ্যাক্টরির গাড়ি হর্ন দিচ্ছে।

'হ্যাঁ। মহেন্দ্র প্রথম দিন গাল টিপে দিয়েছিল, 'কেন বাপি?'

'না-আ। তাই বোলচি।' বলে এমন একটা সর্বজ্ঞ, অবিশ্বাসী, আবিল অথচ মূলত লাজুক হাসি হেসেছিল সে, যে বাবা হয়েও গা রি-রি করে উঠেছিল তার। পরের দিন আবার হুবহু, সেই এক প্রশ্ন এবং সেই অব্যর্থ মুহূর্তে। 'এ কী রে বাবা, এ যে যমের প্রতি নচিকেতা দেখছি' অপ্রস্তুতভাবে হেসে সে পূরবীকে বলেছিল।

তৃতীয় দিন হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল মহেন্দ্র, কেন?'

'নাআ। তাই বলচি।' বলে আবার সেই অবিশ্বাসীর, সর্বজ্ঞের, মূলত লাজুক অথচ আবিল হাসি যা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্যভাবে এক হাসিতে হাস্যকর করে তুলেছে টাইপিনসহ আমোজামাথা মহেন্দ্রর গোটা অস্তিত্ব। আর সব পারে, দুর্বোধ্যতা মহেন্দ্র আর সহ্য করতে পারে না। স্নায়ু-চাপে কেঁপে উঠে এক ছোঁ-তে সে তাকে শূন্যে তুলে নিয়েছিল। হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও নি। আর কখনো ও-রকম বলে নি।

'পিঁড়িটা আনব বাপি?'

বেশ সম্ভ্রান্ত দূরে এখন ছেলেটা। যাঃ, মা হয়ে কী যে সব বলে পূরবী। মর্মরের স্বচ্ছ শিশুদেবতার মতো, দ্যাখো, কী অপলক বড় বড় চোখে তাকিয়ে।

কী যেন মনে পড়বে বলে খোলা জানালা দিয়ে মহেন্দ্র একবার বাইরে তাকায়।

'যাও।' সে বলে।

রাস্তার দিকের জানালা এখন বন্ধ। নব-উন্মোচিত দ্বিতীয় হুক থেকে এখন একটা দড়ি ঝুলছে। দড়ির প্রান্তদেশে ঝুলছে একটা লম্বাটে শূন্য। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শূন্যটিতে ঈষৎ দোলা আছে। পাখা নেই। বাইরে গুমোট। তবু এই ঘরে নামমাত্র হাওয়া রয়েছে।

নিচু চা-টেবিলের ওপর একটা বড়সড় টুল বসিয়ে, তার ওপর দাঁড়িয়ে, দোলনার কারণে দড়ি গলাবার জন্যে পাখার হুকটির তুলনায় নব-উন্মোচিত দ্বিতীয়টি নির্বাচন করছে দেখেই, জীবনে এই প্রথম, মাথা না ঘামিয়ে, অন্তত একটি দুর্বোধ্যর অন্তস্তল পর্যন্ত মহেন্দ্র দেখতে পায়। 'এত স্বচ্ছ?' ফিসফিস করে কে যেন বলেই গেল তাকে। ও, তাই নাকি, তাহলে এই ব্যাপার! আসন্ন আবিষ্কারের আগে বৈজ্ঞানিকের তৃপ্ত হাসি জেগে ওঠে মহেন্দ্রর ঠোঁটে! আজ থেকে আট বছর আগে কে-এক মানবহিতৈষী কংক্রিট ফাটিয়ে দ্বিতীয় হুকটি বসিয়ে গিয়েছিল, সে তবে এইজন্যে? আট বছর পরে একদিন, কোনও একদিন, কোনও এক মানুষের প্রয়োজন হতে পারে বলে? মুসলমান রাজমিস্ত্রির ছদ্মবেশে সাদা নূর-অলা শ্বেতির দাগে ভর্তি রোগা বিধাতার বৃদ্ধ প্রতিবিম্ব মহেন্দ্রর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অননুমেয়কে সে অন্তত একবার দেখতে পায়!

হুকে-গলানো দড়িটা দুহাতে ধরে, টুল ছেড়ে, সে একবার ঝুলে দ্যাখে। পাকে পাকে এত শক্ত থেকে গেছে, আজও, এত আবহাওয়া-প্রহারের পরেও! 'এত আবহাওয়া-প্রহার' শব্দ দুটি অস্ফুট উচ্চারণ করে সে বলতই, বিস্ময়ে তার গলা দিয়ে স্বর বেরয় না। ঈষৎ নাগালের বাইরে হুকটার দিকে উঁচু করে তুলে ধরতেই মন্ত্রপূত খাড়া হয়ে এক চান্সে কেমন সুড়সুড় করে

গলে গেল দড়িটা? ক্রূর, পাতলা হাসির হেমারেজে ভরে যায় মহেন্দ্রর মাথা। ঠোঁটে এসে পড়ে। সে বারবার হাসি চেটে তোলে ঠোঁট থেকে ও দড়ির লোমবহুল জেজে হাত বুলোয়। দড়ি আনার জন্যে তাই এত জেদাজেদি পূরবীর, উঁ? সে বলতে চায়। এক ফোয়াল নোনতা হাসির জন্যে পারে না। অতি শান্ত মনে সে একটি ফাঁস তৈরি করছে, মহেন্দ্র দ্যাখে।

টেবিলের ওপর টুল, টুলের ওপর মহেন্দ্র। এখন তার মুখোমুখি সামনে জীবনের সরলতম দুর্বোধ্য। সো ফার সো গুড। এবার?

এবার হাসি-হাসি ফাঁসিটি গলায় পরে ফেলা! আস্তিন গুটিয়ে ডান-হাত ভাঁজ করে মাস্‌ল ফুলিয়ে মহেন্দ্র দ্যাখে। দেখে সে চমৎকৃত হয়। হাফ-স্লিভ শার্ট পরা থাকলে—বিশেষত বাঁ-হাতে বাসের হ্যান্ডেল ধরে যখন—তার বাম বাহুর এই সেই যৎকিঞ্চিৎ বাইসেপ যার সুডৌল অপরাজেয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সবার অলক্ষ্যে, সেখানে সে বারংবার মৃদু-চুম্বন রেখেছে যতবার, ততবার বুঝেছে এত মীনিংফুলি চুম্বন একে ছাড়া আর কিছুকে, কারুকে করা যায় না। যায় না। যায় না।

'আওর কুছ্?' দুব্‌লা প্রতিপক্ষকে, মাস্‌ল ফুলিয়ে, সে স্মিতচক্ষু চ্যালেঞ্জ জানায়।

ও, হ্যাঁ, এরপর টুলটা আলতো করে ঠেলে দেওয়া। বাঁ পা দিয়ে?

তারপর নামমাত্র হাওয়ায়, দোলা।

গৌরের মা দিয়েছিল ঠেলে। না দেবে কেন? হাঃ, এর চেয়ে অপরিশ্রমসাধ্য কাজ আর কী, তা ভেবে মহেন্দ্রর মতো কুঁড়েও কূল পায় না। বেলা পেরিয়ে, অতি অবেলায় এসে রক্তচক্ষু গৌর ভাত চাইল। ভাত হয় নি দেখে, 'হারামজাদি রেন্‌ডি' বলে মার গালে মারল এক থাপ্পড়। গৌরের মাথা খারাপ। আধ ঘণ্টা পরে পিছনের জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ। তারপর 'ওগো মা, এ তুমি কী করলে' বলে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে।, জানালায় ঠুকে ঠুকে সে তার পাগল মাথা ফাটাল।

'আচ্ছা, ঝুলে পড়েই দড়িটা দুহাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরলে তো ফাঁসের চাপ কমে? ধরে না কেন বলুন তো?' জানতে চেয়েছিল মহেন্দ্র। 'উহুঁ! সেটি হবার নয়,' সে এখন জানে। 'ফাঁসটা একবার বসলেই হাত দুটো আর তোলা যায় না।' হোমিসাইড-অফিসার তাকে বলেছিলেন, 'হাতের ফাংশান নষ্ট করে দেয় সবার আগে।' দরজা ভেঙে পুলিসের সঙ্গে সে ঘরে ঢুকেছিল। লোকে কত কী দ্যাখে—কালীর মতো লকলকে জিভ, ফেটে-পড়া চোখ, রাজহাঁসের মতো গলা। মহেন্দ্রর প্রথমেই চোখে পড়েছিল বিধবার পায়ের পাতা দুটো। পেটো দড়িতে গোঁজা মাঙ্গলিক আমপাতার মতো লম্বা হয়ে ঘুরে ঘুরে দুলছে। মাটি ছোঁবার অমানবিক জন্তু-কামনার পায়ের অ্যাঙ্কল অনেক সময় ভেঙে যায়, পুলিস অফিসার তাকে জানান।

মহেন্দ্র ফাঁসটির গায়ে গোলাকারে হাত বুলোয়। এই সেই গোল। একটিও বেশি নিঃশ্বাস না ফেলে মহেন্দ্র ভাবে, যা থেকে তার মৃত্যু নির্গত হলে হবে। ফাঁসটির গিঁট থেকে গিঁট পর্যন্ত সে গোলাকারে ঠোঁট বুলোয়। চুমু খাবার সময় পূরবীর অনুকরণে সে এক জায়গায় আলতো দাঁত বসিয়ে দেয়। জিভ দিয়ে চেটে দেখতে গিয়ে, ধুলো আর ছ্যাৎলার জন্যে, টোকো লালায় তার মুখ ভরে ওঠে। সে ফাঁসটা গালে চেপে রাখে।

পিচ কেটে থুতু ফেলে, মহেন্দ্র হাসি-হাসি ফাঁসিটি পরে ফ্যালে।

'বাবা গলায় দড়ি দিচ্‌চো?'

মহেন্দ্র নিচে তাকায়।

জল-খাওয়া আমকাঠের পিঁড়ের ভারে ছেলেটার হাত দুটো ঝুলে পড়েছে, কী ভয়াবহ চওড়া দেখাচ্ছে ওর বক্ষপট, তার মুখ উঁচু। একটি প্রগাঢ় বামনাবতার যেন! মর্মরের মতো

স্বচ্ছ কৌতূহলভরে সে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। দড়ি থেকে এতক্ষণ যা ঝুলছিল এবং এখন যা মহেন্দ্রর গলায়, আর যাই হোক, সেটা যে তার দোলনা নয়, ছেলেটা বেশ বুঝতে পেরেছে। ভাত ছিল না বলে গৌর মার গালে চড় মেরেছিল। দোলনার জন্যে...জড়বুদ্ধি গৌর যা পেরেছিল, ছেলেটা তা পারবে না কেন।

'বাবা?'

অর্থাৎ, হ্যাঁ, না, না?

না, না, হ্যাঁ?

মহেন্দ্র, বাঁ পা দিয়ে টুলটা ঠেলে দেবে, না, দেবে-না?

মহেন্দ্র দেখল যে, সকালবেলা ছেলের 'বাবা, আপসি যাচ্চো?'-র উত্তরে যেমন, সে এখন 'হ্যাঁ' বলতে পারছে না। আপিস যায় বৈকি মহেন্দ্র, যায় না? মর্নিং শিফ্‌টের গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সাতসকালে ভোঁক-পোঁক করে হর্ন দেয় না? শুধুমাত্র একটি পুরুষাঙ্গ থাকার অপরাধে, এক চাবুকে বিছানা থেকে লাফিয়ে—কোনওদিন চোখে পিঁচুটি—টলতে টলতে সে গাড়িতে ওঠে না? দশ-দশটা মেশিনের কাজের তদারকির জন্যে প্যান্ট নামিয়ে মাসের শেষে দাঁড়ালে, আপিস তার পোঁদে স্বহস্তে গুচ্ছের টাকা গুঁজে দেয় না? মহেন্দ্র, হ্যাঁ, আপিসে যায়।

গৌরের মা দিয়েছিল ঠেলে। সে দিতে পারে! তার কল্পনাশক্তি ছিল না। মহেন্দ্রর আছে। কে বলে দুর্বোধ্য মহেন্দ্র মোটে বোঝে না। অন্ধ, খঞ্জ, নুলো ও বধির, উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি—প্রেমে কি অপ্রেমে—এমন কি, ঝাড়াঝাপ্টা জনৈক নিছক মলমূত্রত্যাগী হয়ে বেঁচে-থাকার তুলনায় তাকে শেষ করে দেবার ভয়াবহতা বোঝার ক্ষমতা অতি পরাধীনভাবে তার আছে। 'হ্যাঁ' অমনি বললেই হল?

তার গলায় ফাঁসি, টুলের ওপর এ-রকম উজবুক দাঁড়িয়ে অথচ 'না' বলতেও পারছে না দেখে মহেন্দ্র প্রথমটা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে। গৌরের মা মেনকা যা একাই পেরেছিল, সেই চরম-অপরিশ্রমসাধ্য অবলীলতম কাজটি তবে কি মানুষের সাহায্য ব্যতীত করার ক্ষমতা তার নেই? বোধহয়ত পেটের কাছ থেকে উঠেই একখণ্ড পাথর তার শ্বাসনালীতে প্রবেশ করল, সে এখন ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তার মুখের অনির্ভরযোগ্য হাসি আগেই মিলিয়ে গেছে, সে দেখতে পায়।

জ্যা-মুক্তির আগে তীরের মতো, এক পা এগিয়ে, ভারি পিঁড়ে হাতে, ছেলেটা কি ভয়াবহ আক্রমনোদ্যত ভঙ্গিতে টুলের দিকে তাকিয়ে।

ধাক্কা দেবে নাকি?

যুগপৎ ভয় ও প্রত্যাশায় তার, মহেন্দ্রর, উরুদ্বয় কেঁপে ওঠে।

তার আজন্ম দ্বিধাগ্রস্ততাকে বাঁ-পায়ের এক লাথিতে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ একটি গলায় দড়ি-বাঁধা স্বাধীন সিদ্ধান্তকে শূন্যে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে দেখল মহেন্দ্র।

শরীরে সমস্ত শক্তি ডান হাতে কেন্দ্রীভূত করে মহেন্দ্র দড়িটা ধরে রাখে। তার বাঁ-হাতে পোলিও? অসাড় বাঁ-হাত দিয়ে ধীরে, অতি সতর্কভাবে সে গলা থেকে ফাঁসটি খুলে ফ্যালে।

তারপর যেন দশতলা থেকে, সরাসরি মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে সে। শ্বাসরোধকারী প্রস্তরখণ্ডটি ছিটকে বেরিয়ে গেছে। হু-হু করে নাকে-মুখে নিঃশ্বাস মোচন করতে করতে সে ছেলের সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়ায়।

'কেন?' সে হুঙ্কার দিয়ে জানতে চায়।

'নাঅ। তাই বলচি।'

সর্বজ্ঞের, অবিশ্বাসীর, লাজুক ও মূলত বিদ্রূপে আবিল হাসিতে ছেলের মুখ ভরে ওঠে।

পাঁচ বছরে এই প্রথম মহেন্দ্র ছেলেটার গালে সপাটে একটা চড় মারে। ডান দিকে টলে

পড়ে যেতে যেতে ছেলেটা বাঁ-দিকে উঠে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে পিছন ফিরে মহেন্দ্র দ্যাখে, দরজার আলোকিত ফ্রেমে 'ও কী করলে' চোখে পূরবী দাঁড়িয়ে।

*কৃত্তিবাস, ১৯৭৮*

## মাঝখানের দরজা

রোজকার মতো হল না, বাথরুম সেরে আলোটালো নিবিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে অনুভা আজ প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিল। মেয়ে শুয়ে পড়েছে ঢের আগে, তার মর্নিং স্কুল, এতক্ষণে নিশ্চিত কাদা। তবু ভালো যে হুড়কো লাগিয়ে ছিটকিনি তোলা ও বেডসুইচ অফ করার মধ্যে অনুভা আজ বেশি সময় নেয় নি। গত মাসদুয়েক ধরে রোজ যেমন, সারারাতের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল ঐ ঘর। মাঝখানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ থাকবে সারারাত।

খুব পীড়াপীড়ি না করলে, অনুভা আজকাল আর এ-ঘরে আসে না। ঝাড়া পাঁচটি বছর কাঠখড় পুড়িয়ে উত্তর-কলকাতা-ভাবাবেগে-ভরা যে বিধুর সহপাঠিনীকে বিয়ে করেছিল ধ্রুব, কে জানত, মেয়ের বয়স বছর-চোদ্দ হবার আগেই সারারাত-নারী থেকে সে তাকে এমন নিঃশেষে বঞ্চিত করবে। দীননাথও তো চিনত অনুভাকে, বলতে গেলে তারই বান্ধবী, বিয়ের বেলা শাহ্‌লা দত্ত-হারামজাদা কেমন ক্লিন বারো বছরের মার্জিন রাখল। পড়তি-কুড়িতে বীথি এখন যা, বিয়ের সময় অনুভা তার চেয়ে বড় বই কিছু ছোট ছিল না।

অনুভা এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাবল-মার্চ করে ঘুমের বাড়ি যাবে। ঘুমের বাড়ি না যমের বাড়ি? সে যাই হোক, ততক্ষণ এ-ঘরে একটি চেয়ার টানাটানিও বারণ। হাঁচি পেলে, ধ্রুব আস্তে হাঁচবে। মুনের না মর্নিং স্কুল? অনুভাকে উঠতে হবে না তার সঙ্গে? হ্যাপা কে পোয়াবে, ধ্রুব না অনুভা?

এখন সারা ফ্ল্যাট অন্ধকার। শুধু ঝলমল করছে ধ্রুবর মাথা। আর বিলম্বের প্রয়োজন কী। মশারি তুলে ধ্রুব বিছানা থেকে বেরয়। ধ্রুবদের ফ্রিজটি নতুন না, বেশ শব্দ হয়। দুই ঘরে পাখা চলছে ফুলফোর্সে, একটা সাইসাঁই শব্দ আছে তাদেরও। পদশব্দ যদি কিছু হয়, ঢাকার পক্ষে এটা যথেষ্ট। অবশ্য ঝোপ থেকে বেরনো চিতার সঙ্গে তার এখন বিশেষ তফাৎ নেই। নোখটোক যা কিছু, সবই থাবার মধ্যে।

কিছু আগে অনুভাকে শুনিয়ে ধ্রুব যে ছিটকিনি লাগিয়েছিল, তা ছিল শব্দমাত্র, আসলে লাগায় নি। ভেজানো দরজা সাবধানে খুললে শব্দ হবার কথা না, হলও না। চৌকাঠ ডিঙিয়ে করিডোরের বাঁ-দিকে ডাইনিং স্পেশের সামনে গিয়ে ধ্রুব দাঁড়ায়। টেবিলের পাশে যার-পর-নেই নোংরা, যত্রতত্র গিঁট-বাঁধা, তেলচিটে, টাঙানো মশারি একটি। মশারির বোঁটকা গন্ধে নাকের পাটা কুঁচকে দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে, যে-ভাবে সারা শরীর সে স্ট্রেচ করে নেয় তাতে কটি চিতার জীবনসর্বস্ব ছিলই, বস্তুত, তা ছিল চিতাসুলভ। যেন, খরগোশের বিধিলিপির জন্যে সে এক ঝোপের সামনে স্বাধীকারপ্রমত্ত দাঁড়িয়ে। তার পরনে পপলিনের আন্ডারউয়্যার, উরু অবধি উলঙ্গ পা-দুটি ঘন লোমে ঢাকা।

বাইরে গুমোট। মশারিতে কিছু জ্যোৎস্না এসে লেগেছে বটে, কিন্তু চিটপিটে ময়লা এত পুরু যে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নি। উবু হয়ে বসে, মশারি তুলে, ধ্রুব তার দক্ষিণ থাবা মশারির মধ্যে পাঠায়। ফ্রক সরিয়ে বছর-ষোলোর দুটি স্তন সে পায়, যার মধ্যে একটি ধরে সে মৃদু আকর্ষণ করে। ডাকে, আয়। থাবার সর্বস্ব তাকে ডাকে। ডেকেই সে কিছু এ-ঘরে চলে আসে না। সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধ্রুব যাকে ডাকে, ষোলো বছরের সেই মেয়েটির নাম সিন্ধু। এবার সে বেরয়। ভারি পরিপাটি করে মেঝেয়-লগ্ন বিছানায় সে ফের মশারি গোঁজে। অনুভা যখন থাকে না, এ-সব ধ্রুব তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে। এর মধ্যে একদিন, কোনও-একদিনও কি ঘর খুলে বেরিয়ে পড়ে নি অনুভা? তা নয়। একদিন পড়েছিল। শেষরাতে বাথরুম যাবার ভারি অসচরাচর প্রয়োজন হয়েছিল মেয়ের , দেখতে-শুনতে তা মুনও চোদ্দয় পড়েছে। বছর-দুই আগেও কত ছোট ছিল যখন ভোরের বাথরুম থেকে এসে, মা নয়, বাবাকে নাড়া দিয়ে বলেছিল (হেসে), 'বাপি, আমার হিসির সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে!' বজ্রাঘাত হোক ধ্রুবর মাথায় যদি এ-কথা সত্যি না হয়। মাত্র দু-বছরে ছোটবেলাটা কোথা দিয়ে যে নষ্ট করে ফেলল মেয়েটা, ভালো করে একবারটি আদর করে নেবার আগেই।

সেই মেয়ে ও মা একসঙ্গে বেরুল, শেষরাতে, যখন সিন্ধু এ-ঘরে ধ্রুবর বুকে লীন, ওঃ ভাবা যায়! অনুভা অবশ্য একদম ধরতেই পারে নি যে ঝোপ তখন ফাঁকা। ধরবে কী করে, এ-সব মহালয়া-মহালয়ায় কাচা মশারির ময়লা এত পুরু আর এমন চিটপিটে যে দিনমানেই বোঝা যায় না ভিতরে কেউ আছে না নেই, তো রাতে। আর, ছেঁড়া কাঁথাকুতির বিছানার সঙ্গে কি পরিপাটি করে গোঁজা মশারিটি! একটিও বেশি হৃৎস্পন্দন হতে না দিয়ে, ধ্রুব শুধু অপেক্ষা করেছিল। হার্ট তো নয় ধ্রুবর, দেওয়ালি ঘড়ি যেন। গুনে ষাটটি দুলুনি পেণ্ডুলামের ষাটটি টিক-টিক, তবে এক মিনিট। পাক্কা ষাট মিনিট, তবে ঢঙ।

বাথরুম বন্ধ হল। অনুভার ঘরে হুড়কো উঠল। ছিটকিনি উঠল। আলো নিবল। তবে টানটান হাত থেকে লাগেজ নামিয়ে রাখল ধ্রুব। অর্থাৎ, বুক থেকে সিন্ধু।

প্রায় মাস তিনেক হতে চলল কাজে লেগেছে মেয়েটি। মাসদুই ধরে এই আসা-যাওয়া চলছে, মাঝে মাঝে। মোট কবারই বা। তবে এত চটজলদি, অনুভা সুইচ অফ করতে না-করতে, এমনটা এই প্রথম। এর আগে মধ্যরাতে বা যখন রাতশেষ, ঘুম ভেঙে গেলে তবেই টেনে এনেছে ধ্রুব। আ-খাওয়া মড়ি যেন বাঘের, কাছে যেতেই হয়েছে, টেনে আনতেই হয়েছে। কিন্তু না, ঘুমের ওপর সে আর বিশ্বাস রাখে না। নতুবা, দেখতে দেখতে একটা হপ্তা কাবার হয়ে গেল, একদিনও কি ঘুম ভেঙে যেতে নেই? কই, ভাঙে নি তো। অগত্যা, বাধ্য হয়ে, তাকে আজ এই চরম ব্যবস্থা নিতে হল।

আজ ধ্রুবর হাত ধরে এ-ঘরে পা-টিপে ঢুকে, মশারি তুলে, সিন্ধু সোজা বিছানায় উঠে যায়। সিঙ্গল বেড, তবে ধ্রুবর কিছু অসুবিধা হয় না। রোগা মেয়েটা কতটুকু বা জায়গা নেয়, আর, আসলে কটা মুহূর্ত বা সে পাশে থাকে। হয় সে থাকে ধ্রুবর বুকে, না-হয়তো ধ্রুব তার। এবং কাজ ফুরনো মাত্র যাঁহাকা মাটি তাঁহা পাঠিয়ে দেয় ধ্রুব। ডাইনিং স্পেশে গিয়ে সিন্ধু পূর্ববৎ শুয়ে পড়ে। আসল কথা, সঙ্কট মুহূর্ত তো একটাই হয় আর সেই অদ্বিতীয় মুহূর্ত-ব্যত্যয়ে এক-জীবনের ভুলচুক হয়ে যায়। ধ্রুব তাই, বরং তিলার্ধ আগেই, পাঠিয়ে দেয়।

সিন্ধু ধ্রুবর বিছানায় ঢুকে গেলে ধ্রুবর কাজ তবু কিছু বাকি থাকে। কনট্রাসেপটিভ সে আগে থেকে ছিঁড়ে খুলে রাখে। বাচ্চা মেয়ে, জেলি লাগে সামান্য, নিরোধক হিসেবেও এটা অধিকন্তু, সে মায় টিউবের কর্কটিও আগেভাগে খুলে রাখে।

বাকি থাকে শুধু ছিটকিনি তোলা। ধ্রুব এতক্ষণে সত্যি সত্যি ছিটকিনি তোলে। ভূমিকম্প না-হওয়া সত্ত্বেও যদি বেরয় অনুভা, সেদিন যেমন, ডাইনিং স্পেশের পাশে পরিপাটিভাবে গোঁজা মশারি ও ধ্রুবর বন্ধ দরজায় সে একবার করে, অকারণে, চোখ বোলাবেই। আঙুল দিয়ে ঠেলে পরখ করেও নিতে পারে, অসম্ভব কি। ধ্রুব তাই ছিটিকিনি দেয়। এবং হ্যাঁ, একটিও কিঁচ শব্দ না করে। যখন অনুভা থাকে না, বা বেরয়, সেইসব সময়ে বহু অনুশলীন করে সে এটা আয়ত্ব করেছে। এই অসাধ্য সাধন, একটিও টু-শব্দ হতে না-দিয়ে ডাঁটি-ধরে এই

ছিটকিনি-তোলা। রাতে অনুভা এ-ঘরে একদম আসে না সে প্রায় মাস ছয়েক হতে চলল।

খুব ফিসফিস করে এখন মশারির মধ্যে কথা বলা চলে। কিন্তু তার প্রয়োজন কী।

মোট কবারই বা, কিন্তু সেই প্রথমবার থেকে আজও, বারেকের জন্যও, প্রয়োজন হয় নি। উঠে যাবার আগে সিন্ধু তোশকের নিচে হাঁটকে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটি দশ টাকার নোটের পেটে অতিরিক্ত টাকাটি আছে কিনা বুঝে নেয়। নিয়ে, নিজের জায়গায় চলে যায়। সাধনালব্ধ কুশলতায় ধ্রুব দেয় ছিটকিনি তুলে। হেয়ারক্লিপ কি একটা সেফটিপিন যে পড়ে থাকবে, সেটি হবার যো নেই। সব, মায় ইজেরটি পর্যন্ত, খুলে আসে সিন্ধু। এ-জন্যে, যখন মুন যায় স্কুলে এবং অনুভা বেরয় এবং ধ্রুব বাড়িতে—ক্বচিৎ হলেও এমনটা হতেই হয়—বেশ কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়েছে ধ্রুবকে। এই সব ক্লাসে, বাংলা অনার্সের মেয়েগুলোকে 'সো মোহ কান্তা দূর দিগন্তা' বোঝানোর তুলনায়, প্রফেসরদের চেয়ে, ঢের বেশি বেগ পেয়েছে সে। তবু সিন্ধুর বিবর্ণ মাথার চুল একটা যদি কোনওদিন আটকে থাকে বালিশে, বলা কি যায়, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। সকালবেলা বেশ দেখেশুনে বিছানা ঝাড়ার সুশিক্ষা ধ্রুব তাকে দিয়ে রেখেছে।

প্রথম কবার দশ পায়। মাসের হিসেবে অঙ্কটি খুব-একটা বেশি দাঁড়ালো কই। কটা বা টাকা পেল সিন্ধু, যা নিশ্ছিদ্র ঘুম ধ্রুবর। প্রথম মাসেই তো দিল একটা গোটা হপ্তা কাবার করে। একদিনও তো জাগতে পারল না! সে-মাসের শেষ-সপ্তাহে ছিটকিনি তুলে ধ্রুব বিছানায় ঢুকতেই, সিন্ধু তাই, ঘোর কটাক্ষ করে, দু'হাত তুলে, বোবাদের মতো ঈষৎ ঝঙ্কার লাগিয়ে হাতে, ধ্রুবর মুখের সামনে দু'হাতের পাঞ্জা দু'বার মেলে ধরেছিল। জানালা দিয়ে সেদিনও কিছু জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। নীল নাইলনের ঝাঁ-চকচকে যা স্বচ্ছ মশারি ধ্রুবর, সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। দশ-প্লাস-পাঁচ সেই থেকে পনেরো চলছে।

অনুভা এ-ঘরে আসে না, সে প্রায় মাস ছয়েক হতে চলল।

গত বছর সেটা এপ্রিল না মে মনে নেই, দার্জিলিঙ-এ তারা তখন, অনুভা তাকে বাথরুমে ডেকে নিয়ে যায় ও পায়খানার দরজা খুলে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনে যে-কটি কাজ দেখে ধ্রুবর বোবা মন মুখর হয়ে উঠেছে প্রশংসায়, তার মধ্যে একটি হল দার্জিলিঙে থাকতে তাদের জমাদারনি ফুলমনি ছেত্রীর ধোয়া প্যানের অকলঙ্ক সাদা : সেদিন তার ওপর পড়ে আছে পোয়াটাক, কমসে-কম তিনছটাক তো হবেই, ঘোরবর্ণে রক্তের একটি ডেলা। লাল যেন কালো হয়ে যাচ্ছে এমন...ধ্রুব খুব-একটা অনুমানী লোক নয়, তবে অনুভার তখনও পীরিয়ড চলছে—সে দেখেই বুঝেছিল, এ-জিনিস মুখ থেকে আসে নি।

সুস্থ পীরিয়ডে ঠিক কতটা রক্ত পড়ে ধ্রুবর জানার কথা নয়। স্ত্রীর পীরিয়ডের হিসেব রাখা সে অন্য ব্যাপার, দীননাথ রাখে। তবু, তুহিন সাদার ওপর ঐ লাল রিরংসা—প্রতীক সৌন্দর্য যেন—সে দেখেই বুঝেছিল, এটা ঠিক স্বাভাবিক না, বা, এমনকি কিছুটা ভয়ের। সে ভয়ে ভয়ে অনুভার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। 'দ্যাখ্ হতভাগা, আমার কী অবস্থা করেছিস', শান্ত, কঠিন গলায় কেটে কেটে বলেছিল অনুভা।

কলকাতায় ফিরে প্রথমে ডি, সি করানো হল। কাজ হল না। জুলাই-এর শেষাশেষি সেই অপারেশন করাতে হল। 'ইউটেরাস রিমুভ্ড্ হল তো কী, এ', দীননাথ বলেছিল, 'ও কিছু না। আমার ছোট শালীর তো, এ, ঐ এক ব্যাপার। বাচ্চা মেয়ে! ভায়রার তো,' দীননাথ আশ্বাস দিয়েছিল, 'এ, ফকিং-টকিং দিব্বি চলছে।'

যদিও কার্যত দেখা গেল, একটি গভীর প্রশ্বাস নিয়ে তা মোচন করে আজ ভাবে ধ্রুব, তা না। দীননাথের কথা বিশ্বাস করে ধ্রুব ঠিক করে নি; ভুলই করেছিল। দীনুর বাঁজা বৌটা তো পাছাটি লেজ হিসেবে নাড়াচাড়া করেই দশ বছর দিব্বি কাটিয়ে দিল অ্যাকোরিয়ামে, যে

ডাকল তার সঙ্গে শুয়ে এল, এক স্বামী ছাড়া। শালা গাড়ু, বৌ-যন্ত্রের তুমি কী বুঝবে?

অনুভা আর ঠিক সেরে উঠতে পারল কই। সেপ্টেম্বরে মনে হল বুঝি সেরেছে, একদিন ট্রায়াল দিতে এ-ঘরে এল। নাঃ, উঃ, অসম্ভব। অক্টোবর...নভেম্বর... গত বছরটা মাঝে-মাঝেই চেষ্টা চলল। ডিসেম্বরের শেষাশেষি ও-ঘরে হুড়কো লাগাল অনুভা। জানুয়ারিতে ছিটকিনি। বছব ঘুরতে চলল। অনশনে এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কোনও রেকর্ড নেই, কোনও জন্তুর, মানুষ বলে এতদিন বেঁচে ছিল ধ্রুব।

মার্চে, বাগবাজারে অনুভার বাপের বাড়ির পাড়া থেকে এসে সিন্ধু কাজে লাগল। সপ্তাহ না ফুরোতেই একদিন শেষরাতে ধ্রুবর ঘুম ভেঙে গেল। সেই থেকে শুরু হল আসা-যাওয়া।

মোট কবারই বা, তবু দু-আড়াই মাসে যার আদৌ দরকার হয় নি, আজ তার প্রয়োজন হল। একটা খালি ট্রাম লটর-পটর করে ফিরে যাচ্ছে গুমটিতে। সেই ফাঁকা আওয়াজের সুযোগ নিয়ে এই প্রথম ফিসফিসিয়ে কথা বলল সিন্ধু।

'মা ডাক্তারের কাছ নিয়ে গিয়েছিল,' সে বলল।

ধ্রুব কিছু কথা বলছিল না, বলেও নি কোনওদিন : সিন্ধুর সঙ্গে কাজের কথা যা কবেই শেষ হয়ে গেছে। তবু, সিন্ধু যা বলল, শুনে সে টের পেল, এতদিন সে সিন্ধুর সঙ্গে কত কথা না বলেছে এবং আজই এই প্রথম চুপ করে আছে। সিন্ধুর পাতলা, পরিণতিকামী কোমরের খাঁজে আটকে আছে তার হাত, উঠে এতক্ষণে তার অন্যত্র যাবার কথা, সে ভুলে গেছে তুলে নিতে।

ডাক্তার! মা? কিন্তু কেন? পেট-খারাপের জন্যে নয় তা বুঝেছে, তবে কেন? সে চুপ করে রইল।

প্রেগন্যান্ট হবার বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ চান্স তো নেই। যখন অনুভা বেরয় বা থাকে না আর মনু-ও স্কুলে, আমি কি তোকে বোঝাই নি কেন কনডোম, কেন জেলি আর কী করলে বাচ্ছা হয়, আর কী না-করলে বাচ্ছা হয় না? শরীর ককিয়ে উঠে বলেছে 'ঢাল, ঢাল—' কিন্তু কোনওদিন কি তা হতে দিয়েছি? মাই-মাই, দ্যাট্‌স নো কাপ অফ মাইন, লেডি! সরি।

এই তো, আবার ভাষা খুঁজে পেয়েছে সে, আর ঐ তো, একটা ট্রাক না এলেও নিদেনপক্ষে একটা গ্যারাজগামী বাস আসছে। আসুক, কাছাকাছি এলেই শুরু করে দেবে ধ্রুব এবং বাস বেরিয়ে যাবার আগেই যা বলার বলে দেবে ভেবে, সিন্ধুর কানে মুখ রেখে তবু, অভিপ্রেত লোডেড ট্রাকটি গাঁ-গাঁ শব্দে বাড়ির সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে, 'সে কী!'—এর বেশি কিছু সে বলতে পারল না। এবার 'কেন, কী হয়েছিল', জানতে চাইবে বলে সে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। নাঃ, কিছু এলো না। না-ট্রাম, না-বাস, না-ট্রাক, নিদেন একটা ট্যাক্সি—না-কিছু।

এখন বাড়ির বাইরে জ্যোৎস্না। ঘরে ঘোর অন্ধকার। সে তাই তার মুখ থেকে রক্তাভা অন্তর্হিত হতে দিল। সিন্ধুর অভিব্যক্তি দেখা যায় না।

হাতের ভাষায় সিন্ধুকে উঠে বসতে বলে ধ্রুব ছিটকিনি খুলে দাঁড়ায়। একটু কিঁচ-শব্দ হল কি? 'এ নিয়ে পরে কথা বলব', বাস বা ট্রাক কি ট্রাম কোনওকিছুর পরোয়া না করে বিবর্ণ ফাঁসা গলায় সে সিন্ধুকে জানাল। ছিটকিনি দিতে ভুলে গেল আজ। সিন্ধু টাকা নিয়েছে কি নেয় নি, এটা জানার আজ খুবই প্রয়োজন ছিল। তার মনে এল না।

সে জানালায় দাঁড়াল। বৃষ্টি শুরু এবং শেষ হল কখন? একটি জলধোয়া ডাবলডেকার আলোটালো জ্বালিয়ে গ্যারাজে গেল। তারপর রাস্তা ফাঁকা পড়ে রইল অনেকক্ষণ। সারারাত যেন আর একটাও গাড়ি যাবে না এমন চকচকে রাস্তা দিয়ে একটি সওয়ারিবিহীন কালো মোষ অতি মন্থরভাবে হেঁটে যাচ্ছে, সে দেখল।

বাসি মুখে চা খেয়ে ধ্রুব দাঁত মাজতে যায়। বহুগুণধর এই পেস্টটির একটি অঘোষিত আসল-কর্ম হল, জিভে গেলেই পেটের মধ্যে গুরুগুরু ধ্বনি। যার হয়, সে ছাড়া নাকি আর কেউ শুনতে পায় না? সিন্ধুর কথা মনে পড়তেই হাত দিয়ে মাছি উড়িয়ে দিল সে। 'মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল...।' ক্যানোগা কুকি, মনে মনে ভেঙিয়ে ওঠে সে, তোমার কি পেট-কারাপ ওয়েছিল!

দীননাথকে বলতে হবে, দাঁত মাজতে মাজতে ধ্রুব ভাবল। বেসিনের নিচেই একটা গামলায় শায়া ও ব্রেসিয়ার কেচে রেখেছে অনুভা, এখনো শুকোতে দেবার সময় পায় নি। সঙ্গে তার একটি গেঞ্জিও রয়েছে। একসঙ্গে খানিকক্ষণ পড়ে থাকলে যা হয়, শায়ার হলুদ কিছুটা গেঞ্জিতে লেগে গেছে। যখন ও-দুটি জিনিস, শায়া ও ব্রেসিয়ার ঝিকে দিয়ে কাচানো যায় না, তখন ও-দুটি পরা কেন—সে একবার জানতে চেয়েছিল অনুভার কাছে। মিষ্টি হেসে আর ছোট্ট হাই তুলে যৌবন তখন সবে অনুভাকে বলেছে, 'এবার উঠি রে।' অনুভা বলেছিল, 'কেন আর ভালো লাগে না খুলতে?'

উত্তরটি কী রসভরা আর পাকা! সঙ্গে অতটুকু হাঁ-মুখের অবিশ্বাস্য চওড়া রক্তাভ হাসি যা আনকথা মনে পড়ায় এবং এককথায় যা টেনে নিয়ে যায় রাতের খোড়ো বিছানায় কামময় উমে। উত্তর-কলকাতা-ভাবাবেগে মথিত যে বিধুর সফিস্ট্রিকে সে বিয়ে করেছিল, খাঁটি সুপ্রভা সরকার গায়কিতে যে গাইতে পারত চল্লিশ দশকের 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবির 'গানের সুরে জ্বালব তারার দীপগুলি' গানটি এবং এখনো পারে—যে ফ্রিজিড ছিল না ও যার অর্গ্যাজম হত—সেই বাহুল্যবর্জিত তলপেট, উরুতে স্পন্দিত ফর্সা, সবই তো আগের মতো—সত্যি, অনুভার মতো রিমার্কেবল মেয়ে কেন যে আর কটা বছর অফার করতে পারল না। সিন্ধুর সঙ্গে এই যে রাতের ব্যাপার, অনুভা কি এ-জন্যে পুরোপুরি দায়ী নয়! ছোট-বড় চাপা নিঃশ্বাসে ধ্রুবর বুক ভরে ওঠে।

তবে তার ভয় নেই, ধ্রুব নিশ্চিত যে, সে দায়ী হতে পারে না। লাভার-টাভার আছে নিশ্চয়। বাগবাজারে মার কাছে তো প্রায়ই যায় সিন্ধু। তার সঙ্গে সিন্ধুর অ্যাফেয়ারটা হয়ত গোড়া থেকে স্টাডি করছে, এখন কিছু টাকা খেঁচার ধান্দা আর কি, সিন্ধুর মায়ের। দু-পাঁচশো যাবে, সিন্ধুর হাতেই সুযোগমতো গুঁজে দেবে ধ্রুব। খসিয়ে নিক, বিয়ে দিয়ে দিক, যা পারে করে নিক। অনুভা না জানলেই হল। যদি বেশি ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করে তো ডি-সি-নর্থ সুনীতি বসুরায়কে বলে ঘড়িচুরির একখানা পুলিস-কেশে ফাঁসিয়ে দিলেই হবে। সুনীল তার ক্লাস-মেট।

আর হ্যাঁ, অফিসে গিয়ে দীননাথকে ডেকে পাঠাতে হবে। সব শুনে, দেখা যাক, এরিয়া ম্যানেজার কী বলে। কমার্শিয়াল ম্যানেজারকে এতদিন তো অন্তত ঘরে ঢুকে 'সার' বলত। এরপর থেকে 'ধ্রুব' ডাকবে নিশ্চিত। চাই কি, ডাকনামে, এ, হাবু বলেও ডাকতে পারে। বলুক, শালা ঘ্যাম খচ্চর, বৌ না-জানুক, সে ঝি জানে। দ্যাবা-দেবী জমিয়েছে ভালো, ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে বীথি তাকে প্রতি পুজোয় নতুন ঝি উপহার দিয়ে যাচ্ছে। দীনুর কাছে সারেন্ডার করা ছাড়া উপায় নেই।

কমোডে বসে ধ্রুব আজকের বাংলা কাগজখানা মেলে ধরে। আ, এই কাগজখানা! নাকি ঐ পেস্ট? বসামাত্র এই তাৎক্ষণিক গলা-ধাক্কা দেয় কে যে, তা এক ওপরঅলা ছাড়া কেউ জানে না। প্রথম পাতায় সুরূপা মামলার অনুসরণে বাকি 'দ্রষ্টব্য' পঞ্চম পাতার ষষ্ঠ কলাম খুঁজে বের করতে গিয়ে, 'আইন ও আদালতে'র অষ্টম কলামে তার চোখ পড়ে। সে আগে ওটা পড়ে। বাঃ, শালারা বাছে ভালো। নিঃশেষে নিঙড়ে বের করবে আজ সবটুকু, কিছুই ভেতরে রাখবে না।

মুরারই থানার মন্দিরবাজার গ্রামে এবার একটি বালিকা-ধর্ষণের জন্য ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ বছরের বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছে।...'সে সুধারাণীকে (১৪) বলে, তার ছাগলটি ঐ শালবনের মধ্যে চলে গেছে। সে বালিকাটির সঙ্গে সেই জঙ্গলের মধ্যে যায়।...জানতে পেরে সুধারাণীর বাবা শ্রীফকিরচন্দ্র সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ও পরীক্ষা করায়। তারপর থানায় ডায়েরি করে...'

ডাক্তার...থানা...পেট খারাপের ব্যাপার না, প্রেগন্যান্ট হবার প্রশ্ন ওঠে না—এসব সে আগেই বুঝেছিল। কিন্তু ডাক্তারি-পরীক্ষা? ধর্ষণ? মাত্র একটি শব্দ তার ধ্রুব-পৃথিবীকে ঠাস করে চালু করে দিল। নীল ফুল তোলা সাদা টালির চকচকে বাথরুমে দুগ্ধফেননিভ কমোডে বসে তার ভারি পাছাটি টুপির মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে, সে টের পেল। পরমুহূর্তে মনে হল, শূনে নিক্ষিপ্ত, সে যেন এক বায়ুভেদী তীর, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, কখন আর কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই।

কমোড থেকে উঠে পড়তে গিয়ে সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ফের কমোডে বসে পড়ল। তার হাত থেকে কাগজ পড়ে গেছে, কাঁপা হাতে না ছুঁয়েও সে টের পায়, মাথায় চুলের গোড়াগুলো ভিজে ইতিমধ্যেই জবজবে হয়ে গেছে। যে কোনও মুহূর্তে একটি স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে জেনেও, কাঁপুনি সে থামাতে পারে না। কমোডে বসে, সে কাঁপতে থাকে।

সিঁড়িতে চটির শব্দ। বাজারের থলি হাতে সিন্ধু ওপরে উঠে আসছে।

বোসপাড়ায় অনুভার দাদাবৌদির বিয়ের আজ রৌপ্যজয়ন্তী। নিউ মার্কেট থেকে পঁচিশ-গোলাপের তোড়া নিয়ে সন্ধেবেলা সেখানে যাবার কথা। এদিকে লোডশেডিং। তবে অফিসের জেনারেটর আছে। এয়ার-কণ্ডিশান্ড ঘরে সাতটা পর্যন্ত ধ্রুব বসে। একা? হ্যাঁ, একা। বাইরে বেয়ারা রাম-আধার।

৭টা নাগাদ ধ্রুব তলদেশ দেখতে পেল। খাঁড়া ঝুলছে, পড়বে, এবং এককোপে মুণ্ডু ছিটকে যাবে। আর কিছু হবার নেই, ধড়ের দিকে মুণ্ডুর চেয়ে-থাকা, এ-ছাড়া। ৭টা নাগাদ সে বুঝতে পারল, কানা নয়, খোঁড়া নয়, প্রেমিক নয়; লম্পট নয়, জোচ্চোর, সাধু, ক্লামজি, সোবার, মনমরা, চালাক, স্টুপিড, লাজুক, লোভী, উদাসীন, স্মার্ট, এ-সব কিছুই নয়—হাজবন্ড নয়, বাবা নয়, কমার্শিয়াল ম্যানেজার নয়—সে সংক্ষেপে, ভীতু। ৭টা নাগাদ আধগজি গদির রিভলভিং চেয়ার বোঁ করে ঘুরিয়ে দেওয়ালের মুখোমুখি শূনে দু'হাত ছু'ড়ে সে নিজেই নিজেকে 'ডেস্ট্রয়েড' বলে ঘোষণা করতে শুনল।

এবং ৭টা নাগাদই সে সেই সাহস পেল যা পুরুষ মানুষের নয়, মেয়ে মানুষের নয়, এমন কি নপুংসকেরও না; যা ভীতুর। অফিস থেকে বেরিয়ে সে, ধ্রুবজ্যোতি মিত্র, একটি ট্যাক্সি নিল। 'সিধা চলিয়ে', ভারি গম্ভীর আর জমকালো গলায় সে বলছে শুনল, 'জলদি'। যেন সে নয়, বুলেটের কথা ভুলে গিয়ে, প্রান্তরের পর প্রান্তর ভরিয়ে ডোরাকাটা লাফে, আ-খাওয়া মড়ির দিকে ছুটে চলেছে স্বাধীকারপ্রমত্ত চিতা।

চারতলায় ল্যাচ-কী খুলে ধ্রুব ঘরে ঢুকল। 'সিন্ধু?' অন্ধকারে সে নিচু গলায় ডাকল।

সাড়া নেই।

ডাইনিং স্পেশে আলো জ্বলছে। কদিন ধরেই অনুভা বলছিল শাড়ি পরাবে, আজ পরিয়েছে। একটি শাদা-নীল সিন্থেটিক শাড়ি পরে, টেবিলের পাশে, বিনা মশাড়িতে, এই ভরা সন্ধেবেলা সিন্ধু চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে।

'ও কী ভাবে শুয়ে আছিস, ধিঙ্গি মেয়ে কোথাকার', অনুভাকে কতবার বলতে শুনেছে

সে 'ঠিক হয়ে শো।'

তবু তার ভঙ্গিমা পাল্টায় নি। ঘুমিয়ে পড়লে, কিছু যদি মনে থাকে মেয়েটার।

স্যুট-টাই না খুলে সিন্ধুর পাশে বোঁটা-ছেঁড়া পাতার মতো ধ্রুব খসে পড়ে। তাকে জাগাতে, এত বিপদগ্রস্ত, তবু, শাড়ি সরিয়ে স্তনে হাত না-রেখে সে পারে না।

'সিন্ধু', কানের কাছে মুখ এনে সে বলে, 'মানইজ্জত নয়। অনুভা নয়; মুন নয়, কেউ নয়, ওরে কিছু না।' সে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'সাত বছর পাথর ভাঙতে আমি পারব না।'

এত বলে সিন্ধুর ঘুম না-ভাঙা পর্যন্ত সে পাশে পড়ে থাকবে বলে শুয়ে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে স্যুট-টাই পরা ধ্রুবকে পাশে শুয়ে থাকতে দেখে সিন্ধু এক অবাক-কাণ্ড করে। বালিকার গাম্ভীর্যে মুখ ঢলঢলে করে সে ইঙ্গিতে বলে, 'ও-ঘরে।'

অর্থাৎ আজ ও-ঘরে হবে। দিদিমণির বিছানায়।

হাত ধরে তুলে সে ধ্রুবকে তাদের প্রাক্তন *দাম্পত্য* বিছানায় নিয়ে যায়। জয়পুরে-কেনা মহার্ঘ চাদরটি অনুভা তাকে দিয়ে আজই পাতিয়েছে। পাখার রেগুলেটার ডানদিকের চরমে ঠেলে দিয়ে লীলাভরে সে নীল আলো জ্বালায়। জয়পুরি কারুকাজের ওপর অবলীলায় শুয়ে পড়ে।

জামাকাপড় খুলে পা-জামা পরতে পরতে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে ধ্রুব বলল, 'হ্যাঁ, কাল কী যেন বলছিলি? মাকে সব বলেছিস নাকি...'

'মা-কে? কী-সব?'

'ঐ-যে। ডাক্তার-ফাকতার।'

'আপনি আমাকে তাই ভাবলেন জামাইবাবু?' বহু-ভর্ৎসিত ভঙ্গিমায় চিৎ হয়ে শুয়ে সিন্ধু ঠোঁট ফোলায়, 'ছিঃ।'

'কাল যে বলছিলি, ডাক্তার...'

'ও, ওটা। ওটা একটা ঠাট্টা করলুম!' ফিক করে হেসে সে পা দোলায়, 'আমি শাড়ি পরেছি।' ধ্রুবর সাড়া নেই দেখে অভিমানে সে এবার হরিণীর কালো ঘনিয়ে আনে চোখে, 'মাকে বলব, আমি কি এত খারাপ মেয়ে।' তার বুক ফুলে ফুলে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে আবার বলে, 'ছিঃ।'

বলে অনুভার বালিশে মুখ গোঁজে।

মেঘ-ডাকাডাকি হচ্ছিল সকাল থেকেই। ঝোড়ো হাওয়ায় জানালার একটা পাল্লা হুশ্ করে খুলে গেল। চমকে উঠে সিন্ধু বন্ধ করতে যাচ্ছিল, ধ্রুব বাধা দিল। প্রয়োজন কী। আকাশ ছাড়া, ওদিকে তো কিছু নেই।

বাইরে এ-গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষা নামল। যেন মাত্র এক বছর পরে নয়। যেন কত খরার পরে—আবার। জানালার শার্সি আবার মেঘমেদুর হয়ে উঠছে, সেখানে, আবার, ঘনঘন বিদ্যুৎ। বাইরের পাগল হাওয়া আর ঘরের ঝুলন্ত খৈতান ঘরের মধ্যে যে প্রতিমুখী বিক্রিয়া তৈরি করেছে, বোধহয় তো সেইজন্যে, পোড়ামাটির কারুকার্যময় শেড-দেওয়া নীল বাল্বটি এমন রীতি-গর্হিত দুলছে।

কট করে একটি শার্সি ফাটার শব্দে ধ্রুবর জীবন জুড়ে ঝনঝন করে সব কাচ ভেঙে পড়ল। ষোলো বছরের হাল্কা বালিকাকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বিয়াল্লিশ বছরের বালক। এবং আগে যা কখনো করে নি, মনে হয় নি যে করা যায়, সে তার মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে লাগল।

অনুভার পাউডার-ব্লু ছ-ফিট গোদরেজের সামনে সে তাকে দাঁড় করায়। অনুভার ভ্যানিটি থেকে চাবি বের করে ব্যগ্র কাঁপা হাতে সে আলমারি হাট করে খুলে ফ্যালে। বাঁদিকে

ওয়াড্রোবে ঝোলানো তা অন্তত খানপনেরো শাড়ি। পিছনের গোপন চেম্বার থেকে বের করে এনে সে অনুভার গয়নার বাক্স ভাঁজ করা শাড়ির ডাঁই-এর ওপর রাখে। রেখে বাক্সর ডালা খুলে ফ্যালে। এখন, ঝলমলে রত্নগুহার সামনে, মর্জিনার সঙ্গে, গাধার পিঠে আলিবাবার মতো সে যেন।

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, উন্মুক্ত আলমারির দিকে ইঙ্গিত করে ধ্রুব সিন্ধুকে বলে, 'বেছে নে।'

শাড়ি না নিয়ে, দেখুন-দেখুন, জড়োয়া-সেট তর্জনীর ঠেলায় সরিয়ে, কত সপ্রতিভভাবে ইমিটেশান-হীরের রোল্ড-গোল্ডের নাকছাবিটি তুলে নিয়ে নাকের পাটায় পরছে মেয়েটা! লাল ভেলেভেটের ডালা-সংলগ্ন আয়নায় ফুটে উঠেছে প্রতিবিম্ব। কী দুর্ধর্ষ মানিয়েছে ওর গর্বিত, সপ্রতিভ, ককেটিশ মুখে?

আ, পছন্দ আছে মেয়েটার।

*কৃত্তিবাস, ১৯৮০*

## মাতৃস্তোত্র

২৬ সেপ্টেম্বর। রবিবার। দুপুরবেলা।

এ-ঘরে তার একক বিছানায় শুয়ে এক আশ্চর্য তৃপ্তিকর সুখস্বপ্ন দেখছিল মহীন। স্বপ্ন যে বিরাট কিছু নিয়ে, তা না। শুধু দৃশ্য একটি।

পাহাড়ি এলাকার উঁচু-নিচু একটি গলি। দুধারে কুটির-শ্রেণী, তবে এলাকা জুড়ে কারফিউ। এমন যে, যেন গাছের পাতা নড়লেই গুলি! গলির এ-প্রান্তে একটি ঝাঁপ-ফেলা অন্ধকার চালা ঘরে সে বসে। ও-প্রান্তে বেশ কিছুটা দূরে, উঁচু জমিতে, গথিক-রীতির একতলা বাড়ি এক। সামনে বাড়ির প্রস্থসমান চওড়া সিঁড়ি যা মাঝ-বরাবর ছোট হতে হতে ওপর দিকে উঠে আবার ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের দিকে পিঠোপিঠি দুটি কোট-আনকোট মার্কার মতন সিঁড়ি শ্রেণীর দুদিকে কারুকার্যময় রোকোকো রেলিং! টিলার ওপর, স্পটলেশ সাদা বাড়িটির গায়ে এখন জোনাকির নীলাভা, কারণ টিলার পিছনে বাড়িটির গা বেয়ে এখনো একটি আ-ভাঙা, আস্ত চাঁদ উঠছে তো উঠছেই। পরপর চারজন গোয়ালিয়র-স্যুটিং-এর মডেল যুবা দ্বারা রেপ্‌ড হবে বলে, তাদের সঙ্গে, জীন্‌স ও কমলারঙা গুরু পাঞ্জাবি পরে রুবি ঐ মূলত সাদা নীল বাড়িটিতে অনেকক্ষণ আগে প্রবেশ করেছে। তখন বাড়ির পিছনে সূর্য দ্রুত নেমে যাচ্ছিল। সূর্যাস্তের আলোয় রুবির স্যিলুয়েট-মূর্তিকে মহীন স্বহস্তে পাল্লা বন্ধ করতে দেখেছিল সে বহুক্ষণ আগে।

স্বপ্নে এমন দেখা যায়, তাই সে, একটা অ্যাসট্রে পর্যন্ত নেই এমন আসবাবহীন বিশাল আয়তাকার কক্ষের কেন্দ্রে, অতিকায় চুনী থেকে বিচ্ছুরিত বিভাময় রক্তিম আলোর মধ্যে, স্ফটিক-মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ও দুহাতে ভর দিয়ে রুবিকে তার মধু-রঙা লোমবহুল ল্যাজ সরিয়ে আসন নিতে দেখতে পেয়েছিল। তারপর থেকেই ঐ বন্ধ বাড়িটিতে চুণীলাল রশ্মিমালার হুটোপুটি।

বাড়ির নাম, মাতৃ-কুটির।

চাঁদ এখনো উঠছে তো উঠছেই। এত দেরি! স্বপ্নে যেমন হয়, ঝাপের ভেতর মহীনের বদলে বুড়ো কুকুরের জিভ ঝুলে পড়ে।

তারপর, যখন চাঁদ উঠে গেছে টিলা ছাড়িয়ে বাড়ির মাথায় আর ঐ সাদা বাড়িটির

রূপরেখাকে পিছনে রেখে, জীবন-যন্ত্রণার স্বর্গ থেকে পায়ে পায়ে রুবি এগিয়ে আসছে মহীনেরই দিকে, তার প্রলম্বিত ছায়া গোটাতে গোটাতে যখন তারই পায়ে লীন হয়ে গেছে, আর ঝাঁপের সামনে দাঁড়িয়ে স্বর্গসুখে কেঁপে রুবি ডেকে উঠেছে, 'মহীন, ও মহীন...'

ঠিক তখনই মহীনের ঘুম ভেঙে গেল। টেবিল-ঘড়িতে ৪টে। ৩॥ টে নাগাদ ঘুমিয়েছে—অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের আগে তো ঘুম ভাঙার কথা না। 'কী হল' অনুসন্ধান করতে গিয়ে, মহীন নিচে বাড়িঅলার টেলিফোন বাজছে, এ-ছাড়া কোনও কারণ খুঁজে পেল না। এতেই ঘুম ভেঙে গেল, একতলা থেকে উঠে-আসা এত মৃদু আর মিঠে আওয়াজে? তাদের ফোন মাস-দেড়েক মৃত, সেটা বাজলেও না হয় কথা ছিল। নিজের ওপর আস্থা কী আর সাধে হারায়, আজকাল কত টুক করে ঘুম ভেঙে যায়...

বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায় তার শরীর থেকে, যা, সেই সঙ্গে নিয়ে যায়, শরীর থেকে, সদ্য-দেখা স্বপ্নটিও। বীথি ফোন ধরতে যাচ্ছে দেখে সে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

পনের মিনিটের বেশি এবারেও ঘুমুতে পারে নি মহীন, নইলে হয়ত বীথি তাকে ডেকেই তুলত। বীথি টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখছে, সে দেখল। মুখ হাত ধুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সে ক্রমশ ঘুম-ভাঙানিয়া টেলিফোন-ঘণ্টির তাৎপর্য বুঝতে পারল।

ঠিকে-ঝি চাঁপির মা ফ্রিজের দুধ ও ভাত-তরকারি নিয়ে যাচ্ছে—রাস্তার ওপাশের ফ্ল্যাট থেকে এসেছে খুকু, প্রেসার কুকার উপুড় করে বীথি তাকে কে-জি খানেক মাংস ঢেলে দিচ্ছে। মেয়ের চুলটুল বাঁধা শেষ, ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা সব বন্ধ, তাহলে ঐ ফোনটাই? বাকি শুধু তার আর বীথির জামাকাপড় পরা ও একটি ট্যাক্সি ডাকা।

'একটা খবর আছে', চায়ের কাপ শেষ হওয়া মাত্র তুলে নিয়ে যাবার সময় ভারি নরম গলায় বীথি বলে গেল, 'লেক টাউন থেকে ফোন এসেছিল।'

'বেঁচে আছে?'

ঐ আর কি। এখুনি যেতে হবে।'

ভাল নয়? বোধহয়, বোধহয় কেন, মহীন বুঝল, তার মানে সব শেষ! গত কুড়ি বছরে বাবা, মেজদি ও দুজন বন্ধুসহ মোট চারটি মৃত্যু-সংবাদ বীথি তাকে এ-রকম দ্ব্যর্থকভাবেই দিয়েছে। আশ্চর্য যে, প্রতিটি মৃত্যুই ঘটেছে মহীনের ঘুমের মধ্যে। 'দেখবে', গৌহাটিতে দীপুর মৃতু-সংবাদ ব্রাহ্ম মুহূর্তে গ্রহণ করার সময় সে তাই বীথিকে বলেছিল, 'যখন এ-ভাবে হচ্ছে, আমি ঘুমের মধ্যেই মরে যাব।'

শেষ? তবু সব শেষ নয়। বীথি তো এখনো বলে নি! বীথির এটা আজও গেল না, সে আজও মানুষ মনে করে মহীনকে! বীথির মতো মেয়েরা যারা লোকসমাজে 'আমি বাঁজা ছিলাম না' এই ঘোষণা রেখে যাবে বলে মহীনের মতো ছেলেদের বিয়ে করে ও ঐ ঘোষণা রেখে যেতে পারে বলে মহীনের কাছে যারা কৃতজ্ঞ—তারা এখনো কত মায়া-ভরা গলায় 'ঐ আর কি' বলে মৃত্যু-সংবাদগুলি তাদের সামনে আজও পেশ করে! একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চেপে মহীন মনে মনে হাসে। মানুষ মনে করে বীথি, অ্যাঁ?

'তবে কেন মাংস আনালে, গুচ্ছের বাজার করালে সকালে?' সদ্য জেগে-ওঠা অসতর্ক গলায় মহীন হঠাৎ বলে বসে। অর্থাৎ, তুমি তো কালই লেকটাউনে গিয়েছিলে, দেখেছিলে যে মার অবস্থা এখন-তখন। তবে কেন আজ...

না বললেই হত। তবে খুকু আর চাঁপির-মা এখন নেই। তাই বলে ফেলেও মহীন বিশেষ লজ্জা পায় না। বীথিকে লজ্জাজনক বহু কথা সে ইতিপূর্বে বলেছে, শুধু বীথি কেন, জীবন জুড়ে বহু কাজ সে করেছে যাতে কেতাবি মতে লজ্জা পাবার কথা, কিন্তু, বারবার দেখেছে মহীন, সে লজ্জা পায় নি। মানুষের লজ্জা হয়? শূন্যতাই বাড়ে শুধু।

ট্যাক্সিতে উঠে মহীন বলল, 'তোমরা যাও। আমি শ্যামবাজারে একবার নেমে যাব'।

'সে কী! ওখানে না গিয়ে?'

মহীন এখনো জানে না, তার মা মারা গেছেন, না মরণাপন্ন। এই মুহূর্তে লেকটাউনে তার মা নারায়ণী দেবীর মৃতদেহ পড়ে আছে—তথ্য হলেও এটা কিছুতেই সত্য হতে পারে না, কেননা, এখনো তো কেউ তাকে বলে নি যে, 'তোমার মা মারা গেছেন!' জানতে চাইলেই জানা যাবে, তাই মহীন একবারও জানতে চায় নি যে, বলো, আমার মা কি মারা গেছেন, না মারা যাচ্ছেন? হ্যাঁ, মুখচোখ দেখে বোঝা গেছে অনেকটাই, অনেকটা কেন, সবটাই। তবু সবটা নয়। বীথি সব জানে, মেয়ে পম্পি সব জানে, এ শুধু মহীনই এখানো জানে না যে, তার মা মৃত। ফাঁসুড়ে দড়ি টানার আগে একবার একজন ফাঁসির আসামী জানতে পেরেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগেই তার ফাঁসি হতে যাচ্ছে। সে, গম্ভীরভাবে, তাকে আরও একটু অপেক্ষা করতে বলেছিল। অনেকটা সেইরকম আর কী।

.কী জানি কী, সেই হিসেবে মহীন একটা হাওয়াই চপ্পল পরে বেরিয়েছে বটে। মেয়ে ড্রাইভারের পাশে, তবে বীথির খালি পা। সেদিকে তাকিয়ে মহীন বলল, 'তুমি গিয়ে বল,আমি বাড়ি ছিলাম না। আমকে অফিসে খবর দিয়েছ। আমি আসছি।'

'সে কী!' বিস্ফারিত চোখে বীথি বলল, 'আমি যে বলেছি, তুমি ঘুমুচ্ছো।' বলে সে মেয়ের দিকে তাকায়। এ-সব কী বলছে মহীন মেয়ের সামনে।

মহীন ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। উপমন্ত্রীর নাবালিকা-ধর্ষণ নিয়ে কাল তার সেনসেশনাল অ্যাঙ্কার স্টোরি বেরুবে। আজ অফ-ডে। তবু, নিউজ-ডেস্কের হালদার সেটা হোল্ড-অন করে দেয় নি, এটা না-দেখে সে লেকটাউনে যেতে চায় না। সে কৃতজ্ঞ যে, বীথির মতো মূল্যবোধময়ী, রুচিসম্পন্না নারীরা আজও মৃত্যু সংবাদগুলি দ্ব্যর্থকভাবে প্রকাশ করে। সে তো জানে না তার মা জীবিত না মৃত, তাই সে মিহি গলায় বীথিকে বোঝায়, 'দ্যাখো ওখানে গিয়ে আর তো বেরুতে পারব না? অফিসে বলা-কওয়ার ব্যাপার আছে। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি।'

মেয়ে বা মা কারো মুখের দিকে অর্ন্তদৃষ্টি মেলে না তাকালেও যদিও বোঝা যেত সত্য কী—অর্থাৎ হ্যাঁ, না, না—তবু ওদের দিকে একবারও না তাকিয়ে মহীন শ্যামবাজারে নেমে পড়ে।

শ্যামবাজারে নেমে সে একটা সিগারেট ধরাল। রিস্ট উল্টে দেখল, আজ ভুলে গেছে ঘড়ি পরতে। রামকানাই-এর ঘড়িতে ৫টা বাজতে এখনো ১০ মিনিট বাকি। রুবি এখনো অফিসে।

রুবি বলেছিল, আজ ২৬ সেপ্টেম্বর দেখা করতেই হবে। কোথায়, মহীন তাকে জানাবে। আগে তো রুবির কাছে ছুটির দরখাস্ত করি, তারপর অফিসে গেলেই হবে,এ-রকম ভেবে রামকানাই-এ ঢুকে পাবলিক টেলিফোনের স্লটে মহীন একটা টাকা ফেলল।

মহীন আসতে পারবে না শুনে রুবি চুপ।

'হ্যালো', মহীন ডাকল।

নো রিপ্লাই।

'রুবি?'

এবার রুবি তার মহীন-খ্যাপানো হাস্কি গলা বের করল, 'ক্যানো?'

মহীন বলতে যাচ্ছিল, 'দ্যাখো, আমার মা...'

কিন্তু আমার মা কী? মারা গেছেন? না তো। কই, মহীন তো নিশ্চিতভাবে জানে না!

সে বলল, 'আজ ভীষণ আটকে পড়েছি রুবি। প্লীজ, আজকের দিনটা। আমি পরে সব

বলব তোমাকে—বললেই তুমি বুঝবে—'

'আপনি এখন কোথায়?'

'শ্যামবাজারে।'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রেস ক্লাবে চলে আসুন।' বলে রুবি লাইন কেটে দিল।

মা এখনো বেঁচে আছেন, নাকি, তাঁর মৃতদেহই লেক টাউনে পড়ে আছে—সেই ৪টে বা তার আগে থেকে, মহীন তা জানে না। এ-রকম সুবিধাজনক ভূমিকা পেয়ে গেছে বলে সে রাস্তা নেমে 'ট্যাক্সি-ঈ-ঈ' বলে ডেকে উঠে টের পেল, সাময়িক তথা মরণশীল হলেও তার দুপুরের ঘুম-জাগা গম্ভীর গলাটির আয়ু এখনো ফুরিয়ে যায় নি।

মহীন ট্যাক্সি পায় নি আর রুবি পেয়েছে, তাই ক্লাবে পৌঁছে সে দেখল, খোলা আকাশের নিচে, লনে, মনুমেন্ট-এণ্ডে দুটি ফিতে-চেয়ার ও একটি হাল্কা টেবিল আনিয়ে মহীন চৌধুরীর গেস্ট আগে থেকে বসে আছে। তা, লিটল রাসেল থেকে কতটুকুই বা।

টেবিলে দুটি পানীয়। রুবির জিন-লাইম আর তার জন্যে হুইস্কি। মহীন এসে মেশাবে বলে দুটি গ্লাসেই এখনো লাইম বা সোডা মেশে নি। মহীনের সঙ্গে এলে এই ঝাউ গাছটার নিচেই তারা বসে বটে, কিন্তু এর আগে রুবি কখনো একা আসে নি।

'ব্যাপার কী?' মহীন হেসেই জানতে চাইল।

'আজ কত তারিখ?'

'মানে?'

'মানে আবার কী। সাত-দুগুনে কত হয়?'

'মানে?'

'মানে আবার কী। মানে কাক্কেশ্বর', রুবি কুল কুল করে হেসে বলল, 'কুচকুচে!... আপনার মেয়ের বয়স কত হল!'

কী উল্টোপাল্টা বকছে! পেগখানেক আগেই মেরে রেখেছে নাকি? একা-একা ক্লাবে আসছে, অর্ডার দিচ্ছে, সার্ভড্‌ও হচ্ছে...'বহুৎ বেড়েছ দেখছি!' বাচ্চা ছেলের মতো গম্ভীরভাবে মহীন বলল, 'তোমাকে সার্ভ করল যে বড়। দাঁড়াও দ্যাখাচ্ছি,' বলে সে চেয়ারে ঘাড় এলিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ডাকে 'রতঅন!' অর্থাৎ বেয়ারা।

'পম্পির বয়স কত হল?'

'আর-এ! এ যে যমের প্রতি নচিকেতা দেখছি। কেন, পনের?'

'এ-এ-এই!' চোখ-মুখ পাকিয়ে রুবি এবার তেড়ে এল, 'আপনি বয়স লুকোচ্ছেন মেয়ের। ওর এখন ঠিক সেই বয়স, যে বয়সে আই লস্ট মাই ভার্জিনিটি টু ইউ—আই মিন, আই হ্যাড টু—নাইনটিন সেভেনটি-ফাইভ টু বি প্রিসাইজ—এবং সেটা ঠিক এই আজ, ২৬ সেপ্টেম্বর!'

'আপনার মেয়ের বয়স এখন ঠিক ষোলো স্যার!' বলেই, মহীনের লাইম মেশানোর জন্যে অপেক্ষা না করে এক চুমুকে জিনটুকু শেষ করে, নাকি, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে ঠক করে শূন্য গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রুবি, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না মহীন।

সেপ্টেম্বরের শেষ। কলাকাতায় যে সাত দিন হেমন্ত থাকে। আজ তারই একদিন। রাত হলে আজকাল হিম পড়ে। লেনের একপ্রান্তে সন্ধ্যার আঁধারে শুধু তারা দু'জন। ক্লাবের গা ঘেঁষে মাঝে মাঝে ট্রাম চলে যাচ্ছে।

নিজের গ্লাসে সোডা ঢালতে ঢালতে মহীন বলল, 'ধ্রুবর ফ্ল্যাটে যাবে নাকি?'

'থ্যাঙ্ক ইউ। একটা জিন বলুন।' রুবি হাসল, 'আমার পীরিয়ড।'

রতনকে ডেকে একটা হাফ-জিন বলল মহীন। 'আজ খুব তাড়াতাড়ি উঠব' সে ঘোষণা করল।

'আপনার কী মনে আছে', রুবি বলল, 'ধ্রুব মিত্তিরের ফ্ল্যাটে, সেই প্রথম দিন—ইউ হ্যাড

স্টিল বীন ওয়ার্কিং অন মী—এমন সময় নিচের ফ্ল্যাটে টেলিফোন বেজে উঠল—থেমে গিয়ে আপনি হঠাৎ আমার বুকের ওপর পড়ে রইলেন—কেউ ছিল না কিনা ফ্ল্যাটে, তাই সারাক্ষণ বেজে গেল, আর আমরা চুউপ করে সেই কাটা-কাটা ক্রিং-ক্রিং শুনে গেলাম সে কতক্ষণ ধরে!'

'টেলিফোন? আ-হ্যাঁ, বেজেছিল বটে', আর-একটা হুইস্কি বলে মহীন টেবিলের নিচে দিয়ে পা-দুটো ছড়িয়ে দিল।

'একি! আজ যে রবারের চটি?' রুবি জানতে চাইল।

রাত নটা নাগাদ রুবিকে মানিকতলায় নামিয়ে দিয়ে, লেকটাউনে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ড্রাইভার ভি-আই-পি ধরতে চেয়েছিল। মহীন তাকে শ্যামবাজার-বেলগাছিয়া দিয়ে যেতে বলে। খড়গপুর থেকে সোজা ড্রাইভ করে এলেও দিদি-জামাইবাবুর পৌঁছতে যার নাম সেই দশটা। মা যদি মারা গিয়ে থাকেন, রাত বারোটার আগে বডি বেরুবে না। ততক্ষণে মুখের গন্ধটাও একটু কমুক।

মা সম্পর্কে সেই দুপুর থেকে কোনও-কিছুই মনে পড়ে নি, কোনও ঘটনা বা দার্শনিক প্রতীতি কিছু। এবার কিছু মনে পড়েবে আশা করে সে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়।

মহীন দেখল, সেই চুনারের শিউপুরায় থাকতে, ছোটবেলায় তারই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে যাওয়া হয়েছিল, একদিন বাবার ওপর রাগ করে মায়ের গাছতলায় গিয়ে বসে-থাকা গোছের সাপ-খুঁড়তে-কেঁচো ছাড়া তার কিছুই মনে পড়ছে না। মা'র মোট ৭২ বছরের মধ্যে তার নিজস্ব ৪২ বছরের মাকে নিয়ে, হোক ফুঁ দিলেই ফট, সাবানের ফেনার মতো আর একটা স্মৃতিও কি থাকতে নেই? সকলেরই এই দুরবস্থা নাকি! অথচ, ওঃ, এই মা-কে নিয়ে কত হৈ-চৈ চারিদিকে— অনুরূপা দেবী থেকে গর্কি পর্যন্ত খালি-মা-মা আর মা—শাল্লা, মাদার-কা-বাচ্ছাদের মাতৃমাংসের স্টেক খেতে দাও, বলবে, 'তওবা', 'আর-একটু দাও।' টেরই পাবে না।

শ্যামবাজারে মোড় থেকে জ্যাম—শোনা গেল, নাকি বেলগাছিয়া পর্যন্ত। ট্যাক্সি ছেড়ে মহীন হাঁটা শুরু করল। লেকটাউন কতটুকুই বা। দশটার মধ্যে ঠিক পৌঁছে যাবে।

মানুষের কী যে মনে থাকে আর কী যে তার মনে নেই! কেন যে! বিয়ের পর টানা দশ বছর মহীন বলতে গেলে একটা বইও পুরো পড়ে নি। বিয়ের দিন-সাতেকের মধ্যেই টেবিল ল্যাম্প নিবিয়ে সেই যে একদিন ঝপ করে বইটা বন্ধ করে দিল গীতি— সেই থেকে বই-খোলার বদলে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল বীথিকে-খোলায়। প্রথম দু'-চার বছর তো ড্রয়ারের মতো শুধু টেনেছে আর বন্ধ করেছে!

অথচ, কী আশ্চর্য, হাঁটতে হাঁটতে মহীন দেখল, মা নয়, যুগান্ত পেরিয়ে দর কলেজজীবন থেকে বরং তার একটি বই-এর কথাই মনে পড়ছে। কাটা-ছেঁড়া জল-ছবির মতো টায়ে-টায়ে ফুটে উঠে, প্রচ্ছদ ও টাইটেলসহ বইটি একবার তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসেও গেল। আর, সে আরও অবাক হল, গল্প ভুলে গেলেও, বইটির অন্তত তিনটি লাইন তার প্রায় হুবহু 'কেন-যে' মনে থেকে গেছে দেখে।

ওহো, সে কী আজকের কথা। ৫০ দশকের শেষ দিকে, ছাত্রজীবনে, আলবের কামু হঠাৎ নোবেল-প্রাইজ পেলে, মাস ছয়েকের মধ্যেই তাঁর 'দা আউটসাইডার' বইটি, অশোক, না-না অশোক তো নয়, এনসিয়েন্ট ইসলামিক হিস্ট্রির অধ্যাপক অশোক অগ্রবালের এক মামা জয়পুরে বইটি কিনেছিলেন। সামার ভেকেশানে দেশে গিয়েছিল অশোক, ফিরে এল বইটি হাতে নিয়ে। কফি-হাউসে দেবু, নিরঞ্জন, মিঠু সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বইটির ওপর। কিন্তু, উঁহু, নিজে না পড়ে অশোক বইটি কারুকেই দেবে না। তাই, মাসখানেক পরে দুচার হাত

ঘুরে বইটি অবশেষে মহীনের কাছে এসে থামে।

এবং, বই-পড়ার পক্ষে যা আদর্শ, রাতারাতি বইটি শেষ করে, সে অশোককে খুঁজে বের করেছিল মনে পড়ে। যেন ব্যাক-কভার ছাড়া এখনো কিছুই পড়ে নি, এমনি মুখ করে সে অশোককে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বইটা তুমি পড়েছিলে অশোক?'

কাঁধে মুণ্ডু রেখে অশোক বলেছিল, 'হ্যাঁ-অ্যাঁ।'

'তা তোমার মুখ-চোখ সব একই রকম রয়ে গেছে যে!'

যদিও অবশেষে তার মাকুন্দ মুখে ভ্রমসংশোধনের মতো তাড়াহুড়ো এক জোড়া গোঁফ গজিয়েছে, অশোকের চেহারাটা ছিল চিবুকে সৌন্দর্যতিলসহ পুরোপুরি মেয়েলি। শুনে তার গাল লাল হয়ে উঠেছিল। সে 'বেয়ারা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে ও 'ইয়ে টেব্‌লকা বিল কিৎনা হুয়া' বলে তা কাপ দশেক কফি ও তৎসহ স্যান্ডুউইচাদির দাম দিয়ে সেদিন উঠে পড়ে। সে আর বইটি ফেরত চায় নি।

কে বলে মহীনের কিছু মনে নেই বা সে সব ভুলে গেছে! পরে গ্রান্ড-বারান্দার নিচে অসংখ্য গতরজব্দ বই-এর মাঝখানে নরম মলাটের রোগাপাতলা ছিপছিপে বইটি সে যতবার দেখেছে, ততবার তার ভাল লেগেছে। মনে পড়ে, তুমুল বৃষ্টির মধ্যে, রামপুরহাট স্টেশানে একবার দেখেছিল। লোহার খাঁচা ছেড়ে এইমাত্র যেন ভিজে শিরিষের ডালে বসেছে টুনটনিটা, আহা, জিরোচ্ছে। প্রচ্ছদে কামুর তিরেশোত্তীর্ণ বিখ্যাত ছবিটি। হাল্কা কিছু বলবেন বলে, ঝুঁকে-পড়া অর্ধ-ইওরোপীয় মুখে সিগারেটের বাট-এণ্ড—একেবারে শেষাংশ—তখনও ফিল্টারের চল হয় নি—আর ঈষৎ ধোঁয়াও উড়ছে। শট নেবার সময় সুখ-টান দিতে ভুলে যাওয়া ঠোঁটদুটি নিশ্চয়ই পুড়ে যাচ্ছিল।

টু-ডে মাদার ডায়েড। অর, ইট কুড বী ইয়েসটারডে। আই ডোন্ট নো হোয়েন।

প্রায় এ-রকমই ছিল লাইন তিনটি। গল্প একদম মনে নেই তাই হাঁটতে হাঁটতে বেলগাছিয়া ব্রিজের ওপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মহীন। এর মানে কী?

—আচ্ছা, সে আবার চলতে শুরু করে, অনুবাদে বাক্য-তিনটি কী-রকম দাঁড়াবে? 'উমম্‌ম...মা যেন কবে মারা গেলেন...আজ, না কাল?'—না-না, এমন চিন্তিত, দ্বিধাগ্রস্ত বা বিষণ্ণ ধরনের হবে না কিছুতেই। কারণ, তাহলে তো, রঁদার 'ভাবুক'-এর মতো ওল্টানো রিস্টের ওপরেই থাকত আলবের-এর থুতনি। 'আমার মা আজ মারা গেছেন। বড় জোর কাল। জানি না কখন—' অনুবাদে এমন অব্যর্থ গম্ভীরই হতে হবে পঙ্‌ক্তি-কটিকে, কেননা, এই কথাক'টা বলেই না, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটিকে ঠোঁট পোড়াতে দিয়ে আরও দু'এক মুহূর্ত—তর্জনী ও বুড়ো আঙুলে সিগারেটটি ঠোঁট থেকে খুলে ও টুস্‌কি দিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলে সে পরমুহূর্তে তরতর করে ফাঁসির মঞ্চে উঠে যাবে ও শূন্যসদৃশ ফাঁসের উদ্দেশ্যে ঈষৎ লেংচে গলাটা দেবে উঁচিয়ে—যখন কোমরের কাছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাখা তার বামের ওপর ডান কব্জিটি, অকারণে, শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার্থেই, বাঁধা হতে থাকবে।

সেই ১৯৫৮ থেকে আজ ২২ বছর ধরে লাইনকটা মনের মধ্যে ছিল আমার? হাঁটতে হাঁটতে ক্রূর পাতলা হাসিতে ভরে যায় মহীনের মাথা। এত স্মৃতিধর, অ্যাঁ?

দত্তপুকুরের কাছে পৌঁছে মহীনের হাঁটায় হঠাৎ এক নৃত্যছন্দ এসে দোলা দেয়। সে হঠাৎ বোধ করে, আজ ২২ বছর ধরে সে শুধু সিঁড়িই ভাঙছিল এবং এই মুহূর্তে সিঁড়ি ভেঙেই সে লেকটাউনে উঠছে। তবে, আজ ২৬ সেপ্টেম্বর, লেকটাউনে পৌঁছে অবশেষে নিশ্চয়ই সেই পরিচ্ছন্ন, সমতল, দাঁড়াবার জায়গাটা পাওয়া যাবে। মা বেঁচে আছেন না নেই, আজ জানা যাবে।

লেকটাউন আর কটা সিঁড়ি?

*কৃত্তিবাস, ১৯৮২*

# হ্যাঁ, প্রিয়তমা

বিয়ের পর ১৫টা বছর নিরুপদ্রবে কাটিয়ে, রিটায়ার করতে যখন তার আরও ১২ বছর বাকি এবং মেনাপজ হতে বীথির অন্তত আরও বছর ৪/৫—যখন রেকারিং-এ লাখখানেক ও প্রভিডেন্ট ফান্ডেও অমনি কিছু—একটি ইনসিওরেন্স ম্যাচিওর করেছে এবং আরও ৩টি আগামী ৩ বছরের করবে বলে পরপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে—সল্টলেকের জমি কেনা শেষ—এবং ১০-তলা মাল্টি স্টোরিডের পঞ্চমতলার ফ্ল্যাটে ফ্রিজ-টিভি-টেলিফোন-স্টিরিওফোন সবই, প্লাস ড্রয়িং রুমে চিরু চক্রবর্তীর অ্যালুমিনিয়াম মিউরাল ও দরজায় কোকিলকণ্ঠি বেল—সকাল ৯টায় অফিসের এক্সক্লুসিভ গাড়ি—মায় আলমারিতে আধা বোতল গোলকুণ্ডা যা থেকে কিছুটা প্রতি সেকেন্ড ও ফোর্থ স্যাটার্ডেতে নৈশ-ভোজনের আগে বীথি তা নিজের গ্লাসে ঢালে ও তার হুইস্কির গ্লাসের পাশে রাখে—এককথায়, যাকে বলে, যখন 'মেরে এনেছে' সে—এমন সু-সময়ে অমিয়র জীবনে এক ঘোর বিপদ দেখা দিল। ১৫ বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠে এক মেয়ে-কুম্ভকর্ণ একদিন মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে তাকে বিছানায় বসাল।

'তুমি ডাক্তার দেখাও।' বীথি বলল।

তার মানে? অমিয় ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কেন? সে যেন জানাতে চায়, কী আমার অসুখ?

পেটে-ব্যথা, বুকে-কষ্ট, দাঁতে যন্ত্রণা, ম্যালেরিয়া, অ্যাপেন্ডক্স-কাটানো মায় কফে-রক্ত (৬ মাসের প্লুরিসি)—চিকেন পক্স আর টাইফয়েড একবার করে কার না হয়—ইত্যাদি আধি-ব্যাধির প্রায় সব ঘাটই অমিয় পেরিয়ে এসেছে। এতগুলো ঘাটের জল খেয়ে, বয়স বলতে বাধ্য হলে অমিয় এই যে এদাস্তি '৪৯' না বলে '৪৮' বলে, তার কারণ একটাই। কারণ এই যে, শেষোক্ততে এখনো চল্লিশ লেগে আছে এবং এ-রকম বলতে বলতে সে বোঝে বৈকি যে আসলে তার অসুখটা কী। শুধু একটিমাত্র চুল প্রকাশ্যে সাদা রেখে সে যে তার ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে এবং ভূর ৫টি পাকা চুলে নিয়মিত কলপ লাগায়—অথচ, সিক্সটি পার্সেন্ট পেকে যাওয়া সত্ত্বেও মাথার চুল লাগায় না—এর মানেটা কী? এও তার ঐ আসল অসুখের স্ব-রচিত প্রেসক্রিশান—কোনও ফার্মাকোলজিতে পাওয়া যাবে না অবশ্যই। চ্যালেঞ্জটা হল, মাথার চুল বেশ কিছু পাকলেও, হুঁহুঁব্‌বাওয়া, আমার ঐ বিলকুল-কালো জোড়া-ভূ আর কুল্-কাঁচ্চা এক-পাক্কা দাড়ি দেখে একবার ভাব দেখি যে আমার পিউবিক হেয়ারও টু-দ্য-লাস্ট-স্ট্র কাঁচা নেই! বড় জোর একটি-দুটি পেকেছে, আর কত। স্টেটসম্যানের কাছে গাড়ি রেখে একদিন, কোনও একদিন, লিন-লিন হুয়া থেকে জুতো কিনে পথে নেমে—সহসাই—যেন জীবনের পারে—উনুন থেকে সদ্য-নামানো ধোঁয়া-ওঠা কচি ভুট্টায় নুনসহ নোংরা লেবু মাখাতে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ, ফের সেই যে চালু হয়ে গেল অমিয়, তারপর আর কখনো দাঁড়ায় নি। কেন? এ তো কিছু কাল-পরশুর ঘটনা না, গত বছর বর্ষাঋতুর ব্যাপার—আজও ভোলে নি। কেন? কারণ, পাবলিকে জানে না, এ শুধু অমিয় জানে যে তাঁর কষে তিন-তিনটি দাঁত আর নেই এবং সামনের দিকে তার ক্যানাইন তথা কুকুর-দাঁতটিও বাঁধানো। গত বর্ষাতেই দাঁতটি মূল থেকে আলগা হয়ে আসছিল।

তো, নানান ঘাটের জল খেয়ে, অমিয়, যখন সবে বুঝছে যে তার শিবের অসাধ্য আসল

অসুখটা কী, সেই সময়; এহেন লোডশেডিঙের মধ্যরাতে, ফোর্থ স্যাটার্ডেতে, ৪ পেগ হুইস্কির ঘুম থেকে তুলে—নিজেরও নিদেনপক্ষে ২টো গোলকুণ্ডার ঘুম মাটি করে—বীথি বলে কিনা, 'ডাক্তার দেখাও?'

বাইরে লোডশেডিং। তবে তাদের মাল্টি-স্টোরিডে, মে গড বী ব্লেস্‌ড্‌, জেনারেটর! বেড-সুইচ টিপতে গিয়ে আমিয়, কী ভেবে, হাত সরিয়ে নেয়। ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে রাস্তায় সিগারেট কোম্পানির 'মেড ফর ইচ আদার'-এর বিজ্ঞাপন নিবে থাকার পর, এই সময় ৫ সেকেন্ড ধরে জ্বলে থাকে ও তার এ্যাসিড-ব্লু নীলে সে বীথিকে বেশ দেখতে পায়। সার্টিনের কালো শায়া পরা আঁট-সাট নিম্নাঙ্গের ওপর বীথির ফর্শা বলশালী টোরসো সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। নারীর পক্ষে অতি-প্রশস্ত, তার আউট-সাইজ বক্ষপটে ফুলে-ফুলে ওঠা ফর্সা স্তনদ্বয়ের ওপর দুখণ্ড রুবির মতো এখন-শক্ত বৃন্তদুটি ধ্বকধ্বকিয়ে জ্বলছে।

বীথি কি আজ চুল বেঁধে শুতে আসে নি? নাকি, কী ভেবে, সে স্লুইস খুলে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে তার চুলের তোড়—শীতের এই প্রখর মধ্যরাতে সে যে কখন পাখা চালিয়ে দিয়েছে! পাখার ফুল স্পীড ও উত্তর দিক থেকে আসা হু-হু হাওয়ার হুটোপাটিতে সব চুল তার মুখের ওপর উড়ে এসেছে...চুলে, হাওয়ায়, কান্নায়, ভেজা সিঁদুরে সারা মুখ তার মাখামাখি—দেখে, সভয়ে, যুগান্ত পেরিয়ে—সহসা—যেন জীবনের পারে—দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত কাঞ্চনজঙঘা সিরিজের 'হানা বাড়ি' বইয়ের কাভারে প্রতুল ব্যানার্জির আঁকা সাপ-হাতে পাগলিনী রমণীর ছবি ছাড়া অমিয়র আর-কিছু মনে পড়ে না। পিছনে দাউ-দাউ আগুন।

প্রগাঢ়, হাস্কি গলায় বীথি বলল, 'তুমি আগে দেখাও। তারপর আমি দেখাব।'

এ-কিছু কফে-রক্ত, বুকে-কষ্ট বা গলা-খুচখুচের ব্যাপার না। 'মেড-ফর-ইচ-আদার' নিবে যেতেই, পরবর্তী ৫ সেকেন্ডের প্রথম মুহূর্তের অন্ধকারে অমিয় বুঝতে পারল বীথি কী বলতে চাইছে।

সব মানুষই বোঝে যে তাকে, কারুকে, কোনও-কিছুকে ভালবাসতে হবে। যারা কোনও 'কিছু'কে ভালবাসে, যেমন, মেসিন কি সেক্স, ফুটবল বা কবিতা—দেশ, রাজনীতি, বা, ধরা যাক, পথের একটা নেড়িকে ভালবাসে যারা—অথবা যারা ভালবাসে বিশ্বপ্রকৃতিকে— মোট কথা, কোনও 'কিছু'কে ভালবাসবে—ভালবাসবে—ভালবাসবে বলে, যারা এই পৃথিবীতে আসিতেছে চলে—তারা ভালবাসে বটে, কিন্তু ভালবাসা পায় না। অমিয় চেয়েছিল ভালবাসতে এবং ভালাবাসা পেতে। ভালবাসা পাবে বলে, সে তাই 'কারুকে' ভালবেসেছিল।

সে বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছিল, মেয়েরা নাকি ভালবেসে থাকে। প্রকৃতি বা নেড়ি কুকুরের মতো তারা অকৃতজ্ঞ নয়। তারা প্রতিদান দেয়। বা, ভালবাসে। বেলেঘাটার ধোবাপাড়ার প্রসিদ্ধ চাউল-বিক্রেতা হরিপদ ভৌমিকের বড় ছেলে ইকনমিক্সের অমিয়পদ ভৌমিক তাই অই উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য গড়চা ফার্স্ট লেনের ইংরেজি অনার্সের বীথি চক্রবর্তীর প্রেমে পড়েছিল এবং বাবা হরিপদ ভৌমিক ও তাঁর পরিবারের রক্তবেচা পয়সায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়াকালীন একদিন হঠাৎ অ্যালিয়াজ ফ্রাঁসের ফরাসি ভাষার ক্লাস থেকে ডেকে বীথিকে প্রেম-নিবেদন করেছিল।

অ্যালিয়াজ-এর করিডরে একটা মস্ত শেড-দেওয়া ঝুলন্ত ২০০ পাওয়ারের আলোর বৃত্তাকারে পরিধির মধ্যে, ক্লাস-ভাঙা ভিড়ের বিরুদ্ধে তারা তখন হাতে-হাত চেপে দাঁড়িয়ে। পাতলা ঠোঁটে ভারি সপতিভ হাসতে গিয়ে হঠাৎ, হঠাৎই থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল বীথি। 'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম'—তার প্রগাঢ় হাস্কি গলায় বের করে সে যে কতক্ষণ পরে বলতে পেরেছিল বীথি!

পাশ করেই বিখ্যাত মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি ভাট্‌চারিয়া অ্যান্ড ভোল্টে চাকরি।

ছোটবোনের বিয়ে সিক্সটি সিক্সের আগে হল না, তারপর বছর ঘোরার আগেই অমিয় বীথিকে তাদের ধোবাপাড়ার ফ্ল্যাটে নিয়ে এল। অত গাড়ি এক বিয়েতে ধোবাপাড়ায় কেউ কখন দেখে নি। সবই বীথির আত্মীয়-স্বজন।

প্রশস্ত জলাভূমির প্রান্তে ধোবাপাড়ায় তাদের একহারা দোতলা বাড়িটা খুব খারাপ ছিল না। 'ওমা, এত বক'— কৌমার্যহারা ঘুম থেকে জীবনে প্রথম জেগে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল বীথি। দিনকতক মনে হয়েছিল বুঝি বড় বেশ লাগছে তার। ছোট ভাই রবিকে চুল আঁচড়ে স্কুল পাঠাত, অমিয়র টাই বেঁধে দিত আর মার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত, যেন পোষা বিড়ালিটি। মাস ছয়েক যেতে না-যেতেই তবু, বীথি যেন হয়ে গেল গল্পের সেই জেলেনি, সোনার মাছ জালে পেয়েও মাছের কাকুতি-মিনতিতে যে তাকে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে, নির্জন বেলাভূমি পেরিয়ে, পূর্ণিমা রাতে, জলের ধারে গিয়ে জেলেনি যতবার তাকে ডাকবে, সোনার মাছ ততবার উঠে আসবে ও 'তবে তাই হোক' বলে তার প্রার্থনা পূরণ করবে।

'সোনার মাছ! সোনার মাছ!' মাত্র ৬ মাস যেতে না যেতেই সে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

তীরের কাছে এসে ঘাই মেরে অমিয় মুখ তোলে, 'কী চাও, জেলেনি?'

'আমি এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন সব বালিগঞ্জে। সোনার মাছ, তুমি বালিগঞ্জে একটা ফ্ল্যাট দ্যাখো।'

গোড়াতেই খোদ বালিগঞ্জে যেতে না পারলেও, প্রথম চোটে অমিয় অন্তত সেলিমপুর যেতে পারল। লেভেল ক্রশিং-এর ধারে ছিমছাম ৩-কামরা নতুন ফ্ল্যাট। বেডরুমে অফ্‌ফ-লিমন, বাকি দুটি ঘরে দুরকম রঙ, কনসিলড্ ইলেকট্রিক উয়্যারিং, দেওয়াল-আলমারি সব ইনসেটে— বড় বড় গরাদহীন ফ্রেঞ্চ উইনডো। ফ্ল্যাটে একবার ঢুকলে কে বলবে সেলিমপুর! মা বলেছিলেন, 'ওদিকে যাস নি রে অমি। আলাদা থাকবি তো এদিকেই থাক, বি. টি. রোডে কত সুন্দর সব ফ্ল্যাট হচ্ছে। ওখানকার ঠাট-ঠমক রাখতেই তোর সব রক্ত জল হয়ে যাবে বাবা।'

সেলিমপুরে সব ছিল, দরজা-জানালায় পেলমেট ছিল না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিস্ত্রি ডাকিয়ে এনে বীথি পেলমেট লাগাল, জানালায়-দরজায় ঝোলাল রাজস্থান এম্পোরিয়মের মোটা ক্যাসমেটের মেরুন পর্দা—মিস্ত্রি কিন্তু সহজে গেল না। সে, তারপর, ড্রয়িংরুমে তিনদিকের দেওয়ালে নিচু কিন্তু প্রশস্ত বেঞ্চ (পরে গদি দেওয়া হবে) এবং হেডরেস্টের জন্য দেওয়ালে ফ্রেম ফিট করাতে লাগল (পরে মণিপুরী মাদুর)।

এসব ১৯৬৭ সালের কথা। তখন বোন-ভগ্নিপোতরা আসত, রবি তো সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে রোজই চলে আসত। অমিয় তখন হাতে পায় মোটে ৮ কি সাড়ে-৮শ', বাড়িতে তখনও কিছু কিছু দিত। বাবা মারা যেতে শ্রাদ্ধের সব খরচ অমিয়ই দিয়েছিল। হাজার হোক, বীথির বাপের বাড়ির লোকজনের উপস্থিতিতে তার শ্বশুরবাড়িতে কাজ! সে ন্যাড়া হয়েছিল।

এবং চুলে চিরুনি চালাবার প্রয়োজন দেখা দেবার আগেই, একদিন অফিস থেকে ফিরে, মাই মাই, কাণ্ড দ্যাখো জেলেনির! ডাইনিং টেবিলের পাশে অমিতাভ্ বচ্চন সাইজের একখানা নীল গোদরেজ, ফ্রিজ একটি! পিসতুতো পিসিমার স্যাঁকরা অনন্তবাবুর কাছ থেকে মাত্র ৩০ টাকা সুদে ধার নিয়ে ১০০০ টাকা ক্যাশ ডাউন নিয়ে সার অধীপের ভাগ্নের দোকান থেকে (আত্মীয়) বীথি ঠেলার সঙ্গে সারা রাস্তা রিক্সায়, আজ দুপুরেই এটা এনেছে এবং নিজে মুটে ডেকে তুলিয়েছে। বাকি আড়াই হাজার কিস্তিতে দিলেই হবে।

৩০ টাকা? মাসে নাকি? হ্যাঁ, মাসে। মাসে না তো কি বছরে! দীর্ঘশ্বাস চাপলেই অমিয়র

নাকের পাটা কাঁপতে থাকে। ঈষৎ হাঁ করে শ্বাসমোচন করবে বলে সে প্রস্তুত, বীথি হঠাৎ তার গলা ধরে ঝুলে পড়ে। আ, বীথি শুধু ফ্রিজই আনে নি, এক ফাঁকে ইভ্‌স্ পার্লার থেকে চুলও তৈরি করে এসেছে। এই অ-দেখা হেয়ার-ডু ও তার অনাঘ্রাত সুগন্ধ, আকাশে যেমন মেঘ তেমনি অমিয়র বুকে লেগে থাকা বীথির ফ্রেঞ্চ-জানা স্তনদ্বয়, এই বাহুল্যবর্জিত পেট—অমিয়র হাত এখন যেখানে—আর ঠেঁটের ওই সুশিক্ষিত পাউটিং—একে উপেক্ষা করার সাধ্য লেট হরিপদ ভৌমিকের চতুর্দশ পুরুষের নেই, অমিয় টের পায়।

'ত্রে বিয়াঁ! নেস্‌পা?'

এর মানে কী অমিয় জানে : চমৎকার, নয় কী? বীথি তাকে এই প্রশ্ন করে থাকে এবং এর উত্তরও সে-ই তাকে শিখিয়েছে। কোন বিষয়ে সে জানতে চাইছে বুঝতে না চেয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মতো, কৃতজ্ঞ পড়ুয়ার অস্ফুট স্বরে অমিয় বলে ওঠে : 'উই, মা শেরি!' অর্থাৎ, হ্যাঁ, প্রিয়তমা!

'মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা ধারশোধ করতে তুমি পারবে না?' উদ্ধত ঠোঁটে আমন্ত্রণ আধ-খোলা রেখে বীথি জানতে চায়। এমন মেয়ে কোথায় পাবে অমিয়, বিয়ের দুবছর পরেও যার ঠোঁট, চুমু খেলেই, অমন টকটকে লাল হয়, আর ফুলে ওঠে?

'সোনার মাছ, তুমি না পুরুষ মানুষ?' জেলেনি আরও বলেছিল।

১৯৭৫-এর শুরুতেই, কার্লেকার, চৌবে, সান্যাল, চৌধুরি সকলকে কাটিয়ে, বিদেশ বোসের চেয়েও ভাল ড্রিবলিং করে, ভাগ্যিস কোম্পানির দুবাই প্রোজেক্টের অফারটা পেল অমিয়। ওখানে কাম ফতে করে, দু-বছর পরে ফিরে এল প্রোজেক্ট প্রোমোশনের ২নং হয়ে। ১নং হতে আরও ৩ বছর।

'সোনার মাছ! সোনার মাছ!' নির্জন বেলাভূমি পেরিয়ে, পূর্ণিমা রাত্রে, আবার একদিন জলের ধারে গিয়ে জেলেনি তাকে ডাকে।

তীর এবং জলের সীমারেখায় এসে, ঘাই মেরে মুখ তুলে অমিয় বলে, 'আবার কী চাও, জেলেনি?'

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর নির্মীয়মান এক মাল্টি-স্টোরিডে ৫-তলায় পূর্ব-দক্ষিণ খোলা একটি ৩-কামরা ফ্ল্যাট দেখে এসেছে বীথি। আপাতত মাত্র ৪০,০০০ টাকা ক্যাশ ডাউন দিয়ে অমিয়কে সেটা কিনতে হবে। বাকি ২ লাখ ইনস্টলমেন্টে।

'দেখুন, এইভাবেই আজ টিভি, কাল ফ্রিজ, পরশু ফ্ল্যাট—এ, ম্যা—মানে এইসব প্রসব করতে করতেই আপনি বলতে পারেন—কোথা দিয়ে যে ওর ১৫টা বছর কেটে গেল! তারপর গত শনিবার...'

অলিভ কর্ডুরয়ের আঁট-সাঁট প্যান্টটা একটু আগে নিজের হাতে টেনেটুনে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়েছে অমিয়। সে তখনও ডাক্তারের ছ-তলার চেম্বার সংলগ্ন বেডের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। অঝোরে পাউডার-মাখানো ডান হাতের গ্লাভ্‌স টেনে খুলতে খুলতে ডাঃ ব্যানার্জি যখন পেশেন্টের উন্মুক্ত পাছার দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, 'বিয়ে তো পনের বছর করেছেন বলছেন, এতদিন কী করছিলেন', তখন অমিয় গলাটলা ঝেড়ে ঐভাবে শুরু করল।

এতক্ষণ প্রস্টেট ম্যাসাজ হচ্ছিল তার। এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে স্পেশিমেন দিতে আসতে হয়েছে। প্যান্টুল খুলে তাকে উপুড় হয়ে শুতে হয়েছিল এ কারণেই। কেননা, গুহ্যদ্বারের বদলে গলা দিয়ে বাঁশ চালালেও কি এক ফোঁটা সীমেন পাওয়া যাবে!

প্রথম যেদিন আসে, সেদিন অবশ্য ঠিক প্রস্টেট ম্যাসাজ হয় নি। হাতে দুটো স্লাইড ধরিয়ে

ডাঃ ব্যানার্জি বাথরুম দেখিয়ে বলেছিলেন, 'যান, ওখানে মাস্টার্বেট করে এতে একটু স্পেসিমেন আনুন।'

'জাস্ট ওয়ন ড্রপ উড ডু' বলে কড়াৎ করে খুলে-আসা দাঁত মাড়িতে ফিট করে নিয়ে, বেলের ডাঁটির ওপর সস্নেহ চাপড় মেরেছিলেন একটি। অর্থাৎ নেকস্ট।

আজ তো তবু ঢের সম্মানজনক! বন্ধ বাথরুমের মধ্যে একা-একা, নতমুখ নুঙ্কু হাতে, ও-হো, সেদিন সে কী চোখের-জলে বীর্যের-জলে অবস্থা তার। ৪৮ তো নয়, এই আসলে ঊনপঞ্চাশ বায়ুতাড়িত বয়সে, সে একবার, ফাঁসির মঞ্চের ওপর শহীদ-সুলভভাবে মাথা তুলে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল।

নিচে শীতের পার্ক সার্কাস ময়দান। ধবধবে শেরোয়ানি ও ফেজপরা এক রোগা ও বৃদ্ধ মুসলমান লোহার গেট ঘুরিয়ে ছড়ি-হাতে পার্কে প্রবেশ করছেন, সে দ্যাখে। পার্কে কুয়াশা।

'আপনি উঠে বসুন।'

ডাঃ বামনদেব ব্যানার্জি বেঁটে-খাটো মানুষ। গা থেকে অ্যাপ্রন খুলে তিনি ঘুরে দাঁড়াতে, অমিয়র মনে হল, অত প্রশস্ত আউটসাইজ বক্ষপট আর একটু দীর্ঘদেহীকেই মানাত যেন। প্রখ্যাত ভ্রূণতত্ত্ববিদ আজ একটি ডাভ-গ্রে রঙের দামি স্যুট পরে আছেন, গলায় পোলকা-ডট টাই, গ্লাভ্স খোলার সময় চীজ কটন সাদা সার্টের কাফের বাইরে তাঁর একরাশ রোমরাজি সে আগেই দেখেছে। কৃতজ্ঞভাবে সে উঠে বসল।

'হ্যাঁ, বলুন, কী বলছিলেন—'

সুচিন্তিত কিছু বলার আগে অমিয়র কপালে ভাঁজ পড়ে। তার নাতিপ্রশস্ত কপাল ভাঁজে-ভাঁজে ছোট হয়ে এল।

'দেখুন ডাক্তারবাবু' বলে সে একবার থামল। তারপর বলে গেল, 'হ্যাঁ, যা জানতে চাইছিলেন—১৫ বছর কী করছিলুম, তাই না। দেখুন, ঐ যা হয়, বিয়ের পর প্রথম ৫ বছর আমরা বাচ্চা চাই নি। তারপর বছর দুই এক্সপেকটেশনে কাটছে—এই হল বলে—কোম্পানি দুবছরের জন্যে দুবাই পাঠাল। ৯ বছর হয়ে গেল, তাই না? ফিরেই ১নং হবার জন্যে র‍্যাট রেস তিন বছর—আমাদের এক্সিকিউটিভদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে আর কি—এ, ম্যা—আমরা এটাকে বলি বট্‌ল-নেক। তারপর ধরুন, ফ্ল্যাট-কেনাকিনি। তৈরি হতেই তো ১ বছর লেগে গেল। কত হল?' লুকিয়ে কড় গুনে যাচ্ছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল অমিয়, 'প্রায় ১৩ বছর হয়ে গেল, তাই না? তারপর এই শেষের ২ বছর আমরা যখন মুখে না মানলেও, মনে মনে মেনে নিয়েছি যে আমদের বাচ্চা তাহলে হল না, এমন সময়—ঐ যে সেই ২১ ঘণ্টা লোডশেডিঙের দিন...'

'১৪ই ডিসেম্বর—'

খুব সীরিয়াসলি বলে যাচ্ছিল অমিয়। বাগ্মিতায় বাধা পেয়ে থতমতভাবে, 'আ-হ্যাঁ, আঁজ্ঞে-হ্যাঁ, বলে সে ফের শুরু করল, 'মাঝরাতে, বুঝলেন না, ঐ যাকে গর্ভ-উন্মাদনা না কী বলে না—অবিকল আপনার সেই ব্যাপার।'

'বোধহয় হঠাৎ মনে পড়েছে ওর মেনাপজের আর খুব বেশি দেরি নেই,' এত বলে, বুক খালি করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অমিয় মাথা নিচু করল।

প্যাড টেনে নিয়ে ডাঃ ব্যানার্জি এবার প্রেসক্রিপশান লিখতে বসলেন। হাতের কাফের বাইরে চওড়া রিস্টের অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে, অমিয় আবারও সেখানে রোমরাশির ঘটা লক্ষ্য করল।

লিখতে লিখতে ডাঃ ব্যানার্জি বললেন, 'আপনার লাস্ট উইকের সীমেন-রিপোর্ট ইজ পাহ্‌ফেক্টলি নর্মাল। আমি সিওর হবার জন্যে আজ সোর্স থেকে স্পেশিমেন নিলাম, তবে

রিপোর্ট সাধারণত একই হয়। আর, আপনাকে তো আগেই বলেছি, মিসেস ভাউমিকের প্যাথলজিকাল রিপোর্ট ইজ পাহ্‌ফেক্টলি হেল্‌থি। আপনার সন্তানের মা হতে ওঁর অন্তত রিজ্‌নেবল কোনও বাধা নেই।'

লিফ্‌ট চলছিল। ৬ তলার চেম্বার থেকে অমিয় সিঁড়ি ভেঙে পথে নামল। একটা ট্যাক্সি ডাকতে গিয়ে, না ডেকে, সে ঠিক করল, বেকবাগান পেরিয়ে, খানিকটা পর্যন্ত আজ হেঁটেই যাবে। সে ডান দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল। কুয়াশা কেটে শীতের ঝলমলে রোদ এখন রাস্তার এ-দিকেই।

ওষুধ মাত্র ৩টি হলেও ৬ পৃষ্ঠার একটি রচনা-বিশেষ এখন তার পকেটে। প্রায় মিনিট-পনের ধরে একটা ছকের ওপর মোট ২৮ দিনের ব্যাপার প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডাঃ ব্যানার্জি। সামনেই পীরিয়ড। পীরিয়ডের দ্বিতীয় দিন থেকে লিনোরিল (ট্যাব) ২-টো করে প্রথম ৫ দিন, মোট ১০টা। পরে ৫ দিন রোজ ২-টো করে ফার্টিল। এর পরে প্রোফাসি। এটা ইটালিয়ান ওষুধ, দাম ভালই এবং বলাবাহুল্য ইনজেকশান। 'কলকাতায় পি জি-র কাছে 'ভূপি' বা দেজ মেডিকেল ছাড়া এ ওষুধ আর কোথাও পাবেন না।' পীরিয়ডের ১১ থেকে ১২ তারিখে প্রতি পীক পীরিয়ডে এই দুটি ইনজেকসন মিসেস ভাউমিককে নিয়ে যেতে হবে।

'আসলে পীক পীবিয়ড বলে কিছু নেই', ডা: ব্যানার্জি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা, বডি-টেম্পারেচার নাইনটি-এইট ডিগ্রি থাকা চাই—ঐ সময় মিসেস ভাউমিকের যেটা প্রায়ই থাকে না। 'অ্যান্ড দাট ইজ দ্য হার্ট অফ দা মাটার!'

প্রোফাসি ২৮ দিনই ঐ টেম্পারেচার রাখবে, দরকার হলে আফটার দা ফোর-প্লে ইজ ওভার অ্যান্ড জাস্ট বিফোর এনটারিং মুখে থার্মোমিটার দিয়ে একবার দেখে নিতে পারে অমিয়।

'কিন্তু ডাক্তারবাবু', চোরাবালিতে ডুবন্ত লোকের মতো দু'হাত তুলে অমিয় বলেছিল, 'সামনের মাসেই আমার ৩ দিনের ট্যুর।'

'স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন।'

'ওভার-নাইট ট্রাভেল...'

'নো প্রবমেল। ট্রেনে যান।' হুকে-টাঙানো আপ্রনের গভীর পকেটে কনুই ডুবিয়ে ফী-এর টাকা রাখতে রাখতে ডাঃ ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'ইউ ক্যান অলওয়েজ হায়ার আ কুপে, কান্ট ইউ?'

'ইন সাম', ডানহাতের আঙুলে বাম হস্তের অঙ্গুলি-সন্নিবেশ করে ডা: ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'ইউ-মাস্ট ওয়ার্ক আপন হার ডেয়লি অ্যান্ড উইদাউট ফেইল। অ্যাণ্ড আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দা মিরাক্‌ল টু হ্যাপেন উইদিন দা নেক্‌সট সিক্স মান্‌থস্‌!' বাম ও দক্ষিণের দ্বন্দ্বমূলক সিনথেসিস থেকে ডান হাত খুলে তারপর বেলের ডাঁটিতে সস্নেহ চাপড় মেরেছিলেন একটি। অর্থাৎ নেক্‌স্ট।

বেক্‌বাগানের মোড়ে বাস স্টপে এক অন্ধ বাদক হেটোর ওপর কাপড় তুলে উবু হয়ে বসে হার্মোনিয়মে ফোক সঙ বাজাচ্ছে। গায়ে ময়লা ফতুয়া, বন্ধ দরজার ওপর রিপিটের মতো তার মুখময় ফাটা বসন্তের দাগ, বেশ স্টাউট লোকটি, প্রায় তার সমবয়সীই হবে অমিয় লক্ষ্য করল। তাকে ঘিরে বর্তুল ভিড়। এক চক্ষুষ্মান মেয়ে-কাউন্টার বৃত্তের বাইরে আলুমিনিয়ামের তোবড়ানো গামলা হাতে ঘুরছে। বেশ বড়সড় গামলাটি, আর তাতে অন্তত মিনিটে গড়ে চারবার 'ঠঙ' 'ঠঙ' করে শব্দ হচ্ছে।

লয় ঈষৎ দ্রুততর করে দিয়ে, একদম জমিয়ে দিয়েছে লোকটা। সে বাজাচ্ছে:

বরলোকের বিটি লো
লম্বা লম্বা চুউ-উল
অমন মাথায় বেন্‌ধে দিব
লাল গেন্‌দা ফুল...

প্রথম মিনিটে যারা পয়সা দিল (অমিয় লক্ষ্য করল) :

১। মসজিদে প্রার্থনা সেরে মুখের পর্দা তোলা এক প্রৌঢ়া সুখী বিধবা (বিধবাই মনে হল);

২। স্কুল-ড্রেসে লা মার্টিনেয়ারগামী দুজন বালক;

৩। সমাসন্ন বাস ও গানের টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত একজন অফিস-যাত্রী (শেষ পর্যন্ত বাসের হ্যান্ডেল পরাজিত হল);

৪। আরোহীবিহীন রিক্সার হ্যান্ডেল মাটিতে নামিয়ে রেখে এক রিক্সাচালক; এবং

৫। স্টার্ট-দেওয়া ডাবল-ডেকারের দোতলা থেকে এক রাবীন্দ্রিক তরুণী (ছুঁড়ে-দেওয়া পয়সা, অমিয়কে অবাক করে, 'ঠঙ' শব্দে গামলার ঠিক মধ্যিখানে পড়ে)।

গানটির বীথিকার, সুরকার ও শিল্পীর উদ্দেশে তার অস্তিত্ব পাদস্পর্শের ভঙ্গিমায় বেঁকে যাচ্ছে দেখে, চমকে উঠে, অমিয়কে দেখবে বলে, সে, অমিয়, দুপা পিছিয়ে দাঁড়ায়।

সহসা, নাকের ডগা দিয়ে পলায়নপর একটি ট্যাক্সির উদ্দেশে 'এই ট্যাক্সি' না বলে সে আকাশমুখী গ্রীবা তুলে 'হূ-উ-উ-উ' বলে ডেকে ওঠে। গীয়ার-অ্যাক্সিলেটর-হাত-পা'র ব্রেক সবকিছু একসঙ্গে চেপে ট্যাক্সিটি মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে যেতে দেখে সে একটুও অবাক হয় না। শান্ত পদক্ষেপ গুণে সে ট্যাক্সিতে ওঠে বটে, কিন্তু, এত বেহুঁশ জোরে দরজা বন্ধ করে যে ঠক ঠক করে কেঁপে ওঠে গাড়িটা। দাঁতে-দাঁত চেপে 'ভূপি' বলতে গিয়ে তার দুসার দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত হয়ে পড়ে, মুখ সুচলো হতে থাকে, সূক্ষ্ম তারের মতো কয়েক গাছি লম্বা-লম্বা গোঁফও বেরিয়ে পড়ে ঠোঁটের চারপাশে। 'ভূপ্‌-পি!' বলে সে টাক্সিতে বসে হুঙ্কার দেয়।

এবং ঐ অমানবিক শব্দ-সংকেতের বিশদ ব্যাখ্যা বিনাই ট্যাক্সি তন্মুহূর্তে স্টার্ট নেয় ও এগিয়ে চলতে থাকে। কেননা, সেইসব শেয়ালেরা যারা জন্ম জন্ম শিকারের তরে দিনের বিশ্রুত আলো নিবে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে নীরবে প্রবেশ করে—বার হয়—চেয়ে দ্যাখে বরফের রাশি জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে...তাদের হৃদযন্ত্র আজ তার হৃদয়ে সংস্থাপিত হয়েছে, বেকবাগানের মোড়ে, সহসা নিজেকে দেখে জীবনের পারে, তাদের নিরভিসন্ধি তার স্নায়ু-আধারে অবশেষে কেঁপে উঠেছে।

তৃতীয় ওষুধটার নাম কী যেন? প্রোফাসি না প্রোফেসি? সে যাই হোক, 'ভূপি' থেকে দাঁত পর্যন্ত সশস্ত্র হয়ে আজ অমিয় বাড়ি ফিরবে। ভালবাসা পাবে বলে, কোনও-'কিছু'-কে না ভালবেসে সে ভালবেসেছে 'কারু'কে। এ তারই পছন্দ। আগামী ৬ মাস সে তাই উইদাউট ফেইল প্রতিরাতে বীথিকে ভালবেসে যাবে।

ভালবাসা কে না চায়?

*আজকাল রবিবাসরীয়, ১৯৮৩*

# সাপের চোখের ভিতর দিয়ে

জন্মবার আগে খুব চিন্তায় ফেলেছিল। নলিনীর মেয়ের ডাক নাম তাই চিন্তি। আজ চার তলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই চিন্তি বলল, 'বাবা, দশ মিনিট আগে এখান দিয়ে একটা সাপ গেছে।' বলে, করিডরের দেওয়াল বরাবর হাত স্ট্রেচ করে সে নলিনীর ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। আর সব ফ্ল্যাট অন্ধকার, শুধু তাদের ফ্ল্যাটটাই ঝলমল করছিল আলোয়। দূর থেকে, ঠিক যেন একটা ফানুস। নলিনী ভেবেছিল, আজ রাত হয়েছে, এ বুঝি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যেই। ভেবে খুশি হয়েছিল।

নলিনীর স্বভাবের একটা মাধুর্যময় দিক হল তার বিশ্বাসপ্রবণতা। স্বচক্ষে কিছু ঘটতে দেখলে তো কথাই নেই, এমন কি, কেউ, কোথাও, কোনও-কিছু ঘটেছে বললেও সে তৎক্ষণাৎ তা বিশ্বাস করে ফ্যালে। আর যে-কেউ হলে এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করতই। হোক না ডানলপ ব্রিজ পেরিয়ে রথতলা, না হয় লিফ্‌ট নেই, জেনারেটর নেই—মাল্টি-স্টোরিড তো বটে। বাকি বাহান্নটা ফ্ল্যাটের যে কোনও বাবা এমনাবস্থায় 'যাঃ', 'সে কী রে' বা অন্তত 'তাই নাকি' বলতই। কিন্তু শুনে, নলিনী শুধু দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বলল, 'কোন ঘরে ঢুকল সাপটা?'

তাদের ৭৫০ স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটে দুটি ঘর। এইটুকুর মধ্যে তুলনায় বড় ঘরটি, বলা বাহুল্য, চিন্তি ও মমতার শোবার জন্য। অপর ঘরটি একাধারে আপ্যায়নখানা ও নলিনীর শয়নকক্ষ। সারাদিন ধোপা থেকে বাড়িঅলাসহ যাবতীয় আত্মীয়-অতিথির নিতম্ব-লাঞ্ছিত হয়ে, মেয়ে বড় হবার পর থেকে, সোফাটি নিজের ভাঁজ খুলে রাত্রে বিছানায় পরিণত হয়, সেখানেই নলিনীর শোবার ব্যবস্থা।

আসলে, আদৌ বিচলিত হবার আগে একটা প্রশ্নের জবার পাওয়াই ছিল ঢের বেশি জরুরি। বিচলিত হওয়া অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটি পারে না। নলিনী তাই নিঃসন্দেহে হতে চলেছিল। যে, সাপ তো ঢুকেছে। কিন্তু কোন ঘরে। তার ঘরে, না চিন্তিদের ঘরে? উত্তরের জন্যে তার সর্বস্ব বাজি ধরে সে অপেক্ষা করছে, সে দ্যাখে।

'ঐ স্টোর রুমে ঢুকে গেল।' চিন্তি বলল।

মেঝের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চিন্তি এতক্ষণ তার ডান হাতটা মেলে রেখেছিল। এবার সে হাত নামায়। চিন্তি যে দিকে হাত তুলেছিল বা তার অলীক অঙ্গুলি-সঙ্কেত এখনও যে দিকে, সেদিকে যে আরও একটা ঘর আছে—মমতার স্টোর রুম—এটা ভুলেই গিয়েছিল নলিনী। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল, স্টোর রুমের দরজা নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ। নিশ্ছিদ্র? আর-এ! না তো। একটা কেঁচোরও আরামে বেরুবার উপায় নেই, এমন একটা গর্ত এতদিনে চোখে পড়তে নলিনী গোটাকতক ঝাঁটার কাঠি সহযোগে সেটাও বন্ধ করে দিল।

'অবিকল রেপসীড রঙের, এই লিকলিকে সাপটা!' মমতা এতক্ষণে শুরু করল, 'আমি রান্নাঘরের সামনে, দেখি, একটা আরশোল্লা ঢুকছে আর বেরুচ্ছে—তারপর দেখলাম সাপের মাথাটা—আমি প্রথমে ভেলেছিলাম আরশোল্লাটাই, সাপের মাথা অনেকটা আরশোল্লার মত না? আর রঙটাও একই রকম। চুপচাপ পড়ে ছিল। যেই আমি হুশ-হাশ করেছি—আরশোল্লা ভেবেই—অমনি স্রিক স্রিক করে জিবদুটো...'

'ও বাবা গো,' দাঁড়ানো সাপিনীর মতো এঁকে-বেঁকে দুলে উঠে শিউরানিতে নরম হাতটা বাড়িয়ে দিল চিন্তি, 'বাবা, হাত দিয়ে দেখ!' হাত দিতে হবে না, নলিনী স্বচক্ষেই দেখতে

পাচ্ছে, গাত্রবর্ণের সঙ্গে এতদিন মিশে-থাকা চিন্তির হাতের রোমরাজি এখন পাখার হাওয়ার ফুরফুর করে উড়ছে।

''আমি 'চিন্তি, সাপ সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই হিলবিল করে ছুটে সাপটা স্টোরে ঢুকে গেল। তুমি মাত্র দশ মিনিট আগে এলেও...' মমতা বলল।

'বাঞ্চোৎ!'

মাথার ভিতরে দাঁত-দাঁতে ঘসার শব্দ শুনতে পেল নলিনী। বহুদন্তী করাতের মতো আত্মকর্মক্ষম এক ক্রোধ কেটে দু-ফাঁক করে দিচ্ছে তার মাথা, তবু নলিনী দেখল, আজ ৪৬ বছরে সে কারুর উদ্দেশে, কখনো, একা-একাও, 'খানকির ছেলে' কথাটি বলতে পারে নি এবং সামন্তদাকে মনে-মনেও ঐ বলে সে আজও সম্বোধন করতে পারল না। অথচ, আজকালকাল ছেলেরা কত না অবলীলায় দু'অক্ষরের ছাপার অযোগ্য শব্দটি ব্যবহার করে। এই তো সেদিন, ঝকঝকে সকালবেলা, বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগেই, মিনিবাস থেকে প্যারেডের স্পটলেশ সাদা পোষাকে হেয়ার স্কুলের সামনে নামল স্টার পেতে-পারে-এমন দেখতে দুটি ছেলে। তিনজনের সিটে তার পাশেই বসেছিল তারা। সালমা আগার 'দিল কি আরমা আঁসুও সে বসে গয়ে' গানটি সুর-সহযোগে শুনিয়ে দিয়ে একজন তার সতীর্থকে কেমন নিষ্পাপ কণ্ঠে জানাল, ''যা গেয়েছে না, চোখে বাঁড়া জল এসে যায়!' নলিনীদের টাইমে এক্ষেত্রে তারা বড় জোর 'মাইরি' বলত।

আজ হয়েছিল কী, সামন্তদা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অম্বর-এ। তিনজনের সিনিঅরিটি ড্রিবল করে এই ঘোর বামফ্রন্ট আমলে সামন্তদা সুপারিনটেন্ডিং। এঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন, মন্ত্রী আজই নলিনীকে অফিস-অর্ডার করতে বলেছেন। এখন কিছুদিন অফিসিয়েট করবেন, পরে ভেকেন্সি হলেই...কংগ্রেস আমলে এক্সিকিউটিভও ঠিক এইভাবেই হয়েছিলেন। সেবারেও খানা ও পিনা হয়েছিল এবং এই অম্বর-এই। এবার মন্ত্রী কাল ভোরেই জলপাইগুড়ি যাচ্ছেন, ফিরতে সাত দিন। সই না হওয়া পর্যন্ত, এবার পুরো এক সপ্তাহ খবরটা চেপে রাখতে হবে। অবশ্য উনি সে-কথা উল্লেখও করবেন না, নলিনী নিজেই এটা করবে, বন্ধু কিনা! তবে, পুরো এক সপ্তাহ, এবার তাই খানা-পিনার ঘটা একটু বেশিই ছিল। বস্তুত, ফেরার পথে, গাড়িতে, সোনাগাছির শেফালির ঘরে একবার টুঁ মেরে যাবার প্রস্তাব উনিই তুলেছিলেন। কিন্তু সোনাগাছির কাছাকাছি বিবেকানন্দ-সেন্ট্রাল অ্যাভিনুর নাথু-সঙ্কটে পৌঁছে সতীরই জয় হল। হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠে সামন্তদা হেঁকে উঠলেন, 'পরিতোষ, বাঁয়া চল। নাঃ, তোর বৌদি জেগে আছে রে!'

'বৌদি এখনো আপনার জন্যে জেগে থাকেন বুঝি সামন্তদা?' কল্পনাশক্তিহীন, অ-দেখা বোকা রমনীটির জন্য স্মিত হাসিতে ভরে গিয়েছিল নলিনীর মাথা। মাত্র চোদ্দ বছর তাদের বিয়ে হয়েছে, মমতা আর জেগে থাকে না। লোড়-শেডিং, এত রাতে সব ফ্ল্যাট অন্ধকার, শুধু তার ঘরে মমতার বদলে একটি সরু মোমবাতি জ্বলছে, সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিল।

যাবে তো বেলগাছিয়া, বাঞ্চোৎ কেন যে শ্যামবাজার দিয়ে গেল না। গাড়ি ছুটল মানিকতলা-পেরিয়ে। দীনেন্দ্র স্ট্রিট হয়ে। বেলগাছিয়া রোড ক্রশিং-এর আগে সামন্তদা ড্রাইভার পরিতোষকে হিন্দিতে 'রোক্‌কে' ও নলিনীকে তুই-তোকারি করে সস্নেহে 'এ-টুকু হেঁটে যেতে পারবি তো' বললেন।

পাঁচ-পেগের টলমলে ফুটপাথ ডাইনে-বাঁয়ে রেখে সে যখন ঈষৎ মনঃক্ষুন্নভাবে হেঁটে আসছিল শ্যামবাজারের দিকে, তখন, কে জানত, আজ কুড়ি বছরের সহকর্মীর সবচেয়ে নিরীহ অতটুকু খচরামিতে তার এক জীবনের ভুলচুক হয়ে যাচ্ছে! রাত তখন সবে সওয়া

১১টা। হাতে ঘড়ি না থাকলেও হ্যাঁ, কারেক্ট টাইম। কেননা, যেতে-যেতে, ১১ এবং এল-নাইনের লাস্ট বাসদুটো—মাত্র দশ-বিশ গজ দূরে সে তখন—শ্যামবাজার মোড় দিয়ে হুশ হুশ করে বেরিয়ে গেল। তারপর তিন টাকার শেয়ার-ট্যাক্সি ভর্তি হল, তারপর ডানলপ। তারপর রিক্সায় রথতলা। এতেই সাপ বেরনোর চেয়ে ১০ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল নলিনীর।

মমতা টেবিলে খাবার বেড়ে দিয়েছে। মেয়ের গালে হাত বুলিয়ে নলিনী বলল, 'এত রাত্তিরে তো কিছু করা যাবে না, মা। আজ দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। আমি কাল শালাকে ঘর থেকে বের করব।'

'থালা-বাটি সব বাথরুমে রেখো কিন্তু', বলে মমতাও মেয়ের সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকে ক্যাঁচ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

খাবার টেবিলে বসতেই সামন্তদার উদ্দেশে আবার তার ফনা খুলে যাচ্ছে, সে টের পেল। সত্যি, অফিসের গাড়ি, কনট্রাকটররা প্যান্টুল নামিয়ে তোর পোঁদে অত টাকা গোঁজে—আর মাত্র একটা স্টপ এগিয়ে দিলে সে লাস্ট বাসটা পায় ও সাপ বেরবার মিনিট পনের আগেই পৌঁছে যায়। সে তো কিছু দেখামাত্রই 'চিত্তি, সাপ সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠত না, সাপটা শুয়েই থাকত এবং আশা তো করে সে সাপটাকে মারতে পারত। মমতার ১৪ বছর ধরে জমানো গুদোমে সে এখন লুকিয়ে আছে কে জানে।

'তোর বৌদি জেগে আছে রে!' মুখ ভেঙিয়ে সে বলে ওঠে। আমার বৌদি কি ঝাঁপির ডালা তুলে বসে ছিল নাকি রে বাঞ্চোৎ, যে তড়িঘড়ি ফিরে সাপখানা না সেঁদিয়ে দিলেই চলছিল না? অত রাত্তির, আর মাত্র ৫০ গজ এগিয়ে দিলেই—

খাবার আগে আসনে বসে থালার পাশে সামান্য ভাত রেখে তাতে জল-ছিটে দিয়ে 'নমঃ শ্রীবিষ্টুঃ', 'নমঃ শ্রীবিষ্টুঃ' নমঃ শ্রীবিষ্টুঃ', বলে বাবা তিনবার গণ্ডুষ করতেন। জীবনে এই প্রথম খাবার আগে জল-ভাতসহ গণ্ডুষ করে, নলিনী সামন্তদার উদ্দেশে তিনবার উচ্চারণ করে 'বাঞ্চোৎ' বলল। এর বেশি কিছু পারল না।

শুতে গিয়ে নলিনী দেখল, বিছানা আজ খুবই পরিপাটি এবং মশারিটিও দুর্ভেদ্যভাবে গোঁজা। অধিকন্তু, বালিশের পাশে আজ তাদের ছয়-সেলের প্রকাণ্ড টর্চটি রয়েছে। মশারির ভেতর থেকে প্রকাণ্ড টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের খাঁজ-খোঁজ ভাল করে দেখে নিতে গিয়ে টর্চের আলো গিয়ে পড়ল মমতাদের শোবার ঘরের দরজায়। নলিনীর হঠাৎ মনে পড়ল তখন তারা ভদ্রেশ্বরে। বিয়ে তিন পেরিয়ে চার বছরে পড়ল, অথচ তখনও চিত্তি হয় নি, বা কিছুতেই হচ্ছে না—এ-রকম অবস্থায় বৌকে তৈরি করে, একবার পেচ্ছাপ করে আসবে বলে সে গিয়েছিল উঠোন পেরিয়ে টিনের চালের বাথরুমে। টর্চ জ্বালতেই দ্যাখে একটা সাপ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। না, ঠিক সাপ নয়, সাপের লেজটাই সে দেখেছিল। দেখে ভয় পেয়েছিল খুব। ফিরে এসে মমতাকে বলতেই, 'দূর, ও কিছু নয়, ওটা একটা টিকটিকি। তুমি এসো তো...' বলে যে বিপুল আগ্রহে কেঁপে উঠে দুহাতে তাকে বুকে টেনে নিয়েছিল মমতা, সেটা কাম বা গর্ভ-উন্মাদনা যা হয় একটা কিছু হবেই। সাপ দেখলে নাকি বংশবৃদ্ধি হয়। সে মাসেই চিত্তি পেটে এসেছিল।

কাল সকালে সাপটাকে পাওয়া যাবে কী? নলিনী টর্চ নেবায়। স্টোর রুমে আলো জ্বলছে। আজ সারারাত জ্বলবে।

২

নীল নাইলনের মশারির মধ্যে পরদিন নলিনীর ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। ঘুম ভাঙতে সে

প্রথমেই যা বুঝল, তা হল, কাল রাতে তাহলে সাপটা তাকে কামড়ায় নি। চিন্তি বা মমতাকেও সে কামড়ায় নি, সেটা তো বোঝার অপেক্ষাই রাখে না, কারণ, তাহলে সে এতক্ষণ ঘুমাত না। ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপ-ডিস নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এ-ঘর থেকে বেরলেই করিডর, বাঁ দিকে মমতার গুদোম ঘরটা। রাতের ঝাঁটার কাঠিসহ দরজাটা বন্ধই আছে দেখে সে বুঝল, ওটা এখনো খোলাই হয় নি। এমনিতেই কালে-ভদ্রে খোলা হয়, প্রয়োজনে মমতাই মাঝে মাঝে খোলে। ওতে আছে মাসের পর মাসের খবরের কাগজ, এ-যাবৎ সমস্ত বাঙলা ও ইংরেজি ক্যালেণ্ডার, চিন্তি যখন ফ্যারক্স কি ল্যাক্টোজেন খেত সেই তখন থেকে যাবতীয় খালি টিন ও কৌটো, নলিনীর ছয় মাসের প্লুরিসির সময়কার যাবতীয় ওষুধের শিশি, শ-পাঁচেক লিভ-ফিফ্‌টি-টু'র খোল, এ-যাবৎ ব্যবহৃত সমস্ত প্রসাধনী মায় সাবান ও টুথপেস্টের যাবতীয় অবশেষ। আজকাল খাবার জলে যে দু-চার ফোঁটা করে ওষুধ দেওয়া হয়, শুধু সেই জিওলিন-এর কৌটাগুলো যা খুব বেশি হবে না, এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার। সত্যি ঘাড়-ভাঙা টেবিল ল্যাম্প থেকে বতিল রেডিও, হাটাগোমারিয়ার বাঘ, ড্রাম-পেটা ভাল্লুক, শিলং-এর ঝুমঝুমি, ভদ্রেশ্বরের পাতকুয়ার দড়ি, দুমকার হাটে কেনা চাকা-বসানো কাঠের ওয়াকার যা ধরে চিন্তি প্রথম হাঁটতে শেখে, কী যে নেই ওখানে। তাদের ১৪ বছরের দাম্পত্যের সমস্ত ছেঁড়াখোঁড়া লেপ-তোশক ও জামাকাপড়ও ওখানে। গতবছর শাশুড়ি মারা গেলে, মায়ের যাবতীয় উত্তরাধিকারও মমতা ঐ ঘরেই গচ্ছিত করেছে।

বস্তুত, তাদের ছোটখাটো ফ্ল্যাটটি যে এমনিতে এত স্ট্রিম-লাইনড্ তথা বাহুল্য-বর্জিত—অত্যুক্তি বলতে একটা কুটোও নেই—তার আসল রহস্য মমতার ঐ গুদোমে। আজ ১৪ বছর ধরে একটা জিনিস ভাঙল কি বাতিল হল, অমনি দরজাটা প্রয়োজন মাফিক ফাঁক করে (যে জিনিসের জন্য যতটুকু), দাও গুদোমের মধ্যে ফেলে। নলিনী ঠাট্টা করে ঐ ঘরের নাম দিয়েছে 'মমতালয়'।

বেশ কিছুকাল আগে, কী কারণে যেন, একবার দরজাটা খুলেছিল নলিনী। ব্যাস, আর যাবে কোথা, যেন বিনানুমতিতে তার প্রাইভেট পার্টস-এ হাত দেওয়া হয়েছে, হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছিল মমতা। কিন্তু ততক্ষণে সে একটা মেমেন্টো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। তার আজানুলম্বিত বাঁহাত আমেরিকার স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো তুলে ধরে, জিনিসটা নাড়াতে নাড়াতে ও হাসতে হাসতে সে জানতে চেয়েছিল, 'আচ্ছা, এটা কী?'

'ওটা একটা প্যানের ডাঁটি', বলে তিড়িং-লাফে মমতা সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে।

'উঁ-হুঁ।' উত্তোলিত ডাঁটিসহ সরে গিয়ে নলিনী বলেছিল, 'আগে বল, এটা ওখানে কেন?'

'দাও বলছি! ভাল হবে না বলছি....'

'না। আগে বল।' স্মিতচক্ষু লিবার্টি-স্ট্যাচুর মতো সে এবার ঘাড় হেঁট করে।

'ওটা অ্যালুমিনিয়ম। বিক্রি হবে।' ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে আরক্ত মুখে মমতা বলেছিল।

'বিক্রি?' হাত নামিয়ে ডাঁটিটা হ্যান্ড-ওভার করতে করতে নলিনী সস্নেহে বলেছিল, 'কিন্তু মমতা, আজ ১৪ বছর ধরে জিনিস ঠাসছ ঐ একখানা পুঁচকে ঘরে, কাগজগুলো তো দেখলাম সিলিং ছুয়েছে—তোমার ক্রেতা কই! সে তো এল না?'

বলে অবশ্য, মেয়েরা গাড়িতে ওঠার আগে দরজা খুলে দাঁড়ানো সিভালরাস পুরুষের মতো, সে গুদামের দরজাটা ঠিক ততটুকু ফাঁক করে দাঁড়ায়, যাতে মমতা ডাঁটিটা ভিতরে নিক্ষেপ করতে পারে। সত্যি, আজ ১৪ বছর ধরে ব্যবহৃত যত টুথপেস্ট, যত অবশেষ সাবানের, সব মমতা ঐ ঘরে গুদামজাত করেছে। তা সংখ্যায় তারা, যথাক্রমে, ২০০ ও ৫০০ তো হবেই।

'রিটায়ার করার পর ঐ সব জিনিস ব্যাগে করে নিয়ে আমি শিয়ালদায় বসব।' মমতাকে

বুকে টেনি নিয়ে, কপালে চুম্বন করে ও চুলে জবাকুসুমের রক্তিম ঘ্রাণ নিতে নিতে সে সেদিন বলেছিল, 'স্রেফ সাবান আর টুথপেস্ট বেচেই বেশ কিছুদিন চলে যাবে আমাদের, কী বল?'

যুগান্তব্যাপী তাদের বিধুর দাম্পত্যে, সেদিনের মতো অমন রোমান্টিক মুহূর্ত আর কখনো আসে নি।

তো, সাপটা যে এ-হেন মমতা-গুদোমের ঠিক কোথায় লুকিয়েছে, তা মানুষের পক্ষে সত্যিই অননুমেয়, দাঁত মাজতে মাজতে সে বুঝতে পারল। চিন্তির খেলাদেলির বেডরুম সেটের সোফা থেকে বিছানায় শুতে যাচ্ছে হয়ত— এই মুহূর্তে! ও-হো, বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠা বলতে ঠিক কী বোঝায় সে টের পেল। শিউরে উঠল গা-টা। তবে যত ঘোরো-ফেরো বাছাধন, বেরবার কোন রাস্তা নেই। ও-ঘরে নর্দমা নেই। দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারলেও কথা ছিল। ঘুলঘুলি ছিল। চেষ্টা করবে নিশ্চয়। কিন্তু, ক্রুর হাসিতে নলিনীর ঠোঁট আরও পাতলা হয়ে এল, বৃথা এ সাধনা, ধীমান!

চিন্তির বাস এল বলে, সে স্কুলড্রেস পরছে। টেবিলে চায়ের কাপ ও কাগজ রেখে আঁচলে হাত মুছে মমতা বলল, 'সাপটা এমনিই বেরিয়ে যাবে, কী বল?'

'বেরুবে কী করে? নর্দমা তো তুমিই বুজিয়ে দিয়েছ? তা ছাড়া চার তলা...'

'ধুস! ও যেখান দিয়ে এসেছে সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে।' সত্যি, এইসব তাচ্ছিল্য করার সময় মমতার ঠোঁটের পাউটিং দেখার জিনিস। সম্রাজ্ঞীর এক-একটি ঠোঁট-ওল্টানোয় কত যে জাহাজডুবি হয়েছে আটলান্টিকে!

আজ ঊষা উথুপ মামলায় রায় বেরিয়েছে। আজ কাগজের হেডলাইন: ঊষার জিৎ, যতীন চিৎ। দেখেই নলিনী হেসে ফেলল। ঊষা-হাসি হাসতে হাসতে সে বলল, 'তাহলে তো ঝাঁটার কাঠিগুলো দরজা থেকে খুলে ফেলতে হয়!'

'ওমা, না-না' বলে একপায়ে কেডস পরে ছুটে এল চিন্তি।

'তবে থাক ওখানে মুখপোড়া। দরজাটা মাসখানেক না খুললেই হবে। পচে মরুক।'

'মরবে কেন?' নলিনীর এখন শুধু ঠোঁটে হাসি, 'তোমার গুদোমে যা ইঁদুর! বহু বছর বেঁচে থাকবে।'

'আমাদের ফ্ল্যাটে ইঁদুর আর বিশেষ নেই।'

'এ্যাঁ!' এতক্ষণে বজ্রাঘাত হল নলিনীর মাথায়। ইঁদুরগুলো গেল কোথায়?

'পালিয়ে-টালিয়ে গেছে।' ঠোঁট উল্টে মমতা বলল, 'মাঝে ফ্লিট-টিলট খুব দিয়েছিলাম না? আরসোল্লাও তো নেই।'

ফ্লিট! মশাই মরে না যাতে, তাতে ইঁদুর!

একটা গোটা দিগন্তকে যদি স্টেজ ভাবা যায়, যার ওপর এতক্ষণ ঝুলে ছিল মেঘের পর্দা—পুলিতে লগ্ন দড়ি টেনে কেউ যেন তা দু-দিকে সরিয়ে দিল। সে হঠাৎ বুঝতে পারল, কেন তাদের বাড়িতে আর একটাও ইঁদুর নেই, এমন কি আরসোল্লাও নেই। ক্রুর পাতলা হাসি ঠোঁট ছেড়ে ভরে দিতে থাকল তার মাথা, ও তাহলে এই ব্যাপার! মহারাজ তাহলে নৈশ ভোজনের কারণে বেরিয়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করেছেন। আই সি। ঐ কেঁচোর গর্তটা দিয়েই? নয়ই বা কেন। লখিন্দরের বাসরে তো সূচাগ্র ছিদ্রও ছিল না! ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। অন্তত, একটি টিকটিকির আশায় সে দেওয়াল থেকে দেওয়ালে তাকায়।

'আচ্ছা, আজকাল টিকটিকিও কত কমে গেছে দেখেছ মমতা! এও তোমার ঐ ফ্লিটের জন্যেই, কী বল?'

'তা কেন?' মমতা বলল, 'আমি কি দেওয়ালে ফ্লিট দিয়েছি নাকি? বোশেখ মাসে কলি ফিরিয়ে দিল না? তারপর থেকেই,' মমতা জানাল, 'এখন নেই বললেই চলে।'

এই গৃহস্থ বাড়িতে আর আরশোল্লা নেই। টিকটিকি নেই। ইঁদুর তো নেই-ই। মহারাজ তাহলে পুরনো অতিথি, সব সাবাড় করে মুখ-টুক মুছে বসে আছেন। এবার তাঁর আহার না-জানি কী দিয়ে হবে! চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে নলিনী ধীরে উঠে দাঁড়াল।

স্টোরের দরজা একদন খুলো না, আমি অফিস যাই খোঁজ-খবর করি। দেখি কী করা যায়'—অফিস যাবার আগে এর বেশি একটা কথাও সে বলল না।

৩

অফিসে অনেকের সঙ্গে কথা হল। সে দেখল, প্রায় সকলেই সর্প-বিশারদ এক-একটি। কেউ বলল, একটা বেঁজি কিনে ফেল। কেউ বলল, ময়ূর। সন্তোষদার সঙ্গে সেই ভদ্রেশ্বর-আমল থেকে পরিচয়। ভদ্রলোকের একটা করে দাঁত পলছে আর এক এক দাঁতে লম্বা লাফে পৌঁছে যাচ্ছেন শৈশবের দিকে। হাসিটি হচ্ছে ক্রমাগত সুন্দর। সুন্দরতর হেসে সন্তোষদা বললেন, 'তুমি এক কাজ কর নলিন। তুমি একটা ব্যাঙ কিনে নিয়ে যাও মার্কেট থেকে। জ্যান্ত পাওয়া যায়। দুটো ডালকোলেক্স পুরে দিতে বল ব্যাঙের পেটে। তারপর ওটাকে সাপের ঘরে ছেড়ে দাও। বাঞ্চোৎ, হেগে-হেগে—' সবাই হেসে উঠল। নলিনীও যোগ দিল। মেঘ যেন অনেকটা কেটে গেল।

সব শেষে সে গেল সামন্তদার ঘরে। লাইব্রেরি ফ্রেমের ডাঁটি ভেঙেছে, টেবিলের কাছে মুখ এনে সামন্তদা চশমা মেরামত করছিলেন। মাইনাস-৬, নলিনী জানে, মুখ তুলে উনি এখন অন্ধকার দেখছেন। বর্ণনা শুনে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'সে কী রে, এ তো খরিশ। গোখরোর বাচ্চা। বেহুলার বাসরে ঢুকেছিল।'

সন্তোষদার ডালকোলেক্স-প্রস্তাব তখনও নলিনীর মাথায় ঘুরছিল। জীবজগতের তুলনায় মানুষের উচ্চমন্যতার কমপ্লেকস থেকে সে হেসে বলল, 'বেহুলার বাসর? ও বাবা, তবে তো লখিন্দরকেই কামড়াবে।'

'হুডেড, না, ননহুডেড?'

'সে তো ছোবল দেবার সময় জানা যাবে। মরবার আগে একটা ডাইং ডিক্লারেশন রেখে যাব'খন।'

'না-না, ঠাট্টা নয়, হুডেড হলে তোর গোখরা। বা কেউটে! নন-হুডেড হলে ভাইপার। মানে সিরাম না অ্যান্টি-ভেনাম কী দেবে,' চশমার কব্জায় একটা আলপিন ঢোকাতে ঢোকাতে সামন্তদা বললেন, যেন বন্ধু, 'বলতে হবে তো ডাক্তারকে। তুই এক কাজ কর—চিড়িয়াখানার দাশগুপ্তকে ফোন কর, ডিরেক্টর। আমি বলে দিচ্ছি। যদি স্নেক-ক্যাচার কাউকে পাস একদম ট্যাক্সি করে নিয়ে যা' মুগা পাঞ্জাবির ঢোলা হাতা তর্জনী দিয়ে সরিয়ে সোনার ঘড়ি দেখলেন সামন্তদা, 'এখনো সময় আছে।' বলে গাইড আর একটা ১০০ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন, যেন বন্ধু। ঘুষ, নলিনী বুঝল। এক সপ্তাহ চুপচাপ থাকতে হবে। ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে সে অবাক হয়ে দেখল, সামন্তদা ইতিমধ্যেই চশমা মেরামত করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন চোখে।

শূ-শূ করে তিনবার সিগারেট টেনে ডিরেক্টর বললেন, 'দেখুন, শুনে মনে হচ্ছে চন্দ্রবোড়া। যদি বোড়ার বাচ্চা হয়, উই আর ইন্টারেস্টেড। লোক যাবে ধরতে। উই আর শর্ট অব আ বোড়া। এই, এঁকে স্নেক-হাউজের পীর মহম্মদের কাছে নিয়ে যাও।'

শ্বেতির দাগে ভর্তি কালো নূর-অলা পীর মহম্মদ ছেলেটি যুবাবয়সী। জলার পাশে চিড়িয়াখানায় অদ্বিতীয় উইলো গাছের ধারে বসে তার সঙ্গে অনেক কথা হল। পীর প্রথমেই

গোলাকার সর্প-গৃহটি দেখিয়ে বলল, 'চলুন সার, আগে সাঁপগুলো চিনে লিন।' অর্থাৎ, আগে, আপনার সাপটা আইডেনটিফাই করুন।

নলিনীর চোখের সামনে একটা ভয়াবহ দৃশ্যমালা ভেসে উঠল। মর্গে যেমন ডোম, একটার পর একটা গ্লাস-কেস টেনে বের করে মৃত সাপের মুখ দেখাচ্ছে তাকে পীর—কেসের ওপর লেখা: 'খরিশ (বিষাক্ত)'....

—না!

লাইডগা (নির্বিষ)—না। হলুদের ওপর মোটা কালো ডোরা—শাঁখামুটি (বিষাক্ত)—না। কালনাগিনী—লিকলিকে, সরু, ছোট্ট, কালো সোনার ওপর যেন চুনি-সেটের নেকলেশ, আ, অপূর্ব—(নির্বিষ)—না। শিশু চন্দ্রবোড়া—জমাট রেপসিড রঙের—লিকলিকে—বি-ষা-ক্ত—ল্যাজটা একটু নড়ে উঠল যেন কেসের ভেতর, মরে নি, বা, অমর বলে ঐ আবার বেঁচে উঠছে!

'না!' চমকে একটু সরে গিয়ে নলিনী বলল, 'আমি তো নিজে দেখি নি। চিনতে পারব না।'

## ৪

চিড়িয়াখানা কি সাপুড়ের ঝাঁপির বাইরে এবং ভদ্রেশ্বর বাদে নলিনী জীবনে দু'বার সাপ দেখেছিল।

সে জীবনে প্রথম সাপ দেখেছিল বাঙলা-বিহার সীমান্ত বরাবর, দুমকা রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সঙ্গে ছিল স্থানীয় স্কুল-শিক্ষক পল্টু সাহা। বিয়ের পরে-পরেই ড্রাই প্লুরিসির চিকিৎসা-অন্তে মমতার সঙ্গে সে ওদিকে গিয়েছিল মাসখানেকের চেঞ্জে। তখন সন্ধেবেলা। শেষ বাস বেরিয়ে গেছে। পাতাবেড়িয়ার দিকে টিলার পিছন থেকে একটু দেরিতে উঠছে পূর্ণিমার চাঁদ, দুমকা রোড ধরে চাঁদের আলো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তাদেরই দিকে। দুধারে শালবীথি।

গায়ে খোঁচা দিয়ে, ঠাণ্ডা গলায়, হঠাৎ পল্টু বলল, 'নলিনীদা, দেখবেন।'

পল্টু কী বলছে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে ভাগ্যিস বাঁ-পাটা আর ফেলে নি সে। তার পায়ের সঙ্গে উত্তোলিত কোলাপুরি চটির নীচে, আর-এ, দ্যাখো-দ্যাখো কী সুন্দর কুচকুচে ভেলভেট-কালো সাপের বাচ্চা একটা! তার ছোট্ট তুলতুলে শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে, আহা, বুঝি জীবনে এই প্রথম ফণা তুলেছে। যেন সে করজোড়ে বলছে, তার আধো-আধো গলা আজও কানে বাজে নলিনীর, 'ওগো পথিক, ওগো পা, ওগো চটি, দয়া করো আমাকে। আমাকে পিষে মেরো না!' নলিনী পা আর নামায় নি।

সে আর-একবার সাপ দেখেছিল রাজাভাতখাওয়া থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, সাইকেলে, মেসোমশাই-এর সঙ্গে জয়ন্তীর দিকে যেতে যেতে। স্কুল-ফাইনালের গেজেটে থার্ড ডিভিসন দেখেই সেবার মেসোমশাই-এর কাছে পালিয়ে গিয়েছিল। স্কুল ফাইনাল যখন, ১৯৫৩ সাল জুন-জুলাই হবে।

ডুয়ার্স সরলবর্গীয় বনাঞ্চল, এখানে সব গাছই আকাশ ছোঁয়া। মনে পড়ে, একটা কদম-বীথির পাশ দিয়ে উতরাই বেয়ে তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছে—মেসোমশাই অনেকটা এগিয়ে—অত উঁচুতে আর এত কদমফুল একসঙ্গে নলিনী আগে কখনো দ্যাখে নি তাই তার চোখ আকাশে, আর কমদফুল যখন, নিশ্চয়ই বাদল-দিনের ব্যাপার—হঠাৎ ক্যাঁচ করে ব্রেক কষার শব্দ। মেসোমশাই দূর থেকে হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বললেন। কাছাকাছি গিয়ে নলিনী

দ্ াখে সরু বনপথ জুড়ে, পাঁচ/ সাত ফিট দূরে, কদমকেশরের হলুদ কার্পেটের ওপর একটা শ্যাওলা ধরা গাছের ডাল পড়ে আছে। সে তো অন্তত তাই ভেবেছিল। নড়ে উঠতে ক্রমে বুঝেছিল সাপ। রাস্তা পেরিয়ে সাপটা বনের মধ্যে ঢুকে যাবার পরেও, সেখানে দাঁড়িয়ে, সে যে কতক্ষণ ধরে সে শুকনো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে তার চলে যাবার ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম শব্দ শুনেছিল। মেসোমশাই বলেছিলেন, প্রমাণ সাইজের শঙ্খচূড় লম্বায় ১০/১২ ফিট পর্যন্ত হয়, ফণা এত উঁচু হয় যে বুকের নীচে ছোবলের দৃষ্টান্ত নেই। রান-ওভার হলে, কী যে হত সেদিন, ওঃ হো, ভাবা যায়!

ঝুরি-নামা উইলোর ধারে বসে পীরের সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হল। পীরদের দেশ মুর্শিদাবাদে ভৈরব নদীর ধারে, চক ইসমাইলপুর থেকেও মাইল চারেক দূরে, গ্রামের নাম বাঁটি। চর একটা। সাপের সঙ্গেই তারা মানুষ। 'ছোট বেলায়, বুঝলেন সার, ডিম ফাটিয়ে খেউটের বাচ্চাগুলোখে বের খর্তুম—আর সে এই টুখটুখু—আর দু দিখে দু পাও রেকে তা-তা-তা-তা- তা-তা-তা-তা বলে তাঁড়া খর্তম—যতক্কণ না শালারা গরতে ঘেঁদোয়। পরে সার, এই জু-গার্ডেনে খাজ করতে এসে শুনলুম কি, ওই বাচ্চাগুলোতেও পুরা পয়জিন। তা, আমরা তো সার এমনিভাবেই মানুষ হয়েছি।' অর্থাৎ, দু পায়ের ফাঁকে মৃত্যুকে রেখে, ঐ তা-তা-তা-তা করে তাড়া করে।

'তবে ও সাঁপ সার আপনার ঘরে আর নেই, বেরিয়ে গেছে। সে আপনার চারতল্লা হোখ, দশ তল্লা হোখ, তার বেরবার রাস্তা শে ঠিখ খুঁজে লেবে। আর যদি থাখে, শুনুন সার, আপনাকে বলি। আমার চাচাতো ভাই এরফান আলি—তখুন এই দু বচ্ছরের হোবে—বাড়ির সামনে উঠানে চটের উপর শুয়ে হাত-পাও ছুঁড়ে খুব খেলছে আর হাসচ্ছে—ইয়াব্বড়া একটা গোকরো তার পায়ের খাচে। আমিই পরথম দেকেছিলুম। তা-তা-তা-তা-তা-তা করে ছেলেটা পাও ছুঁড়ছে আর গোকরোটা ইয়া ফণা তুলে মাথা দোলাচ্ছে আর ফোঁস-ফোঁস করছে,' ফোঁস বাদে বাঁ-হাতের কনুই-এর ওপর ডান হাত রেখে পীর দুলিয়ে দেখায়, 'সাঁপটা সার আমার ভাই-এর গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল।'

হাত নামিয়ে পীর এবার তিন-আঙুল দেখায়, 'সেই ভাই-এর সার আজ তিন খানা মিনি বস, মিটিয়াবুরুজে ভূষির কারখানা। লাখো রুপিয়ার মালিক। আর দেকুন সার, আমরা আর তেরোটা ভাই অ্যানা-ত্যানা করছি—দুজন ভিকারি...

'তাই বলছিলাম সার যদি ঘরমে থাখে তো থাখ, আপনি রাজা হবেন। জানবেন কী, আপনার রাইজের টাইম আসছে।' এবার হাত দিয়ে ফণা তুলে সে রাইজ-এর রূপকল্প দেখায়। মানুষের কী যে কখন মনে পড়ে, কেন যে। এমনি এক শোকাকুলা উইলো--ঝুরির নীচে একদিন ওফেলিয়া ভেসে উঠেছিল, তার কেন যে মনে পড়ল। আজ সেখান থেকে একটি সাদা রাজহংসী জল ঝেড়ে তীরে উঠে আসছে, সে দেখল।

চিড়িয়াখানা বন্ধর ঘন্টা বাজছে। পীরের হাতে ১০ টাকা আগাম দিয়ে নলিনী উঠে পড়ল। সে কাল আসবে।

সন্ধার কিছু পরে মিনিবাসে সে বাড়ি ফিরল।

সামন্তদার দেওয়া টাকাটা পুরোটাই থেকে গেছে। ধর্মতলায় পৌঁছে একবার ভেবেছিল, অম্বর-এ একটু বসে যাবে নাকি। সামন্তদাও থাকতে পারে। মদ না খেয়ে সে কী সসর্প সারারাত কাটাতে পারবে! কালকের রাতটা কেমন গ্লোরিয়াসলি কেটে গেল! এক ঘুমে রাত কাবার। কিন্তু আজ...তারপরই মনে হল, নাঃ, লাভ কী। মদ একটা চোখের ঠুলি বই তো কিছু না।

সে তো মদ খায় নি। ঠুলি পরে নি! সে সবই দেখবে, খোলা চোখে। আর সে দেখবে এমন দুটি চোখ দিয়ে, যে চোখে নিমেষের জন্যেও পলক পড়ে না। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া একরকম অ-মানবেয়, বিষন্ন মনে সে মাথা নাড়ায়।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই সে একটা তীব্র, অনাঘ্রাত কিন্তু সামহাউ ফ্রেন্ডলি গন্ধ পেল। কার্বলিক? হাঁ, খাঁটি কার্বলিক অ্যাসিডের কৃস্টাল কিনে এনে, শিশির মধ্যে রেখে, গরম জলে ডুবিয়ে, গালিয়ে, প্রতিটি নর্দমার মুখে আর দরজার চৌকাঠে ছড়িয়ে দিয়েছে মমতা। 'বাবা, দ্যাখো-দ্যাখো,' দুহাতে ঠেলে স্টোরের দরজাটা দু'হাট করে খুলে দেয় চিন্তি। একটা আলপিনও নেই এমন আসবাবহীন শূন্য ঘর থেকে সেই অনাঘ্রাত, তীব্র কিন্তু মলূক স্বস্তিদায়ক গন্ধ নলিনীর নাকে এসে লাগে।

ব্রাভো, আর-এ, এ যে দেখছি 'গুদাম সাফ!' করছে কী মমতা, একদিনে এ যে এক জীবনের কাজ করে বসে আছে। পাড়ার খোকা-গুণ্ডা কালা আর ভোলাকে এলে সে ৭২ টাকার খবরের কাগজ বিক্রি করিয়েছে। লে-লে-বাবু ৩০ পয়সা রেটে টুথপেস্ট-সাবান। থেকে কৌটা-টিন-শিশি-চিন্তির ওয়াকার—মায়, মায়ের উত্তরাধিকার—সব, সব বেচে দিয়েছে। 'বাবা দ্যাখ, এটা নিল না', সাদা সাবান-টুকরো দিয়ে তার তৈরি ছোট্ট তাজমহলটা দেখিয়ে চিন্তি ঠোঁট ফোলায়, 'বলল, এটা কেউ নেবে না।'

'পালিয়ে গেছে সাপটা। কোথাও নেই, কিছুতে নেই। কালা আর ভোলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। মা রবিবার ওদের মাংস খাওয়াবে বলেছে,' চিন্তি সোৎসাহে বলে চলে, 'বাবা, এবার আমাকে একটা ছোট খাট কিনে দেবে। টেবিল-চেয়ার কিনে দেবে। এটা আমার ঘর। আমি এই ঘরে থাকব। শোব। পড়াশোনা করব।' অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হবার আশায় তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৫

রাতে সে এসে হাজির।

ঝুম-ঝুম...ঝুম-ঝুম... ঘরের মধ্যে চকিতও ক্রুর, স্খলিত ঘুঙুরের শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই, মশারির মধ্যে থেকে, বাঁ-হাতে প্রকাণ্ড টর্চটা পাকড়ে ধরে নলিনী। ছয়-সেলের তীব্র আলো জ্বলে ওঠে।

ঐ! বিছানা থেকে অদূরে পিত্তলবর্ণের বিচ্ছুরিত শোভার মধ্যে সে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। গা থেকে গলে গলে পড়ছে তরল পিত্তল। মাথায় দুলছে ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপ।

ডলফিনের যেমন, তার দুদিকে দুটি ডানা। একটি ডানায় ধর্মতলা স্ট্রিটের দপ্তরি-পাড়ার এইটুকু সস্তা, সফট-কভারখাতা নাড়িয়ে করুণ, মিনতি-মাখা সুরেডানাদুটি জড়ো করে, সে বলছে, 'ওগো মানুষ, তুমি কি তোমার একটা অটোগ্রাফ আমাকে দেবে?'

অটোগ্রাফ? স্বপ্ন দেখছে নাকি নলিনী! না-আঃ ঐ তো তাদের পুবের বারান্দা, বারান্দায় জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় গ্রীলের ছায়া। ওখানে টবে, আজই তিনটে রক্ত-জবা ফুটেছে।

মমতার নাম ধরে চেঁচাবে নাকি সে? ভারি টর্চটা সে আর বাঁ-হাতে ধরে রাখতে পারছে না। তার হাত ভেরে আসছে। হাত পাল্টাবে নাকি নলিনী?

'না', কে যেন বলেই গেল তাকে, 'আলোর একটু নড়চড় হলেই মৃত্যু!' সাপের চোখের ওপর ছয়-সেলের তীব্র আলো ফেলে সে প্রস্তুরীভূত বসে থাকে। তার ফণা দুলে চলেছে। উজ্জ্বল পঞ্চপ্রদীপের একটির বুকে ঘৃতহীন পলতে চিড়বিড় করে পুড়ছে।

'ওগো, তুমি কি তোমার....'

ধুউস! নিশ্চয়ই স্বপ্ন। আচ্ছা, যদি সত্যি হয়, যদি সত্যিই জেগে উঠে থাকি, দেখি তো টর্চটা নেবাতে পারি কিনা। তাহলে না হয় স্বীকার করব যে, জেগে উঠেছি...সুইচ নামাতেই ঘর, একি, অন্ধকার হয়ে গেল!

তবে বুঝি আর কোনও সন্দেহ নেই যে, সে, নলিনী, নিঃসন্দেহে জেগে উঠেছে। জেগে উঠে, জীবনের বিশ্বাসযোগ্য অবিশ্বাস্যকে আজ, অবশেষে, সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে; সে এসেছে।

'মমতা!'

ফাঁসা গলায় নলিনী চেঁচিয়ে ডেকে।

উত্তর নেই

'চিন্তি!'

সাড়া নেই।

টর্চের ভারে খসে পড়ছে বাঁ-হাত, ও-হো, এই অনন্ত শাস্তির চেয়ে ওর ছোবল শ্রেয়। নলিনী আর পারে না। সে আবারও টর্চ জ্বালায়। কই, কিছু নেই তো। সে যত্র-তত্র আলো ফ্যালে: নেই। সে এখন তবে কোথায়। স্বপ্ন দেখছে কিনা শেষবারের মতো নিঃসন্দেহ হবার জন্যে নলিনী বারান্দায় টর্চ ফ্যালে। ঐ—তিন-তিনটে রক্ত-জবা টবে টকটকে করছে!

সন্তর্পণে মশারি তুলে সে মেঝেয় পা রাখে। না, গায়ে পড়ে নি। সারা ঘরে টর্চ-আলোর চাবুক মারতে মারতে পিছন ফিরে বারান্দায় গিয়ে সে মমতাদের ঘরের গরাদ ধরে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে হাঁফায়।

নাইট-ল্যাম্পের নীল আলোয় মশারির মধ্যে চিন্তি বহু-ভর্ৎসিত ভঙ্গিমায় হাঁ করে শুয়ে। পাখার হাওয়ায় একগাছি চুল উড়ে এসে পড়েছে মমতার উসুখুসু ঠোঁটে। সে ঠোঁট চকাচ্ছে। মা ও মেয়ের এই নিশ্চিন্ত ঘুম, আহা, এই নিরাপত্তা—এতে তারও কিছু অবদান আছে ভেবে নলিনী বেঁচে-থাকার এক বড় দীন চরিতার্থতা খুঁজে পায়। জিরো পাওয়ার নাইট ল্যাম্পের মায়াময় বাজাজ-নীলিমায় মা ও মেয়েকে গরাদ ধরে দেখতে দেখতে সহসাই মনে হয় নলিনীর—আচ্ছা, এমন তো নয় যে আমার এই জেগে-ওঠাও স্বপ্নেরই একটা অংশ—স্বপ্নের একটা ছলনা—আসলে আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি?

গরাদের ওপারে মমতা ও চিন্তি—এরা স্বপ্ন না এরা সত্যি, জানার জন্যে নলিনী ব্যাকুল হয়। এই মুহূর্তে এর মীমাংসা না হলে সে এখুনি পাগল হয়ে যাবে টের পেয়ে, সর্পভীতির চেয়ে তুলনাবিহীনভাবে বেশি ভয়াবহ এক ভয়ে সে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

'মমতা!' সে গরাদ নাড়া দিয়ে ডাকে। হাঁউমাউ করে উঠে বসল মমতা। মেটিং কল মনে বিরক্ত ঝংকার তুলে বলল, 'কী ব্যাপার, এত রাতে! বাঁদরামির আর সময় পেলে না। সারাদিন খাটাখাটনি—উঃ—মাগো!'

'মমতা! বাইরে এসো—

'চিন্তি ওঠ্ তো।' ঠেলা দিয়ে মমতা তাকে তোলে।

'কী ব্যাপার, বাবা? এত রাতে?' চিন্তির গলায় গরল, 'কী মনে করে?'

'চিন্তি, বাইরে আয়। সাপটা এসেছে।'

'এসেছে তো কী করব?'

'অটোগ্রাফ চাইছে।'

'অটোগ্রাফ চাইছে তো তুমি দাও, আমাদের কাছে তো চায় নি।' বলে কেমন যেন একটু অস্বাভাবিকভাবে, দুহাত তুলে বিছানার ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে, তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ল চিন্তি।

চিন্তিই, তবু ঠিক চিন্তি নয় যেন। অবিকল পাথরের মূর্তির মতো কেমন অদ্ভুতভাবে কথা কয়ে উঠল। একটা মূর্তি হঠাৎ তার নিমীলিত চোখ খুললে যেমন...

'মর্ মুখপোড়া।' মমতা বলল।

বলুক মমতা। সে তো বলবেই। কিন্তু চিন্তির কথায় বহুকাল পরে বুকে বড় ব্যথা পেল নলিনী।

পায়ের কাছে কী যেন সুড়সুড় করছে? টর্চ জ্বালতে হল না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুমকা রোডের জ্যোৎস্না প্রলম্বিত হতে হতে আজ অবশেষে তাকে ছুঁয়েছে।

ঠিক ১২ বছর আগে দেখা দুমকা রোডের সেই কচি, তুলতুলে কেউটের বাচ্চাটা, নলিনীর পায়ের ফাঁকে জীবনের প্রথম ফণা তুলে করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

কোথা থেকে যে কী। নলিনী হঠাৎ সেটার বাঁ-দিকে বাঁ-পা ফেলে বলে ওঠে, 'তা!' সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবাক করে তার পায়ে 'ঝম' করে ঘুঙুর বেজে ওঠে। দু-পায়ের ফাঁকে ফোঁস করে ওঠে সাপটা।

নলিনী এবার ডান-পা না ফেলে পারে না। আবার 'ঝম' শব্দ, আবার ফোঁস, নলিনী আবার বলে ওঠে, 'তা!' চিরায়ত ছন্দের অমোঘ ডাকে এবার তাঁর আঙুলে চলে আসে কত্থকের তৃতীয় মুদ্রা।

ডান হাত মাথার ওপর ঘুরিয়ে তুলে সে বলে ওঠে, 'থেই'। অর্থাৎ, আকাশ।

নলিনীর মাথার ওপর এখন রাতের আকাশ। নক্ষত্রহারা, গ্রহহীন, চন্দ্রলুপ্ত আকাশের নীচে কেউটের ফোঁসফোঁসানির দুদিকে দুপা রেখে 'তা-তা-থেই-থেই' 'তা-তা-থেই-থেই' বোলের ছন্দে নলিনী নেচে চলে। তার পায়ে ঘুঙুর।

*প্রতিক্ষণ শারদীয়, ১৯৮৩*

## চটি

সারাজীবন বিপদগ্রস্ত হতে হতে শেষে যে বিপদ আসে তা হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস। বিপদের শুরু হয় মাসখানেক আগে, নির্মলের এবারের নতুন চটিজোড়া নিয়ে। কিন্তু নির্মলের চটি বললে মোটে ঠিক বলা হয় না। সম্পূর্ণ ভুল বলা হয়ে যায়।

সেই ছোটবেলায় যা নটিবয়, তারপর থেকে একজোড়া চটি ছাড়া জুতো বলতে নির্মলের কোনও-কালেই কিছু নেই। বিবাহের সময় একজোড়া পাম্প-শু পেয়েছিল বটে, সেটা, বছরচারেক হতে চলল, বিয়ের জোড় কি জামাইবাবুর সঙ্গে জয়পুরে তোলা মলিনার বালিকাবয়সের ছবিটার সঙ্গে হয়ত তোরঙ্গ বা আলমারির কোনায় পড়েই আছে। নতুন চাকরিটার ইন্টারভিউ-এর দিন শালার-শু পরে গিয়েছিল ঠিকই, সওদাগরি অফিস, নইলে নাকি কাজটাই পেত না। তারপর থেকে চটিতেই তো দিব্যি চলে যাচ্ছে।

চটি ছাড়া সে কিছু পরে না, সে কখনও চটিতে হাফসোল লাগায় না। কাজেকাজেই, বুরুস, পালিস, এ-সবের বালাই তাদের বাড়িতে নেই। মলিনাও চটি বা ঐ-জাতের জিনিস কেনে। চটি ছিঁড়ে কি অকেজো হয়ে গেলে, সে সটান চলে আসে কলেজ স্ট্রিটে। নিউ মার্কেটেও যায়, সে তো অফিসের লাগোয়া। সে বরাবর বাড়ি ফেরে নতুন চটি পরে, পুরোনো চটি দোকানে নিয়ে নেয় ভালোই, নতুবা, নতুন বাক্সসহ, কাছাকাছি মুচিকে নির্মল তা দান করে। ডাস্টবিনেও ফেলে দেয়। দোকানের পর দোকান ঘুরে, বেশ নির্বাচন করেই ও বহু সময় ধরে সে চটি কেনে, টেকসই দেখে তো বটেই, প্রায়ই বছর কাবার হবার আগে চটি-বদলের তার প্রয়োজন হয়

না। সবসময় একদিনের চেষ্টাতে চটি কেনা যায় নাকি? সেক্ষেত্রে ছেঁড়া চটি পরেই সে কোনওমতে কদিন চালায়, ফুটপাতে মুচিকে দিয়ে একটু সেলাই-ফোঁড়াই করিয়ে নেয় কখনও-বা পুরোপুরি মনোমাফিক না-পাওয়া পর্যন্ত চটি কেনা থেকে তবু সে বিরত থাকে। বাস্তবিক, একটি চটি মানে কি শুধু তার দীর্ঘায়ু নাকি? আরও নানান দিক আছে, যেমন, সেটা স্টাইলিস তো হবে—যার নাম কিনা বেশ আধুনিক বা সমকালীন হবে—অথচ, এমনটি হওয়া চাই যেন চোখে না পড়ে, যেন পথচারীর শতসহস্র চটির ভিড়ে তা মিশে থাকার যোগ্য হয়। মোটকথা, তার একটা ইউনিকনেস থাকা দরকার। সাবালক হবার পর থেকে চটি থেকে চটি সে এ ভাবেই কিনে যাচ্ছে, অর্থাৎ একা-একা, বন্ধুবান্ধব কারো সাহায্যের প্রয়োজন কোনওদিনই হয় নি। আজ সে একটা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছে বলা চলে এ-ব্যাপারে, মানে, তার চটি-ব্যাপারে সে। আর কিছু না বুঝুক, এটা মলিনা বোঝে; যে-জন্যে একদিকে যেমন মলিনা তার চটি কি চটি-জাতীয় জিনিস সে নিজেই কেনে বা কিনিয়ে নেয়, অপরপক্ষে সে কখনো চটি-সংক্রান্ত নির্মলকে বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ সাহায্য করার প্রস্তাব করে না। বস্তুত, বিবাহোত্তর চার-বছরে নির্মলকে ৭-টি চটি কিনতে হয়েছে। দীর্ঘজীবনসহ তাদের সর্বৈব অতুলনীয়তার জন্যে মলিনা বরাবরই, প্রতি চটিজোড়াকেই, দিতে পেরেছে সেই চাউনি যা এ্যাডমিরেশানে ভরা। বিপদজ্ঞাপক শেষ চটিটি তো একেবারে হালফিল কেনা হয়েছিল।

বিয়ের পর যাকে অনেক সময় মধুচন্দ্রিমা বলা হয়, কতকটা সে-কারণেই তারা চুনারে গিয়েছিল। চুনারে কবর অজস্র, নুড়ির মতন যত্রতত্র, একটা ছিল শীতের গঙ্গার পারাপারহীন চরের ওপর 'কেশরী ভবন' নামে তাদের খেলাদেলির বাড়ির একেবারে খিড়কিতেই, সেখানে রোদে বসে ও পাহাড়ি হাওয়ায় সে বাক্সটি প্রথম খোলে ও দুধ-রঙের খরখরে কাগজ দুহাতে সরিয়ে কাছে ডেকে মলিনাকে চটিজোড়া দেখায়, যার মাহাত্ম্য, সে কৃতজ্ঞ যে, প্রথম দৃষ্টিপাতেই মলিনা যা বোঝার বোঝে। 'ওও!' দেখে চকচকিয়ে উঠেছিল মলিনা, 'কখন কিনলে?' 'তুমি আমাকে আগে বলো নি!' ওষ্ঠাধর বিস্তৃত করে সে আরও বলে। সত্যি, ভারি আকর্ষণীয় ছিল মলিনার ঠোঁটজোড়াও, শুকনো এবং কাঁপত, ধুলো-ভরা পাখনা বল্লে বলা চলে। এ ছিল সেই ধরনের ঠোঁট, ডাগর এবং পুরন্ত, কথা বললেই যা মস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষমাত্রকে তার কাছে টানে যা। চুনারেই সে ঐ চটিজোড়া প্রথম ব্যবহার করে, আহা, অমন সৌখিন জিনিস, দিনপনের ধরে উন্মাদ ও উপর্যুপর ব্যবহারে, পাথরে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে, পাহাড়ি রাস্তায় ক্রমাগত ওঠা-নামার দরুনই বুঝি তা অমন কমজোরী হয়ে পড়ে। 'এ তো তোমারই', কতবার বারণ করেছিল তাকে মলিনা, 'নিজের জিনিস নিয়ে এমন করো না প্লীজ। ছিঁড়ে যাবে।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। কলকাতায় ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই আবার চটি কিনতে হল।

অপর একজোড়া চুরি হয়ে যায়। চুরি? হ্যাঁ, চুরি। সেটা অবশ্য, শেষ-বিপদের কারণ এই এবারের চটিজোড়ার মতন, আন্‌কোরা নতুন ছিল না। তবে সেটি ছিল কোলাপুরি। সেবার চুনার থেকে ফিরেই নতুন চটি কিনতে হয় এবং মাস পাঁচেকের মধ্যে, মানে তাদের বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ঐ কাণ্ড! সেটা ছিল ভারি যুৎসই, কালচে চামড়ার, অ্যাঙ্কলের সামনের স্ট্র্যাপটিতে ছিল একটিমাত্র সাদা জরি, যা তার লম্বাপানা ফরর্সা পায়ে দিব্যি মানিয়েছিল। আ, তার ফিটনেস আজও পায়ে লেগে আছে।

সত্যি, ভাবাই যায় না, কল্পনাতীত উপায়ে চটিটি চুরি হয়ে যায় এবং চোখের পলকে। সে-বছর দিনতিনেক ধরে প্রায় ১৯-ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, এমন যে, ডিভিসি জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাড়ির চারদিকে বৃষ্টির জল এত জমে ওঠে যে নির্মল সেদিন অফিস যেতে পারে না। চারদিকে আর-সব ডুবে গিয়ে অদূরে খানিক খালি জমি ও বড়রাস্তার সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী

কালভার্টটি শুধু জেগে থাকে। দুপুরবেলা বৃষ্টি একবার থেমে যায়। আকাশ অবশ্য তেমনি মেঘময়, জোলো হাওয়া বইছে আগের মতই। এ বেশিক্ষণের ব্যাপার নয় বুঝে নির্মল একটা আর্জেন্সি বোধ করে বাইরে যাবার, চট করে উঠে পড়ে একটা পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে ব্যগ্রস্বরে সে মলিনাকে ডাকে।

'কিছু পয়সা দাও তো?'

'সিগারেট?'

'আঃ দাও না' বলে সে চটিজোড়ার দিকে অগ্রসর হয়।

একতলার বিড়ালীর বেশ কয়েকদিন হল বাচ্ছা হয়েছে। তার একটি ভিজে একসা হয়ে কী-ভাবে ঢুকে পড়েছে তাদের ফ্ল্যাটে, বসবি তো বোস, নির্মলের চটির ওপরেই বসে আছে। 'হুশ', 'হুশ', 'যাঃ', বলে হাত নেড়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা নির্মল, ইস, এক্ষুনি বৃষ্টি এসে যাবে। নির্মল এবার মারমুখো জোরে তাড়া দিলে, অতটুকুন বিড়ালছানা তারই চটিতে বসে মুখব্যাদান করে তাকে শাসায়, স্পষ্টত সে একটা ঠ্যাঙও তোলে। এ-সময় মলিনা এসে একহাতে টুটি ধরে ছানাটা তুলে ধরে ও অন্যহাতে একটা টাকা নির্মলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'এত তেজ নিশ্চিত বিড়ালী!' নির্মল সহাস্যে বলে।

টাকাটা একরকম ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে সে তরতর করে চটি পরে একতলায় নেমে যায়। যা করার, বৃষ্টি আসার আগেই করতে হবে। তাদের ছাতা নেই।

দু-এক পশলা বৃষ্টি হলেই এদিকটা রীতিমতন নাব্য হয়ে ওঠে। একতলার খোলা দরজা থেকে গোড়ালিসমান জলে সে দ্বিরুক্তিহীন নেমে পড়ে। চটি পরে? হ্যাঁ চটি পরে। তবে আর তার কৃতিত্বটা কোথায়, এমন চটিই যদি সে কিনবে যা নাকি রোদে-জলে-কাদায়-পিছলে পরা যায় না? বালির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না? বা, যা পরে পাহাড় ডিঙোনো যায় না? এই চটিজোড়া সে কিনতে পায় কলেজস্ট্রিটের 'পদাম্বুজ' থেকে। কেনার সময় দোকানের বালক-কর্মচারীর সঙ্গে ভারি মজার একটা কথা হয় তার। চার-পাঁচ জোড়া চটির একটাও ফিট করতে না দেখে ছেলেটি, 'আপনার পাঞ্জা সরু' বললে, উত্তরে নির্মল তাকে বলে, 'দ্যাখ ভাই, পা আমার যে-রকমই হোক, তা তো আর তোমার জুতোর মাপে করা যাবে না, জুতোকেই আমার পায়ের মাপে হতে হবে।' উত্তরটি কোনও না-কোনও দিক থেকে মার্ভেলাস হয়েছিলই, কেননা, উত্তর শুনে, দোকানের নিভৃতি থেকে দোকানের মালিক বেরিয়ে আসে ও স্বহস্তে প্রকৃত চটিটি নির্মলের পায়ে পরিয়ে দিয়ে যায়।

সত্যি, নির্মল চটি কেনে কত মনস্তভাবে এবং প্রতি চটির সঙ্গে, কেনার আগে, একটা ভালোবাসাবাসি না-জন্মালে সে তা কেনে না বলা চলে। মাঝে মাঝেই নির্মল তার চটি-জোড়া ধোয়, মোছে, তাকে রোদে দিতে দেখা যায়। কোলপুরিগুলো তো একবার রোদে দিয়ে একটু তেল-ন্যাকড়া বুলিয়ে নিলেই তরতাজা হয়ে ওঠে। কিন্তু কে বলবে নির্মলের প্রাণে একটু মায়াদয়া আছে যখন সে, দৃপ্ত ও দ্বিরুক্তিহীনভাবে, জলে-কাদায় নেমে পড়ে— জুতো পরে নামতে কে না দ্বিধাবিভক্ত হয়—দেখে মনে হয় যেন সে অনিচ্ছুক, মূক জানোয়ারকে চাবকে নামাচ্ছে। হাজার চটির ভিড় থেকে পরিশ্রমসাধ্য পছন্দ করে সে, নির্মল রায়, সেই তো এটা কিনেছে। নির্মলকে সার্ভিস না-দিয়ে তা যাবে কোথায়, দিতে বাধ্য।

সেদিন শুকনো কালভার্টে উঠে তবু থমকে দাঁড়ায় নির্মল। মাঠে অল্প জল হলেও, রাস্তায় জল একহাঁটু। গর্তগুলো এড়িয়ে যেতে না-পারলে জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে, তা সে জানে। হঠাৎ বহুকাল পরে, স্মরণকালের মধ্যে বোধহয়তো এই প্রথম, চটিজোড়া কালভার্টে রেখে খালি পায়ে নির্মল জলে নেমে পড়ে।

কালভার্টটি এমনিতে বাড়ি থেকে দূরে; ২১০ টাকা দামী দমদম হাউসিং এস্টেটের তাদের

এই দক্ষিণ-পূর্বদিকের চারতলার ফ্ল্যাট থেকে দূরতর, তবু জানালার পর্দার ওপর মলিনার মুখ তো জেগেই ছিল, সে চটির প্রতি একটা ইশারা করে যেতে পারত। মলিনার চোখে চশমা, তবে কাছের জিনিসই শুধু সে দেখতে পায় না। তাছাড়া, জলে তো যা ভেজার ভিজেইছে, গভীরতর জলে চটিজোড়া কি বেশি-বেশি ভিজত নাকি?

পথ প্রাণীহীন। মোড়ে একটা রিকসা এখনো দেখা যায়, এখুনি বাঁক নিলে জঙ্গম বলতে আর কিছুই থাকবে না। রাস্তা পেরিয়েই ভূজাঅলার দোকান, এখন ঝাঁপ-ফেলা, তবে ব্যাটা ভেতরেই আছে। নতুন বৌ আনিয়েছে দেশ থেকে, আর এই বৃষ্টি, যাবেটা কোথা। লোকটা সিগারেটও বেচে। এখানে পৌঁছে, কালভার্ট পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। চারদিকের পানাভর্তি, ঘোলা, নোংরা জলের মধ্যে ঐ জেগে রয়েছে, কালভার্টের ওপর, তার নাতিতরুণ চটিজোড়া, সে দ্যাখে। ডাকাডাকি করে সিগারেট পেতে কতটুকুই বা দেরি হয়ে থাকবে, বড়জোর পাঁচ-মিনিট? ইতিমধ্যে মেঘ ঝুলে পড়ে।

এবং মুখ ঘুরিয়েই, কে বলে মিরাক্‌ল বলে কিছু নেই জীবনের বিশ্বাসযোগ্য-অবিশ্বাস্যকে সে প্রত্যক্ষ করে। তার চটিজোড়া আর নেই। নেই? নেই? কই নেই তো! এবং ঠিক সেই জায়গায়, কোথা থেকে ও কী-করে কে জানে, একটি বেগুনি রঙের আস্ত কচুরিপানার ফুল। পাশে, রাস্তায় জলের ওপর দাঁড়িয়ে, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ও কালো হাফপ্যান্ট-পরা একটি গরিবলোকের ছেলে।

ছেলেটি কোথা থেকে এল! ছপছপ শব্দ তুলে কোনাকুনি হেঁটে নির্মল কালভার্টের ওপর ওঠে যেতে যেতে মেঘ ডেকে ওঠে ও হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে পড়ে। বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটি জলে গোড়ালি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন তার কোথাও যাবার নেই! কালভার্টের ওপর, ঠিক, অবিকল চটিজোড়ার জায়গায়, যেন চটির বদলেই রয়েছে মস্ত ফুলটা, হ-য-ব-র-ল'র সেই 'ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল' গোছের নাকি ব্যাপারটা?

'এখানে একজোড়া চটি ছিল?' পাশেই কারখানার টিনের চালের জন্যে বৃষ্টির শব্দ এত বেশি যে ঠোঁটদুটি যথাসম্ভব ফাঁক করে নির্মলকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হয়, যে-জন্যে মুখের মধ্যে তীরের মতো বৃষ্টির জল এসে পড়ে। ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে,'আমি তো জানি না। ' 'সে কী!' অবাক লাগে নির্মলের, এ-রকম অবস্থায় পড়লে বড্ড বোকা-সোকাও লাগে, তার ওপর আবার মৃদু হাসি পায়, যা বোকারই। নির্মল অসহায়ভাবে ওপর দিকে চায়, বৃষ্টি আরও ঝেঁপে আসছে, চারতলার জানালা একটুখানি ফাঁক করে মুহূর্মুহূ হাত নেড়ে কালভার্টের দিকে ইশারা করছে মলিনা, সেদিকে চেয়ে বড়সড় একটা পানাফুলের জল-ধোয়া অমল বেগুনি ছাড়া কোনও চটি নির্মলের চোখে পড়ে না। ফুলে-ফেঁপে বৃষ্টি আরও বাড়ে, ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক ও মেঘ-ডাকাডাকির মধ্যে নিচু হয়ে নির্মল ফুলটা কুড়িয়ে নেয়। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মলিনা একরকম কেড়ে নেয় তার হাত থেকে ফুলটি ও ভাস-এ জল ভরে তখুনি রাখে। তারপর শুকনো তোয়ালে বের করে নির্মলের হাতে দেয়। সেদিন আর বাইরে বেরবার দরকার করে না। ফ্ল্যাটে এ-ঘর ও-ঘর করতে গিয়ে যতবার চোখে পড়ে, নির্মল ততবারই বিশ্বাস করতে চায়, ঐ মস্ত বেগুনি ফুলটাই হচ্ছে তার চটি; সে ইচ্ছুক, তবু তার বিশ্বাস হয় না। ফুলের কারুকাজ থেকে বেগুনি আভা ছাড়া কিছু তার, কোনও চটি তার, চোখে পড়ে না।

যাই হোক, পরদিন ঘরে-পরার হাওয়াই-চপ্পল পরে নির্মলকে বাজারে যেতে দেখার আগে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি মলিনা। গত রাতে নির্মল তাকে যার-পর-নেই আপ্যায়ন করে। তবু চটিহারা নির্মলের রাতের ভালোবাসার যথার্থ-ব্যাপারে দিনের বেলায় সে রীতিমতো বোকা বনে যায়।

কিন্তু এবারের চটি নিয়ে যে বিপদ আসে অভাবিত দিক থেকে, সত্যি, তা হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস। এ কিছু হঠাৎ স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া বা চুরি-টুরি হওয়ার ব্যাপার না। ব্যাপার এই যে, আসলে, গত মাস দুই ধরে নির্মল যে-চটিজোড়া পরে আসছে-যাচ্ছে, সেটা তার চটিই নয়!

অথচ এবার চটি কিনতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয়নি। বিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটে এবার তাকে আদৌ ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। কিছু টাকার জন্যে সে গিয়েছিল শিবপুরে, মানুর ওখানে। টাকা পায়ও। স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাম-বাস কিছুরই দেখা নেই, মাঝে মাঝে শালিমারের দিক থেকে লরি-ভরা মাল ও ট্রাকভর্তি সি. আর. পি. যায়। ওদিকে ঘন ঘন বোমার শব্দ আগেই পেয়েছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, তারপর সিগারেট-এর দোকানে দড়ি তুলতে গিয়ে সে চমকে ওঠে—আর-এ! ধূলিমলিন কাচের লম্বালম্বি ক্র্যাকের ভেতর দিয়ে মাসদুই আগে ও ধোঁয়াকুয়াশার মধ্যে সহসাই এবারের চটিজোড়ার সম্মুখীন হয় সে। তবু হাতে না নিয়ে তথা পায়ে গলাবার আগে চটির মাহাত্ম্য সে বোঝে নি। হ্যাঁ, এর জাত আলাদা। স্ট্র্যাপের বদলে, ওহ্, এটা তৈরি হয়েছে কিনা চামড়ার কতকগুলো পাকানো দড়ি দিয়ে? ভাবা যায়! স্রেফ দড়ি দিয়ে—আর কিচ্ছু না—না-কোনও পেরেক, না-একটা সেলাই, না-কিছু। এ-রকম চটি এখানে, শিবপুরের এই এঁদো দোকানে এল কোত্থেকে, কতদিন ধরে-বা পড়ে আছে এই ভাঙা ধুলো-ভরা শো-কেসে। আর এর পাতলা সোল, আ, নারীর অনিচ্ছুক রূঢ় ঠোঁট যা, পায়ে গলিয়ে দুপা হেঁটেই সে বুঝতে পারে, একে নিষ্পিষ্ট করার মতো সুখ আর কী। এত হাল্কা! এ কী এ-দেশে তৈরি? উত্তরের জন্যে সে দোকানির লোল মুখের দিকে তাকায়। আসন্ন বিক্রির লোভে দোকানের মলিন আলোতেও জ্যান্ত হয়ে উঠছে বৃদ্ধের কোটরাগত দুটি চোখ—এ-ছাড়া সে কিছুই সেখানে খুঁজে পায় না। নীরবে সে চটিজোড়া কেনে ও পুরানোটি বিনাবাক্যব্যয়ে রেখে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। আগেরটা আর মাসখানেক বেকসুর চলত। ঠিক এখুনি কেনার দরকার ছিল না। মানুর কাছে পাওয়া প্রায় সব টাকাই বেরিয়ে গেল।

সে অন্তত দুমাস আগের কথা। তারপর মাসখানেক আগে একদিন ছুটে ট্রাম ধরতে গিয়ে ও অতি অনির্দেশ্যভাবে পড়ে গিয়ে নির্মলের প্রথম সন্দেহ হয়। উঠে দাঁড়িয়ে পা থেকে খুলে, একপাটি উল্টিয়েই যা বোঝার সে বোঝে। দেখে তার মাথার ভিতরে, স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম, স্তব্ধ-এলাকার নিউরণগুলির মধ্যে দারুণ কোলাহল পড়েযায়; মাথার ভিতরে লক্ষ-লক্ষ-লক্ষ নিউরণের সহসা-ছোটাছুটি-সে টের পায় বললে একটুও বেশি বলা হয় না।

এ কার চটি সে পরে আছে, গত এক, দেড় কি দুমাস ধরে! এতো তার চটি নয়! অথচ, কে বলবে এ তার নয়, অবিকল তারই, এটিও মাস দুয়েকের মতো ব্যবহৃত। নিজের মনের ভুলে কখন সে দ্বিতীয়রহিত ভেবে তার চটিজোড়াকে ভুল করেছিল। অথচ আছে,; ছিল। অবিকল আর-একজোড়া ছিল এই কলকাতাতেই, কেননা, বিগত দু-মাসের মধ্যে সে কলকাতার বাইরে যায় নি এবং যা-কিনা কেনা হয়েছিল আনুমানিক মাসদুই আগেই! অফিসফেরত জনস্রোতের মাঝখানে হতচেতন দাঁড়িয়ে থেকে, ধাক্কা খেতে খেতে, একপাটি চটি ধরে নির্মল দাঁড়িয়ে থাকে। তার গোড়ালির চাপ পড়ে বাঁ-দিকে। সাধারণত তাই তো পড়ে থাকে তার মতো গড়পড়তা মানুষের? কিন্তু, ক্রমাগত পেষণে, এর ডানদিক ক্ষয়ে গেছে। সে এই জন্যে পিছলে গিয়েছিল—বাঁ-দিকে গোড়ালির চাপে ছুটন্ত শরীরের ভার অভ্যাস মতন রাখতে গিয়ে। কিছুদিন যাবৎ এ-নিয়ে অসুবিধের আরও দুটি-একটি খুঁটিনাটি নির্মলের এবার মনে পড়ে। সে আর ট্রামে ওঠার চেষ্টা করে না। এখানে থেকে বাসা পর্যন্ত মাইল-তিনেক হাঁটার জন্যে প্রস্তুত হয়ে, ফুরনো সিগারেট থেকে আর-একটা আস্ত ধরিয়ে, সে এগোয়। তবু

তার কিছুতে মনে পড়ে না সে গত দুমাসে কোথায়-কোথায় গিয়েছিল, কোথায়-বা পা থেকে খুলে রেখেছিল চটি অথবা কার বাড়িতে বা ঠিক কোথায় তার এহেন-অজ্ঞতসারে চটি বদলাবদলি হয়ে গেল। আকাশ-পাতাল রোমন্থন করেও সে কোনও কিনারা করতে পারে না। যত মনে করতে চেষ্টা করে, ভুলে-যাওয়া তাকে তত ছেঁকে ধরে। ডানদিকে গোড়ালি বসাতে সে একবার, দুবার, পঞ্চাশবার চেষ্টা করে। পঞ্চাশ পা-র বেশি সে এগুতে পারে না। গোড়ালির ডানদিক থেকে একটা শিউরানি উঠে এসে মেরুদাঁড়া নরম করে দিয়ে এখন মাথায় ঢুকে পড়ছে, শরীর ভেসে যাচ্ছে ঘামে বুকের ওঠা-পড়া অসম্ভব বেড়ে গেছে, সে বোঝে। সে থামে; থেমে সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

এতে কোনও ভুল নেই যে অন্তত মাসখানেকের বেশি সময় ধরে যে-চটিজোড়া নির্মল পরে রয়েছে তা নির্মলের নয়। ট্রাম-অ্যাকসিডেন্টটি ঘটে আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে। সেটা ছিল পে-ডে। পড়ে যেতে-যেতেই নির্মলের হাত চলে গিয়েছিল বুকের-বাঁ দিকে, হার্টের ওপর, পে-প্যাকেটটি সেদিকেই ছিল। চটির আসল মালিকও টের পেয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। সন্দেহ কী যে, ও-প্রান্ত থেকে সেও এমনি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

সমস্যা বটে একটা। সমস্যা যখন, সমস্যামাত্রেরই একটা না একটা সমাধান থাকার কথা। কিন্তু নির্মলের কেমন একটা পূর্বধারণা জন্মায় যে, এটা বোধহয় গুজবের সেই অতিলৌকিক ধরনের, যতদিন যাবে যার জটিলতা ও রহস্য বাড়বে বই কমবে না। সুতো একটা আছেই যা অনুসরণ করলে জটিলতম জটও খোলে, হুঁ, এটা একটা সত্য ধারণা বটে। তবু স্থিরনিশ্চিত হবার আগে যে-কোনও একটা সুতো পরীক্ষামূলক ছুঁতে নির্মল সাহস পায় না। একটিমাত্র ভুলে, এক্ষেত্রে, এক-জীবনের ভুলচুক হয়ে যাবে, সে মনে করে। বহু রাত অব্দি জেগে জেগে সে ভাবে। এর শেষ কোথায় নির্মল কিছুতে বুঝে পায় না। 'আচ্ছা, জ্ঞানের বিয়েটা কত তারিখে ছিল বলো তো?' মলিনা মনে করে এটা কোনও প্রশ্নই না, যে-জন্যে, উত্তরে, অন্ধকার থেকে তার বুকের টিপকল খোলার পুটপুট ভেসে আসে। 'আচ্ছা, জ্ঞানের বিয়েতে কি আমি চটি খুলেছিলুম?' মলিনার পিঠের দিক থেকে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্মল এবার জানতে চায়।

'সবুর করো না, আঃ। হুকটা খোল।' চাপা কামনাকাতর গলায় মলিনা জবাব দেয়। জ্ঞানের বিয়েতে চটি খোলার প্রশ্ন ছিল না তো, নির্মলের মনে পড়ে যায়।

শ্যামপুকুরে দেবজ্যোতির সঙ্গে একদিন দেখা, সেও প্রায় মাস দুই হতে চলল। 'মেথি আছে, মেথি?' একটা মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নস্বরে দেবজ্যোতি জিজ্ঞেস করেছিল। ছেলের হাম রিলাপ্‌স করেছে। জীবনভর মানুষ এমন কত-না বিপদে পড়ে। না, চটি সেখানে খোলে নি। সে কথা নয়। সে দেবজ্যোতির বাড়িতেই যায় নি। 'গা স্পঞ্জ করাও। আর হোমিওপাতি করাবে, বুঝলে?' গোছের বলে তাকে এড়িয়ে যায়। তখন সবে সন্ধে, তবু বাকি গলিটা কী অস্বস্তিকর ফাঁকা, আজকাল এ-দিকে গণ্ডগোল লেগেই আছে। আল্গা কসিটা আঁট করার জন্যেই এক জায়গায় জামাটা তাকে তুলতে হয়। তুলতেই তড়াক করে তিনটি ছেলে অন্ধকার রক থেকে একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে। নির্মলও জামা তুলে রেখে যতক্ষণ উচিত তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কসি আঁটে। সে কিছু প্লেন-ড্রেসড নয়, এটাই দেখায় আর কী। কিন্তু এটাও কথা না। গলি থেকে পরিত্যক্ত রাজপথে পড়ে, ট্রামলাইনের দিকে একা এগিয়ে যেতে যেতে ও একবারও মুণ্ডু না-ঘুরিয়ে, সেদিনই প্রথম টের পায় নির্মল যে, দূরত্ব বজায় রেখে একজোড়া চটি-পরা পা তাকে অনুসরণ করে আসছে।

কথা হল, সেদিন সে যে-চটি পরে ছিল, সে কী তার? কেননা, সেই থেকে শুরু। তারপর থেকেই দিনকে-দিন সে কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সে ভেবে দ্যাখে। বিশেষত, ট্রাম-অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে এটা বেড়েই চলেছে। একটা চার্টার্ড ফার্মে পার্টটাইম সেরে ফিরতে

আজকালকার হিসেবে নির্মলের বেশ রাত হয়ে যায়। ততক্ষণে, দোকানপাট এদিকে বিলকুল বন্ধ হয়ে যায়। এস্টেটের মেন গেট থেকে তাদের এফ-ব্লক পর্যন্ত সুরকির পথটুকু ৯-টা নাগাদ নিঃঝুম হয়ে পড়ে। এইটুকুর মধ্যেই নির্মল ঘাড় ফিরিয়ে বারকয়েক আশপাশ দেখে না-নিয়ে পারে না। কেউ বোধহয় একা-তাকে কোনও কিছুর জন্যে দায়ী করবে যে জন্যে সে অপরাধী নয়, তার মনে হয়, অবশ্য কোনও প্রমাণ নেই যে সে নয়। উল্টোদিকে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই বোধও তার মধ্যে জন্মাতে দ্যাখে। আজ থেকে চার বছর আগে, ভোরবেলার কথা ভেবেই সে এই দক্ষিণ-পূবের বারান্দাঅলা ফ্ল্যাটটি নেয়। বরাবর সে ভোরে ওঠে, প্রত্যূষার এই লাল রৌদ্রাভাটুকুর জন্যে পাঁচ শ টাকা ঘুষ দেওয়া সে যুক্তিযুক্ত মনে করে। কিছুদিন হল সে আর বারান্দায় বসে না। শুধু সে কেন, মাটি শুঁকতে শুঁকতে, দূর থেকে একটি পুলিসভ্যান আসতে দেখে আজকাল ভয় কে না পায়। ধরো, ঠিক পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা পেটো পড়ল, পড়তে তো পারেই, ওঃ, ভাবা যায়! দূরে পুলিসভ্যান বা সি. আর. পি.-র ট্রাক দেখলেই নির্মল তাই দ্রুত হেঁটে একটা না-একটা গলির কাছাকাছি পৌঁছে গতি শ্লথ করে দেয়?, যাতে করে, যদি পড়ে, যেন সে সুট করে গলিতে ঢুকে পড়তে পারে। অনেকেই এ-রকম করছে কিনা, নির্মল তা জানে না। আজকাল কে-বা কার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে, বিশেষত এ-সব ব্যাপারে। গত মাস দুই ধরে, প্রায় চটি-বদলের সমসাময়িক কাল থেকে, তার এই অপরাধীবোধ না কমে বরং বেড়েই গেছে।

তাদের ব্লকে ঢোকার মুখে একটা ছোট গেট রয়েছে। গেটের আঙটা খোলার 'টিং' করে ছোট্ট শব্দ দিনের মধ্যে কতবারই না তার হৃৎস্পন্দন এলোমেলো করে তোলে। আগে তবু রাতের দিকেই ভয় করত বেশি। কর্কশ স্বরে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। এখন আর দিন-রাত নেই। ব্লকে আরও ৭-টি ফ্ল্যাট রয়েছে, তাদের কেউ হতে পারে, এ-রকম ভেবে নির্মল আর কোনও সান্ত্বনা পায় না।

রাত এক সময় সত্যিসত্যি স্তব্ধ হয়। ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিং-এর বিলীয়মান ঝকঝক-এর সঙ্গে পা ফেলে তখন কলকাতার দিক থেকে এগিয়ে আসে একজোড়া চটি-পরা পা'র হেঁটে আসার শব্দ, সে শুয়ে শুয়ে শোনে। রাস্তার ধুলো-কাঁকরের ওপর অসংলগ্ন পদপাত অতি অস্বাভাবিক ও রহস্যজনকভাবে তাদের এস্টেটের চারদিকে ঘোরাফেরা করে। তারপর একদিন 'টিং' করে গেট খুলে পদশব্দ ঢুকে পড়ে তাদেরই ব্লকে। একতলায় সিঁড়ির নিচে দারোয়ানের সঙ্গে নিচু গলার জিজ্ঞাসাবাদ নির্মল স্পষ্ট শুনতে পায়।

সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে আসে। হৃৎস্পন্দন থামিয়ে নির্মল অপেক্ষা করে। একতলা...দোতলা...তিনতলা...পদশব্দ একদিন সত্যি-সত্যি চারতলায় উঠে আসে। তারপর একসময়, কোনও-এক সময়, চারতলার ৩৯-নম্বরের 'বাজার' বেজে ওঠে। নির্মল আর পারে না। মলিনার খেশ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। মলিনা বলে ওঠে, 'কে?' বিয়ের পর থেকে গত চার বছর ধরে এই মলিনাই ছিল তার অনিদ্রারোগের একমাত্র চাবুক তথা অব্যর্থ মকরধ্বজ। আজকাল মলিনাও পারে না। মলিনা ঘুমিয়ে পড়ে। সে জেগে থাকে।

এর ওপর একদিন ভোররাতে নির্মল একটা স্বপ্ন দেখে ফ্যালে। একটা রৌদ্রকরোজ্জ্বল বালুকাময় উপত্যকায় খালি পায়ে সে দাঁড়িয়ে, তার গা পুড়ে যাচ্ছে, তাকে ক্রমাগত পা বদল করতে সে দ্যাখে। ওদিকে একটা পাহাড়, ত্রিকোণ, বেশি দূরে হবে না, তার সবুজ বনানী স্পষ্ট দেখা যায়—যা ডিঙোবার সাহস তার নেই, যার ওপারে কী, সে জানে না। অথচ, পিছনের জনপদ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে! দিনের বেলায় ধ্রুবতারকার জন্য ভুল করে আকাশে তাকিয়ে তার আরও ভুল ভাঙে। আকাশে সূর্য নেই। বিরতিহীন বিদ্যুৎচমকে তৈরি এ এক অলৌকিক দিনের বেলা, এখানে হাওয়া নেই। 'আশার কবরভূমি', কে যেন বলেই যায় তাকে।

ঠিক তখুনি বালির ওপর দিয়ে একটা মর্মরধ্বনি শুনে সে চমকে ওঠে—কে? অদূর দিয়ে একজোড়া চটি হেঁটে যায়। তীরে-ওঠার আগে হাঁসের মতো সেদিকে সরু ও লম্বা হয়ে যায় তার গর্দান, 'চটি, তুমি কী পা খুঁজছ?' সে বলতে চায়, তবু তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। সে এক-পা এগুতেই, দ্রুততর হেঁটে চটি অনেকটা এগিয়ে যায়। নির্মল হঠাৎ দৌড় শুরু করে দেয়। চটি ক্রমাগত দিক বদলায়—তবু সে পাহাড়ের দিকেই ছুটে চলেছে নির্মল জানে—যেখানে ঢুকে পড়লে নির্মল আর তাকে খুঁজে পাবে না। ফুটন্ত বালিতে ঝলসে যাচ্ছে তার চটিহারা পা—তবু এই তৃণহীন, দিক-চিহ্নহীন উপত্যকায় সে লুকোবে কোথা? হুংকারে উৎক্ষিপ্ত খরগোসের দিকে মরুভূমির রৌদ্রোজ্জ্বল চিতার মতো অবিশ্বাস্য দৌড়ে নির্মল বারংবার তার কাছাকাছি পৌঁছয় ও শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে তার জ্বলন্ত লাফের থাবা একটা পাটি চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে রোদের প্রকাণ্ড থাপ্পড় তার গালে এসে লাগে। স্বপ্নের মধ্যে মাথা ঘুরে নির্মল লুটিয়ে পড়ে...

'এই—এই—কী হচ্ছে কী—অ্যাঁ—কী হচ্ছে—' হাসি-হাসি মুখ মুখের কাছে নামিয়ে এনে মলিনা তাকে জাগায়। নির্মল বহুসময় ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ওহ্, কী কষ্ট তার সর্বাঙ্গে, কেউ যেন বাঁশপেটা করছে সারা রাত। অতিকষ্টে মোচড়ানো হাত তুলে, চুল সরিয়ে মলিনার ঘাড়ে সে রাখে, 'আচ্ছা মলিনা, ওই যে সেদিন কাঠের পাটা দিয়ে টুবলুরা ক্রিকেট খেলছিল না, সেটা কোথায়। সেটা কাদের।'

'ওমা। তা দিয়ে তুমি কী করবে?'

'আঃ।' শরীরময় ব্যথা আড়মোড়া দিয়ে ভেঙে, বুক থেকে মলিনাকে পাশে নামিয়ে রাখে নির্মল, 'তুমি কিছু বোঝো না। আজকালকার দিনে, ধরো যদি একটা হাউস-ব্রেকার আসে, মাঝরাতে আসতে তো পারে? একটা-কিছু—কিছু-একটা—থাকার তো দরকার। আমি কী দিয়ে তাকে রুখবো? কী আছে আমাদের, একটা বেড়াবার ছড়ি ছাড়া?' শূন্যে দু'হাত তুলে নির্মল বিলাপ করে, 'ডাকলে আজকাল কেউ সাড়া দেবে তুমি মনে করো?'

যার চটি, সে এখন কোথায়। নির্মল ভাবে। নির্মলদের বেনেটোলার পৈতৃক ছোট্ট বাড়িটি কবেই, সেই ছোটবেলাতেই, বিক্রি হয়ে গেছে। এখন ঘরে ঘরে ভাড়াটে। সে বেশ কয়েকবছর হতে চলল, একদিন, তখন সন্ধেবেলা, কী-একটা ছুঁতো করে সে বাড়িটায় ঢুকে পড়ে ও উঠোনে তাদের আমলেই অকেজো হ্যান্ডপাম্পটি আজও থেকে গেছে দেখতে পায়। ছোটবেলায় তার একটা লাল মার্বেল ওর ভেতর পড়ে গিয়েছিল। মার্বেলটা আজও ওখানে থেকে গেছে, নির্মল জানে। এ শুধু নির্মলই জানে যে, যে চটি সে পরে আছে সেটা তার চটি নয়। নইলে, এবারের চটিজোড়া যথার্থই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। অফিসে এখনো কারো চোখে পড়লে কিছু না-কিছু জানতে চাইবেই। আগে কত আগ্রহ ভরে উত্তর দিত। এখন এড়িয়ে যায়। অফিসে সীটে বসামাত্র টেবিলটি তার কাছে একটা দাবার ছকে পরিণত হয়ে যায় যেন। একটিমাত্র কাল্পনিক ঘুঁটিকে সে দাবা-বোড়ে-রাজা-রানী কি মন্ত্রীর বেপরোয়া চালে চালায়, যত্র-তত্র রাখে। কোনও একটি ঘরে ঘুঁটিটাকে সে একমুহূর্তের বেশি রাখতে পারে না। রেখেই তাকে তুলে নিতে দেখা যায়। সে এখন ঠিক কোথায় বা কোন দিকে। সে কী ঠিক পথে? তার থেকে আর কত দূরে; নাকি সে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এটাই জানতে ইচ্ছে করে তার খুব বেশি। সে কী টের পেয়েছে? হ্যাঁ পেয়েছে। না, পায় নি? টের পেয়ে, সে হয়ত আর একজোড়া কিনেই নিয়েছে। নির্মল পারে নি কিনতে। মাসের শেষে নির্মল পারে না।

বাসে-ট্রামে সর্বত্র নির্মল লোকের চটি-পরা পা দ্যাখে। এত রকমের পা হয় নাকি মানুষের? রেভিনিউ-সেকসানের দোতলা থেকে ফুটপাত স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক সময় ফুটপাতে দাঁড়িয়েও সে দ্যাখে। গত রবিবার চটি পরে মলিনার জ্যাঠামণি এসেছিলেন।

চুনোটের মধ্যে চটিটা পুরোপুরি দেখতে না-পেয়ে নির্মল কৌতূহলী হয়ে পড়ে। সে বহুক্ষণ চোখ সরাতে পারে নি। প্রণাম করতে ভুলে যাবার জন্যে নয়, এঃহে, ওঁর পায়ে গোদ আছে এটা একদম ভুলে যাওয়ার জন্যেই সে খুব লজ্জিত হয়ে পড়ে। ঘন ঘন কেশে খালি পা বদলাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

কদিন আগে মেজদার বাসা থেকে উঠতে কিছুটা রাত হয়ে যায়। বাসার সামনে ডিপো থেকে বেরবার মুখে ফাঁকা ট্রামের লাইন পাল্টানোর ঘটাং-ঘট শুনেই সে বরাবর রাত বুঝেছে, আগে টু-দা মিনিট বলে দিতে পারত। আজকাল অবশ্য আটটা-নটা থেকে ট্রাম-বাস ফাঁকা হতে শুরু করে। তবু, এ কেউ শুনেছে, রাত সাড়ে দশটায় ফাঁকা বাসে শুধু সে ও আর-একজন মাত্র যাত্রী, বাস পাইকপাড়া ছাড়ালে অন্যমনস্ক নির্মল সহসা পিছন ফিরে তবু তাই দ্যাখে। ওদিকে ছ'জন বসার লম্বা সীটের কোণে মুড়িঝুড়ি দিয়ে সে একা বসে, লোকটি খর্বকায়, মধ্যবয়সী ও তার নাক বাঁকা, নির্মল দ্যাখে। লোকটি এতক্ষণ তাকে, হ্যাঁ, তাকেই দেখছিল, নির্মল বুঝতে পারে। মুহূর্তে, কেন কে জানে, লোকটার পা দেখার জন্য নির্মল ব্যাকুল হয়ে পড়ে। লোকটা তখুনি পা সরিয়ে নেয়, সে দেখতে পায় না। লেকটাউনের কাছে আচমকা দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নির্মল দ্যাখে দুজন নিমগ্ন কন্ডাক্টর ছাড়া হু-হু বাসে সে একা!

এর মধ্যে অফিসের কাজে এক-সপ্তাহের জন্যে নির্মলকে বাইরে যেতে হয়। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরেই শোনে পানিহাটি থেকে কে-একজন পর পর দুদিন, পরশু এবং কাল, দুদিনই সন্ধের পর, তার খোঁজে এসেছিল।

'আচ্ছা লোক বাবা। বললুম তুমি আজ ফিরছ, তবু আবার কাল এসে হাজির। কী অদ্ভুতভাবে বেল দেয় না লোকটা!'

পা-নি-হা-টি! কোন দিকে? পানিহাটিতে তার চেনা কেউ থাকে না তো। সে কখনো পানিহাটি যায় নি। সে যেখানে, পানিহাটি তার থেকে কত দূরে? হঠাৎ পানিহাটিকে পৃথিবীর একমাত্র ভ্রাম্যমাণ জায়গা বলে মনে হয় নির্মলের, যা দূর থেকে ক্রমাগত-দূরে সরে যাচ্ছে।

'পানিহাটি?'

'পানিহাটিই তো বলল।'

'দেখতে কেমন?' মুখ মোলায়েম রেখে নির্মল জানতে চায়।

'ছোকরা মতন। বেশ স্মার্ট দেখতে।'

সাধারণত নির্মল জেলাশ। বলে তাই মলিনা ঠোঁট টিপে হাসে।

'নাম বললে?' শরীর শক্ত করে মুখ ফিরিয়ে রাখে নির্মল।

'নামটাম তো কিছু বলল না বাপু। চা না কফি?'

'পানিহাটি কোন দিকে তুমি জানো?'

'ন্না তো।'

হ্যাঙারে না ঢুকিয়ে হঠাৎ ট্রাউজারটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে নির্মল। বোঁ করে ঘুরে দু'হাতে মলিনার কাঁধ ঝাঁকাতে শুরু করে, 'কেন জিজ্ঞেস করো নি তুমি নাম কী, অ্যাঁ?' চিৎকারে সে ঘর ফাটিয়ে ফ্যালে, 'পানিহাটি কোথায় জানো-না, নাম কী জানো-না, কেন এসেছিল জানো-না...হোয়াট আর ইউ? কী করতে রয়েছ তুমি বাড়িতে? আমার কার সঙ্গে কী দরকার...কতটুকু দেখতে পাচ্ছ তুমি আমার, অ্যাঁ? গাধা কোথাকার!' বলে বৌকে বিছানায় ঠেলে ফেলে দেয় নির্মল।

তারপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। শুধু আন্ডারউয়্যার-পরা লোমশ তাকে দেখে মনে হয় অতিপ্রকৃতি বা উপকথা থেকে যেন দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এক দৈত্যাকার কুকুর-মানুষ'

'আজ সন্ধেবেলা সে আবার আসবে বলেছে', পরদিন অফিস বেরবার মুখে ম্রিয়মান মলিনা তাকে জানায়। সে কাঁদতে ভুলে গেছে।

অফিসে পাশের সীট থেকে প্রৌঢ় বিশুবাবু রোজকার মতো একখিলি পান এগিয়ে দেন, 'কী ব্যাপার মশাই, রোজ টেলিফোন, রোজ টেলিফোন। যত বলি বাইরে গেছেন। তবু রোজ সেই এক কথা, নির্মল রায় চাউড্রি আছেন? ব্যাপার কী নির্মল?'

আজ সকাল থেকে রেডিওয় সাইক্লোনের কথা বারবার বলা হচ্ছে। সারাদিন মেঘও ঝুলে রয়েছে। অনেকের মতো নির্মল আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। এসে দ্যাখে, মলিনা বাড়ি নেই। একটা চিঠিতে লোকটির আজ সন্ধেবেলা আসার কথা মনে করিয়ে দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের টুবলুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। রাতের খাবার করে রেখে গেছে অবশ্য। তবু এটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মলিনা।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে, তারপর পাজামা, পাঞ্জাবি ও হাওয়াই চপ্পল পরে নেয় নির্মল। বসার ঘরে এসে তার বেশ সাফসুফ লাগে। বিয়ের পর চার-বছর গড়িয়ে গেল, তবু ছাতা ও জুতো-বুরুশের মতোই গৃহস্থালীর বেশ কিছু অবশ্যম্ভাবী জিনিস তাদের নেই। যেমন, আজও তাদের কোনও বুক-সেলফ নেই। অথচ বইটই বিস্তর জমেছে এবং কাগজপত্র—সব তাকে-তুকে, যত্রতত্র ছড়ানো। লোকটি যদি আসে, ঐ কোনার সোফাটায় তাকে বসতে দিয়ে তার পিছনে ঘরের অপর ল্যাম্প-স্ট্যান্ডটি জ্বালিয়ে দেবে, নির্মল ঠিক করে ফ্যালে। বইপত্র সরিয়ে একটু পথ করে রাখবে নাকি? মেঝে থেকে 'দা অ্যানালেক্টস অফ কনফুসিয়াস' মেঝের ওপর বইটি হেঁট হয়ে তুলে রাখতে গিয়ে, কী মনে করে, নির্মল আবার ওটা ওখানেই রেখে দেয়। কদিন ধরেই ফুলদানিতে গোঁজা রয়েছে খবরের কাগজের একটা দরকারি পাতা। সেটা খুলে রাখে। তারপর দেওয়াল-আলো নিবিয়ে এদিকের ল্যাম্পস্ট্যান্ডটি জ্বালয়িে দেয় ও তার নিচে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসে। ঝড় জল শুরু হবার আগেই ওরা পৌঁছে গেছে মনে হয়। টুবলুর কাছে একটু পরেই খবর পেয়ে যাবে। বাইরে মেঘগর্জন।

ঠিক সাতটা বাজলে ঝড় আসে, হাড়কলে যথারীতি সাইরেন বেজে ওঠে এবং আসে সে। 'ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং...ক্রির্‌র্‌র্‌রিং...ক্রির্‌র্‌র্‌ং'...সত্যি, ঠিকই বলেছিল মলিনা—অশ্রুতপূর্বভাবে বেল বেজে চলে, কাটা-কাটা, ঢালাঢিলে, অকুতোভয় ও জেদী, যেন মজায় পেয়েছে। কেউ কারো বাড়িতে এসে এভাবেও বেল বাজায় তাহলে? একটানা এ-হেন বাজিয়ে অবিশ্বাস্যকে সে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। নির্মল একটু সময় নেয়। গলা জমকালো করে তারপর সাড়া দেয়, 'কে-এএ?'

বেল থেমে যায়।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ঢুকে পড়ে। ঠাট্টা করেছিল মলিনা। মোটেই স্মার্ট বা ছোকরা নয়। আধবুড়ো লোকটা পিঠ দিয়ে পাল্লা চেপে ধরার আগে, তার পিছনে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে, যে-জন্য, নির্মলের মনে হয়, বিদ্যুৎ য়াকে তাড়া করে এ সে।

লোকটা খর্বকায়; তবু তাকে বামন বলা চলে না। তার মাথায় ফেল্টের টুপি। সে একটি মেয়েলি রেনকোর্ট পরে এসেছে, যাতে এখনো বোতাম লাগাবার প্রয়োজন হয় নি, যে-জন্যে, ময়লা ট্রাউজারের মধ্যে শার্ট ঠিকমতন গোঁজা হয়নি দেখা যায়, আন্ডারউয়্যার দড়ি সহ খানিকটা বেরিয়ে। সদ্য ডুব দিয়ে উঠলে যেমন হয়, ভিজে চুলগুলো লেপ্টে রয়েছে কপালে—অর্থাৎ, ফুরফুরে বৃষ্টিই এমনটি করেছে বা হতে পারে ঘাম। তার বেমানান চওড়া বুকের ওঠা-পড়া দেখে, নির্মল ভেবেছিল, লোকটি হাঁপাচ্ছে।

কাঁপা হাতে আগন্তুক নিজেই ছিটকিনি তুলে দেয়। তারপর তালু উল্টেও একসঙ্গে ভ্রূ ও

তর্জনী নাচিয়ে নির্মলকে তার সঙ্গে ভেতরে যেতে বলে।

'আপনি নির্মল রায় চাউড্রি?' ল্যাম্পস্টান্ডের উজ্জ্বল নিচে এদিকের সোফাটায় গভীরভাবে বসে পড়ে আঙুল তুলে সে জানতে চায়। তার কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়, বয়সকালে মুখে তার ব্রন হত খুব, এখন ঠিক যেন একটা বন্ধ দরজা, যাতে সংখ্যাতীত বল্টু। নির্মল মাথা নাড়া সত্ত্বেও লোকটা সৌজন্যমূলক বিনতি করে অকারণে আবার প্রশ্ন করে, 'নির্মল রায় চাউড্রি?' বলে সে একটা বন্ধ খাম নির্মলের দিকে বাড়িয়ে ধরে। খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে নির্মল দ্যাখে, ইতিমধ্যেই সে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে। এ নয় যে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, নির্মলকেই দেখছে, তবু সে তার দিকে তাকিয়ে নেই। অন্তত নির্মলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোনও ধারণা আছে, এ তার চাউনি দেখে মনে হয় না।

'ন'মামা', নির্মল পড়ে যায়, 'এই ভদ্রলোকের নাম মধু ঘোষাল। এঁকে পাঠালাম। এঁদের বাড়ি পানিহাটি, আমাদের বাড়ির কাছে সি-আই-টি রোডে এঁর নতুন বাড়ি হচ্ছে। সেই কারণে আজকাল প্রায়ই আসেন ও যেচে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তুমি শেষ যে-দিন আসো, ইনি পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অনেক দিন পরে গতকাল হঠাৎ এসে ইনি বল্লেন, আমাদের বাড়িতে সেদিন এঁর চটি-বদল হয়ে গেছে, চটি দেখেই আমি বুঝি, তোমার সঙ্গে। আজ তোমার ঠিকানা আর অফিসের নম্বর এঁকে দিলুম। শুনেছি ভদ্রলোক বহু আগে পাগলাগারদে ছিলেন, তবে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তবু এঁর সঙ্গে বুঝে-সুঝে কথা বোলো, মা বলে দিয়েছেন। ইতি, তাপস।'

চিঠির তারিখ দিন আস্টেক আগেকার।

'আসলে বদলা-বদলি হয় নি, বুঝলেন। সব ঠিক আছে। আমারই ভুল হয়েছিল, মাপ করবেন। সব ঠিক আছে...' ফস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে সে নির্মলের দিকে তেড়ে আসে। নির্মলের ঠোঁটের সিগারেটটা ধরিয়ে দেয় ও নির্মলেরই প্যাকেট থেকে বের করে নেবার আগে, নিজেও একটি দিব্যি ধরিয়ে নেয়। তার আঙুল পুড়ে যাবার কথা, নিশ্চিত গেছেও, তবু সে সাবলীলভাবে অবশিষ্ট কাঠিটুকুর আগুন হাত ঝেড়ে নেবায় ও অ্যাসট্রেতে ফ্যালে। 'তবু দেখুন', ঠোঁট বাঁকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে নির্মলকে হেসে বলে, 'আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। আলাপ করে গেলুম আমি আপনার সঙ্গে। কেন গেলুম, উঁ, তাই না?'

নির্মল অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। স্কাইলাইটটা বিদ্যুতের আলোয় জ্বলে উঠে পরক্ষণেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। সে সেদিকে চেয়ে থাকে। ঘর নীরবতায় ভরে যায়।

তারপর এক সময় নির্মল বলে, 'আপনি কিন্তু, আমার মনে হয়, প্রথমেই ঠিক বুঝেছিলেন। মানে, যে-চটি আপনি পরে আছেন, সেটা'...

'ও, নোও! নেভার! আই অ্যাম সিওর। এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না।'

'তাহলে আপনি এলেন কেন! এত খোঁজাখুঁজি... এ কী-জন্যে?'

'দেয়ার ইউ আর! তাই তো বলছি, আমি তবে এলুম কেন, উঁ?' নীল ঠোঁটের কোন মুড়ে সে হাসে, 'আমি এলুম কেন। তাই না...?' রেনকোটের পকেটে কনুই-অব্দি ডুবিয়ে, আগন্তুক একটা সবুজ চিরুনি বের করে চটপট চুল আঁচড়ে নেয়। তারপর ধীরে-সুস্থে অপর পকেট থেকে একটা বড়সড় কাগজ বের করে অসম্ভব বাঁকা ও বেঁটে পায়ে বইপত্র মাড়িয়ে, ও-প্রান্তে নির্মলের অন্ধকার সোফা পর্যন্ত হেঁটে যায়। নির্মল এবার এদিকের স্ট্যান্ডটির সুইচ টিপে দেয়। 'পড়ুন আপনি, পড়ুন এটা...' নম্রগলায় সে অনুরোধ পেপার করে। কাগজটা দুহাতে লম্বালম্বি খুলে ধরে নির্মল দ্যাখে, টাকার ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্প একটা, পঞ্চাশ। রুদ্ধশ্বাসে সে পড়ে যায় :—

**ডীড অফ রেলিঙ্কুইশমেন্ট**

আমি শ্রী.....পিতা.....সাকিন.....এতদ্বারা অঙ্গীকারপূর্বক বলিতেছি যে অদ্য শ্রীমধুসূদন ঘোষাল পিতা উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পানিহাটি, ২৪-পরগনা হইতে....তারিখে ক্রীত যে চটি পরিয়া আছেন তাহাতে আমার কোনও স্বত্ব-স্বামীত্ব নাই তথা ইহা আমার নিজের বলিয়া কোনও দাবি করি না কিম্বা ভবিষ্যতে করিব না কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ কোনও দাবি করিবে না কিম্বা দাবি করিলেও তাহা সর্বসময়ে আইন মোতাবেক অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে এবং অন্যের বিনানুরোধে অত্র নাদাবীপত্র লিখিয়া দিলাম।

'এ্যা-এ্যাই। এইখানে, হ্যাঁ, এইখানে—' খোলা লালকালির পেন মেঝের ওপর 'দা এ্যানালেক্টস অফ কনফুসিয়াস'-এর ওপর একবার ঝেড়ে, তর্জনী ঠুকে লোকটা দেখায়, 'এইখানে একটা সই করে দিন। জাস্ট নির্মল রায় চাউড্রি। ব্যাস, আর কিছু লাগবে না।'

সেই পাঠ শুরু করার পর এতক্ষণে নির্মলের হৃদপিণ্ডে প্রথম শব্দ হয়। তারপর অনেকক্ষণ পর পর বীট হতে থাকে। ভদ্রলোকের বুকের প্রকাণ্ড ওঠাপড়া দেখে নির্মল বোঝে হাঁপানোর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। সই-করার জায়গায় আগে থেকেই লালকালির একটা টিক মারা রয়েছে, সে দ্যাখে।

সকৌতুক স্মিত হাসিতে মুখের বলিরেখা ও গর্তগুলি ভরিয়ে ফেলে আগ্রহভরে সে দাঁড়িয়ে।

'আমি দুঃখিত মধুসূদনবাবু। আমি পারব না।'

'ও!' মুখ অন্ধকার করে আগন্তুক জানতে চাইল, 'কিন্তু কেন বলবেন কী?'

নির্মল বলল, 'কারণ আপনি যেটা পরে আছেন, সেটা আপনার চটি নয়।'

বিদ্রুপ ও ঘৃণায় আগন্তুকের মুখ বীভৎস হয়ে ওঠে।

'ওহ্, নো-নো! দ্যাটস রং। টোটালি রং আই সেড। এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। এটা ছেড়ে দিন, প্লীজ, এটা ছেড়ে দিন...' ভূতগ্রস্তের মতো সে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে। 'আচ্ছা, আমি বরং আর-একদিন আসব।'

'আপনি আর আসবেন না।' নির্মল উঠে দাঁড়ায়।

'আর-এ! বসুন, বসুন।' নির্মলের পিঠে সে এবার হাত রাখে। হাত পৌঁছয়। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ করে ধোঁয়া ছেড়ে, নির্মলের মুখোমুখি সামনে মুখমণ্ডল ধোঁয়ায় লুকিয়ে ফেলে ধোঁয়ার আড়াল থেকে লোকটা বলতে থাকে, 'দেখুন নির্মলবাবু, আমি যেটা পরে আছি যদিও সেটা আমারই—অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট—তবু যখন কথাটা উঠেছে...মানে আপনারও যখন মনে হয়েছে—ভুল—তবু মনে তো হয়েছে, তাই না, উঁ? ভুল আমারও হয়েছিল। আসলে উই হ্যাভ আনউয়িটিঙলি মেড এ কেস আউট অফ ইট অল... এ-ভাবে আমাদের একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে—একটা বন্ধন—তাই তো? তাই যদি হয় তাহলে আমাকে আবার আসতে হবে, তাই না?' মাথা থেকে খুলে টুপি দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে বিনতি করে সে বলে, 'হেঃ-হেঃ...ইউ সী মাই পয়েন্ট?

'তার চেয়ে লেট আস মেক এ ডীল, অ্যাজ সেনজিব্‌ল পীপল অলওয়েজ ডু', আগন্তুক এবার ধমকের সুরে সোজাসুজি প্রস্তাব করে, 'আপনি এখানটা একটা সই...জাস্ট নির্মল রায় চাউড্রি, দ্যাট উড ডু। এবং আমাদের আর দেখা হবে না।

'সী মাই পয়েন্ট?' চোখ পাল্টিয়ে সে জানতে চায়।

তর্জনীতে তর্জনী আটকে হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে রেখে নির্মল বসে থাকে।

স্কাইলাইটটা বহুক্ষণ অন্ধকার হয়ে আছে। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আছে তার মন। তবে তার হৃদপিণ্ড ফেটে দুখানা হয়ে যেতে চাইছে, 'তবে তাই হোক', সে বলতে চায়। তবু নিজের ল্যারিংস-এ হাত চেপে রেখে সে বসে থাকে।

'আমি। পারব। না।' সে বলে।

'সো ইউ ডোন্ট এগ্রি?' কলম বন্ধ করে কাগজটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আগন্তুক মুখ কালো করে বলে, 'তাহলে দেখা হবে মাঝে মাঝে? একদিন আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এর-চেয়ে-সই-করে-দেওয়া-ভালো মনে করে হয়তো একদিন—একদিন আপনি—ইউ কান্ট রুল দ্যাট আউট, ক্যান ইউ? যে-জন্যে আমাকে আসতেই হবে। আচ্ছা উঠি...' বলে গভীর ভাবে সে সোফায় ডুবে যায়।

এতক্ষণে তার পায়ের দিকে তাকাবার কথা মনে পড়ে নির্মলের। সে তাকায়; সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘর ভরিয়ে মুহূর্মুহু ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতে ঝলসাতে থাকে তার পা। ল্যাম্পস্ট্যান্ডের ঢাকা আলোর নিচে ভ্রূণ অন্ধকারের নির্মলের চটিজোড়াকে মরণকামড় কামড়ে ওই পড়ে রয়েছে আগন্তুকের পা, ঐ বিচ্ছুরিত হচ্ছে চটি থেকে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ...নির্মলের শরীর সে-দিকে বেঁকে যেতে চায়। মরুভূমির খরগোসের গা থেকে অবিরল রূপালি লাফে-লাফে ভরিয়ে ফ্যালে তার বুক, তবু সে স্তব্ধ বসে থাকে। আজ থেকে দুমাস আগে একদিন, কোনও-একদিন, নিজের মনের ভুলে কখন সে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে সর্বান্ত:করণে গলিয়ে দিয়েছিল তার পা, পথ ছেড়ে সেই থেকে ক্রমাগত বিপথে চলে গিয়ে আজ আর ফেরা বলতে কী থাকবে? আ, বুক উজাড় করে এবার একটা নিঃশ্বাস ফ্যালে নির্মল, ছোড়দির বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলার একটিমাত্র ভুলে এক-জীবনের ভুলচুক হয়ে গেছে।

গোল আলোবলয়ের নিচে ঐ বসে রয়েছে মধুসূদন ঘোষাল। তার শরীর থেকে এখন শীতের বাষ্প বেরুচ্ছে। সে উঠছে না কেন। সরল বিশ্বাসে অতিথির বিদায়-নেওয়া একজন গৃহস্বামী হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করার পর তার তো ওঠাই উচিত। প্রতি মুহূর্তে সে একটা অপরিত্যাজ্য অংশ হয়ে উঠছে নির্মলের, ইতিমধ্যেই শারীরিকভাবে তাকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দেবার ক্ষমতা নির্মলের আর নেই! বোধহয় নির্মল তাকে মুখেও আর চলে যেতে বলতে পারবে না। তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বাইরে সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছে।

*শারদীয় অমৃত, ১৯৭২*

## বন্‌ধ-এর ১০ দিন

আজ ২৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আশ্বিনের মাঝামাঝি। আজ নিয়ে পাক্কা ১০ দিন শুভব্রতদের ফ্ল্যাটের পায়খানা বন্ধ হয়ে আছে।

গেল মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার সকাল বেলা। বাজার যাবার আগে দুটি বিস্কিটসহ চা খেতে খেতে এ সপ্তাহটা কেমন যাবে শুভ জেনে নেয়, সেই মর্মে সেদিনও তার মেষরাশিতে সবে চোখ রেখেছে, এমন সময় ৭ বছরের মেয়ে পিঙ্কি বাথরুম থেকে এসে জানাল, 'বাপি চেন টানতে আজ প্যানটা জলে ভরে গেল।'

শুভ ধরা গলায় বলল, 'যাঃ।'

'হ্যাঁগো, এখনো ভরে আছে। তুমি দেখে এস।'

এমন কথা শুভ আগে কখনো শোনে নি। কোম্পানির কান মুলে শেষ পর্যন্ত এবার ৮ শতাংশ বোনাস আদায় হয়েছে, গত দেড় মাস ধরে অষ্টপ্রহর 'দাও দাও' আর 'দিতে হবে'

করতে করতে গলা বসে গিয়েছে তার। শেষ পর্যন্ত আজ আকাশ যখন সত্যিই নীল, পাকা তালের মতো ও একখণ্ড মেঘ নেই কোথাও, যখন সে ধরেই নিয়েছে যে অন্যান্যবারের মতো এবারের পুজোটাও তাহলে ভালই কাটছে—হেন সময়, জীবন-দেবতার এ কী কৌতুক!

শুভদের পৈতৃক বাড়ি আহিরীটোলায়, জয় মিত্র স্ট্রিটে। ৫ বছর আগে কোম্পানি বেহালা ছাড়িয়ে জোকায় উঠে এলে, বৌ-মেয়ে নিয়ে তাকেও গুটি গুটি এখানে চলে আসতে হয়েছে। ৩ শিফ্‌টের চাকরি তো আর আহিরীটোলা থেকে হয় না। ৬০ বছর বয়স হয়ে গেল বাড়ির, তার ৩০ বছর তো টানা ওখানেই, কই, এমনটা তো ওখানেও কোনওদিন শোনে নি। বিশ্বাস না হবারই কথা।

শুভ, কাগজ হাতেই তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেল। গিয়ে দেখল, ধুস, কোথায় কী, প্যানে একটি ফোঁটাও জল আর নেই। ছিল নিঃসন্দেহে, যে জন্যে গায়ে ইতস্তত মল এখনো লেগে আছে। তবে, জল তো নেই, সবটাই পাস করে গেছে। সে তাই আর চেন টানাটানির মধ্যে না গিয়ে, ১০ লিটারের বালতিটায় জল ভরে হুড়ুস করে সবটা প্যানে ঢেলে দিল।

ওগো মা! ঐ দ্যাখো ততোধিক বেগে হুড়মুড়িয়ে উঠে এসে প্যান তো মল আর ময়লা জলে ভরে গেলই, উপরন্তু গড়িয়ে এসে বাথরুমও ভাসিয়ে দিচ্ছে।

কুন্তলা এসে পড়ার আগেই মেথরানির ঝাঁটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তত বাথরুমটা সাফ করে ফেলতে গেল সে। কুন্তির শুচিবায়ুগ্রস্ততা ইদানীং এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে, এ বাড়িতে, এখন একে সেক্স ছাড়া, আর সবটাই ভাগ হয়ে গেছে 'তোমার আমার'-এ। এমন যে বেসিনের ওপর কাচের ট্রে-তে শুভ আর কুন্তলার টুথব্রাশেও ঠেকাঠেকি হবার যো নেই। মায়, বারান্দায় কুন্তলা আর পিঙ্কির জামাকাপড় শুকতে দেবার প্লাসটিকের তারটিও আলাদা এবং সেটি ঘোর আক্রোশ-বর্ণের—বারবার সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, একদিন, স্নান সেরে অফিস যাবার হুড়োতাড়ায় নিজের তোয়ালেটা ওখানে টাঙিয়ে দিয়েছিল বলে উরেব্বাস, সে কী অনর্থ! খাওয়া, জামা-কাপড়-জুতো পরা—দরজা বন্ধ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলল সে নিয়ে গজগজানি, বারান্দা থেকে শেষটুকু রাস্তায় ছুঁড়ে দেবে—এমন আশঙ্কা যে করে নি, তা নয়। শুভ তাই দ্রুত হাতে অন্তত বাথরুমটা...যা ভেবেছিল। মেয়েটা ঠিক মাকে লাগিয়েছে! বা, ঐ ১০- লিটার জলের তোড় শব্দের জন্যেই হয়ত শাড়ি গাছ-কোমর করে বেঁধে কুন্তলা রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে একদম সরেজমিনে এসে হাজির। বাথরুমের কাজ অনেকটা মেরে আনলেও, গুয়ে-মুতে পায়খানার তখনও সে এক বীভৎস দৃশ্য। তার পাজামা হাঁটু পর্যন্ত সপসপে।

'ওগো মা!' বলে কোমরের প্যাঁচ থেকে খুলে যে ভাবে শাড়িটা নাকে চেপে ধরতে লাগল কুন্তলা সে শুভর মনে হল সে বুঝি সবটা খুলে ফেলার আগে থামবে না।

শুভ প্রথমেই ছুটে গেল একতলার ফ্ল্যাটের প্রাচীন ভাড়াটে গোপালবাবুর কাছে। ভদ্রলোকের নতুন বাজারে খোয়া-ক্ষীরের কারবার, বেশ চালু ব্যবসা। খানদশেক শাড়ি খাটের ওপর বিছিয়ে ওঁর স্ত্রী ওঁকে পুজোর সওদা বোঝাচ্ছেন, আর উনি বলছেন, 'না-না, এডা তোমারে মানাইব, এডা কাউকে দেবা না'—এমন সময় খিড়কি দরজা দিয়ে না বলে-কয়ে ঢুকে একেবারে শোবার ঘরে শুভকে দেখে গোপালবাবু বেশ অপ্রসন্নই হলেন। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন।

শুনেটুনে বললেন, 'আর-এ মোশয়! আপনি তো আজ টের পালেন। আমাগর একতইল্লা। আমাগর তো গত হপ্তা হইতেই মাল যাচ্ছে না।'

'সে কী। কই, বলেন নি তো কিছু। চালাচ্ছিলেন কী করে!'

'আর-এ মোশয়। আমরা হলেম গিয়া রেফিউজি। শেয়ালদ'র প্ল্যাটফরমে আইস্যা উঠি। আমাগর কথা ছাড়ান দ্যান। আমি আর ছাওয়ালডা তো ঐ মাঠে গিয়ে হাইগ্যা আসি।

'অ্যাঁ!' শুভ ঢোক গিলে বলল, 'আর মেয়েরা?'

'অরা রিক্সা করে অর বোনের বাড়ি চলে যায় হেই আপনার ইউনিক কলোনিতে। ক্যান, আপনার বাড়িঅলাকে বলুন না।' বেড়ালের মতো চোখের তারা পাল্টে আবিল হাসি হেসে গোপালবাবু বললেন, 'অর সঙ্গে তো দেহি খুব পীরিত আপনার।'

উনি ১৫ বছর আছেন। এক পয়সা ভাড়া বাড়ান নি। ৫ বছরে, বাড়িঅলার ছিঁটে-ফোঁটা ফেভার পাবার আশায়, শুভ ২৫ টাকা বাড়িয়েছে। একটা ছিটকিনি ভেঙে গিয়েছিল, উনি সেটাও লাগিয়ে দেন নি। উল্টে, বাস্তুহারা গোপালবাবুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার জন্য, তাঁর নাকের ডগায় টিনের ঘর তুলে লিয়াকৎ আলি নামে এক মুসলমান দরজিকে ভাড়াটে বসিয়েছেন। তার পায়খানা নেই। ছানাপোনাসহ সে নাকি অতি প্রত্যূষে সেপটিক ট্যাঙ্কের লোহার ডালা তুলে, সরাসরি ওখানেই পায়খানা করে। আজ সেই বাড়িঅলা ব্যাপারেই উনি ঠেস দিচ্ছেন। সত্যি, ভুলই করেছিল শুভ। এই দু-কামরা ফ্ল্যাটের জন্যই, যেখানে ভাড়াটে তুলতে পারলেই সেলামি ১০ হাজার, সেখানে মাসে ২৫ টাকা এক টিপ নস্যি ছাড়া কী।

সেই কখন থেকে শুভর ঠোঁট দুটি ইংরেজি 'o' অক্ষর হয়ে আছে! শুভর সসেমিরা অবস্থা থেকে বোধহয় মায়াই হল গোপালবাবুর। কথার সুর পাল্টে উনি এবার বললেন, ওঁরা চালিয়ে নিচ্ছেন। তবে শুভরা শিক্ষিত লোক, তাদের কথা আলাদা। শুভ এক কাজ করুক। কালীকিষ্টবাবুর কাছে চলে যাক। এই ওয়ার্ডে কনজারভেন্সির ব্লক-সরকার. পুষ্পশ্রী সিনেমার কাছে—ঐ যে নুটুর চায়ের দোকান, ওখানেই রোজ সকালে বসেন ভদ্রলোক—শুভ এখুনি চলে যাক, ওঁকে পেয়ে যাবে। উনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন।

এই সময় নতুন বাজার থেকে ওঁর ফোন আসে। তাড়াতাড়ি রিসিভার ধরে উনি, 'হ্যাঁলোও-কে-হ্যাঁ-না-হ্যাঁ-না-হ্যাঁ-হ্যাঁ-না' ইত্যাদি বলতে লাগলেন। শুভ তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে উনি বাঁ হাতের ওল্টানো তালুর আঙুলগুলিতে ভারতনাট্যমের কোনও একটি মুদ্রার কাঁপন তুলে তাকে তাড়াতাড়ি যেতে বললেন।

ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, গু আর ছানার কারবারীদের চেহারা যেমন হয়, বেশ গায়ে-গতরে। মুখে দু-দিনের দাড়ি, চুল একটাও পাকে নি। কালীকৃষ্ণবাবুকে সে ওখানেই পেয়ে গেল। এবং, করিৎকর্মা ছেলে বটে শুভ, ভদ্রলোককে রিক্সায় তুলে নিয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে একদম বাড়িতে। সোফায় বসে কালীকৃষ্ণবাবু বেশ জম্পেশ করে একটি টিপ নস্যি নিলেন প্রথমে, কিছু তার আধময়লা লঙক্লথের পাঞ্জাবির ওপর ঝরে পড়ল, টি-ভি'র দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'অলিম্পিক দেখলেন?'

'হ্যাঁ।'

'রাশিয়ার মতো পারে নি।'

'না। তবে....'

'পি টি উষার ব্যাপারটা দেখলেন। চ্চুঃ, চ্চুঃ,'

'উঃ একটুর জন্যে, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। আর এক-টু...'

'আজকাল-ই সবচেয়ে বেস্ট লিখেছে—ঊষা সোনা ছুঁয়ে ফিরে এল।'

এই সময়, পাঁচীদিকে না পাঠিয়ে কুন্তলা স্বয়ং এসে একটা কোয়ার্টার প্লেটে বেশ খানিকটা ফ্রায়েড রাইস রেখে গেল, তৎসৎ দু-দুটি ক্ষীরমোহন। জিজ্ঞাসা করল, 'চা না কফি?'

'এন-না-না। চা।'

শুভ দেখল কুন্তলা পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে। সে আর দ্বিরুক্তি না করে বলল, 'আচ্ছা, কালীবাবু, তাহলে আমাদের পায়খানার ব্যাপারটা...'

'ও হচ্ছে। আমি তুলসীদাসকে বলে এসেছি। এল বলে।'

বলতে বলতেই একতলা থেকে বেল। পিঙ্কি দৌড়ে বারান্দায় গেল। কালীবাবু হাঁক দিলেন, 'কে, তুলসীদাস?'

একতলায় নেমে প্রথম ট্যাঙ্কটির ঢাকনা তোলাবার আগে, শুভকে একটু সরে যেতে বললেন কালীবাবু। শুনে শুভ তো বটেই, গোপালবাবুও জানালার পর্দাটা টেনে দিলেন। ট্যাঙ্কের হাঁ-মুখের দুদিকে দু-পা রেখে তুলসীদাস মস্ত একটা বাঁকারি ট্যাঙ্কের ভেতরে ঘোরাতে লাগল। উৎকট, ভয়াবহ দুর্গন্ধের কারণে শুভদের দোতলার জানালা-দরজাগুলো সব একে একে বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কালীবাবু নাকে তর্জনীর টোকা দিতে লাগলেন আর শুভ দাঁড়িয়ে রইল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে।

ঢাকনা বন্ধ করে সিমেন্টের ট্যাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে তুলসীদাস মাটিতে নামল। এই প্রথম লোকটার সা-জোয়ান চেহারার স্বরূপ লক্ষ্য করল শুভ। আটহাতি ধুতি-জড়ানো কোমর ছাড়া সম্পূর্ণ নগ্ন, লম্বায় ফিট-ছয়েক তো হবেই, বুকে ঘন চুল, তার মধ্যে গললগ্ন কারে বাঁধা একটা অ্যালুমিনিয়মের চৌকা চাক্তি। শুভর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাদের ডাইনিং টেবিলের মাথার কাছে অনেকদিন টাঙানো ছিল নন্দলাল বসুর 'কিরাতার্জুন' ছবিটা, ঝড়ে পড়ে গিয়ে কাঁচ ভেঙে যায়। ওটা বাঁধাতে দিতে হবে।

তুলসীদাস বলল, 'ট্যাঙ্কি পুরা বান্দো নাহি হুয়া বাবু। আভি কিছু দিন চলেগা। লেকিন হাপিস করনে পড়েগা।'

হাপিস? সে আবার কী? হাপিস মানে তো লুকিয়ে ফেলা। যেমন, লাশ হাপিস। চোরাই মাল হাপিস। এক্ষেত্রে, সে কী হাপিস করবে?

কালীবাবু বললেন, 'আচ্ছা, কত বছর ট্যাঙ্ক সাফাই হয় নি আপনি জানেন?'

'আমি জানি।' পর্দা তুলে গোপালবাবু বললেন, 'পনেরো বছর।' বলে পর্দা টেনে দিলেন। কালীবাবু (পর্দানসীনের প্রতি): ও, তবে তো কথাই নে। আচ্ছা, আপনারা কি প্যান ধোবার জন্যে অ্যাসিড ব্যবহার করেন?'

উত্তর নেই। শুভ বলল, 'আমরা করি।'

'করবেন না।' কালবাবু বললেন; 'ট্যাঙ্কের মালে আপনার যে পোকারা জন্মায়, ওরাই আপনার স্টুলটা খেয়ে ফেলে, তাই জলটা আপনার ট্যাঙ্ক-টু-ট্যাঙ্ক সহজেই পাস হয়ে যায়। মোট চারটে ট্যাঙ্ক তো। আর লইলে যা আপনাদের ক্ষেত্রে হয়েছে, পোকাগুলো অ্যাসিডে বারবার মরে গেল, প্রথম ট্যাঙ্কের আউটলেটটা স্টুল আর মরা পোকায় জাম হয়ে যায়।'

গোড়াতেই যে কথাটা মনে হয়েছিল শুভর, সে বলল, 'আচ্ছা কালীবাবু, আমাদের আহিরীটোলার বাড়িতে তা ধরুন অন্তত চল্লিশ বছরের স্যানিটারি প্রিভি। সেখানে তো কোনওদিন...'

'আরে মোশাই, সে তো আপনার কলকাতায়। তার কানেকশান তো সেন্ট্রাল সুইয়ারেজের সঙ্গে। আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেমে একদন সোজা চলে যাচ্ছে সেই ধাপায়। আর এ তো আপনার ব্যায়লা। এখানে তো যে-যার সে-তার সিস্টেম।'

'আই সি।' সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের আদত ব্যাপারটা কতকটা প্রাঞ্জল হয়ে আসে শুভর কাছে।

'হাপিস' ব্যাপারটা কী, তাও বেশ বোঝা গেল। হাপিস আর কিছুই না, একটা বাঁশের খোঁটার মুণ্ডে প্রচুর ন্যাকড়া বাঁধা। অত নেই বলে ফ্রিল দেওয়া একটা আস্ত শায়াই তুলে দিতে হল কুন্তলাকে, শায়ার টেপ খুলে খোঁটার মাথাটা বাঁধা হল, তাতে হল না। তাই বারান্দা থেকে ঘোরতর লাল-বর্ণের ফর-হার-ম্যাজেস্টি-ওনলি প্লাসটিকের দড়িটাও শেষাবধি অফার করতে হল কুন্তলাকে—এবং তারপর প্যান জলে ভর্তি করে, সেই ন্যাকড়ার মুণ্ডর দিয়ে প্যানের মুখে বারবার ভ্যাকুয়াম প্রেসার দিতে থাকা—এই হল, সংক্ষেপে, হাপিস!

কিন্তু, হা কলাপ, প্যানের গর্তে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ভ্যাকুয়াম ঠাপ দিয়ে হাত খানেকের বেশি ভাল কিছুতেই নামে না। দু-একবার ব্যবহারেই প্যান আবার মলে ভর্তি হয়ে আসে।

সেই থেকে চলছে, আজ দিয়ে ৬ দিন। এতদিন সারারাত ধরে নলের মধ্যে দিয়ে বিঘৎ খানেক এমনিই নামছিল, রোজ সকালে মিনিট-পনেরো 'হাপিস' করে শুভ নামাতে পারছিল আরও হাতখানেক। নাকে-মুখে চাপা দিয়ে তিনজনে কোনওরকমে একবার করে কাজ সারছিল। কিন্তু, গত পরশু থেকে প্যানের মল প্যানেই থেকে যাচ্ছে। একটুও সরছে না।

গোড়া থেকেই প্রস্রাব-ট্রস্রাব বাইরেই সেরে আসছিল শুভ, ও-ব্যাপারে বাথরুম ছিল তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা। প্রথম দিনেই হাঁকিয়ে দিয়েছিল কুন্তলা, 'ও সব তুমি যে চুলোয় পারে সেরে এসো। বাথরুমে পা দেবে না বলে দিচ্ছি।' কিন্তু পরশু দিন, প্যানের মাল একটুও সরে নি দেখে, এবার হৃদয়-বিদারক বড় কঠিন নারা লাগল সে, 'তুমি বাইরে পায়খানা করে এসো। কোথায়, তা আমি জানি না।'

বস্তুত, পরশু থেকে শুভ রাস্তায় ওপারে কুন্তলার প্রাক্তন ছাত্রী মণিকাদের বাড়ি পায়খানা করে আসছে। বাবা-দাদারা সবাই অফিস-কাছারি চলে যাবার পর সে যায়। তার অফিসে তাকে তিনদিনই হাফডে ক্যাজুয়্যাল নিতে হয়েছে। তা হোক, কিন্তু একজন ৩৫ বছরের ভদ্রলোকের পক্ষে পরের বাড়ির পায়খানা ব্যবহার লজ্জাজনক তো বটেই, তদুপরি, ও হো, সে কি কম ঝকমারি নাকি, প্রথমত, কোন মগটা ব্যবহার করব। জানালার ফ্রেমে লাল-নীল-হলদে নানা রঙের সাবানোর টুকরো। বোঝা যায়, এর কোনওটা মণিকার, কোনওটার বাবা-মার, কোনওটা পিসি বা দাদাদের। হায়, শুভর জন্যে ভিবজিওরের একটা রঙ-টুকরোও কি সেখানে থাকতে নেই। রোজ রোজ নিজের পায়খানার মগ হাতে বড় রাস্তা পারাপার, সে কী ভাবে যায়। কাল সে চেন টানতে বিলকুল ভুলে যায়। অবশ্য মল সে প্যানের ওপর পড়ে ছিল তা না। শৌচকার্যের সময়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তবু কুন্তলা সেই পাঠাল। চোখ পাকিয়ে, প্রায় ধমকে বলল, 'যাও, চেন টেনে এসো। পরের পায়খানায়-ছিঃ।'

তো, পরশু থেকে প্যানের মাল প্যানেই থেকে যাচ্ছে। নাকে-মুখে চাপা দিয়ে, চোখ বুজে, মা ও মেয়ে তার ওপরেই কাজ সেরে আসছে আজ নিয়ে ৩ তিন। জল ঢালবে যে, সে গুড়ে বালি। প্যান অমনি জলে ভর্তি হয়ে যাবে, এবং, এখন, আর তো সরবে না।

ছিটকে লাগবে। কুন্তলার দূরদর্শিতা তাই পিঙ্কিকে বারেকের জন্যও প্যানে থুতু ফেলতে বারণ করে দিয়েছে। সত্যি, ছুঁৎমার্গিতায় যে আনন্দমার্গীদের চেয়েও একনিষ্ঠ—সেই কুন্তলার জন্য, দুঃখ নয়, আজ কান্না পায়।

আজ বৃহস্পতিবার। আজ নিয়ে দশদিন। আজ কালীবাবু এসেছিল। এখন ৪টি ট্যাঙ্ক সাফাই করা ছাড়া উপায় নেই। মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দিলে সেটা হতে পারে বটে, কিন্তু তা ৪০০ টাকার ধাক্কা এবং কি বাড়িঅলা, কি গোপালবাবু, কেউ একটা তামা ঠেকাবেন না। কুন্তলা তুব গয়না বাঁধা দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু কালীবাবু বললেন, ৬ মাসের আগে মিউনিসিপ্যালিটির মালের গাড়ি আসবে না। তাই আজ ঠিক হয়েছে, আপাতত ৩০০ টাকার ফুরনে, রাতারাতি, ১০/১২ জন মেথর লাগিয়ে কালীবাবু প্রথম ট্যাঙ্কের অন্তত নাইনটি টু এইটটি পার্সেন্ট মাল তুলে ফেলে দেবেন। মাস ছয়েকের জন্যে ত নিশ্চিত! কোথায়? চোখ আধাআধি মেরে কালীবাবু বলে গেছেন, 'সে আপনার জানার দরকারটা কী। এইদিকে-ঐদিকে -বলে হাতটা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন, যাতে ভারত ও ভূমণ্ডলও বোঝায়। 'হাপিস' শব্দের অর্থ সম্পর্কে শুভর পূর্বধারণা এই নতুন ব্যঞ্জনা পাবে আগামী শনিবার শেষ রাতে—কাকপক্ষী টের পাবার আগেই—এরকমই ঠিক হয়েছে। অর্থাৎ, নরকে আরও ৪ দিন।

অবশ্য, 'নরকে ৪ দিন' বললে ঠিক বলা হয় না। বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। ছোট ছোট ফ্লাটে যেমন হয়, শুভদের পায়খানা বাথরুমের সঙ্গে ৬ ফিট দেওয়াল দিয়ে পার্টিশান করা। অর্থাৎ, ওপর দিকটা খোলা। বাথরুমের দরজা থেকে কাঠের একটা পিস অনেকদিনই খুলে গেছে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে হু-হু দুর্গন্ধে ফ্ল্যাট ভরে থাকে সব-সময়। ধূপ-ধুনো তাকে ঠেকাবে, এমন সাধ্যি কি। ঘরে ঘরে তাই একটা করে 'ওডোলিন' টাঙিয়েছে কুন্তলা। মার রান্নাঘরও বাদ যায় নি। এবং, তার এই একটি অদূরদর্শিতা—৫টি ওডোনিল-এর অবিরাম ল্যাভেন্ডার-গন্ধ—গোটা ফ্ল্যাটটিকে, রাতারাতি, কিচ্‌েন-স্টোররুম ও ডাইনিং স্পেসসহ এক দুই—কক্ষ বিশিষ্ট অভিনব পায়খানায় রূপান্তরিত করেছে। সুতরাং, নরকে আরও ৪ দিন না বলে 'পায়খানায় আরও ৪ দিন' বললেই আজ ঠিক বলা হয়।

২

রাত তখন ৩টে হবে। ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং। নিচের গোপালবাবুর ঘরে ফোন বাজছে। এত মৃদু শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনতে শুনতে শুভ ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কুন্তলা তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সে দেখল, মা ও মেয়ে একদম রেডি। ব্যাপার কী?

আহিরিটোলার বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। শুভর মা একটু আগে মারা গেছেন।

মা'র বয়স হয়েছিল। এবারের সর্দিটা নিউমোনিয়ার দিকে টার্ন নেয়। দিন-পনোরো। আগেও দেখে এসেছে সে, তখন ভাল হবার দিকে। তারপর পায়খানা-বিভ্রাটে আব খবর নেওয়া হয় নি। মা, সেই সুযোগে, এভাবে ফাঁকি দিয়ে পালালেন?

'হঠাৎ আবার কী হল?' সে মনোহীনভাবে জানতে চাইল।

'তা তো বলে নি। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি করো। মধুদার বাড়ি যাও। ট্যাক্সি বের করতে বলো।'

'অ্যা-হ্যাঁ, যাচ্ছি-যাচ্ছি' দু'হাতে পা-জামা ধরে একটু পেচ্ছাপ করে নেবে বলে সে বাথরুমের দিকে ছুটেছিল, মণিকা মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছো। প্যান একদম ভর্তি। সারা রাতে একটুও নামে নি। তুমি তো বেরুচ্ছ?' অর্থাৎ, বাইরে করে নিও।

'ও-হ্যাঁ, ও হ্যাঁ' বলতে বলতে ছিটকিনি খুলে, কিছুটা ঘুমঘোরে, কিছু-বা মাতৃশোকে টলতে টলতে শুভ খালি গায়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল, কুন্তলা একটা গেঞ্জি ধরিয়ে দিল হাতে। বাইরে বেরিয়ে সে প্রথমে খোলা ড্রেনের ধারে বসল।

ভোর হতে এখনো দেরি আছে। ছোট্ট লোহার গেট ধরে মেজদা দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সির দরজা জানলা গলিয়ে হাত ঢুকিয়ে খুলতে খুলতে মেজদা বললেন, 'আয় আয়। এসো মা। আগে খবর দিতে পারলাম না। ও-হো, হো-হো।'

আহিরিটোলার বাড়ির এখন যাই যাই অবস্থা। এখন প্রায় সবটাই মেজদার দখলে। ঘর কম, তাই ওদের বাড়িতে কেউ মরলে, তবে ছেলেদের বিয়ে হয়। ক্যানসারে বড়দা মারা গেলেন বেশ তাড়াতাড়িই, বৌদি ছেলে-মেয়ে নিয়ে চিলেকোঠায় চলে গেলেন, শুভ বিয়ে করল। মা অবশ্য বড্ড দেরি করছিলেন, মেজদা তাই বাধ্য হয়ে মাকে দোতলা থেকে একতলায় নামিয়ে আনেন ও খাবার ঘরের একাংশে খাট পেতে শেষ শয্যায় শুইয়ে দিয়ে, গত মাঘে ভাইপো ভোল্টুর বিয়ে দেন। বড়দা তথা শুভর ঘরটি আপাতত গৃহ-দেবতা জনার্দন জীউ ও মেজদার ছোট ছেলে পুনপুনের দখলে।

ভাসুরকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়ে কুন্তলা পিঙ্কির হাত ধরে সোজা ভোজন কক্ষে চলে গেল। মেজদার সঙ্গে শুভ বসল সদর ঘরে। মেজদা টেবিল-ল্যাম্প জ্বালালেন ও পাখার সুইচ টিপলেন। ওদিকে ঝুরঝুর করে খানিকটা পলেস্তরা খসে পড়ল।

দুজনেই চুপচাপ। রাঁধুনী গৌরীদি 'চা না ভিভা' জানতে এলে মেজদা বললেন, 'চা? তা, এ্যাঁ...'

'ভিভা তাহলে?'

'ভিভা খেলে তা আবার উইন্ড হয়। আচ্ছা ভিভাই দাও।'

'ছোটবাবুর চা তো?'

শুভ ঘাড় নাড়ল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মেজদা আগে বুকটা ফুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'আমার হাত থেকে গঙ্গাজল পুরোটা খেলেন, তবে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। তার আগে গৌরীর দেওয়া ওষুধ সবটা ফেলে দিয়েছেন।'

শুভ চুপ করে রইল।

শেষ যেদিন এসেছিল, সে তখন ভাবছিল, মা তাহলে বুঝতে পেরেছিলেন যে আর বেশিদিন নেই। শুভর হাত ধরে বলেছিলেন, 'ছোটখোকা, শিগগির আবার আসিস। মরার আগে তোর হাতের জল যেন পাই।' অসুখের পর থেকে শুভ সপ্তাহে দু'দিন করে আসছিলই। হঠাৎ কোথা থেকে যে কী, দুনিয়ার সব পায়খানা সড়গড়, যাবি তো যা, শুধু তাদেরটাই বন্ধ হয়ে গেল।

মা শুভকেই ভালবাসতেন। বিয়ের আগে পর্যন্ত কাশী-বিন্ধ্যাচল থেকে হরিদ্বার মায় কেদারবদ্রি মাকে কোথায় নিয়ে যায় নি সে। বিন্ধ্যাচলে কী একটা ব্যাপারে মাকে কটু কথা বলেছিল, বাস, ধর্মশালার ঘর থেকে, এক বস্ত্রে, বুড়ি একদন হাওয়া। দারুণ লু বইছে সেদিন, তখন দুপুরবেলা। বহু খোঁজাখুঁজি করে রাস্তার ধারে এক বটগাছের নিচে শেষ পর্যন্ত পেল। শুভকে দেখেই, রাগ করে মা'র সেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ও-হো, সে জিনিস এ জীবনে ভোলার নয়। অনেক হাতে-পায়ে ধরে শেষ পর্যন্ত টাঙ্গায় তোলে।

শেষ যেদিন এসেছিল, তখন মেজাদর ভাত বাড়া হয়েছে আর দু-একটা ইঁদুর ঘোরাঘুরি করছে দেখে গৌরিদি ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'ছি-ছি মা, আপনি কি একটু হুস-হাসও করতে পারনে না?'

শুনে সে কী চন্দ্র-সুষমা ছড়িয়ে পড়েছিল মার মুখে! ক্ষীণ হাসির উদয়-অস্তের মাঝখানে, মৃদুকণ্ঠ মা বলেছিলেন, 'কী করব মা। আগে হুস-হাস করতাম, ওরা পালাত। এখন আর গেরাহ্যি করে না। এখন তাই গুরুদেবকে ডাকি।'

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে শুভ কুন্তলাকে বলেছিল, 'আমি মাকে কালই-এ বাড়িতে আনব।'

'মেজ্‌ঠাকুর আনতে দেবেন না। মার গলায় এখনো বিছে-হারটা রয়েছে। তাছাড়া', কুন্তলা বলেছিল, 'মাও ভিটে বাড়ি ছাড়বেন না।'

'আলবৎ দেবে, আলবৎ ছাড়বে', হাতের তালুতে ঘুষি মেরে শুভ বলেছিল, 'তা বলে ঐ স্যাঁৎ-সেঁতে ঘরে ইঁদুর-আরশোলার মধ্যে মরে পড়ে থাকবে? গৌরী ঐ রকম করে বলবে? বৌদি তাহলে কীভাবে ট্রীট করছে, ভারতে পারো তুমি?'

'বেশ তো, আনো না, যদি আসেন।' কুন্তলার স্বরে আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছিল।

সে আর হয়ে ওঠে নি। তারপরেই তো পায়খানা বুজল।

বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। একটা ট্যাক্সি এসে থামল। রাস্তার কুকুরগুলোর পরিত্রাহী চিৎকারের মধ্যে বোন কমলা আর ভগ্নীপোত জগদীশ নামছে। টেবিল ল্যাম্প সুইচ টিপে নিবিয়ে, ভিভায় শেষ চুমুক দিয়ে অভ্যর্থনার জন্য মেজদা উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে জানতে চাইলেন, 'হ্যাঁরে, তোদের পায়খানা নাকি চোক্‌ড?'

চা খেতে খেতে শুভর বেশ পায়খানা পেয়েছে। এসে পর্যন্ত সে মৃতের ঘরে যায় নি। তার সর্বস্ব তাকে বাধা দিচ্ছে ও-ঘরে যেতে, সেই বিশ্বাসযোগ্যকে প্রত্যক্ষ করতে, জীবনে শুধু একমাত্র যাকে একটুও অবিশ্বাস করা যায় না।

সে বরং পায়খানায় গেল। দিনের বেলাতেও সুইচ টিপতে হয়, এমন পায়খানা। আলো জ্বাললে বাদামী দেওয়ালে খরখর, শত শত আরশোলা। ফাটা, চলতা-ওঠা প্যান। সপ্তাহে মাত্র একদিন মেথর। সিস্টার্ন নেই। সেন্ট্রাল সুইয়ারেজ সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত বলে তবু মাত্র দু মগ জলেই, দ্যাখো, সি-এস-এসের সঙ্গে হাতে হাত, নাচতে নাচতে কেমন কোথায় চলে গেল।

খাটে তোলার আগে মেজবৌদি যখন মা-র মাথার সিঁদুর শাঁখায় ঠেকিয়ে নিচ্ছেন—কুন্তলাসহ অন্যান্য সধবারা ওঁর পিছনে লাইনে—আর মেজদা ফোটোগ্রাফার এস. কুমারকে বলছেন, 'শ্রাদ্ধের দিন আমি চাই আমার সুন্দরী মায়ের ছবি, একদম কম বয়সের'—সেই সময় ঘরে ঢুকে মা-র মুখের দিকে একবার তাকিয়েই শুভ মুখ ফিরিয়ে নিল। বেঁচে থাকার শেষ অভিব্যক্তিটি, সে দেখল, মৃতের মুখ থেকে এখনো মুছে যায় নি। এবং সেটা হল, তার মনে হল, 'আঃ, বাঁচলাম।'

দাদা তখনও একটু চেঁচিয়ে, 'ও হো-হো, এই মায়ের জন্যে আমি কী না করেছি...মার যখন কলেরা হল....শুভ তখন পাঁচ বছরের আর কমলি পেটে—' বলে যাচ্ছেন বলে, শুভ সেই সুযোগে, মার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে, অস্ফুট উচ্চারণে দু-বার 'মা ক্ষমা করো, মা ক্ষমা করো' বলে নেয়।

নিমতলায় ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে শবের লম্বা লাইন, মা-র টার্ন আসতে সন্ধে হয়ে গেল। স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরাবার আগে 'বন্ধনমুক্ত' করার সময় শ্মশান-পুরোহিত 'এখন যা পাওয়া যাবে সব আমার' বলে পুরান জামাকাপড় থেকে হাতের মাদুলি পর্যন্ত সব খুলে নেবার সময় এক কাণ্ড ঘটল। শাড়িতে একটা শক্ত গিঁট, কিছুতেই খোলে না।

মেজদা, জগদীশ, ভোল্টু, পুনপুন—সবার সঙ্গে শুভও ঝুঁকে পড়ল। অবশ্য, পাবেটা কী। গয়নাগাটি বৌদি তো সবই একে একে খুলে নিয়েছেন। শেষ সম্বল গলার বিছে হারটা দেখিয়ে সকলের সামনে মা এই সেদিনও বলেছেন, 'এটা পিঙ্কির।' বৌদি নিঃসন্দেহে সেটাও দেবেন না।

মার আঁচলের গিঁট অনেক টানা-হেঁচড়া করে খুলে পাওয়া গেল একটা কুড়ি টাকার নোট, কতকাল বাঁধা আছে কে জানে, নিঃসন্দেহে দু-একবার জলকাচা হয়ে গেছে। তুলোর মতো নরম নোটটির ভাঁজ সন্তর্পণে খুলে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে পুরোহিতকে তাকাতে দেখে, শুভ তাঁর দুটি হাত ধরে 'দেখুন পুরুত মশাই, এটার নম্বর তো ঠিকই আছে—আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়ালেই—রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকে—হয়ত খুব জোরে একটা টাকা কেটে নেবে' ইত্যাদি বলে মার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল।

নতুন কাপড় পরে গোধূলিলগ্নে মা ট্রলিতে চেপে চুল্লির মধ্যে ঢুকে গেলেন, ঠিক যেন টোস্টারে পাউরুটির স্লাইস। ভিতরে হটপ্লেটে ছোঁয়া লাগা মাত্র দপ করে লাফিয়ে উঠল আগুন। চুল্লির বিশাল গেট নেমে গেল।

পরদিন শুক্রবার সকালে তারা বেহালা রওনা দিল। কাল ফোন-টোন করে দিয়েছে অফিসে, দিন পনের ছুটিও মৌখিকভাবে পেয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে আজ এশট্যাবলিশমেন্টের মৌলিক আসবে। ট্যাক্সিতে সেই কথাটা ফের মনে পড়ল শুভর, গঙ্গায় এক বুক জলে দাঁড়িয়ে কাল সন্ধ্যাবেলা যা মনে হয়েছিল। আচ্ছা, কাল সকালে কাছা গলায় নতুন কাপড় পরে সে মণিকাদের বাড়ি যাবে কী করে। অবশ্য, বাকি শুধু কালকের দিনটা। আজকের ব্যাপার তো সবারই এ বাড়িতে হয়ে গেছে। কাল শনিবার রাতারাতি নাইনটি টু এইট্টি পার্সেন্ট মাল হাপিস হবে। তারপর ছ-মাসের জন্যে নিশ্চিন্তি। সত্যি, মার মৃত্যু রাতারাতি কত বদলে দিয়েছে কুন্তিকে! কাল থেকে বারেকের জন্যও সে পায়খানা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নি। আর একটা দিন সে ঠিক মানিয়ে নেবে। আর-এ! রবিবারেই ত মহালয়া, তাই না। ভোরে মহিষমর্দিনী। এ-বছর মহালয়ার সকাল বেলাটা সত্যিই ছোটবেলার সেই 'রাত পোহালো ফর্সা হলো' পদ্যের মতোই নীল পতাকা কাঁপিয়ে আবার ফিরে আসবে।

বাড়ি ফিরে নতুন ইঁটের ফাঁকে বালি ছড়িয়ে তার ওপর নিবে যাওয়া প্যাঁকাটি ও কাঠের আগুনে, বাতাস করতে নেই বলে, শুভ আর কুন্তলা উপুড় হয়ে একযোগে ফুঁ দিচ্ছে—ওপরে ফুটন্ত মালসা—এমন সময়—হুড়-হুড়-হুড়ু স!

ব্যাপার কী! দুজনেই লাল অশ্রুভরা চোখে দুজনের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, এর দিল কি আরমা এখন ধোঁয়ার জ্বালায় ওর চোখের আঁসু দিয়ে ঝরে পড়ছে, কিন্তু দুজনের চোখের ভাষা একই। আওয়াজটা বাথরুম থেকে না? একটাই সম্ভাবনার আশা তাদের চোখে ফুটে উঠেছে।

সবার আগে পিঙ্কি ছুটে গেছে বাথরুমে। পায়খানার দরজা দু-হাট করে খুলেই সে চিৎকার করে উঠেছে, 'বাবা! মা!'

শুভর পিছনে পিছনে কুন্তলাও হুড়মুড়িয়ে দৌড়, দৌড়। সত্যি, দৈব ছাড়া একে আর কী বলা যায়। এখনো গায়ে ইতস্তত মল লেগে থাকলেও, গুডনেস প্যান একদম বিলকুল খালি! এতে কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও অলৌকিক উপায়ে পাইপ খুলে গেছে হঠাৎ,

সব মাল হুড়হুড় করে কোথায় তলিয়ে গেছে!

শুভ প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এক মগ জল ঢেলে দ্যাখে। কাণ্ড দেখলে, নেংটি ইঁদুরের মতো সহর্ষে, কেমন সুড়ুৎ করে চলে গেল! সে আর ধৈর্য রাখতে পারে না। দশ লিটার জল-ভরা বালতির জন্য তার হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। সে হুড়ুস করে প্যানের মধ্যে একসঙ্গে দশ লিটার জল ঢেলে দেয়।

বিস্ফারিত দুচোখ মেলে সে প্যানের জলধোয়া অকলঙ্ক সাদার দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। ঠিক যেন তার হেঁড়ে মাথার ভেতরটা, কত সাফ-সুফ আর ঝকঝকে লাগছে সেখানেও। কতদিন এত নির্ভার বোধ করে নি তার মাথা! সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে এক অবাক-কাণ্ড করে বসে শুভ। বাথরুমের ছাঁদ ফুঁড়ে সে মেয়েকে আকাশ পর্যন্ত তুলে ধরে। তারপর চিৎকার করে বলে ওঠে, 'মা! মা!'

মেয়েকে নামিয়ে দুহাতে নাড়া দিতে দিতে উদ্ভাসিত মুখে সে কুন্তীকে বলতে থাকে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মা! কুন্তি, আমার মা! মা আমাদের কষ্ট আর সহ্য করতে পারেন নি। মা-ই ট্যাঙ্কের মধ্যে বন্ধ আউট-লেটটা নিজের হাতে সাফ করে দিলেন; তুমি বিশ্বাস কর, দ্যাখো, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার!'

'ওগো মা, তুমি আমাকে এত ভালবাসতে!' বলতে বলতে ঘরের মেঝেয় পাতা খড় ও কম্বলের বিছানার ওপর, কাছা গলায়, লুটোপুটি খেতে খেতে হাঁউমাউ করে কাঁদতে লাগল শুভ। না পিঙ্কি, না কুন্তলা, কেউ তাকে থামাতে পারল না। রান্নাঘরে পাতা ইঁটের উনুনে পাশাপাশি দুটি মালসায় হবিষ্যির অন্ন ফুটে ফুটে ইঁট হয়ে যেতে লাগল।

*আজকাল, শারদীয় ১৯৮৪*

## রুবির সঙ্গে হীরা বন্দরে

আজ চার বছর ধরে রুবি ডায়মণ্ডহারবার যেতে চাইছে। আর আমি চাইছি না যেতে। রুবির বাসনাদি সেখানে যায়। আমি ডায়মণ্ডহারবার কখনো যাই নি। শুনেছি, নদী-মোহনা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। শুনেছি, গভীর রাতে সেখানে যে-কোনও বাসগৃহের ছাদে দাঁড়ালে, ছাদে একা দাঁড়ালে, গভীর রাতে ছাদে একা দাঁড়ালে—দূর থেকে সমুদ্র-গর্জন শোনা যায়। তা সে ছাদ একতলা, দোতলা কি পাঁচতলা যাই হোক না কেন। ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তায় নাকি একটাও কুকুর নেই? লোকে তাই বলে।

গত চার বছর ধরে রুবির সঙ্গে শুধু দেখা-সাক্ষাৎই হচ্ছে। সিনেমা, রেস্তোরাঁ—কেবিন-চুমু, মাংস ঘাঁটা—বিশেষত বুকের—এইসব। সেক্স হয় নি। কলকাতায় বান্ধবীর সঙ্গে এ জিনিসটি হওয়া বেশ কঠিন। বিবাহিত বন্ধুবান্ধবদের সংসারে এ জিনিস হবার নয়, মা-বোন আছে, ছেলে-মেয়ে রয়েছে। কিন্তু যারা বিশুদ্ধ বামাচারী, মানে শুধু বৌটি নিয়ে ঢুকে পড়েছে ফ্ল্যাটে, ছেলেপিলেও হয়-টয় নি, বা, বৌ বাঁজা—তারা যখন ফ্ল্যাটের দরজাটি বন্ধ করে, আপাতদৃষ্টে মনে হয়, শুধু মা-বাপ, ভাই-ব্রাদার ও আত্মীয়-স্বজন নয়, শুধু নিজের দেশ ও জাতি নয়, বুঝি সারা পৃথিবীর মুখের ওপর তারা ওই দরজাটি বন্ধ করে দিল। কিন্তু, তা না। সেখানেও যে কল্কে পাবে এমন আশা দুরাশা। সেখানে স্বয়ং বৌটি রয়েছে। নারায়ণী শিলা।

কলকাতার হোটেলে আইডেনটিটি ডিসক্লোজ করতে বলে। যে, সম্পর্ক কী? যদি বলা

যায়, আমি কষ্ট পেলে ও কষ্ট পায়, সেদিন একটা আধলা ইঁটে ঠোক্কর লাগল রাস্তায়, আমি নয়, এই যে, ইনি বলে উঠলেন, 'উঃ', মশায়, এই আমাদের সম্পর্ক—তাহলে হবে না। অথচ, যে বৌকে চার বছর চুমু খেতে মনে নেই, তাকে নিয়ে গেলে কোথাও কোনও দ্বিরুক্তি নেই। তাছাড়া, হোটেলে অ-পত্নীকে নিয়ে উঠতে গেলে, নিদেনপক্ষে একটি সুটকেশ হাতে থাকা দরকার। লাগেজ থাকলে ভাল। অথচ বৌ নিয়ে গেলে কেন যে সুটকেশ-লাগেজ এ-সব কিচ্ছুটি লাগে না। কে জানে।

কিন্তু, ডায়মণ্ডহারবারে যাও, সেখানে কোনও সুটকেশ-লাগেজ নেই। বৈধ-অবৈধ নেই। সেখানে জিজ্ঞাসা নেই।

কলকাতায় কিছু ঢালাও হোটেল অবশ্যই আছে, যেমন কিড, সদর কি রয়েড স্ট্রিটে, যেখানে কোনও বাধা নেই। কিন্তু, সেখানে অন্তত একটি, অব্যর্থ রিলেশান লাগে। অর্থাৎ, বেশ্যা ও বাবু। রিসেপশান অবধারিতভাবে রুবিকে বেশ্যা ভাববে। তা নইলে, জিওলজিকাল থেকে মাত্র দু-ফার্লং দূরে হোটেলে নামিয়ে তিন টাকা ভাড়ার পরেও রিক্সাওলা রিশেপশান থেকে দশ টাকা দালালি পায় কেন? রুবিকে কেউ বেশ্যা ভাববে, এটা মানা যায় না। তাই ওখানে যাওয়া যায় না।

কিন্তু, ডায়মণ্ডহারবার। শুধু ডায়মণ্ডহারবার। ডায়মণ্ডহারবার গেলে এক লোটা আর কম্বল ছাড়া কিছু লাগে না।

কলকাতায় বোধহয় এমন আর কোনও রেস্তোরাঁ নেই যেখানে আমাদের যেতে বাকি। মাস-চারেক আগে, কলকাতার এমন শেষ অনাবিষ্কৃত রেস্তোরাঁটি আমরা খুঁজে পাই, যার কেবিন আছে ('এমন একটা ঝিনুক, যাতে মুক্তো আছে')। সেটা ছিল নিষ্ঠুরতম মাস এপ্রিল, ট্রামের চাকায় ফুলকি ও পাথর গরম—যখন রয়েড স্ট্রিট ছাড়িয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ, বাঁ-দিকে—ইং পিং! আর-এ, এটা এতদিন ছিল নাকি, এখানেই? কই কোনওদিন চোখে পড়ে নি তো। নীল ছপ্পর ফুঁড়ে খসে পড়ল কখন? আ, ঠিক যেমনটি আমরা চাই। ভিতরে ঢুকেই সরু আবছায়া করিডোর। বাঁ-দিকে ছোট ছোট চার-পাঁচটি কেবিন। তারপর সমকোণ বাঁক নিতেই, আবার ঝর্ঝরে কেবিন দু'সারি, এবার ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই। কেবিনে-কেবিনে ছয়লাপ একেবারে, ড্রাগনের নীল তলপেটে ঢুকে পড়েছি যেন। সেখানে সার সার উড়ন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে যে-টুকু চোখে পড়ে, জোড়ায় জোড়ায় ইং-পিং অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকা। ভিতরে শেড-দেওয়া জোনাকি-আলো, তুলনায় অন্ধকারই বিকীর্ণ করছে বেশি। আ, নরকে স্বর্গ যেন এক টুকরো।

যেতে যেতে খালি পেয়ে তারই একটিতে বসে, 'ইং-পিং স্পেশাল ছাউ-মিয়েন' দু-ভাগ করে খেতে খেতে, কাঁটা-চামচ প্লেটে রেখে আমি রুবির বুকে হাত ডোবাই ও তাকে সস্নেহে বলি, 'রুবি, আর সব মেয়ের বুকে মাংস। তারা মেয়েছেলে। শুধু তুমি নারী। শুধু তোমার বুকে আমি আতরের গন্ধ পাই।'

না, আতর নয়। আতর বললে ঠিক বলা হয় না। বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। আসলে, আমি নির্ভুলভাবে অগুরুর গন্ধই পাই ওর বুকে। কিন্তু অগুরুতে কেমন যেন মড়া-পচা গন্ধ। তাই আতর বলি।

তবে, আমি এ-রকম পারি না বলতে। কেন আতর, কী করে এমন লাগসৈ বলতে পারলুম, বলছি। আসলে, স্টুডেন্টস হলে, হ্যাঁ, গতকালই তো—নাকি পরশু? কবি-সম্বর্ধনা না কী-একটা কচু-পোড়া হচ্ছিল। তখন বিকেলবেলা। গোলদীঘির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাইকে কোনও-এক দাঁত ফোকলা তরুণ কবির গলায় প্রবীণ কবিরও-হেন লাইন

দুটি আমার কানে আসে। সে 'আতর'ই পড়েছিল।

পাছে ভুলে যাই, আমি তখুনি লাইন দুটি মনে গেঁথে নিই, ও ঠিক করি, এরপর রুবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই এটা ঝাড়তে হবে। মূল লাইনদুটি ছিল পয়ারে, তবে তাতে অন্ত্যমিল ছিল না। কিন্তু আবেগবর্জিত গদ্যেও সেটা শুনতে খারাপ লাগে না। অন্তত, শুনে রুবি বেশ কাতর হয়ে পড়ে।

তো, আতরের গন্ধে বেশ মাস চারেক চলল। আর কতদিন? দেখতে দেখতে আগস্ট মাস এসে পড়ল। মানে ভাদ্র। মানে, কুকুরদের মাস। কথায় বলে, ভাদ্রের কুকুর। কলকাতার পথে-ঘাটে কুকুর-কুকুরীর সর্বান্তঃকরণ প্রণয়লীলা! আমি একদিন রুবিকে বলেই ফেললুম, 'এবার কোনও কাপ্‌ল দেখেছ এখনো?'

'মানে? রুবি তখনও বোঝে নি। তখন সন্ধেবেলা বৃষ্টি সবে থেমেছে। জল-রঙে আঁকা বহুবর্ণ লিণ্ডসে স্ট্রিট ধরে আমরা হেঁটে যাচ্ছি ইং-পিংয়েরই দিকে। যেতে যেতে একটা গোলা পায়রাকে, ঝর্না ভেবে, 'গঙ্গোত্রী'র (ইউপি হ্যাণ্ডলুম) ড্রেন-পাইপ থেকে বেরিয়ে-আসা নোংরা জল খেতে দেখি। একবার জলে-ঠোঁট, তো দশবার টুকটুক করে ঘাড় ঘুরিয়ে, ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে চারদিকে আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টি! খাচ্ছে বিষাক্ত জল, অথচ সতর্কতা বাজপাখির ছোঁ থেকে। যদিও কলকাতার আকাশে আর একটাও বাজ নেই। জিন-কোডের ব্যাপার আর কি।

যেতে যেতে আমি বলি, 'মানে, হ্যাভ ইউ সিন এনি ডগ অ্যান্ড বিজ মেটিং দিস সিজন—অ্যাজ ইয়েট?'

'ও, ইয়েস।' একটু লাজুক, বেশ সপ্রতিভ, কিছু-বা আগ্রহের সঙ্গেই রুবি জানায়, 'আই হ্যাভ। অ্যাণ্ড ইন ব্রড ডে-লাইট ট্যু।'

'কবে?'

'এই তো', পিঠ ভর্তি চুল দুলিয়ে, 'পরশু দিন।'

তার ঘাড়ের ঐ চুলগুলি রুবি আমাকে কখনো তুলতে দেয় না। 'আমার পিঠে বড় সুড়সুড়ি' সে বলে।

অনেকক্ষণ চুপ। তারপর আমি জানতে চাই, 'কোথায়?'

'ঐ যে, আমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে জেনসন-নিকলসনের বিজ্ঞাপনটা হোয়েন-এভার ইউ থিঙ্ক অফ কলর, থিঙ্ক অফ আস—ওর একদম নিচে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি ভাবলুম, হায়, ওদের কোনও হোটেল লাগে না। ব্রড ডে-লাইটে আমাদের কী? না, চিতা! সেখানে আলোয় আলো। আগুন। শুধু ভালবাসার জন্য গাঢ় অন্ধকার ঘর।

আমি মুখে বলি, বেশ অভিমানভরেই, 'যত ভাল ভাল জিনিস শুধু তোমার চোখে পড়বে!' রুমি মাথা নিচু করে হাসল। মুখ যথারীতি তার বুকে। সত্যত, এ-রকম ছাপার অযোগ্য, অধম, কথাবার্তা, আমরা কলকাতার প্রেমিক-প্রেমিকারা নিজেদের মধ্যে বলে থাকি। বা, না বলে পারি না। আমরা ছাড়া কে বা শুনছে!

ঐ তরুণ কবির মতো আমরা পারি না বলতে। এ-সব মহানাগরিক সূর্য-কিরণ, এরা ঈষৎ ধুলো-ভরা বটে, কিন্তু এতেই আমাদের জামা-কাপড় শুকোয়, তথা জীবন ঝলমল করে। এ-ভাবেই বুকের মাংস থেকে অগুরু বা আতর তথা আতর-অগুরু থেকে বুকের মাংসে আমাদের যাতায়াত।

আমি কুকুর-কুকুরীর সঙ্গম শেষ দেখি, নিমতলার কাছে চিতার জন্য কাঠ-বোঝাই একটি ব্রেড-ডাউন লরির নীচে, টায়ারের পাশে। সেও বছর তিনেক আগের কথা। হয়েছে কী, আমার ভায়রাভাই মারা গেছেন সেদিনই সকালবেলা। ভায়রাভাই ডাক্তার। শুনলুম, শোবার ঘরে রেক্সিনে-মোড়া টেবিলটার ওপর স্তূপাকার ওষুধ—হরেককিসিমের অ্যাম্পুল-ক্যাপসুল-ট্যাবলেট-স্ট্রিপ দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে 'প্রেগনিসোলন' 'প্রেগনিসোলন' বলতে বলে টেবিল ছেড়ে সে মেঝেয় পড়ে যায়। বাস, পয়সা হজম।

টেলিফোনে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা খবর পাই, কিন্তু, রবিবার, রুবির সঙ্গে আগে থেকেই নুন-শো ছিল, তাই আমি রাণুকে বলি, 'আজ শিলিগুড়ি থেকে বসাক সাহেব আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে আজই লাঞ্চে না বসলে তিস্তায় বোল্ডার ফেলার কাজটা আমি পাব না।' কাজটি সাড়ে তিন লাখের, সে জানে। শুনে সে বলল, 'তুমি তাহলে শ্মশানেই এসো। বিকেলের আগে তো ডেডবডি বেরুচ্ছে না।' নীল-পাড় সাদা শাড়ি-টাড়ি পরে, খালি পায়ে, বেরবার জন্যে রাণু মেয়েকে নিয়ে রেডি। নিখুঁত বিষাদ-প্রতিমা!

'আমাদের বাঞ্ছারাম অক্রূরের মোড়ে ছেড়ে দিয়ে যাও। ফোন করে বেরুবার সময়টা জেনে নিও। আর শোনো, শোকস্তব্ধ গলায় সে বলল, 'বিয়ার খেয়ে এসো না প্লীজ।'

নুন-শো থেকে সোজা শ্মশানে। তখনও কেউ আসে নি। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে রাখা সবকটি লাশ আমি দেখে নিই। ওদের মধ্যে ধূর্জটি নেই।

বাইরে শূন্য খাট একটি। শবদেহটি সদ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভিতরে। একটা বাছুর-সাইজের রামছাগল খাট থেকে স্তূপাকার ফুল ও বোকে নামিয়ে, লাথি দিয়ে জগদীশবাবুর গীতা ও জ্বলন্ত ধূপটুপ সরিয়ে রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলো খাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। অগুরুর শিশিটা তার খুরের চাঁটে ভেঙে গেছে। থ্যাঁতা, উচ্ছিষ্ট রজনীগন্ধার গা বেয়ে অগুরু গড়িয়ে পড়ছে, আমি লক্ষ্য করে দেখি।

অগত্যা শ্মশান থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে যাই আমি আহিরিটোলার দিকে। অন্তত কিছুটা শবানুগমন করা যাবে। এইখানেই লরির নিচে ও টায়ারের পাশে সঙ্গমরত পশুদ্বয় আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে শবযাত্রা এসে পড়ে। 'এই যে অরুণ, তুমি কতক্ষণ এখানে...ওহো, যা রোদ্দুর...' বলে রাণুর দাদা, সেল্‌স ম্যানেজার, স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া, আমাকে শবযাত্রায় ডেকে নেন এবং তিনি 'বলহো' পর্যন্ত বলা মাত্র ও 'রি' বলার আগেই আমি মাত্রাজ্ঞানহীন 'হরিবোল' বলে উঠে অনুগামী হই।

থাক এ-সব তিন কি চার বছর আগের কথা, এখন চার ও তিন মাস আগের কথা, বলা যাক, যা বলছিলুম। এখন ভাদ্র মাস। এখন অগুরু তথা আতরের গন্ধ থেকে রুবি আমাকে নিয়ে যেতে চায় বুকের মাংসে।

'চলো ডায়মণ্ডহারবার যাই।'

'ডা-য়-ম-ণ্ড-হা-র-বা-র?'

'আ-হ্যাঁ। ডায়মণ্ডহারবার! এমনভাবে বলছ, যেন লঙ্ বিচ কি মায়ামিতে, যেতে বলছি। যেন এই প্রথম নাম শুনলে, যেন চার বছর ধরে তোমাকে বলছি না যেতে। বাসে ঘন্টা দেড়েক। আমি সব খবর নিয়েছি। ছটায় ফেরার বাস ধরব। ফিরতে আটটা।' একদমে এতটা বলে নিঃশ্বাস ফেলার জনে রুবি থামল প্রশ্বাসে বুক ফুলিয়ে বলল, 'ওখানে ঢের হোটেল।'

'তারা রিলেশান জানতে চায় না?'

'একদম না। অন্তত হোটেল অঞ্চরীতে।'

'কে বলল?'

'বাসনাদি বলছিল। সুকান্তদা, আমাদের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সঙ্গে প্রত্যেক অলটারনেট শনিবারে যায়।'

'সেকেণ্ড অ্যাণ্ড ফোর্থ?'

'রবিবার ফেরে।'

'বাসনাদির হাজবণ্ড সব জানে বলেছিলে, না?'

'না-তো কী! তোমার মতো বৌ-ভীতু?'

রুবির সঙ্গে চার পেরিয়ে পাঁচ বছর, আমি এখনো রানুকে কিছু বলতে পারি নি। রুবি কতবার বলেছে, 'আমি কারো সংসার ভাঙতে চাই না। বিশেষত বিন্তি, তার বাবাকে আমি কেড়ে নিতে চাই না। শুধু বৌকে তুমি বল যে, আমি আছি। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।'

'আমি তো সবই দিচ্ছি বাপু তোমাকে। কী পাচ্ছ না, বলো? বৌ-মেয়ে নিয়ে কালিম্পঙ যাবে, যাও। মেয়ে স্কুল-ফাইনাল পাশ করল, রঙিন টি-ভি দেবে, দাও। আমেদপুরের কাজটায়...দশ হাজার টাকা কম পড়ল, ফিক্স ভেঙে এনে দিলাম, নাও। শুধু আজ চার বছর ধরে বলছি, একবার একদিনের জন্যে ডায়মণ্ডহারবার চলো—সেদিনই ফিরে আসব—রাতে শুতে পাবে বাবা বৌ-এর সঙ্গে—একটা দিন কি তুমি আমাকে দিতে পারো না?'

এত বলে রেস্তোরাঁয় কেবিনের মধ্যে সে ঠোঁট ফোলায় ও পিঠ-ভরা চুল দোলায়। হাতদুটো জড়িয়ে ধরে মুখ কাছে আনে ও চুম্বনের জন্যে ডাকে। চুল তুলে আমি তার ঘাড়ে চুমু খেতে চাই।

'ও কি, ও কি', বলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সে সরে যায়। সে বরং তার গ্রীবা তুলে ধরে। আমি ওখানে চুম্বনের জন্য ঠোঁট ডোবাই। বাঘে চুম্বন করলে এটাই হয়ে যায় টুঁটি। আমি দাঁত বসিয়ে দিই। আমার জিভে এই প্রথম রুবির রক্ত-স্বাদ লাগে।

'রুবি', জিভ দিয়ে তার রক্ত চাটতে চাটতে আমি বলি, 'যাব। আজ মঙ্গলবার, সামনের শনিবার সকালে আমরা যাব। তুমি বাসনাদিকে বলে আমাদের জন্যে অপ্সরীতে একটা ঘর ঠিক করে রাখ। ফোন তো করা যায়, তাই না?'

বলতে বলতে কেবিনের আলো-অন্ধকারে আমরা শিরা-উপশিরা ধরে থ্যাঁতা রজনীগন্ধাকে ঠেলে সরিয়ে অগুরুর গন্ধ উঠে আসে।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসে।...

রুবি আমাকে ভালবাসে আর রাণু বাসে না। সেই কবে, কলেজ জীবন থেকে, দশ বছর ধরে ভালবেসে আমি রাণুকে বিয়ে করি। বিয়ের আগে আমি এটা বুঝি নি যে বিবাহিত জীবনে একটি জিনিসের আদৌ প্রয়োজন হয় না। এবং সেটা হল ভালবাসা।

'রুবি আমাকে ভালবাসে।' শুক্রবার রাতে বাড়ি ফিরে আমি রাণুকে জানাই, 'আমি রুবির সঙ্গে কাল ডায়মণ্ডহারবার যাব?'

'কেঃ?'

'রুবি।'

'রুবি কে?'

বিগত চার বছরের সার-সংক্ষেপ আমি রানুকে একটি সিগারেট শেষ হবার আগে জানিয়ে দিই। তারপর অগ্নিমুণ্ড অ্যাসট্রেতে চেপে ধরি।

সারাদিনে কাগজ পড়ার সময় হয় না। রাণু রাতে পড়ে। সব শুনে কোলের ওপর পড়ে-থাকা কাগজটি সে এক ভাঁজ করে। দু'ভাঁজ করে। তিন...চার...ভাঁজ করতে করতে সে কাগজটাকে বই, ডায়েরি...একটা সিগারেট প্যাকেটের মতো ছোট্ট করে ফ্যালে। তার মুখ কড়ির মতো সাদা দেখায়। মুখ তার হিম।

'যাচ্ছ যাও। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবার গেলে কেউ আর ফেরে না।' জ্বলন্ত চিতা থেকে তুলে একটা ভিজে কাঠ সে টান মেরে দূরে ছুঁড়ে দেয়।

শহর ছাড়িয়ে নদীর ধারে একতলা হোটেল। আশ্চর্য, রাস্তায় একটাও কুকুর সত্যিই নেই তো। অথচ, ভাদ্র মাস! হোটেল থেকে নদী দেখা যায় না। সমুদ্র-গর্জন শোনা যায় না।

অপ্সরী না ভিখারিণী? বিছানায় হাওড়া হাটের নোংরা সবুজ চাদর, প্যাকিং বাক্সর কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট ন্যাড়া টেবিল, তার ওপর তাল-তোবড়া টিনের অ্যাসট্রে। টেবিলে দেড় হাত হ্যাণ্ডলুমের তোয়ালে। অ্যাটাচ্‌ড নর্দমার ধারে এক বালতি জল। একটা ছ্যাতলা পড়া থান-ইটের ওপর একটা মগ ও ব্যবহৃত একটুকরো পাতলা সাবান। পাখা একটা ঝুলছে, কিন্তু লোডশেডিং।

এত দুর্ভোগ, তবু আজ যেন কিছুই চোখে পড়ার মতো নয়, এক রুবি ছাড়া। মাত্র একটি অব্যর্থ শটে রুবি সব আক্কেল গুড়ুম করে দিয়েছে। কার সাধ্য রুবির মুখ থেকে চোখ সরায়, যে তাকে আগে দেখেছে!

এসপ্ল্যানেড বাস-স্ট্যাণ্ডে তাকে দেখে আমি তো থ! এ-তুমি-কী-করলে চোখে শুধু তাকিয়ে থাকি।

'কেন খারাপ দেখাচ্ছে?'

'কিন্তু তোমার অত চুল...গোটা পিঠটা ঢেকে রাখত—'

'মা মারা যাবার পর থেকে একটা পার্লারে মাসে একবার যাই, শ্যাম্পু করাতে। আমি নিজে পারি না। এবার গিয়ে দেখি কী, নতুন একটা মেয়ে এসেছে, নাম কিম। সে একটা বাঁধানো ছবি সামনে ধরে বললে, তোমার মুখের যা শেপ, তাতে এই কাটটা মানাবে ভাল। ওকি, আর কতক্ষণ হাঁ করে থাকবে,' ঘুঘুর মতো ঘাড় কাৎ করে ও কুহর কেটে রুবি বলল,'এবার মুখটা বোজাও।'

'একে বলে বয়কাট, এই ঘাড় পর্যন্ত', বলে সে মুখ নিচু করে হাসল।

রুবির এই বুকে-চিবুক হাসি। বুকে চিবুক না ঠেকিয়ে সে আজ চার বছরে কখনো হাসে নি। এই হাসি, ঠিক এ-ভাবে, এ আমি রুবির আগে কোথায় দেখেছি! যতবার দেখেছি রুবিকে হাসতে, ততবার ভেবেছি যে, কোথায়। মনে পড়ে নি। আমার আবারও মনে পড়ল না।

'ঘড়ং!'

বিনা নোটিশে হঠাৎ পাখা চলতে শুরু করল দুপুরবেলা, এবং ফুল ফোর্সে। দেওয়াল থেকে ঝুরঝুরিয়ে বালি ঝরে পড়ল।

একমাত্র জানালায় পর্দা নেই। পাল্লাদুটো বন্ধ করে রুবি আলো জ্বালায়। পাশে এসে শোয়, 'ঠিক যেন কবরের মধ্যে, তাই না?'

'মাছটা চমৎকার করেছিল কী বলো। ইস, কী বড় বড় পিস!' রুবি হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, 'আরে আরে, তোমার কোমরে এটা কী?'

'কোমরে কী, তা আমি কী করে জানব। কী ব্যাপার!'

'দ্যাখো, দ্যাখো, ঠিক এইরকম' রুবি এতদিনে এই প্রথম ঘাড় থেকে কেশর তুলে দেখায়।

রুবির ঘাড় জুড়ে চামড়ায় বিঘৎ খানেক ঘোর লালচে প্যাচ। না, লাল বললে ঠিক বলা হয় না। বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। বরং ঘোর আক্রোশ বর্ণের বললে কিছুটা ঠিক বলা হয়।

আই সি! তাহলে এই ব্যাপার? এই জন্যে চুল তুলে ঘাড়ে কোনওদিন চুমু খেতে দেয় নি! বিউটি কমপ্লেক্স!

'ওখানেই বুঝি তোমার যত সুড়সুড়ি,' বলে আমি চুল তুলে চুমু খেতে যাই। ওইখানে। রুবি মুখ সরিয়ে নেয়। 'ওখানে আমার কোন সেনসেশানই নেই!' ঠোঁট উল্টে সে বলে।

'তার মানে, এতদিন যে বলতে—'

'ও এমনি বলতুম! সাড় নেই বলেই তো ওখানটায় চুমু খেতে দিতাম না। টেরই পাব না!' বলে সে চিবুক-হাসি হাসে ও তদবস্থায় দু-চোখ ভরে কটাক্ষ করে, 'দ্যাখো, দ্যাখো তোমারও এখানে লোম নেই।' সে আমার কোমরের ওপর আবিষ্কারের দিকে বৈজ্ঞানিকের আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, 'কী, সুড়সুড়ি লাগছে?'

'সুড়সুড়ি কীসের?'

'বাঃ দেশলাই কাঠি বোলাচ্ছি, সুড়সুড়ি লাগবে না? লাগারই তো কথা। আমারও লাগে না, জানো?'

ডান গালে জিভ বুলিয়ে সারা শরীর দুলিয়ে রুবি মুখ নিচু করে হাসতে থাকে। হঠাৎ, সমুদ্র পেরিয়ে, ভাসতে ভাসতে একটা ফোটোগ্রাফ আমার মাথার ভেতর ভেসেওঠে! কী নাম ছিল যেন মেয়েটার, আ—হ্যাঁ, পলিন পার্কার। যুগান্ত পেরিয়ে তার নামও আমার ঠিক ঠিক মনে আসে। বয়স ১৮, অস্ট্রেলিয়ার ক্যান্টারবেরি শহরে মেয়েটা তার মাকে খুন করল। তারও চার বছর আগে সহপাঠিনীদের সঙ্গে স্কুলে-পোশাকে একটি গ্রুপ ফোটোয় সে, গলায় টাই। আর সবাই যথাযথ, চিবুকে বুক ঠেকিয়ে মধ্যিখানে শুধু সে হাসছে। তারও ছিল ঘাড় পর্যন্ত চুল, এই বয়কাট। রুবির পিঠময় চুল-ঢালের ছদ্মবেশের জন্যে তাকে এতদিন মনে আনতে পারি নি।

কলিন উইলসনের 'দা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মার্ডার' বইতে পলিনের ঐ গ্রুপ-ফোটো সহ আমি বইটি পড়ি। সেই সত্তরের গোড়ার দিকে, সে কি আজকের কথা! ১৯১৩ সালের ২ অক্টোবর ভোরবেলা ঘুমন্ত অবস্থায় কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে সে তার বিধবা মাকে খুন করে। 'এ-ভাবে, থেঁতো করে মাথা, কেন তুমি মাকে মারলে?' আদালতে জুরিদের মুখপাত্র তার কাছে জানতে চান। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু রেখে সে জানায়, 'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি এর উত্তর দেব না।' জুরি: তুমি কি আগেই ঠিক করেছিলে যে মাকে খুন করবে? পলিন: হ্যাঁ। জুরি: কতদিন আগে? পলিন: চার বছর। ১৯১৪ সালের ৩ জানুয়ারি ক্যান্টারবেরি সেন্ট্রাল প্রিজনে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখে তার সর্বসম্মত ফাঁসির হুকুম হয়।

আমার বরফের পা থেকে বাষ্প হয়ে ভয় উড়ে আসছে। রুবি বলে চলেছে, 'আচ্ছা, তোমার ওটা কি জন্ম থেকে? আমার তখন ১৬ বছর, হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করি। কাগজে তখন লুথেরান মিশন থেকে খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল, যদি জন্মগত না হয়...আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, একি আমার জন্ম থেকে? মা বলল, জানি না। আমি মাথার কাঁটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে একদিন দেখেছিলুম। দেখলুম কোনও সাড়া নেই। তারপর আর দেখি নি। কে জানে এতদিনে, কতটা বেড়েছে। মরুক গে যাক...'

রুবি দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধরল।

'আমার বাবার বুক ছিল তোমার চেয়েও চওড়া।' বুকে মুখ ঘষে কী না-ভেবে যে সে এ-কথা আমাকে বলল!

ডায়মণ্ডহারবারে নাকি কুকুর নেই? জানালার বাইরে 'কেঁই করে একটা মাদি কুকুর ভৎসনা করে উঠল। নিশ্চিত প্রণয়-পালার শুরু। আরে বাবা, এ মাহ ভাদরে কুকুর না থেকে যাবে কোথা।

'লুথেরানের বিজ্ঞাপনে বলেছিল প্রলঙ্গড অ্যান্ড পারপিচুয়াল সেক্সুয়াল বা মেমব্রেন কনট্যাক্ট ছাড়া এ-জিনিস হঠাৎ হয় না। বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে আমি হবার সময়েই মার বুক শুকিয়ে গেল, তা আমি কী করব। একটা সাঁওতাল বৌকে রাখা হল। তার বুকে খুব দুধ। এই গোলগাল আর মোটাসোটা ছিলুম ছোটবেলায়, জানো। পরে তার কুষ্ঠ হয়। আচ্ছা নিপ্‌ল কী মেমব্রেন? তা, আমাকেও তুমি কম চোষোনি বাপু। ওখানে। আমার থেকেই হয়েছে তোমার, যাই বলো!'

আজ রাতে পূর্ণিমা।

'এই, শুনছো, তুমি কোনো স্কিন-স্পেশালিস্টকে চেনো?'

আজ বান আসবে।

'কলকাতায় গিয়েই ডাক্তার দেখাব আমরা দুজনে। লেপ্রসি তো সেরে যায়, যায় না?'

আজ রাতে কামান দেগে ভাঙতে হবে আগুয়ান জল-তোড়।

'কাল রাতে ঘুম ভেঙে গেল, জানো। আর ঘুমোলাম না। সঙ্গে কাজের মেয়েটা শোয়। ওর ঘুম ভেঙে যাবে বলে আলো আর জ্বালালাম না। বিছানায় উঠে বসে ডায়মন্ডহারবারের কথা ভাবতে লাগলাম। তোমার মতন, আমিও আগে কখনো আসি নি তো। গির্জার ঘড়িতে যেই তিনটে বেজেছে, অমনি ন্যাশানাল মেডিকেলের হস্টেলের ঘরে ঘরে অ্যালার্ম বেজে উঠল। এক সঙ্গে সে কত যে অ্যালার্ম! একতলা...দোতলা...তিনতলা... ঘরে ঘরে শব্দের আগুন লেগে গেছে যেন। পাঁচতলা বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আগুনের আভায় একতলায়, দোতলায়, পাঁচতলায় ছোটাছুটি করছে লুঙ্গি-পরা, পা-জামা পরা, আণ্ডারউইয়ার পরা সব ছেলে—সবার খালি গা। বুঝলাম, সেপ্টেম্বরেই ওদের ফাইনাল, তাই। আমারও কলেজ জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল...'

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রুবি বলে চলেছে। তার ফর্সা বলশালী থাই অবধি সায়ার ফ্রিল উঠে গেছে। যেন, যবনিকা উঠছে! অন্ধকারে তার শরীরটা দেখাচ্ছে দিগন্তে পাহাড়ের সিলুয়েটের মতো। চাঁদ উঠছে। বাইরে সন্ধ্যা।

তার ঘাড়ের চামড়ায়, ঐ, আমার অ-দৃষ্ট কোমরের প্রতিচ্ছবি, লাল কালো হয়ে গেলে যেমন, ঘোর আক্রোশ-বর্ণের একটি বিঘৎখানের প্যাচ। তার এবং আমার শরীরে এই দুটি জায়গায় আর সাড়া নেই। রুবি বলেই চলেছে। কী বলছে সে আর জানে না। কখন থামবে জানে না। কেই শুনছে কি না, তা জানার আগ্রহও তার আর নেই।

আচ্ছা, আজ কী আমরা ফিরব? বোধহয় না। আজ রাতে পূর্ণিমা। আজ বান আসবে। আজ কামান দেগে ভাঙতে হবে জল-তোড়। হোক একতলা, আজ ছাদে একা গেলে, সমুদ্র গর্জন নিশ্চয়ই শোনা যাবে।

*শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৮৫*

# শেষ মেট্রো

প্রথম যেদিন রঞ্জনের কারণে আসতে পারে নি শেলী, যথেষ্ট অ্যাপোলোজাইস করেছিল। 'রঞ্জনের সঙ্গেও খুব ভাল কাটল না', বলেছিল, 'খালি মনে হচ্ছিল তুমি এই কোণের টেবিলটায় বসে আছ, আর কেউ রেস্তোরাঁর দরজা খুললেই মুখ তুলে তাকাচ্ছ।'

'না-না। তাতে কী। এ তো বুঝতেই পেরেছিলাম তুমি কেন আসছ না।' আমি বলি, 'কোনও-কিছু বুঝতে পারলে আর অসুবিধে কী। যত মুশকিল বুঝতে না-পারলে।'

ওর অফিসের তরুণ ইঞ্জনিয়ার রঞ্জনের সঙ্গে শেলী মেলামেশা শুরু করেছে মাত্র মাসছয়েক। এর মধ্যেই অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে যে-কোনওদিন শেলী আমাকে বলবে, 'আমি আর রঞ্জন বিয়ে করছি' এবং শোনামাত্র, 'বা-বা, এর চেয়ে সুসংবাদ আর কী হতে পারে' বলে আমাকে তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হবে। মুখেই যে বলবে, এমনটা নাও হতে পারে। হয়ত একটা সাদা খামই বাড়িয়ে দিল বড়সড়, উলটো করে। ওলটালেই, প্রজাপতেয় নমঃ। ওর সঙ্গে আমার এমনটাই কথা হয়ে রয়েছে।

প্রথম যেদিন ও আসতে পারে নি, সেদিন অবশ্য সমস্যাটা হয়েছিল অন্য। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে তবে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম, সে তাহলে আজ আর আসছে না, যদিও, শেলী খুব অদ্ব্যর্থক ভাষাতেই আমাকে বলে রেখেছে, 'ঠিক আধঘণ্টা দেখবে। যদি দ্যাখো, তার মধ্যে এলাম না, চলে যাবে। বুঝবে, রঞ্জন ছাড়ে নি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' আমি সাগ্রহে বলেছি, 'আমার কথা তুমি একটুও ভেব না। রঞ্জন সবার আগে।'

তবে, সেদিন সম্যসাটা হয়েছিল অন্য। সেদিন ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু বেশিই হবে, আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আসলে শেলী আসবেই ও বিল মেটাবে এমনটা ধরে নিয়ে শুরুতেই আমি পুরো একপাত্র পর্ক ওয়ানটান খেয়ে ফেলি। এতেই বিল হয়ে যায় ২১ টাকা প্লাশ সেলস ট্যাক্স। শেলীর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তখন আর উপায় কী, কারণ আমার পকেটে মোট টাকা-তিন। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার লী ইয়ঙকে 'কাল দিয়ে যাচ্ছি' বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরতে হয়। পুরনো খদ্দের, হেসে তাই 'নো প্রবলেম' বলেছিল লী। বুঝেছিল সবই। প্রায় দিনই তো শেলী বিল মেটায়। মিস মিত্র টেলিফোন-ভবনের কোন টেবিলে বসে সে জানে। রেস্তোরাঁর তেরশ টাকার টেলিফোন-বিলের ভুলচুক মেটাতে গিয়ে, তাকে জানতে হয়েছিল।

রঞ্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু শেলীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। রঞ্জন মাস্ট পে। অ্যান্ড টু দা লাস্ট নয়ে পইসে। সিনেমার টিকিট সে কাটবে। ট্যাক্সি ভাড়া রঞ্জন দেবে। শেলী মহার্ঘ, এটা তাকে বুঝতে হবে না?

'একদিন ১৭০ টাকা বিল হয়েছে—'

'শুধু ফুডে?'

'তা হবে না? শে-নাজ বলে কথা। অবশ্য দুটো বিয়ারও ছিল—'

'তুমিও খেলে বুঝি এক গ্লাস?'

'পাগল!' ফিশ মিয়নিজ-এর টুকরোয় কাঁটা ঢুকিয়ে জিভের আধাআধি জায়গা রেখে ঝাল অথবা গরম যে-কোনও একটা কারণে সে তার ষাঁড়ের রক্তে রাঙানো

ঠোঁটদুটিকে ০-এ পরিণত করে, 'শূ-শূ-শূ। রঞ্জন কী ভাববে! ভাববে চীপ। ভাববে আগেও খেয়েছি।'

'তারপর? ১৭০ টাকা বিল...'

'হ্যাঁ। আমার ব্যাগে হাত দিয়েছি রুমালটা বের করব বলে—রঞ্জন ব্যাগটা ছুঁয়ে বলল, এন্‌নো-নো। দ্য প্লেজার ইজ মাইন।'

কেবিন খালি হবার অপেক্ষায় আমরা এখনও বাইরে বসে। 'রঞ্জন', আশেপাশে বেয়ারা-খদ্দের কেউ নেই দেখে নিয়ে আমি শেলীর বাম স্তনে একবারটি হাত রাখি, 'রঞ্জন তোমার হাতটা চেপে ধরতে পারত। হাত ধরে কথাটা বলতে পারত।'

'কই, ধরে নি তো এখনো।' ঘাড় পর্যন্ত চুলের কার্ল ঝাঁকিয়ে শেলী তার আয়ত চোখদুটি তুলে আমার দিকে তাকায়।

ওর চোখে নেতারহাট-নীলের ছায়া আজও কিছু পড়ে আছে কিনা আমি খুঁজে না দেখে পারি না, যখনই ও আমার চোখে চোখ রাখে।

নেতারহাটে শেলী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, এই তো, এখনো বছর ঘোরে নি। বাড়িতে বলেছিল, অফিস-কলিগ বাসনা সেন ও তার ফ্যামিলির সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ সরকারের ট্যুরে বান্ধবগড়ে বাঘ দেখতে যাচ্ছে। সে-রকমই কথা ছিল।

শেষ মুহূর্তে টিকিট ফেরত দিয়ে আমাকে নিয়ে রাঁচির বাসে উঠল ধর্মতলা থেকে।

নেতারহাটের আকাশ তখন নীল ভেলভেট, রোঁয়া দেখা যায়। মুখ তুললেই ওর চোখের সাদা নীলাভ হয়ে যেত। কতদিন দেখেছি। বলেছি ওকে। 'যাঃ, কই তোমার তো হয় না', শেলী উত্তরে আমাকে বলেছে।

পুজোর সময়। ফরেস্ট বাংলো ভরতি। মূল বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে কটি লগ-কেবিন। তারই একটি আমরা পেয়েছিলাম। রাতের খাওয়া ক্যান্টিনে সেরে অন্ধকার পাইন-বনের মধ্যে দিয়ে, বানভাসি উদ্ভিদের জড়াজড়ি শেকড়ের মতো, কেবিনের আলো লক্ষ্য করে আমরা হেঁটে যেতাম। আমাদের চারিদিকে, অন্ধকারে, ক্রমাগত লম্বা হবার জন্য নিষ্ঠুর—অমানবিক— পাইন-প্রতিযোগিতা!

'কই ধরে নি তো এখনো।'

'সিনেমায়?'

'একদিন' রুমাল দিয়ে চোখ থেকে মুছে নেতারহাটের নীল, শেলী আমাকে জানায়, 'ওই প্রেম-প্রতিজ্ঞা দেখতে গেলাম যেদিন। বলেছি তো তোমাকে। অরুণা ইরানী আর দেবেন ভার্মার দারুণ একটা কমেডি-সিচুয়েশন আছে, বুঝলে?' শেলী হাসতে হাসতে বলে গেল, 'হাসতে হাসতে ওর হাতে হাত লেগে গেল, বুঝলে!'

'তারপর, তারপর!' আমি উদগ্রীব, 'তারপর কী হল?'

'যতক্ষণ হাসলাম দুজনে, মানে সিচুয়েশানটা যতক্ষণ থাকল আর কী, দুজনের হাতে-হাতে লেগেও থাকল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। তারপর তো মিঠুনের জন্যে মাধুরী দীক্ষিতের কান্না। সিচুয়েশান শেষ হল। আমরাও যে যার হাত কোলে নিয়ে বসে রইলাম।'

'রঞ্জনকে', আমি বলি 'তুমি একটু প্রোভোকেট করলে তো পার?'

'কী রকম?'

'এই ধর বাড়ির কথা বললে কিছু। যে বাবা রিটায়ার্ড। সুগার। ব্লাডপ্রেসার। আজ আছেন, কাল নেই। দাদারা, মায় ছোট বোনও প্রেম করে বিয়ে করে ফেলল। তুমি কত

একা...এদিকে বিয়ের বয়সও বেড়ে যাচ্ছে তোমার। এরপর—'

'সে কী!' একগাল হেসে শেলী বলল, 'এ-ভাবে তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। নিঃসন্তান। বিপত্নীক। বিয়াল্লিশ। চার হাজার। স্বগৃহ। সঙ্গিনী চায়।' হাসি সুইচ অফ করে চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা নিচু করে বলল, 'চীপ ভাববে।'

আমি রঞ্জনকে দেখি নি। শুনেছি, স্বাস্থ্য ভাল। এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার। এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কে যেতে তার দেরি নেই। থুতনিতে ফ্রেঞ্চ কাট, যা শেলীর পছন্দ নয়। যথাসময়ে সে এ-বিষয়ে তার আপত্তি জানাবে। চোখ থেকে সে এখনো গগল্‌স খোলে নি। রঞ্জন।

রঞ্জনের সঙ্গে শেলীর এক-একদিন করে দেখা হয়, আর আমি সাগ্রহে জানতে চাই 'কতদূর এগলো' আর শেলী সমস্ত খুঁটিনাটি আনুপূর্বিক আমাকে বলে।

আমার অবস্থা অনেকটা ফাঁসির আসামীর মতো। ফাঁসি হবে, কিন্তু ডেটটা জানি না। আউটসাইডার-এর নায়ক মারসোর সঙ্গে ভিজিটার্স রুমে এসে দেখা করত তার গার্ল ফ্রেন্ড। মাঝখানে একটা করিডর, লোহার জালের এপার-ওপার থেকে চেঁচিয়ে তাদের প্রশ্নোত্তর চলত। মারসোর সব উত্তর ছিল মোনোসিলেবিলে। যেমন, 'ভাল', 'আচ্ছা', 'হ্যাঁ', 'জানি না', 'ধন্যবাদ' বা শুধুই 'বাঃ'—এরকম। মারসোকে তো তবু এ-অবস্থায় পৌঁছতে দু-দুটো খুন করতে হয়েছিল। আমাকে তাও করতে হয় নি।

আমি রঞ্জনকে দেখি নি। আমার ধারণা রঞ্জন যেদিন প্রথম ওর হাত ধরবে, যদি রেস্তোরাঁর কেবিনে হয়, সেদিনই সে ওকে চুমু খাবে এবং তা আমার মতন খুব সযত্ন ও সপ্রেম চুম্বন নাও হতে পারে। আর ব্যাপারটা যদি কোনও ঘরে শুরু হয়—হোটেল হোক, গেরস্তবাড়ি হোক—বিছানা থাক বা না থাক, প্রথম দিনেই তা সঙ্গমে পর্যবসিত হবে। কেননা, শেলীর যত প্রতিরোধ সব যুক্তি আর ভাবনায়। দেখেছি তো, ওর শরীর ভাবতে জানে না। বাধা দিতে জানে না। প্লাস্টিকের স্বচ্ছ বয়েমের মধ্যে ও বোধ হয়ত বন্দি মৌমাছির বোঁ-বোঁ।

হাজরা পার্কে রিভলভিং গেট ঘুরিয়ে ঢুকে যাবার মতো সহজ ব্যাপারটা। পার্কে, বেঞ্চিতে, কতদিন আমি একা বসে থেকেছি। ওর পার্কে চিরকুয়াশা। দু-হাত দূরে কী সে দেখতে পায় না।

আমার ধারণা, ধারণা কেন, আমি জানি, রঞ্জনের সেই প্রথম আক্রমণ তথা তার দ্বারা ধর্ষিত হবার গল্পও শেলী আমাকে অনুপর্ব বলবে। এবং আমাকে তাও ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।

আমি রঞ্জনের দেখি নি। শুনেছি, সবসময় সানগ্লাস পরে থাকে। আমার ধারণা, পৃথিবীতে দুজাতের লোক আছে। এক, যারা সানগ্লাস পরে। দুই, যারা সানগ্লাস পরে না। রঞ্জন এই দ্বিতীয় জাতের লোক।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে বিরতিহীন যোগাযোগ আমাদের। ধাঁচ একটাই। আগের দিনের সিদ্ধান্তমতো নির্দিষ্ট দিন ও ক্ষণে রেস্তোরাঁয় সাক্ষাৎ। তারপর ওর বাড়ির দিকে, পার্ক সার্কাসগামী ট্রাম, বাস বা মিনিবাস স্টপের দিকে, হাঁটা, কিছুদূর। পরবর্তী দিন, ক্ষণ ও রেস্তোরাঁ ঠিক করে তারপর বিদায়।

তবে, রঞ্জন সীন-এ আসার পর থেকে আমাদের গতিবিধিতে ঈষৎ অদল-বদল হয়েছে। রেস্তোরাঁগুলি সরে গেছে রয়েড, রিপন বা ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের দিকে। আমাদের মিডিল ক্লাস লোকজন এদিকটা বড় মাড়ায় না, তাই। ক্বচিৎ-কখনো কারও সঙ্গে যে মুখোমুখি হতে হয় নি, এমন না।

এমনকি, ওদের অফিস-কলিগের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল একদিন।

মোকাম্বোর থেকে বেরুচ্ছে। এমনটা হলেও, অসুবিধে কিছু নেই। কারণ, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আজকাল আমরা হাঁটি ঈষৎ সামনে-পেছনে। শেলী অনেকক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলল। আমি উলটো ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক ঈষৎ পানাক্রান্ত, দূর থেকে আমার মনে হল।

রঞ্জনের কারণেই শেলী এইসব সাবধানতা অবলম্বন করেছে। কলকাতার রাস্তা ধরে আমাদের এ-ধরনের হাঁটা-চলা বিগত মাত্র ছ-মাসের রিহের্সাল এক নিখুঁত কোরিওগ্রাফে পরিণত হয়েছে।

চৌরঙ্গি ওয়াই এম সি এ-র বারান্দা-কাফেতে একদিন বিকেল থেকে শেলীর জন্যে বসে আছি। জীবনানন্দ দাসের একটা বড় গল্প ('রক্তমাংসময়') শেষ করার মুখে শেলী এসে হাজির। প্রায় দুঘণ্টা দেরি হয়েছে আজ।

'সরি। আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল।'

এসেই সে সর্বান্তঃকরণে দুঃখপ্রকাশ করে।

তার মুখে সূর্যাস্তের আলো দেখেই আমি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাই। এখান থেকে গঙ্গার ওপার পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশে রুখুশুখু, ধূলিধূসর মেঘ। দিকচক্রবালে এখনো একফালি অস্তরাগ লেগে আছে।

'তোমাকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন বল তো?'

আমি ভেবেছিলাম সূর্যাস্তের আলো। তা নয়। শুধু তা নয়।

'চুল বাঁধার জন্যে। আজ উঁচু করে বেঁধেছি।' শেলী বুঝিয়ে দেয়, 'আজ গোটা মুখটা এক্সপোজড, তাই, অন্যদিন গাল-টাল ঢাকা থাকে। আজ একটু লম্বা দেখাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ। মুখটা বেশ লম্বা দেখাচ্ছে।'

'শরীরটাও লম্বা দেখাচ্ছে' শেলী বসার আগে দাঁড়িয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'শাড়িতে ভার্টিকাল স্ট্রাইপ। এতে একটু লম্বা দেখাবেই। অপটিকাল ইলিউশন হয়।' বলতে বলতে সে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে ওঠে। এ-সব আমার কখনো চোখে পড়ে না। শেলী বুঝিয়ে না দিলে বুঝি না। শেলী তা জানে।

কাউন্টার থেকে শেলীই দু-হাতে কফি আনল।

'এমন একটা চমৎকার সূর্যাস্ত হয়ে গেল, দেখলে না!'

ওরা কী আজ স্ট্রান্ডের 'গে' রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল? বা, বসেছিল, নদীতীরে, গোয়লিয়র মনুমেন্টের চাতালে?

'এই গল্পটা পড়ছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঢের আগেকার গল্প। গোয়ালন্দর এক স্কুল মাস্টারের বউ। বাপের বাড়ি যাচ্ছে, একা। বাইরে রিকশ। যাবে কি যাবে না, বাচ্চা বউটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। এখনো ছেলেপুলে হয় নি। স্বামীকে সন্তানস্নেহে দ্যাখে বেচারা। তার সাংসারিক জ্ঞানহীন অবুঝ স্বামী কি পারবে কটা দিন চালিয়ে নিতে। সে ঘর-বার করছে। যেতে হবে। আবার যেতেও পারছে না ছেড়ে। এইরকম আর কী। আর এমন সময় বেজে উঠল স্টিমারের গম্ভীর ভোঁ আর তুমিও এসে পড়লে।'

'রঙ জাজমেন্ট।' শেলী আউট-অফ-পিটি হাসি হেসে বলল, 'বই পরে পড়তে পারতে। একই থাকত। কিন্তু এই সূর্যস্তটা তোমার জীবনে আর একবার আসবে না।'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'আমি মুখ তুলে একবারও দেখেও ছিলাম যে, সূর্যাস্ত হচ্ছে। সত্যিই গ্লোরিআস লেগেছিল। কিন্তু তখন কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না, কীসে আমার বেশি ফায়দা সূর্যাস্ত না বই? শেষ পর্যন্ত বই-ই বেশি টেনে নিল। যাকগে,', কফির কাপ টেনে নিয়ে আমি জানতে চাই, 'আজ কী হল বল? আজ কোথায় গিয়েছিলে?'

আমাদের চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে।

শেলী বলল, 'দ্যাখো, রঞ্জন তোমার মতো নয়। সে অতি সাধারণ ছেলে। আর সাধারণ ছেলেই আমি চাই। আমি চাই স্বামী। যার ওপর নির্ভর করা যায়। আমি শারীরিকভাবে একা থাকতে পারি। আমার স্বামী ইমপোটেন্ট হলেও আমি তার সঙ্গে থাকব। কিন্তু মেন্টালি একা থাকতে আমি পারব না।

রঞ্জন সাধারণ ছেলে। সে ঘুষ নেয়। শেলী আমাকে বলেছে। বিয়ে হলে, ওদের স্বামী-স্ত্রীর উপার্জন মাসে সাড়ে সাত হাজারের মতো হবে। শুধু মাইনেতেই। সে জানিয়ে রেখেছে। সত্যিই তো, স্বামী ইমপোটেন্ট হলেও, ওদের ভাল থাকা কে আটকাবে? রঙিন টিভি, ভিসিআর, জেনারেটর অন্তত একটা হিরো-হণ্ডা—এরাও তো বংশধর! সন্তানের মতো।

আজকের কাগজে সালমন রুশদি আর মারিয়ানের খবরটা বেরিয়েছে। গত ৬ মাস ধরে ওরা স্বামী-স্ত্রী ৫৬টি ফ্ল্যাটে লুকিয়ে থেকেছে। তারপর আর পারে নি মারিয়ান। একা, এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে। শুধু দুজনে মিলেই যদি থাকা যেত, তাহলে তো ওরাও থাকতে পারত। অন্তত, মারিয়ান পারত, যে তার প্রথম বই উৎসর্গ করেছিল 'প্রিয়তম সালমন'কে। 'ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যদি রাস্তার জনস্রোতও দেখতে পেতাম দিনে একবার, তাহলে আমি সালমনকে ছেড়ে আসতাম না' বেরিয়ে এসে মারিয়ান জানিয়েছে। ইচ্ছে হয়, শেলীকে এইসব বলি। হেয়ার-ডু আর ভার্টিকাল স্ট্রিপের মতো করে বোঝাই। যে, দুজনে হয় না।

'আজ ছ-মাসে হাতটাও ধরল না, তাহলে কী করে হবে?'

'এত তাড়াহুড়ো কীসের তোমার?' শেলী বলল, 'দেখি না কী হয়। প্রথমে ও-ই কিছু বলুক। কিছু করুক।'

'বলবে মনে হয়?'

আমি 'করবে' বলতে পারি না। শেলী কত সহজে পারল!

'বলবে বৈকি। নইলে কী আর এমনি-এমনি মিশছি?'

'যদি না বলে?'

'বলবে। ওটা মেয়েরা বুঝতে পারে, যে কে বলবে আর কে শেষ পর্যন্ত বলবে না। সবাই কি তোমার মতন?' এত বলে সে তার দক্ষিণ স্তন থেকে আমার হাত সরায়, 'আমার ফিগার ভাল, রঞ্জন বলেছে।'

আমি যা বলি নি।

বললাম, 'ও-বাবা, তাহলে তো অনেক বলেছে।'

'হ্যাঁ। এক স্টেপ এগিয়ে বলেছে। ভালবাসি-ও বলবে। তবে কোন ভাষায় বলবে কে জানে।'

'অনেকগুলো ভাষা জানে বুঝি?'

'তা কেন?' চোখের কোণ দিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে শেলী খালি প্লেটের ওপর কাঁটা নামিয়ে রাখে, 'ফিল্মের একটা গানই তো আছে।' ঈষৎ সুর লাগিয়ে বলে, 'আংরেজিমে কহতা হ্যায় আই লাভ ইউ। শোন নি। পাঞ্জাবিতে বলে 'তেরেব-বো!' না কী যেন। পাঞ্জাবিতেও বলতে পারে।'

'তুমি তো তাও বল নি।' উদাসীন হাই তুলে সে জানতে চায়, 'কটা বাজল?'

'আমি তো বলেছি তোমাকে, ওই শব্দটা হাস্যকর। অশ্লীল।'

'বলেছিলে, মীনিংলেস!'

'মীনিংলেস নয়? কী ইতর-বিশেষ হয় ওই শব্দটা বললে বা না-বললে। তুমি যেদিন

যখন আমাকে বিয়ের কার্ড দেখে তখনও কোনও মানে থাকবে না শেলী। তখনও নয়।' খুব খারাপ লাগে আমার ওকে এ-সব বলতে। বলতে বলতে আমি আত্মসম্মান হারাতে থাকি কত যে। তবু বলা আমি থামাতে পারি না, 'মৃত্যু-সময়ের আগে কি কেউ তখনও বুঝতে পেরেছে—বাঁচা ছিল কত জরুরি। হয়ত তোমাদের কমজামেশনের রাতে আমি বুঝতে পারব। কিংবা, তখনও না। কেননা, সে রাতেও তো আমি ঘুমিয়ে পড়ব।'

'ফুলশয্যার রাত' হাই চিবিয়ে শেলী জানতে চাইল, 'বলতে পার না?'

বলে সে দুই চোখ তুলে আবার আমার চোখের দিকে তাকায়।

নেতারহাট ফরেস্ট বাংলোর লগ কেবিনের ভেতরটা ছোট। দশ বাই ছয়। একটা দেড় জনের বিছানা। একটা টেবিল। দুটো চেয়ার কোনওমতে। মিনি বাথরুমে একটা কমোড আর বেসিন।

একদিন শেলী বিছানা পাতছে ভেতরে আর আমি বনের মধ্যে ছোট্ট-ব্যালকনির আলোয় সার্ভেন্টিসের 'ডন কিহোটে' শেষ করছি। মৃত নাইটকে দুহাতে ঝাঁকিয়ে ভৃত্য সাঙ্কো পাঞ্জা কাঁদতে কাঁদতে তাকে আর একটি, শেষ অভিযানের জন্য জেগে উঠতে অনুনয় করছে। আমাকে ডাকতে এসে শেলী দেখে, আমিও সাঙ্কোর সঙ্গে কেঁদে চলেছি নিঃশব্দে। দু-গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এসে জমছে আমার থুতনিতে। একটা বড় ফোঁটায় পরিণত হয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে ডন কিহোটের হাস্যকরতম পাতাদুটির উপর।

তুমি মুছিয়ে দিয়েছিলে।

আমি এইরকম। তুমি এস আমার কাছে। এস, ভয় কী। আমিও একজন গ্রহণযোগ্য মানুষ। কেন ভয় পাও আমাকে। এস, ছোঁও আমাকে। আমাকে ছুঁয়ে দ্যাখো। আ-আলিঙ্গন কর।

প্যাডের পাতা ছেঁড়ার পর পারফোরেশন-এর গুঁড়োগুলোকে আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি ইতিহাস। সে কি তোমাকে ভালবাসা নয়?

আমি ভালবাসি তোমার চোখের নিচে ওই আঁচড়গুলি যে কেটেছে, তাকে। আমি সময়কে ভালবাসি। আমি ভালবাসি, শত জল-ঝরনার ধ্বনি। সে কি তোমাকে ভালবাসা নয়?

তুমি কাছে এসেছ, তাই তোমাকে বলি, 'গ্রহে গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল।' আমি কবিতা ভালবাসি। সে কি তোমাকে ভালবাসা নয়?

তুমি কাছে এসেছ, তাই তোমাকে বলি, 'সময়ের স্রোতের মধ্যে রয়ে গেছে বিষাক্ত, বিশ্বাসঘাতক এক অন্তঃস্রোত।' একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার এই যে ক্রমাগত প্রতিযোগিতা, এ নিষ্ঠুর দৈর্ঘ্য পাইনকে মানায়। মানুষের কি সাজে? আমি সেই মানুষে বিশ্বাস করি যার মুখে ফেরানো। সে কি তোমাকে ভালবাসা নয়?

তুমি কাছে এসেছে, তাই তোমাকে বলি, পৃথিবীর তিন ভাগ জলরাশির ওপারে একদিন জেগে উঠবে বিশাল এক রূপোর ঘণ্টা। জাগরণের সে অনির্বচনীয় ধ্বনি শুনবে বলেই সমুদ্রতীরে সমবেত হয়েছে, এত অগণন মানুষ। তুমি কি অস্বীকার করতে পার যে এরা সমবেত হয় নি? এদের কারও চোখে সানগ্লাস আছে কি?

এসো, ভয় কী। আমি ওদের ভালবাসি। সে কি তোমাকে ভালবাসা নয়?

*শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৮৯*

# জুপিটার ও থেটিস

১

গত ২৮ শ্রাবণ ১৯১১ শনিবার, ২ ভাদ্র ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯ আগস্ট ১৯৮৯ শহর সংস্করণ দাম ১.৮০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক সংবাদপত্রের ৪র্থ পৃষ্ঠার একেবারে নিচের দিকে সিঙ্গল কলম ৯ পয়েন্টে একটি খবর বেরিয়েছিল। শীর্ষক ছিল : কেবিনে উঠে ড্রাইভারকে পুলিসের প্রহার, ধর্মতলায় ট্রাম অচল। খবরটি হয়ত, আজ ৭ সেপ্টেম্বর, মাত্র তিন সপ্তাহ যেতে না-যেতে, পাঠক মাত্রেই ভুলে গেছেন। খুবই স্বাভাবিক এবং এমনটাই হবার কথা। কেননা, তারপর 'রাষ্ট্রপতিকে ভিপি : আর নয় ইস্তফা দিতে বলুন রাজীবকে' থেকে 'অশোকনগরে সংঘর্ষ, মৃত ৫, রক্তাক্ত প্রিয়রঞ্জন'-সহ কত না স্মরণীয় খবর বেরুল। তারপর এল ৩০ আগস্টের 'ভারত বন্ধ (আংশিক), পশ্চিমবঙ্গে জনজীবন স্তব্ধ' মতো স্মরণীয়রা—এসে বাকি সব খবরের গুষ্টির তুষ্টি করে গেল। ভুলে যাবারই কথা। কিন্তু, খুবই ব্যক্তিগত কারণে আমি খবরটি এখনো ভুলতে পারি নি। অন্যদের তুলনায় আমার বেশ, রীতিমতো, দেরি হয়ে যাচ্ছে ভুলে যেতে।

একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়—

কলকাতা। ১৯ আগস্ট। ধর্মতলার মোড়ে এক ট্রাফিক পুলিস আজ বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে ১নং রুটের এক ট্রামের ড্রাইভারকে কেবিনে তুলে গালে চড় মারায় গতকাল অপহাহ্নে ওই এলাকায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তীর্থতরুণ নন্দী নামে ৫৮৪ নম্বরধারী ড্রাইভারকে পরে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন থেকে হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কানের পাশ দিয়ে রক্তক্ষরণ সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত বন্ধ হয় নি। যান-জট ছাড়াতে পুলিসকে হিমসিম খেতে হয়। তবু ভাল যে, অন্তত একটি কাগজে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, খবরটির অনেকখানিই ছিল ভুল। যে খবর, আমার বিবেচনায়, প্রতিটি সংবাদপত্রে ৩ কলম ছবিসহ অন্তত ২ ডেকে ও ৩ কলম জুড়ে ১৭-এম কলম মেজারে ছাপা হওয়ার কথা—তা কিনা ছাপা হল মাত্র একটি সংবাদপত্রের ৫-এর পাতার ফুটনোট হিসেবে! দুঃখের বিষয় বৈকি।

আর, দুর্ভাগ্যজনক এ-কারণে যে, ওইটুকু খবর, তারও কিনা বিসমিল্লায় গলদ! আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী।

কলকাতার ট্রামে-বাসে চাপছি আমি সেই ছোটবেলা থেকে। এমন কাণ্ড আমি আগে কখনো দেখি নি। ছোটবেলা থেকে ট্রামে চাপছি, এটা এমনিতে বলার মতো কোনও ঘটনা নয়। ভাববার মতো ভাবনা নয়। আমার বিবৃতি তবু কিছুটা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হবার দাবি রাখে।

কেননা, 'ছোটবেলা থেকে' বলতে, আমি মীন করছি, আমার যখন ৭ দিন বয়স, সেই তখন থেকে। আমি কলকাতার ট্রামে প্রথম চাপি আমার জন্মের সপ্তম দিনে। দেশ-বিভাগের পর যাঁরা জয়-বাংলা থেকে এসে এ-শহরে ঝান্ডা গেড়েছেন, এমনকি, পশ্চিমবঙ্গীয় কোচবিহারাদি বিভিন্ন জেলার নটবরহাট, চ্যাংড়াবান্ধা, ডাউকমারি, পাজিপাড়া, লম্বোদরপুর, বালটিকুরি, ছেন্দাপাথর ভাতারমারি, হুমহুমগড় প্রভৃতি স্থান থেকে কলকাতায় তরী ভিড়িয়েছেন যাঁরা, জানি, এ-কথা শুনে তাঁরা সমস্বরে সবাই 'য্যাঃ'

বলে উঠবেন। জানা কথা। তবে, খুব বেশি কলকাত্তানও এ-ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে এগিয়ে আসবেন বলে মনে করি না। যদিও, ট্রামে-জন্ম এমন নাগরিকের সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।

আমার সেই প্রথম ট্রামে চাপার দিনটি তাহলে ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪১। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন। হাতিবাগান বাজারে বোম পড়তে বাকি। সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্ধান করেছেন। বাবা কাজ করছেন যুদ্ধ দপ্তরের এয়ার রেড প্রিকশান বিভাগ—এ আর পি-তে।

কারমাইকেল থেকে ট্রামে চেপে হেদুয়া। তারপর...ট্রাম-স্টপ থেকে বাড়ি পর্যন্ত মা হেঁটে এসেছিলেন। বাবার কোলে মুড়িঝুরি দিয়ে আমি, নবপ্রজন্মের প্রথম পুত্রসন্তান। শুধু ওইটুকু পথের জন্যে সেই শীতের সকালে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। দোতলার কাঠের বারান্দা থেকে, যা দেখে, পিসীমার নাকি মনে পড়ে বসুদেবের কোলে কারাজাতক কৃষ্ণের কথা। যে-জন্যে আমার নাম রাখা হয় বাসুদেব।

২

এঁড়ু না?

যদিও রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর ডান গাল, এঁড়ুও আমাকে ৩০ বছর পরে প্রথম দেখে চিনতে পারল। বলল, "তুই আমাকে বলরে বাসু, ও কেন আমাকে 'শুওরের বাচ্চা' বলল?" তখন ঠোঁট ও কান থেকে রক্ত ছাড়াও তার নাক দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে শিকনি। এবং চোখ দিয়ে জল।

আগেই বলেছি আমি সমস্ত ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। এবং প্রকাশিত সংবাদটির অনেকটাই ভুল। যথা, প্রথমত, ওর নাম তীর্থতরুণ বটে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ও এঁড়ু নন্দী।

আমরা দুজনের সিমলে পাড়ার ছেলে। ওর ঠাকুমা সেদিন রিকশা চেপে ওকে নিয়ে জেলে-পাড়ায় গার্ডদির সারদা বিদ্যাবীথিতে নিয়ে এলেন (গার্ডদির মৃত স্বামী ছিলেন মার্টিন রেলের গার্ড)—পাঠশালার সেই প্রথম দিন থেকেই ওর দুর্ভাগ্যের শুরু। কেননা, ঠাকুমা ওকে ভরতি করালেন, 'এঁড়ু নন্দী' নামে।

পাঠশালার সেই প্রথম দিন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত এঁড়ু ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। ফুটপাথ ধরে আমরা একসঙ্গে এঁড়ু ঠাম্মার পিছু পিছু বাড়ি ফিরতে ফিরতে নিজেদের অজান্তে বড় হয়েছি। স্কুল-জীবন পর্যন্ত এর অন্যথা হয় নি। আমাদের সঙ্গে দিনে দিনে বড় হয়েছে কলকাতা।

ক্লাস-সেভেনে পড়তে, একদিন ওরা পাড়া ছেড়ে উঠে গেল। তারপর পাড়ার পর পাড়া ছেলে ক্রমাগত হারিয়ে যেতে লাগল। ২-৪ বছরের মধ্যে একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল ওরা। শুনেছি, দেনার দায়ই ওদের এ-ভাবে ঠাঁই-নাড়া করেছে বারবার।

এ সেই কলকাতার কথা, যখন কর্পোরেশনের মেথর হাতগাড়ি ঠেলে গলিতে ঢুকত। তার পিছু পিছু ঢুকত ভোরের আলো। বেলা হলে, মাথাঘষা গলি থেকে মা-র মাথা ঘষে দিতে আসত মান্তু পিসি। দুপুরে, খাগড়াই কাঁসার বাসনে ঘণ্টার শব্দ তুলে ঢুকত মাড়োয়ারি বাসনঅলা; পিছনে বাসনবোঝাই ঝাঁকা মুটে। সারাদুপুর বড় রাস্তার হাইড্রান্ট ঘিরে গঙ্গোদকের ঘুঘু-ডাক—বুকবুকবুকবুক। বিকেলবেলা হোস পাইপের জল বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের গা ধুইয়ে দিত। জল

গড়িয়ে আসত গলিতে। যেদিন সন্ধ্যাবেলা ওয়াইল্ড উডবাইনের সিগারেটের জীবন্ত বিজ্ঞাপন লংম্যান এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে—আমাদেরই বাড়ির লাগোয়া গ্যাসের আলোয় ঢাকনা খুলে সটান দাঁড়িয়ে ও ঈষৎ লেংচে সরাসরি গ্যাস থেকে সিগারেট ধরাল, ততদিনে আমরা এ-ভি স্কুলে ঢুকে গেছি। শীলেদের বাড়ির ছাদ সেদিন লোকে লোকারণ্য। আমাদের বাড়ির কাঠের বারান্দা ভেঙে পড়ার জোগাড়। আমরা ওই দুটি গ্যালারির ঠিক কোনটাতে তখন গুঁজে ছিলাম তা অদ্বৈতভাবে জানার জন্য আমার আজও এঁড়ুর শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই।

৩

ঘটনাটি আমি দেখেছি একেবারে কাছাকাছি এবং শুরু থেকেই। প্রকাশিত সংবাদটির মূলে হাভাত। কারণ, পুলিস তো মারে অনেক পরে।

তখন বেলা ৪টে হবে। আমি ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সবে দাড়ি থেকে মুখে তুলছি। একজন ট্রাফিক পুলিস তখন পয়সা নিয়ে লরি-ড্রাইভারের সঙ্গে দরাদরি করছে। এতে এঁড়ুর ট্রাম অনেকক্ষণ আটকে থাকে। সে পুলিসকে তাড়াতাড়ি ট্রাম ছেড়ে দিতে বলেছিল। হ্যাঁ, একটু গলা চড়িয়েই। কিন্তু, এ-সব নিয়ে উচ্চবাচ্য, কই, প্রতিবেদনে নেই তো।

একেবারে সামনে ১নং ট্রামের কেবিনে ছিল এঁড়ু। ঘটনাটি আমার চোখে পড়ে ১নং ট্রামের ড্রাইভার যখন কেবিন থেকে লাফিয়ে পড়ল সেই তখন থেকে। তখন বেলা ৪টে ১৫ও হতে পারে যা কাগজে বলেছে। আমি দেখলাম, ভরা-ভরতি ট্রামের কেবিনের দরজা খুলে, গলা পিচের ওপর লাফিয়ে পড়ল এক মধ্যবয়সি, তার খালি গায়ে অশৌচের থান, মুখে দাড়ি, পায়ের হাওয়াই-চপ্পলে লাগানো সেফটিপিনটি পর্যন্ত আমি দেখতে পেয়েছিলাম কারণ ঘটনাটি ঘটে একরকম আমার নাকের ডগায়। তাই বলছিলাম, পুলিস তো ওঠে নি কেবিনে। প্রথমেই কিন্তু গালে চড় মারে নি।

শ্যামবাজার এ-ভি স্কুলে ক্লাস ফাইভে ওঠার আগে পর্যন্ত, আশ্চর্য যে, তার এঁড়ু নামের হাস্যকরতার দিকটি কেউ লক্ষ্য করে নি। নিয়মিত ক্লাসে সেই শিশুকাল থেকে নাম ডাকা হয়েছে এবং বালক এঁড়ু তার উপস্থিতি সগৌরবে ঘোষণা করে গেছে। ব্যাপারটা প্রথম লক্ষণীয় হয়ে উঠল তখন, যখন নতুন হেড-স্যার কালিধনবাবু মেসোমশাইকে ডেকে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে এঁড়ুর নতুন নামকরণ করলেন তীর্থতরুণ। সে-বছর গরমের ছুটিতে উনি কেদার-বদ্রি গিয়েছিলেন। তারই প্রসাদগুণে এঁড়ুর নতুন নাম ক্লাস ফাইভ থেকে খাতায় উঠল। ভাগ্যিস, তার ঠাকুমা মারা গেছেন কমাস আগেই। বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে অনর্থ করতেন।

নতুন নামে এঁড়ু ডাকা হল ক্লাস ফাইভের প্রথম ক্লাসে। বাংলার স্যার শিববাবু রোল-কল করতেন না, নাম ধরে ডাকতেন। ডাকলেন, 'তীর্থতরুণ নন্দী?'

সবাই ভেবেছিল শিলিগুড়ির নতুন ছেলেটা যার বাবা, ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসেছেন। ক্লাস-সুদ্দু সকলকে অবাক করে 'এঁড়ু' তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং 'তীর্থতরুণ' ও 'নন্দী'র মাঝখানে তার কাটাকাটা, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ উচ্চারণ ধ্বনিত হল, 'ইয়েস স্যার।'

স্যার পরের নাম না-পড়ে খাতা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন হাঁ করে। যেন অবিশ্বাস্যকে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করছেন এ-ভাবে রোগা থুতনি নেমে এল তার বুকে। চশমা হড়কে

নেমে এল তাঁর নাকের ডগায়।

'ইউ...এঁড়ু...'

আমি ব্যাপারটা জানতাম।

'হেড স্যার এঁড়ু নাম বদলে দিয়েছেন স্যার।'

আমি উঠে দাঁড়াই।

'তীর্থ? তরুণ? আই সী...' উনি আর-একবার ডাকলেন 'তীর্থতরুউণ নন্দী!'

এঁড়ু আবার বলল, 'ইয়েস স্যার।'

কিন্তু, এঁড়ুর নতুন নাম তবু খাতা-কলমেই থেকে গেল। স্কুলের ৭০০ ছেলে তাকে 'এঁড়ু' নামে চিনে রাখল। তদুপরি, সে-বছরেই স্কুল ম্যাগাজিন 'কিশলয়ে' ভূতপূর্ব এঁড়ু নন্দী নামেই তার 'পাহাড়ি ঝরনা' নামে একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়ে গেছে যার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'পাহাড়ি ঝরনা, ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি' ক্লাসে ছেলেদের মুখে-মুখে। দেখা হলেই আমরা সবাই সবাইকে 'ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি' বলে অভিবাদন করি। সত্যি-কথা বলতে কী, এক রোল-কলের সময় ছাড়া, স্যারেরা পিওন-কাম দারোয়ান নটবর থেকে, যাকে নামকরণের দিক থেকে তার দ্বিতীয় পিতা বলা যায় সেই হেডস্যারও ওকে 'এঁড়ু' বলেই ডাকতেন। তাই বলছিলাম, কাগজে 'তীর্থতরুণ' ছাপা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে আমার কাছে এঁড়ু নন্দীই থেকে গেছে। তীর্থতরুণ নন্দী নামে সে বহুলপ্রচারিত সংবাদ-মাধ্যমে উল্লিখিত হলেও, আমি নিঃসন্দেহে যে, দিদি-পিসি-কাকা-কাকিমা প্রমুখ আত্মীয়স্বজন যাঁরা আজও বেঁচে, তাঁকে এঁড়ু নামেই চেনেন এবং পরবর্তী প্রজন্ম, এঁড়ুকে, তার নামের সঙ্গে, যার যা সম্পর্ক, জ্যাঠা-পিসি-কাকা প্রত্যয়-যোগে ডেকে থাকে। এই তো সেদিন আমার এক বন্ধুর ভাগ্নী মাধুরীর মেয়ে ঝিঁঝি, বয়স দেড়, সে সবে 'বাব্‌বা' আর 'মাম্' বলতে শিখেছে, তাকে দিয়ে ওরা আমাকে 'দাদদু' বলিয়ে ছাড়ল। আর-একটু বড় হলে নামযোগে ও তো সবটাই বলবে। বলবে না? এঁড়ুর ক্ষেত্রেও অন্যথা হবে না। অর্থাৎ এঁড়ুদাদু।

৪

"তুমি আমাকে 'শুওরের বাচ্চা' বললে কেন জবাব দাও?"

আমি দেখলাম ড্রাইভারের কেবিন থেকে লাফিয়ে পড়ছে একজন তিংখাড়ু রোগা ড্রাইভার, সাদা তকতকে ইউনিফর্ম-পরা ট্রাফিক পুলিসের কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বারবার বলছে, 'বলো! জাবাব দাও!'

সিধু-কানহো-ডহরে সমবেত হয়েছে অধ্যপকদের মৌন মিছিল। দাবি-দাওয়া যা কিছু সব কঞ্চিতে গোঁজা। সমাবেশ সেই পিয়ারলেস থেকে কে সি দাশ ছুঁয়েছে। যে দেশ ২১ শতাব্দীতে হবে পৃথিবীতে নিরক্ষরতম, বাকি পৃথিবীতে যত নিরক্ষর, ততজন শুধু চরে বেড়াবে যে এই একটা দেশে—সে দেশে এত অধ্যাপক! অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি যে বাকি পৃথিবীর ডবল হবে সে-কথা ওই সমীক্ষায় বলা হয় নি। আমার খানিক আগে এ-কথা মনে হয়েছিল। এদিকে, গ্র্যান্ড হোটেল পর্যন্ত ট্র্যাফিক জাম। পূর্বদিকে ওয়েলিংটন ছাড়িয়ে। পুলিস ও ড্রাইভারকে ঘিরে লোকে লোকারণ্য। এই সময় লাল হিরো-হণ্ডা চালিয়ে সার্জেন্ট এসে পড়েন। (সংবাদে প্রকাশ—তাঁর নাম বন্ধুবিকাশ মুখার্জি।)

তার ওই এঁড়ু নামের ব্যুৎপত্তির দিকটি অনেকে ভুলে গেলেও, আমি ভুলতে পারি নি। হয়েছিল কী, সাতদিন ধরে তাঁর নাতি হয়েছে এ-কথা জ্ঞাপিত হয়েও, এমনকি শিশুর অবর্তমানে হিজড়েরা 'অ ঠাক্‌মা, হামাদের লাতি কই গ' বলে ঢোলক-সহযোগে নেচে

যাওয়া সত্ত্বেও, ওর ঠাকুমা ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। যেজন্যে, হাসপাতাল থেকে এসে পৌঁছানো মাত্র, নিজের হাতে-বোনা নকশি কাঁথার ওপর ওকে শুইয়ে, মোড়ক খুলে উনি প্রথমেই তার জননেন্দ্রিয়টি পরখ ও প্রত্যক্ষ করে দেখেন এবং দেখামাত্র 'অ, ভূপীন, তোর ছেলে যে এ্যাঁড়কাটা র‍্যা' বলে সহর্ষ, উচ্ছ্বসিত ও দন্তহীন বিস্ময় প্রকাশ করেন। পৌষের শীত সেবার একটু বেশিই পড়েছিল। তার ওপর তিনদিন ধরে বৃষ্টি। মাতৃজঠরের ওম থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর প্রথম শীতে আসলে তার শিশুসুলভ অণ্ডকোষ দুটি গুটিয়ে একদম পুরোটা ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।

ঠাকুমাই ওকে সংক্ষেপে প্রথম 'এঁড়ু' নামে ডাকেন। রিকশায় করে জেলেপাড়ায় গার্ডদি পাঠশালায় নিয়ে গিয়ে এঁড়ু নন্দী নামে ওকে ভরতি করান। শোনা কথা, ছোটবেলায়, ৩-৪ বছর পর্যন্ত, মেসোমশাইও একমাত্র বংশবর্তিকাকে কোলে নিয়ে 'এ্যাঁড়কাটিদম', 'এ্যাঁড়কাটিদম' বলে সহর্ষে নাচাতেন।

৫

সেফটি-আঁটা হাওয়াই চপ্পল খুলে ট্রাফিক নয়, এঁড়ুই প্রথম পুলিসের গালে মারে। এবং আগে মেরে, তারপর 'তুমি আমাকে' থেকে 'বললে কেন' পর্যন্ত বলে।

এঁড়ু না? আমি তাকে দেখামাত্র চিনতে পারি নি। চিনতে পারর কথা ও নয়। বিগত ৩০ বছর ধরে অ্যালোপেশিয়া চকচকে করে দিয়েছে তার মাথা, অকালবার্ধক্য তুবড়ে দিয়েছে গাল, নাকের ওপর অন্তত বছর ২০ আগে করানো ঝুলন্ত চশমা। তার গায়ে ময়লা অশৌচ-বস্ত্র। যা দেখে প্রথমেই মনে হয়, ভূপেন-মেশোমশাই এতদিন তাহলে বেঁচেছিলেন?

তুমি। আমাকে। শুওরের বাচ্চা। বললে। কেন।—নির্ভুল উচ্চারণে কেটে কেটে কথা বলার এই মৌলিক ঘরানাই আমাকে নিঃসন্দেহে জানায় যে, হ্যাঁ, সে এঁড়ু। আর কারও গলা এত তীক্ষ্ণতায় ঝলসে উঠতে পারে না।

তার ১নং ট্রাম থেকে আছে চৌরাস্তার মোড়ে। সেন্ট্রাল এভেনিউ ধরে যতদূর দু-চোখ যায় ট্রাফিক দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রাম-গুমটি ও ধর্মতলা স্ট্রিটে সারিবদ্ধ ট্রাম। ১নং ট্রামের জানালায় জানালায় ৪-৫টি করে মুণ্ডু। পুলিস, সার্জেন্ট আর এঁড়ুকে ঘিরে জমে উঠছে অফিস-ভাঙা ভিড়, যখন, যে-সময়, প্রথমে সার্জেন্ট তারপর পুলিসরা সমবেত ভাবে তাকে পেটানো শুরু করল।

ঘাড় ধরে মারতে মারতে তাকে কেবিনে তুলে দেওয়া হয়। তখন ওর মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাটা ঠোঁট ঝুলে রয়েছে। আমি তখন তার সবচেয়ে কাছে। কেবিনের নিচে দাঁড়িয়ে। আমি জানি।

"তুই আমাকে বল্‌রে বাসু, লোকটা আমাকে শুওরের বাচ্চা বলল কেন?"

এই বলে সদ্য-পিতৃহারা সে তদবস্থায় ঘণ্টায় লাথি মারল।

তার গায়ে অশৌচ-বস্ত্র। মুখে একগাল সাদা দাড়ি। খুব কাছে মুখটা এনে সে ওই ক্রোধে-রোরুদ্যমান জিজ্ঞাসা চিহ্নটি আমার সামনে রেখেছিল। তার না-রক্তাক্ত অপর গালে সাদার মধ্যে—ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রখর বেশ কিছু কুচকুচে কাঁচা চুলের অস্তিত্বও আমি দেখতে পাই।

আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, আমি এখনো ঘটনাটি ভুলতে পারি নি। তাই, মনোভাব লাঘব করার জন্য জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণমাত্র এখানে রাখলাম।

পেশাদার লেখকরা যত্রতত্র থেকে গল্প শুরু করতে পারেন এবং একটা ঘটনা কি একজন মানুষকে একবার দেখলেই তাঁরা তার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পান। একজন লেখক এ-ঘটনা নিজের চোখে দেখলে নিঃসন্দেহে এখান থেকে একটি উপন্যাস শুরু করতে পারতেন। কিন্তু, আমি লেখক নই। আমি একজন অখ্যাত চিত্রশিল্পী মাত্র। কলকাতার ৩০০ বছর উপলক্ষে এই ঘটনাটি নিয়ে আমি একটি পেইন্টিং করব ঠিক করেছি।

কলকাতাকে নিয়ে চিত্রশিল্পীরা অজস্র ছবি এঁকেছেন। কিন্তু, আশ্চর্য যে, এ-শহরের ৪১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯শ ৯৭ জন হিজড়ের (১৯৮১) একটিকে নিয়েও ছবি আঁকার কথা কেউ ভাবেন নি, যাদের মধ্যে অন্তত হাজার-দুয়েক আমরা, পুলিস ও এঁড়ুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সেদিনের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলাম। কেউ টুঁ শব্দটি করলাম না। এঁড়ুকে দেখতে আমি হাসপাতালে পর্যন্ত যাই নি।

আমার ছবির বিষয় হবে কারুকাজে-ভরা পাথরের সিংহাসনে সমাসীন এক মহামৌন হিজড়ে। আউট সাইজ, অতি প্রশস্ত তার বক্ষপট। তার বাম হাত সাদা মেঘপুঞ্জের ওপর পরম আলস্যে ছড়ানো। অন্য হাতে শাসন দণ্ড।

তার লোমবহুল উলঙ্গ জানু ধরে এলোচুলে লতিয়ে উঠতে চাইছে তারই যৌন-অনুকম্পাপ্রার্থী এক কৃশকটি দিগম্বরী : কলকাতা-৩০০।

আমি ছবিটির নাম দেব : জুপিটার ও থেটিস। হ্যাঁ, জাঁ অগস্ত দমিনিক অ্যাগ্রঁর (১৭৮০-১৮৬৭) ওই নামের বিখ্যাত ছবিটিই আমার মাথায় আছে।

*শারদীয় বিভাব, ১৯৮৯*

# এক টুকরো পৃথিবী

খিলটা খুলে দিতেই যা একটু দেরি হয়ে যায়। বাটা লঙ্কাটা শিল থেকে আঙুল দিয়ে চেঁচে, কচু পাতার ওপর তুলে রেখে হাতটা ধুয়ে নিতে কতটুকুও বা আর সময় লাগে? তবু জয়নাবের মনে হয় অনেক, অনেক দেরি হয়ে গেল যেন। আরো আগে তার খিল খুলে দেওয়া উচিত ছিল। ওই সময়টুকুর মধ্যে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। কে বলতে পারে, আজরাইল দোর- গোড়াতেই বসে আছে হয়তো। শান দিচ্ছে তার রক্তাক্ত ছুরিতে।

আবার কড়া নাড়ে সিরাজ। কড়া তো নাড়ে না, জয়নাবের কলিজার একটা হাড় ধরে নাড়া দেয় যেন। হাত ধুয়ে সন্ত্রস্ত ক্ষিপ্রতায় ছুটে আসে জয়নাব। নড়বড়ে খিলটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হুড়মুড় করে খুলে যায় দরজাটা। দরজাটা খুলেই এক ঝটকায় সিরাজকে ভিতরে টেনে নেয় জয়নাব। তারপর ভেজানো দরজাটায় পিঠ দিয়ে সিরাজের মুখোমুখি হয়। হাঁপায়। বিবর্ণ ছেঁড়া শাড়ির স্খলিত আঁচলটা এখনও সিরাজের কাঁধের ওপর পড়ে রয়েছে আলগোছে। তৈলহীন চুলের তুফান ছড়িয়ে রয়েছে পিঠের ওপর। গহীন দু-চোখে থমকে রয়েছে আদিম আতঙ্ক আর অতর্কেয় অবিশ্বাস। ওপাশে তক্তপোষের ওপর কাগজের তালিমারা কালি ঝুলি মাখা হ্যারিকেনের নিভন্ত আলোটা, আড়াল-করা আঁচলের মধ্যে চুঁইয়ে এসে অন্ধকার হয়ে ঝরে পড়ছে সিরাজের সর্বাঙ্গে। দেখলে মনে হয়, কোন ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে অসহায় বাচ্চাকে রক্ষা করতে চাইছে যেন ভয়ার্ত পাখি।

সিরাজই কথা বললে প্রথম। বিস্ময় আর উদ্বিগ্নতায় ঘড়ঘড় করে উঠল গলাটা, কী হয়েছে কী? অমন করছ কেন?

বুকটা তোলপাড় করতে লাগল জয়নাবের। দম নিয়ে অসংলগ্নভাবে কথা বলতে শুরু করল, এত দেরি হল তোমার? আমি ভাবছিলাম... যেন ফাডা কপাল আমার! পিরের দরগায় শিন্নি মানছি আমি। বাঁদির ওপর এমনি রহম মঞ্জুর করো খোদাতালা... কসুর মাপ করো...

- আ মলো যা। মেলা বগরবগর করছ কেন এত! কী হয়েছে তাই বলবে—না, হ্যান করব ত্যান করব—এতক্ষণে হুঁশ হল জয়নাবের। খোলা বুকের ওপর আঁচলটা টেনে দিল তাড়াতাড়ি। তারপর আশ্চর্য গলায় বলল, আজকার কাণ্ডটা শোন নাই তুমি?

ক্লান্ত মুখের অনেকগুলো রেখা বিরক্তিতে হয়ে গেল সিরাজের। ধমকের সুরে বলল, লাও ঠ্যালা এখন। বলছি তো শুনিনি কিছু। বলতে হয় বল, নইলে ঘ্যানঘ্যান করো না মেলা। একশোবার এক কথা! শালা মেয়ে জাতটাই এমনি।

কী হয়েছে তাই বলব জয়নাব। একটু একটু করে অগোছালভাবে বলল। বর্ণনীয় বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাবার অক্ষমতা যেন আরও ঘনীভূত করে তুলল ওর চোখের বোবা আতঙ্ককে। সব শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল সিরাজ। তারপর ঘামে চটচটে ফতুয়াটা গা থেকে খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে মেঝেয় পাতা জীর্ণ শতরঞ্জিটার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আ-আঃ! ক্লান্তিতে অবশ আর বিরক্তিতে বিকল হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে। টনটন করছে হাত দুটো। দুঃসহ যন্ত্রণায় খসে পড়বে যেন কনুয়ের কাছ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে সিরাজ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, জুলফিকারকে দেখি না যে?

সে কথার উত্তর দিল না জয়নাব। বলল, তুমি কীরকম মানুষ গো! ইদিকে ভেবে

মরছি আমি। সারাটা দিন ধরে এত হাল্লা—ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে আমার। তখনই কইলাম ভিটেমাটির মায়া ছাড়ান দাও। হিন্দুস্থানে ফিরে কাম নাই। তা আবার আগের মত—যে কে সেই। জান নিয়ে টানাটানি—ইয়াল্লা!

কী করব কী শুনি? খেঁকিয়ে উঠল সিরাজ—করবটা কী? রহমৎ চাচা মরেছে তো আমার কী? আমার তো মরেনি কেউ। সে ওর পোলাপানরা বুঝবে। আর ঠিকই তো করেছে হিঁদুরা। কালী মন্দিরের পাশে কবর দিতে দেবে কেন শুনি? কেন দেবে? এ্যাদ্দিন যে দিয়েছে সেই ভাগ্যি মানো গে যাও।

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল জয়নাব। শেষকালে অধৈর্য গলায় সিরাজ বলল, কি অজু করার পানিটানি দেবে? না দাঁড়িয়ে থাকবে সঙের মত?

জল আনতে যায় জয়নাব। রাজহংসীর মতো কীরকম অলসভাবে হাঁটে জয়নাব। কতবার দেখেছে। তবু আবার দেখতে ভালো লাগে। ভারি শান্ত আর নিরীহ মেয়ে জয়নাব। আর ভয় পেলে এত অসহায় রকমের সুন্দর দেখায় ওকে।

জয়নাব জল আনলে দাওয়ায় উঠে গেল সিরাজ। মাচার ওপর ঘন বিন্যস্ত লাউ গাছের আড়াল-আবডাল দিয়ে উঠানের ওপর ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার রূপোলি আলোয় ওর রক্তাক্ত হাতের তালু দুটো মেলে ধরল। অভ্যস্ত আতঙ্কে শিউরে উঠল জয়নাব, এঃ, এত কাটাকুটি হয়েছে আজ? হাতখান যে ফালাফালা হয়ে গেছে!

কাচকলে কাজ করে সিরাজ। ভাঙা কাচের টুকরো যোগান দিতে হয় ফার্নেসে। দগদগে ঘায়ে ভর্তি ওর হাতের চেটো দুটো। পুরনো ক্ষত শুকোবার অবকাশ পায় না তো আর। রোজ নতুন করে ক্ষতবিক্ষত হয়।

হাতের তালু দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল জয়নাব। স্বামীর ওপর দরদে ঢলঢল করে উঠল ওর মুখটা। মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রূপোর নোলকটা থিরথির করে কাঁপতে লাগল। ঘটি থেকে জল ঢেলে আলতোভাবে হাত দুটো ধুয়ে দিল জয়নাব। শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে ঝুঝিয়ে পড়া রক্ত বন্ধ করল। যেন একটা সাদা কুকুর তার লাথি খাওয়া ঘেয়ো বাচ্চাটার সর্বাঙ্গ জিভ দিয়ে লেহন করে দিচ্ছে সীমাহীন স্নেহে।

মুখ-হাত-পা ধুতে ধুতে অন্যমনস্কভাবে বিধবা বোন জরিনার কথা জিজ্ঞাসা করল সিরাজ, জরিনা কোথায়? কী করছে?

শুয়েছিল সন্ধ্যের দিকে। ঘুমিয়ে পড়ছে বোধায়। আজকাল কী যে হয়েছে সন্ধ্যার দিকে ঘুষঘুষে জ্বর আসে। কাল তো মাথা ঘুরেই পড়ে গেল ঘাটে। হাকিম-টাকিম দেখাও বাপু—

জুলফিকার? সে বেটা ঘুমিয়েছে—না, না?

সেই সন্ধ্যা থেকে আব্বাজানের নাম করে কেঁদে কেঁদে এই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমুতে কি চায়? বেহেস্তের হুরির গল্প শুনে, বহুৎ ইলেত-বিলেতের বাত-চিত করে, তবে—

হ্যাঁ! তো বাপ কি 'বেটা—অ্যাঁ? খেয়েছে? নাস্তা-পানি ছিল কিছু—নাঃ?

দুধ পেয়েছে একটু। তোমার পিয়ারি গোরু যখন রয়েছে। সতীন আমার গোরুটা!

তোমার সতীন আমার কানে কি মন্তর দেয় জানো? পরামর্শ দেয় কি ওপরে কাঁটা নীচের কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলি তোমায় হ্যাঁ! সাঁঝ-সকালের শিশিরের মতো হাসি জমল জয়নাবের ঠোঁটে। সিরাজও হাসল। কিন্তু সংশয়ের তলানিটুকু বার বার পাক খেয়ে উঠে ঘুলিয়ে দিয়ে যেতে লাগল ওর হাসির স্বাভাবিক স্বচ্ছতাকে। ট্রেনের বাইরে চলমান গাছপালার মতো মুখের ওপর দিয়ে চকিত ছায়ারা চলে গেল। তবু জয়নাবকে সাহস দিল সিরাজ, ভয় নাই কিছু বুঝলে? ভয়টা কিসের? কিসসু হবে না, দেখো তুমি। আর যদিই কিছু হয়, আমি তো আছি তোমার পাশে—না নেই? সেটা বল আগে—

তারপর আল্লার নাম নিতে পশ্চিমমুখো হাঁটু গেড়ে বসে সিরাজ। এই এবাদতের সময়টা রোজ বুক ঠেলে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সিরাজের। মসজিদের উত্তর মিনারটা থেকে এখন আর মুয়াজ্জিনের সান্ধ্য আজানের স্বর তল্লাট জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয় না। গত দাঙ্গায় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে মসজিদটার। শুধু স্তূপাকার ইট-কাঠ-চুন-বালির মত, জমাট-বাঁধা দুঃসহ বেদনার ভার বহন করছে শ্যাওলা আর আগাছায় ভর্তি মসজিদের চাতালটা।

আল্লার নাম নেওয়ার কথা ভুলে যায় সিরাজ। ছুরা-ফাতেহা পড়তে গিয়ে চোখ ফেটে আসার উপক্রম হয়। আল্লাতালার দরবারে মোনাজাত করার কথা মনে থাকে না। স্মৃতি-মন্থন করে ওঠে শুধু বেদনা। একটার পর একটা চিন্তার ঢেউ ছুটে এসে আছড়ে পড়ে মাথার মধ্যে। এত দ্রুত আর বিশৃঙ্খল তাদের গতি যে মনের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড আলোড়ন। বোঝা যায় না কিছুই। শুধু বার বার ঘুরে-ফিরে আসে সেই দুঃসহ ভাবনা। সংখ্যাতীত স্তব্ধশীর্ষ তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে যেন।

হ্যাঁ কি যেন বলছিল জয়নাব। কবর দিতে দেবে না। কালীবাড়ির পেছনে আর গোর দেওয়া চলবে না। তাহলে গোর দেবে কোথায়? রহমৎ চাচার কবরটা অবশ্য গোলমাল ভালো করে দানা বেঁধে ওঠবার আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর? দুনিয়াদার আল্লা, তোমার রাজত্বে আজ কবর দেবার জায়গা নেই! কিন্তু তাই বলে মানুষগুলোকে অমর করে দেবে না তো তুমি খোদাতালা? এরপর যে মরবে তাকে মাটি দেওয়া হবে কোথায় তাহলে? কোথায়? লাভার মত গরম রক্তস্রোত বইতে শুরু করে সিরাজের মাথায়... কালীবাড়ি! এতদিন কালীবাড়ি ছিল না? এতদিন কালীবাড়ির পাশে গোরস্থান ছিল না? এ-তল্লাটের মুসলমানরা বিশ বছর কবর দিয়ে আসছে না ওখানে? আর আজই তা বরবাদ? বারে, বেশ তো! কোথা থেকে কী হয়ে গেল হঠাৎ?

হঠাৎ কি আর কিছু হয়। হঠাৎ হয়নি কিছুই। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে গান্ধিজীর আবক্ষ অয়েলপেন্টিং-এর তলায়, রিভলভিং চেয়ারটায় হেলান দিয়ে তল্লাটের সমবেত হিন্দু প্রতিনিধিদের সেই কথাটাই বুঝিয়ে বলছিলেন কাঁচকলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গড়াই। এতদিন ধরে নিরুদ্ধ আক্রোশে ধুঁইয়ে উঠছিল যা, তিনি উপযুক্ত পরিমাণ কাঠ-খড় পুড়িয়ে সেটাকে টগবগিয়ে ফুটিয়ে দিয়েছেন—এই যা। কিন্তু এভাবে ঘুরিয়েও বলা যায় কথাটা ঃ সে ক্রোধতপ্ত আগ্নেয়গিরি গুমরে মরছিল এতদিন, তিনি শুধু তার মুখটা উসকে দিয়েছেন—এই যা। আর তিনি কে? তিনি তো নিমিত্তমাত্র। ধর্ম আজ বিপন্ন। উপনিষদের যুগ থেকে মুঘল যুগের অত্যাচার আর নিপীড়নের মরুভূমির তলা দিয়ে ফল্গুধারার মত বয়ে এসে সহস্রধারায় জাতির জীবনে যা উৎসারিত আজ—সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম বিধর্মীর হাতে আজ লাঞ্ছিত। তাই ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে যাঁর আবির্ভাব, তিনিই উদ্দেশ্যসাধন করাচ্ছেন রাধিকারঞ্জনবাবুকে দিয়ে। আসলে তিনিই শ্বাশ্বত—এক এবং অবিনশ্বর—আদি এবং অকৃত্রিম—

মুখের ওপর 'ত্বয়া হৃদিস্থিতেন' গোছের একটা ভাব ফুটিয়ে তোলেন রাধিকারঞ্জনবাবু, কালীবাড়ির পাশে কবর আমরা দিতে দেব না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এ-অঞ্চলে মেজরিটি কারা? একথা যদি সত্যি হয় যে শতকরা ষাটজন হিন্দু এ-অঞ্চলে, তবে কেন তারা ধর্মের ওপর এই অপমান সহ্য করবে? কেন করবে? আর কতদিন করবে? আমি বলছি জগজ্জননী মা কালী রুষ্ট হবেন। যদি আমরা সংঘবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে সব—সব ধ্বংস হয়ে যাবে—আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি—আমরা

আছি আপনাদের পিছনে—। কালো গগল্‌সের অন্তরালে রাধিকারঞ্জনবাবুর দুর্নিরীক্ষ্য, রহস্যময় চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। সুদৃশ্য টার্কিশ পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরলেন তিনি। তারপর কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, কি কিছু বলছেন না যে! সুফল? অনন্ত? হরদয়ালবাবু?

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর উকিল ফণীবাবু, 'প্রিমিয়ার হার্ডওয়ার মার্চেন্ট' নীলাম্বর মল্লিক এবং উপস্থিত আর আর ভদ্রপঞ্চজনের নিস্তেজ প্রত্যাশার নিস্পন্দ অনুসন্ধানের সামনে রক্তে পৌরুষ ডাক দিল হরদয়ালের। শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসে অন্ধ আক্রোশে গজ গজ করতে লাগল। সোডার বোতল ঝাঁকানি দিলে যেমন ঝাঁঝালো ফেনা আর অজস্র ফুলকি গেঁজিয়ে ওঠে। বুড়ো আঙুলে ময়লা পৈতেটা জড়িয়ে টান-টান করে হাতটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল হরদয়াল, এই পৈতে ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করছি—জেবন থাকতে একটা মরা পিঁপড়ে সেঁদুতে দেব না গোরস্থানে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে টিপে টিপে মেরে দেব শালাদের!

গরম রক্ত চমচম করে উঠল অনেকগুলো মাথায়। প্রতিজ্ঞার ঐক্যতানে চকচক করে উঠল অনেকগুলো চোখ। উত্তেজনার আধিক্যে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল রতিকান্ত। ডান হাতটা মাথার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সোফা ছেড়ে বিসদৃশ লাফ মারলে একটা। বলল, বল ভাই, জয় মা কালী কি—জয়!

পঁচিশটা সমর্থ গলার গুরুগর্জনে গমগম করে উঠল গোটা ড্রয়িংরুম।

এই তো চাই! এই তো চাই! আপনাদের কাছে এই তো আশা করি ভাই। আজ গরীব-বড়লোক নয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নয়—আজ আমরা সবাই হিন্দু—এই আমাদের পরিচয়—। নিকোটিনের মতো মিশকালো ঠোঁট ছাপিয়ে হাসি উপছে পড়ে। রাধিকাবাবু গালের পুরু মাংসের ভাঁজে-ভাঁজে একটু একটু করে তা ছড়িয়ে পড়ে। চা এবং আনুষঙ্গিক বহন করে আনে উর্দি-পরা চারজন বেয়ারা। আতিথেয়তার বিগলিত আতিশয্যে বিমূঢ় হয়ে যায় সকলে। তবু বোকার মতো অনভ্যস্ত গলায় আপত্তি করতে যায় হরদয়াল, আমরা এঁজ্ঞে গরীব মানুষ। এসবের যুগ্যি কি আমরা—

এগিয়ে এসে আবেগভরে হরদয়ালের হাত দুটো ধরেন রাধিকারঞ্জনবাবু। টার্কিশ পাইপটাকে টিপয়ের ওপর কাশ্মিরী ফ্লাওয়ার ভাসের গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে হয়। এমন কি তাঁর অমন দামি মার্সেরাইসড জিনের প্যান্টের ক্রিজ ভেঙে যাওয়াকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করেন না তিনি।

এসব কী বলছ হরদয়াল? এসব কথা বলা মানেই তাঁর অক্ষমতাকে লজ্জা দেওয়া—আর একটু চিনি লাগবে? কত ন্যায়-অন্যায়ের প্লাস-মাইনাসের অবক্ষয়ের পর, যে অকিঞ্চিৎকর পুণ্যসঞ্চয় হয় ক্বচিৎ-কখন, সেই বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যফলেই আজ পায়ের ধুলো পড়েছে তাদের, অতিথির, অতিথিনারায়ণের—আর দু-খানা টোস্ট? মহাদাতা কর্ণ তাঁর ছেলের মুণ্ড কেটে যমকে, না-না যমকে কেন হতে যাবে, কাকে যেন... কিন্তু সে যাকেই হোক—আর এক প্লেট সিঙাড়া দিয়ে যাক না?

মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার শেষ সীমানায় একটা মেরুদণ্ডহীন জানোয়ারের ফসিলের মতো ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে এ-দিকটা। সহরতলী আর গ্রামের সীমান্ত এ অঞ্চলটা। সহরের আভিজাত্য পাবার অযোগ্য। আবার গণ্ডগ্রামের পর্যায়ভুক্ত করলেও অবিচার করা হয়। কোন প্রাক্তন হঠকারিতায় মিউনিসিপ্যালিটির কৌলিন্যের অংশীদার হয়ে পড়েছে যেন! জায়গাটার দিকে চেয়ে দেখলে, সেই অপ্রাপ্য সম্মানের সংকোচ এবং সৌভাগ্যের অপরাধ আনাড়ী চোখেও ধরা পড়ে। নীল আকাশের দিকে কালি-পড়া চোখের

কুৎসিত ইঙ্গিত করে, সকাল-সন্ধ্যায় ভুড়ুক-ভুড়ুক করে রূপোলি ধোঁয়া ছাড়ে কাচকলের কদাকার প্রৌঢ় চিমনিটা। খেলাশেষের দাবার ছকের ওপর ছত্রাকার বিবর্ণ ঘুটির মতো, এদিক-ওদিক ছিটকানো পচা খড় কিংবা ফুটো টিনের ছাউনি দেওয়া মেটে বাড়িগুলো। মৌলভি নুর মহম্মদ আনসারি, ফণীভূষণ গুপ্ত, নীলাম্বর মল্লিক এবং কাচকলের ম্যানেজার রাধিকারঞ্জন গড়াই প্রভৃতির চোখ-রাঙানো বাড়িগুলোর পাশে সেগুলো পানের ছোপ লাগা, দাঁত বার-করা, খোসামুদে মোসাহেবের মতো মনে হয়। আর উল্লেখযোগ্যতা আছে হাজার হাত কালীর মন্দির এবং একটি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মসজিদের কঙ্কালের, যা কচিৎ-কখন বিভ্রান্ত পথচারীর অভ্যস্ত সম্ভ্রম আকর্ষণ করে থাকে এখনো। এছাড়া তল্লাট জুড়ে বুক-উঁচু আগাছার ঘন বনের বিস্তার। মধ্যে মধ্যে কয়েকটা ধুতরো, আকন্দ, কন্টীকারী আর ফণিমনসার গাছ বাদ দিলে—কালকাসুন্দে, কচু গাছ আর উলু ঘাসের প্রাচুর্যে ভরাট সমস্ত অঞ্চলটা।

আর আছে একটা কবরভূমি। মন্দিরের পেছনে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে জলাভূমিটার এখানে ওখানে মাথা উঁচু করা বাঁকারির বেড়া, লোহার রেলিং কিংবা হয়তো দু-একটা সিমেন্ট করা স্মৃতিফলক ভৌতিক সাক্ষ্য বহন করছে প্রায় পরিত্যক্ত কবরভূমিটার। দেশ বাঁটোয়ারা হবার পর মুসলমান জনসংখ্যার শোচনীয় অল্পতার জন্যে, আনুপাতিক হারটা ঠিক থাকা সত্ত্বেও, মৃত্যুর সংখ্যা এত নগণ্য দাঁড়িয়েছে যে এত বড় কবরভূমির ব্যবহার হয় খুব কম।

কে ভেবেছিল, একদিন এই নগণ্য কবরভূমিটাকে নিয়েই এতখানি উত্তেজনা ছড়িয়ে পরবে। কিন্তু তাই হল। আকস্মিক ভূমিকম্পের মতো তল্লাট জুড়ে কুটিল স্বার্থ আর অন্ধ বিদ্বেষের আলোড়ন জাগল। এবং রাধিকারঞ্জন গড়াই-এর ত্বরিৎ তৎপরতা সহরের নির্ভিক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোর ভূকাম্পনিক যন্ত্রে নির্ভুলভাবে ধরা পড়ল অচিরে। স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত হল। রাধিকারঞ্জনবাবুর আতিথেয়তার দুর্বোধ্য অতিশয্যে বিমূঢ় হয়ে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন যথাকালে। রোলি ক্যামেরার ওয়ান পয়েন্ট এইচ তেজি লেন্সে প্রতিফলিত হল মন্দিরের কিয়দংশ এবং সমগ্র কবরভূমিটা। কাগজে কাগজে ছবি বেরুল। রিপোর্ট বেরুল এতদঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে গভীর উত্তেজনার কথা উল্লেখ করে। অমন একটা প্রাচীন মন্দিরের পাশে অপবিত্র কবরভূমির অস্তিত্ব থাকার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সারগর্ভ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। সহরে বসেই বিবৃতি দিতে শুরু করলেন হোমরা-চোমরা নেতারা এবং মানুষকে শান্ত থাকবার অনতিক্ষুদ্র বাণী পাঠাতে লাগলেন টেলিগ্রাম করে।

আর পচা তাড়ির কলসির মুখে নেশাখোর মাছির ভন্‌ভনানির মতো কাগজগুলোর নিয়ে মোড়ে মোড়ে জটলা শুরু হল। হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধিকারঞ্জনবাবুকে সভাপতি করে ডিফেন্স কমিটি গঠন করা হল।.... দরোয়ান পাঠিয়ে মৌলভি সাহেবকে ডেকে পাঠালেন রাধিকারঞ্জনবাবু। হ্যাঁ, গোরস্থানটা উঠিয়ে দিতে হবে। এবং তার জন্যে মৌলভি সাহেবের সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনি।

তা কেন করবেন না মৌলভি সাহেব? নিশ্চয়ই করবেন। তাঁর মতো তুচ্ছ ব্যক্তিদের দিয়ে গড়াই মশাই-এর যদি কিছুমাত্র উপকারও হয়... অবশ্য কবরখানাটা উঠিয়ে দিলে আর পাঁচটা স্থানীয় মুসলমানের সঙ্গে অসুবিধার অনতিক্রম্য অন্ধকূপে ফেলে দেওয়া হবে তাঁকেও। তবে সেটা সাময়িক। শেষ পর্যন্ত গণমেষের মাথায় পা রেখে কুয়োর বাইরে বেরিয়ে এসে, যথারীতি তাদের দাড়ি এবং বুদ্ধিবৃত্তির আনুপাতিক হ্রস্বতার কথা উল্লেখ করে, ঈশপ্‌স্ ফেবলসের নীতিবাক্যের মর্যাদা রাখবেন তিনি। তাছাড়া সহরে তাঁর অতি

নিকট আত্মীয়ের প্রাইভেট কবরখানা তো রয়েইছে। আল্লা না করুন, দরকার পড়লে তাঁর নিজের অসুবিধা হবে না কিছু। তবে হ্যাঁ, মৌলভি সাহেবকেও যেন একটু মেহেরবানি করেন রাধিকাবাবু। মানে তাঁর বড় ছেলের সেই এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারটা... কোন মিনিস্টারকে ধরে যেটা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাধিকাবাবু...

তা কেন করবেন না রাধিকারঞ্জনবাবু? নিশ্চয়ই করবেন। তাঁর মতো অভাজনের দ্বারা মৌলভি সাহেবের মতো সজ্জন ব্যক্তির যদি কিছুমাত্র উপকারও হয়.... মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে আছে কবরখানাটা। মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে কি করে সেটা লিজ বা কিনে নিতে হয়, সে তিনি দেখবেন। কিন্তু আপাতত যে করেই হোক কবরখানাটা উঠিয়ে দেওয়া চাই-ই। না হয় একটু কষ্ট করে সহরে কবর দিয়ে আসবে এ অঞ্চলের মুসলমানরা? মাইল দশ—তা কী আর এমন দূর হবে? তাই বলে কাচকলের এমন লাগসৈ এক্সটেনশনটা তো আর বন্ধ থাকতে পারে না!... ভেতরে ভেতরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না কিছুই। তবু বলির জন্তুর মতো আসন্ন সর্বনাশের প্রাকৃতিক উপলব্ধিতে স্তব্ধ হয়ে রইল এ অঞ্চলের কয়েক ঘর মুসলমান সম্প্রদায়। কিন্তু এত কিছু ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও ঝড় আসার আগেকার গুমোট আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন, আবেগহীন জীবন যথারীতি ঝাঁপ তুলতে লাগল প্রাত্যহিক প্রত্যাশায়।

সিরাজের ন্যাংটো ছেলেটা একটা বাঁকারির টুকরো দিয়ে কচুপাতা কাটছিল কচকচ করে। কাচকল থেকে ফিরে, বাড়িতে ঢুকেই, সেই দিকে চোখ পড়ল সিরাজের। ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়ছে সমস্ত শরীর। তবু ভারি ভাল লাগল সিরাজের। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীরত্ব দেখল ছেলের তারপর এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে আচমকা কোলে তুলে নিয়ে ছেলের গাল টিপে দিল সিরাজ, বাহ্‌ওয়া! সাবাস বেটা! তোর নাম কি জানিস? হাঁ জুলফিকার। জুলফিকার মানে কি—না, তরোয়ার। পয়গম্বর বীর হজরৎ আলির তলোয়ারের নাম ছিল জুলফিকার—হাঁ!

বাপের রুক্ষ চুলগুলো দু-হাতে টানতে শুরু করল জুলফিকার, ইঃ, তেল মাখে না আবার, কথা বলে! তুমি তেল মাখ না কেন বাজান!

কী উত্তর দেবে সিরাজ? তৈলপ্রাচুর্যের অভাবে জীবনের বাতিটাই যায় নিবু নিবু সে মাখবে তেল! তবু হাসল সিরাজ, তুমি মাখিস তো না, না?

হ্যাঁ, মা দেয় নাকি—যে মাখব? ভারি পাজি মা-টা। তুমি আচ্ছা করে পিটটান দিও বাজান—অ্যাঁ?

আচ্ছা, আচ্ছা। খুব মার দেব।

মুহূর্তে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জুলফিকার।

আমি তো, কাল একটা ভারি মজাদার খোয়াব দেখছি বাজান! হি-হি-হি—দেখি না, ইয়া লম্বা দাড়িগোঁফওলা এক বুড়ো এসে বলে আমি আল্লা। কী ধোঁয়া তার চারদিকে আই বাপ। আমি তো, তখন বললাম আল্লা, আমাকে চারডা পয়সা দাও না। তা বুড়ো বলে কিনা, উঁহু, সাড়ে তিন পইসা দিতে পারি। চার পইসা হবে না। আমি তো তখন বললাম, তোমার গোড় ধরি আল্লা! পুরো চারডা পইসাই দিয়ে দাও আল্লা! ভগবান তোমায় সুখে রাখবে আল্লা! কাছে রয়েছে, তবু কিছুতে দেবে না বুড়ো! আমিও ছাড়লে তো। শেষকালে ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল আল্লা। আমি তো কত কাঁদলাম বাজান। আচ্ছা, সাড়ে তিন পইসাই দিয়ে দাও আল্লা। আমি কখনো চার পইসা চাইব না আর। তা আর এল না আল্লা। তবে যে তুমি কইছিলে আল্লার কাছে যা চাইবে তাই মিলবে। বিলকুল ঝুট। চুপ-চুঁপ। বেকুব

কোথাকার। বলতে আছে ওকথা?

বললে কী হয় বাজান?

গুণা হয়। কসুর হয়।

আমায় ভরপেট খেতে দেয় না কেন বাজান? ফি রোজ তুমি সন্ধ্যেবেলা খাবার নেসবে বলে ঘুম পাইড়ে দেয়। কই তুমি তো... আমার কি ভুখ নাই বাজান? প্রশ্নটার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে গেল সিরাজ। মাথার ভেতর গোছাল চিন্তাগুলো দুড়দাড় করে ভেঙে পড়ল। স্নেহ ও ভালোবাসয় উথলে ওঠা বুকের ভেতরটা ঘুলিয়ে উঠল যেন। কোলের ওপর শীর্ণ ছেলের ভারটাকেও বিরক্তিকর আর অসহ্য মনে হল। কোল থেকে ছেলেকে নামিয়ে দিল সিরাজ। অবসন্ন ধিক্কার আর মুমূর্ষু আত্মগ্লানিতে ঘাড়-ভাঙা জানোয়ারের মতো, দাওয়ায় খুঁটিতে হোলন দিয়ে বসে পড়ল মুখ গুঁজে।

একটু পরেই একচোট ঝগড়া হয়ে গেল সিরাজ আর জয়নাবের মধ্যে। এঘর থেকে চাল নিয়ে যেতে এসে, সিরাজকে দেখে থমকে দাঁড়াল জয়নাব, এত জলদি ফিরলে আজ? যাও নাই?

ধ্যাত্তেরি—ধমকে উঠল সিরাজ, মনমেজাজ খারাপ করে দিও না বলছি। যাও এখান থেকে।

তালে যাও নাই?

কোথায় আবার যাব?

কোথায় আবার যাবে! জরিনার সাদির জন্যে চাটুজ্জির হাটে ইদ্রিস মিঞার ওখানে যাও নাই তুমি? হা আমার ফাড়া কপাল, এমন লোককে নিয়ে ঘর করে মানুষ!

ওঘর থেকে জ্বরজর্জর জরিনার গোঙানি ভেসে আসে। হঠাৎ কি যে হয় সিরাজের অবসন্ন মনটা একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। গুমরে মরা আহত আক্রোশটা প্রকাশ পাবার ছিদ্র খুঁজে পায়। ফোঁটা ফোঁটা নাইট্রিক এসিডের মতো জয়নাবের বুকের পুরনো ক্ষতটায় দাঁতে-চিবানো কথা ঝরায়, অসুবিধা হচ্ছে নাকি বিবিজান—আঁ? তা বেশ তো, তালাক দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। এ তো খোশখবর। ওয়াহ্ ওয়া কী ওয়াহ্ ওয়া! তবে একটা কথা। সেরেফ একহি বাত। তোমার বাপ জাহান্নম থেকে যে দশবিশ টাকা মাস মাস ভেজে দেয় আমায়, সেটা যেন বরবাদ না হয়। জরা মেহেরবানি করে সেটা তুমি মঞ্জুর করিয়ে দিও বিবিজান! তীব্র ব্যঙ্গটা নগ্ন কটূক্তিতে রূপ নেয় ক্রমশ। অশ্রাব্য, অনুচ্চারণীয় কথা বলে সিরাজ, তা কারো বরাতে পয়গাম কবুল করবি নাকি রাস্তা নিবি—বহিনের মত বেইরে যাবি কাউকে নিয়ে? শালা বিষের ঝাড়ে বিষফলই হয়। একই ঝাড় তো! এক সূপ্পনখা থেকে স্বন্নলঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল! ছারেখারে দিলি তুই আমার সংসারটা। হারামজাদি মাগি কোথায়কার—

ব্লটিং পেপার দিয়ে কে যেন মুখের রক্ত শুষে নিল জয়নাবের, কী কইলে? একথা কইতে পারলে?

এত বড় কথা তুমি কইলে আমায়?

তবে কি বলবে আবার?

তা তো কইবেই। তা কইবে না? বহিনের সাদির টাকা ভেঙে গোরু কেনছো—ইখন সাদি দেবার ক্ষমতা থাকবে কোত্থেকে তোমার? পিরের রওজা চইতে চাও তুমি—এত বড় গোস্তাকি তোমার খোদা মাপ করবে ভেবেছ? কখনো করবে না। যেদিন থেকে তুমি পিরের কবরের ওপর হাল চইবে কয়েছ সেইদিন থেকে ইব্লিশ ভর করছে তোমার ওপর। আমার বাজান দোজখে যাবে? দোজখে যাবে তুমি। তুমি! তুমি! বলতে বলতে হাউ-হাউ

করে কেঁদে ফেলল জয়নাব। এতক্ষণে খেয়াল হল সিরাজের। রাগের মাথায় একি করে বসেছে সে!

মাথাটা ঘুরে উঠল জয়নাবের। ঝাপসা চোখের নিস্পন্দ অনুসন্ধানে খুঁটিটা ধরতে গিয়ে টলে পড়ে সিরাজকেই আঁকড়ে ধরল।

অনেক, অনেক দিন বাদে সত্যিকার দরদে জয়নাবকে বুকে চেপে ধরল সিরাজ। তারপর মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে কত কী যে বকে গেল সিরাজ।

কেন তাকে অমন করে রাগিয়ে দেয় জয়নাব। এক দিকে রক্ত শুষে নিচ্ছে কাচকল আর একদিকে তেল-নুন আর ভাত-কাপড় জোগাতে জোগাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে যে সিরাজ। রাগ লাগে কি লাগে না মানুষের? জয়নাব বুঝেও বুঝে না কেন যে অবস্থাটা। কোনটা আগে সামলাবে সিরাজ? অরক্ষণীয় বোন না অরক্ষণীয় জীবন? সাদি! সাদি! সাদি! হরবখৎ কি ভাল লাগে একথা! সাদি দেবে না তো কি ঘরে পুষে রেখে দেবে সোমত্ত বোনকে? এই তো সেদিন এদ্দাৎ-এর সময় পেরুল। এত তাড়া কিসের। থাক না বোনটা আর দু-দিন। আকালের বাজার কাটলে সাদি দেবে সিরাজ। কী ফায়দা হত ইদ্রিশ মিঞার কাছে গেলে? মাইনর পাশ ছেলে—আর যে চড়া হাঁক ইদ্রিশ মিঞার। কুত্তা, কুত্তা—চামারের বাচ্চা শালা। বাঁদিবাচ্চা টাকাই চিনেছে দুনিয়ায়। নুরনবি হজরৎ মহম্মদের মেয়ে, হাসান-হোসেনের মা, ফতিমা বিবির দেনমোহর কত ছিল শুনি? আজকালের হিসেবে দশ-বারো টাকার বেশি হবে না। হ্যাঁ, কেতাবে লেখা আছে একথা! আর পিরের রওজায় চাষ করার কথা বলছিল জয়নাব? কতবার বোঝাবে তাকে সিরাজ? হ্যাঁ, আজ হোক, কাল হোক, চাষ ওখানে করবেই সিরাজ। কত সুসার হবে সংসারের! হাল রয়েছে, গোরুও কিনেছে একটা। হরদয়াল যদি ওর গোরুটা দেয়, কালই শুরু করে দেবে সিরাজ। কবে ওর চাচার চাচা পির ইলাহির কবরের জন্যে জমিটা দান করেছিল তাও কোন লেখাপড়া নেই—সেসব কি মেনে চলতে হবে নাকি আজও? পির সাহেব কি গোর থেকে উঠে এসে দানাপানি দেবে ওকে?

ঝাঁঝি আর কচুরি পাতার গাটনায় ভরে গেছে পুকুরটা। মাঝখানে নির্জন দ্বীপের মত বৃত্তাকার টলটলে জলে চাঁদ আর তারা ভাসছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে জয়নাব।

আচমকা জয়নাবকে এপাশে টেনে নেয় সিরাজ। এত রাত্তিরেও হরি মাইতির ঢালাই ঘরে কাজ হচ্ছে। সেখান থেকে ওয়েল্ডিং-এর তীব্র নীল আলো প্রতি মুহূর্তে উত্তর আকাশটা ঝলকে দিয়েই নিভে যাচ্ছে। জাল-দেওয়া জানালার ফাঁক দিয়ে অসংখ্য প্রবালের টুকরোর মতো বারবার আলোটা ছড়িয়ে পড়ে জয়নাবের সর্বাঙ্গে। ওর আলো চিকচিক মুখটা ভারি রহস্যময় মনে হয়।

সিরাজের নেশা-ভরা চোখের ভাষা বুঝতে পারে জয়নাব। এই সুযোগ। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই সে এখন দাবি করতে পারে সিরাজের কাছে। আর তা মেটাবার কসমও করতে পারে সিরাজ।

একটা কথা কইব। আগে কও রাখবে কথাডা?

কী? কথাটা কী বল শুনি আগে?

কসম করো... না থাক। তুমি আবার রাখবে না কথা!

কে বলছে রাখব না? আমি বলছি? বলে দ্যাখো তো আগে—

তুমি—তুমি পিরের কবরে হাল চইও না গো! আমার কথা রাখো এই একটিবার!

আবার, আবার সেই পুরনো কথা! মুখের ওপর থেকে জয়নাবের একরাশ শুকনো, নরম ঘন চুলের অন্ধকার সরিয়ে ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সিরাজ। পির ইলাহির রওজাটা এখন উলু ঘাসে ভর্তি। কাঠা দুই জমি। চিহ্নমাত্র নেই কবরের। তবু কন্টিকারী গাছটা ঝোপঝাড় সুদ্ধ নুয়ে পড়েছে যেখানে, তার তলায় একটা ইটের ওপর প্রদীপ রেখে এসেছে জয়নাব। মিটমিট করে এখনো জ্বলছে দু-একটা। শিউলি গাছটা থেকে শিশিরের কণা বুকে নিয়ে টুপটাপ ফুল ঝরে পড়ছে হয়তো তার ওপর।

সেই দিকে চেয়ে জয়নাবের ওপর ভারি মমতা হয় সিরাজের। জয়নাবের মাথাটা বুকে চেপে ধরে। সোহাগে গলে যায় জয়নাব। এক টুকরো সাদা মেঘ যেমন করে গলে যায় হলুদ চাঁদের মধ্যে। সমস্ত ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে বলে সিরাজ।

বিপর্যস্ত জীবনকে ঘিরে তার অপরিসর মনের অসীম আশা-আকাঙক্ষা স্বপ্ন-সাধনার অসার্থকতার কথা। কথা তো বলে না, জয়নাবের বুকের শিরাগুলোকে একটা বেহালায় তারের মতো করে বেঁধে, কথার ছড়ি বুলিয়ে কান্না ঝরায় যেন।

মাটি। মাটি হল মা-বাপ। মাটি হল খোদার রহমান। আলো, বাতাস, পানির মতো মাটিও খোদাতালা দিয়েছেন মানুষকে। মাটির ওপর সমান অধিকার সব মানুষের। সেই মাটিতে চাষ করলে কখনো গুণা হয়! হলই বা তা পিরের কবর, আল্লা কখন গোঁসা করতে পারেন! আর তা ছাড়া চাষ না করলে খাবে কী তারা?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে জয়নাব। সবই তো বোঝে সে। মর্মে মর্মে জানে তো মাটির ওপর কী তীব্র, কী আকুল, কী আবেগময় নেশা মানুষটার। সিরাজের বাপ-ঠাকুর্দা ছিল চাষী। সামান্য লেখাপড়া শিখে থাকলেও, সিরাজও কায়মনোবাক্যে চাষী ছাড়া কিছু নয় তো আর। মাটির সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক যে'ওর! অবসর সময়ের সবটাই মাটি মাটি করে কাটায় সিরাজ। ঘাট পরিষ্কার আছে, তবু কোদাল দিয়ে সিঁড়ি কাটা চাই প্রত্যেক রবিবার—এমন মানুষ। আর পিরের রওজায় কতদিনের চাষ করার ইচ্ছা সিরাজের! শুধু টাকার অভাবেই না হয়ে ওঠেনি এতদিন?

তবু মন খুঁতখুঁত করে জয়নাবের। বলে, তবে যে কয় গুণা হয় পিরের রওজায় লাঙ্গল চইলে?

কে বলে?

মানুষে কয়।

হ্যাঃ যত্ত সব বুজরুকি। বলুকগে লোকে। তুমি আমি সাচ্চা থাকলেই হল—

বলি বলি করেও এতক্ষণ যে কথাটা বলতে পারেনি, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অবশেষে সেটাও বলে ফেলে জয়নাব, এ্যাদ্দিন বুঝতে পারি নাই ঠিক... কিছু কই নাই তোমায়.... বড় ডর লাগে আমার...

ডর! ডর কিসের! আমি তো রয়েছি। না মরে গেছি?

শিউরে উঠে স্বামীর মুখে হাত চাপা দেয় জয়নাব, কেন কেন কইলে তুমি ওকথা? ভালো কথা কি কইতে পার না? হ্যাঁগো, তুমি ওকথা কইলে কেন? বড় বড় চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে জয়নাবের। ওর কালো গহীন চোখদুটো আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় সিরাজের। অনুভব করতে সাধ হয় কত বুকঢালা দরদ, কী অপরিসীম উৎকণ্ঠা ওর কান্নায়।

কতক্ষণ পরে সিরাজ বলে, নাও, কি বলবে বলছিলে, বল দিকিন—

বলছিলাম... বলছিলাম কি যে—অসহায় আকুলতায় সিরাজের হাত দুটো চেপে ধরে জয়নাব, আমার পেডে যেটা এসছে তার মঙ্গলের লেগেও কি তুমি—তোমার দুটি গোড়

ধরি আমি—পিরের রওজায় তুমি হাল চইও না গো! ইলেকট্রিকের তীব্র শক খাওয়ার মতো সরে আসে সিরাজ। চকিতে। আসমান থেকে জমিনে যে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাকে। মাথায় রক্ত বরফের মত হিম হয়ে যায়। সুখি আশা আর উদ্বেল আবেগ দিয়ে স্বপ্নের যে প্রবাল দ্বীপ গড়ে তুলেছিল এতক্ষণ, হতাশার একটা সর্বগ্রাসী কালো ঢেউ তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় মুহূর্তে।

আবার! লোভ, অন্যায়, হিংসা, দ্বেষ, অভাব, অনটন, শোষণ আর অসাম্যে জর্জরিত পৃথিবীতে আবার একটা সন্তানের জন্ম দেবে জয়নাব?

ভোরবেলা মৌলভি নুর মহম্মদ পদার্পণ করলেন সিরাজের কুঁড়েঘরে। নামদার লোক। খোদার দেওয়া এলেম-কালামে মগজ ভর্তি। লিগ আমলে এম. এল. এ. ছিলেন। কি করলে মাননীয় অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা হয় তা ভেবে উঠতে পারল না সিরাজ। আনাড়ি হাতে দড়িতে ঝোলান আসনটা তাড়া তাড়ি পেতে দিয়ে বলল, আসেন মৌলভি ছাব। আসলাম আলেকম। বসতে আজ্ঞা হোক—

মৌলভি বটে, তবে ওই নামেই। পোশাক পরিচ্ছদ আচার-আচরণ প্রচলিত রীতি বিগহিত। মৌলভি নুর মহম্মদের কোন মৌলভি পূর্বপুরুষের ধর্মের উদার ঋণসত্র থেকে, এ তল্লাটের পুণ্যলোভাতুর মুসলমানরা বেপরোয়া ঋণ গ্রহণ করেছিল এককালে। আসলটাই না হয় তামাদি হয়ে গেছে! কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সম্ভ্রমের সুদটা আজ পর্যন্ত আদায় করে আসছেন মৌলভি সাহেব।

পরনে লাল টকটকে বর্মিজ লুঙ্গি। মুর্শিদাবাদি সিল্কে গিলে করা পাঞ্জাবির বুক পকেটে ফুলতোলা রুমালের উঁকিঝুঁকি। নক্সাদার, ইরানি ফেজের আড়াল-আবডালে ব্রাইলক্রীম দিয়ে ব্রাস করা বাবরি চুলের কিছু আভাস। নিচু মোটা জুলপি আর থুতনির কাছ থেকে নেমে-আসা কসমেটিক ঘষা দাড়ি গোঁফের মধ্যে সযত্ন ব্যবধান রচনা করেছে, জনি ওয়াকারের সঞ্চিত রসে শাঁসালো সেভিং-করা গাল দুটো। পায়ে গ্লেসকিডের চকচকে পাম্পসু! হাতে হালকা ছড়ি। সিরাজ বসতে বললে, তেল চটচটে ময়লা আসন আর নিজের জেল্লাদায় বাহারি লুঙ্গিটার দিকে যথাক্রমে দৃষ্টি চালনা করে নিরস্ত হলেন মৌলভি সাহেব। বললেন, থাক-থাক। সময় নেই আমার। একটা কথা জানতে এলাম। তুই নাকি পিরের রওজায় লাঙল দিতে চাস? সত্যি নাকি কথাটা—এ্যাঁ। ছুঁচলো দাড়িটা টুসকি দিয়ে নাকের ডগার কাছে তুলে ছোঁক ছোঁক করে কয়েকটা ঘন নিঃশ্বাসে দরবারী আতরের খোসবাইটা উপভোগ করলেন মৌলভি সাহেব।

সিরাজ কিছু না ভেবেই বলল, তা দোব তো। দু-একদিনের মধ্যেই কাম শুরু করব ভাবছি। ইদিকে বাইনের সময় এসে গেল। বর্ষণ লাঁববে আজ কি কাল। বে-ফায়দা আর দেরি করে কী হবে? আজ কি কাল—

পিরের রওজায় হাল চবি তুই? চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠল মৌলভি সাহেবের। পুরু মাংসের খোঁজে ব্লেড দিয়ে চিরে-দেওয়া, মোটা ভুরুর তলায় চাপা-পড়া, পাতা-ঝরা চোখ দুটো। সোনা-বাঁধান দাঁতে দাঁত ঘষলেন মৌলভি সাহেব। বরফের টুকরো চটকানোর মতো আওয়াজ হল, 'এত বড় গোস্তাকি! উচ্ছন্নে যাবি—জাহান্নমেও ঠাঁই হবে না তোর—নিব্বংশ যাবি তুই সিরাজ! আল্লার গোস্যার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবি। বাঁ হাতটা শূন্যে প্রসারিত করে, সুদূর আকাশে আল্লার একটা আনুমানিক অধিনিবাসই বুঝি নির্দেশ করলেন মৌলভি নুর মহম্মদ। দরজার আড়ালে ছেলে কোলে নিয়ে ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল জয়নাব।

কিন্তু সিরাজ অবুঝের মতো সেই আদিম, অস্বস্তিকর প্রশ্নটাই তুলল আবার, তাহলে খাব কী সেটা বলে দাও। আল্লা কি খেতে দেবে আমাকে? আমার বৌকে? আমার বেটাকে? বহিনকে?

গলার সুর খাদে নামিয়ে দেন মৌলভি সাহেব। বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে সন্তান জ্ঞানে অনেক শূন্যগর্ভ উপদেশ দেন সিরাজকে।

দেবে, দেবে। দেবে বৈকি! সর্বশক্তিমান, বিশ্বনিয়ামক আল্লা। 'ওয়াহ্‌দাহু লা শরিকালাহু'—একমেবা-দ্বিতীয়ম তিনি। তাঁর কৃপা হলে কী না হয়! এই যে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে জমিজমা রয়েছে মৌলভি সাহেবের, ধনসম্পত্তি রয়েছে; অথচ সিরাজের নেই ছিটেফোঁটা—কেন? সবই আল্লাতালার দুর্বোধ্য লীলাখেলা—মেহেরবান, শোকর আল্লা।

তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আবার যাকে ইচ্ছা অবমানিত করেন। তিনি শুধু বলেন 'কুন' অর্থাৎ 'হোক'—অমনি তা হয়ে যায়। আর খাওয়ার কথা বলছিল সিরাজ? আহা—টায়ার থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার মতো ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মৌলভি সাহেব। বিবি মরিয়ম মানুষের অগম্য, রুদ্ধদ্বার সাতমহল হুজরার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন...জ্যাকেরিয়া যখনই সেখানে হাজির হন, তখনই দেখতে পান পানি আর খাবার। জ্যাকেরিয়া আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মরিয়ম, তুমি এসব পাও কোথা থেকে? মরিয়ম উত্তর দিলেন, আল্লার কাছ থেকে। পবিত্র কোরান-ই-শরিফে লেখা আছে এসব কথা। খাওয়া পরা নিয়েই অত মাথা ঘামায় কেন সিরাজ? ইহকালটাই কি সব? আল্লার ওপর ইমান থাকলে—ওয়াক থুঃ—শালা বেইমান হারামির বাচ্চা এঃ এঃ—কার বেইমানিকে যে গালাগালি দেন মৌলভি সাহেব—সিরাজের, না গলায় আটকে খাওয়া পোকাটার তা ঠিক বোঝা যায় না।

চোখ পিটপিট করে ওপর দিকে চাইলেন মৌলভি নুর মহম্মদ, তাহলে উঠি এখন। আমার কথাটা ভেবে দেখিস—তোর ভালোর জন্যেই—

বড়লোকের বাক্সের আঙুরের মতো মৌলভির নধর দেহটা উঠোন পেরিয়ে, চৌকাঠ ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়। দাওয়ায় ভেসে-আসা জরিনার জুরকাতর গোঙানি, আর জয়নাবের ভয়ার্ত ফোঁপানিটা একটা অমনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ঘনিয়ে তোলে সিরাজের মনে। ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সিরাজ। কাল রবিবার আছে। যা থাকে বরাতে—কাল থেকেই কবরের জমিতে গাস্তি করতে শুরু করবে। কেউ রুখতে পারবে না তাকে। বলে কি না, আল্লার ওপর বরাত করে উপোস করে থাকে। আহা, গুড় ঢেলে দিলে যেন গায়ে। গরীবরা শুকিয়ে মরলে তো সুবিধে হয় ওদেরই। গো-মোড়ক হলে ফূর্তি হবে না চামারের?

বাঁশঝোপের আড়ালে, পথের মোড়ে মৌলভি সাহেবের কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহটা আরেকবার দেখা যায়। শালার গদাই লস্করী হাঁটন দ্যাখো! বুড়ো গরিলা যাচ্ছে যেন একটা—বিড়বিড় করে ওঠে সিরাজ।

হঠাৎ। অপ্রত্যাশিত—অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

শনিবার সকাল-সকাল কল থেকে ফিরে ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই ছুটে এল জয়নাব, ওগো সব্বনাশ হয়েছে। ইয়াল্লা, কী হবে এখন?

কী হয়েছে কী?

আলি হোসেন মরে গেল এই খানিক আগে। গোরস্থান নিয়ে হেঙ্গামা উদিকে। ইদিকে কাফন কেনার পয়সা নেই। কাফন নেইলে তবে মাটি দেবে—হা আল্লা—

মৃত্যু! হৃদপিণ্ডটা ধড়াস করে উঠেই স্তব্ধ হয়েগেল। বর্ণগন্ধময় পৃথিবীর ধূলি কী মধুময়? হয়তো তাই। রাগরক্ত কিংশুকবিলসিত জীবনে মৃত্যু কি আসে মোহনরূপে? হয়তো আসে। কিন্তু গরীবদের কাছে মৃত্যুটা শ্যাম-সমান তো নয়ই, এমন কী দুঃখজনকও নয় আদৌ। মৃত্যু ওদের কাছে খোদার রহমান। মৃত্যু তো নয়, মুক্তি—জীবনব্যাপী, নিষ্ফল, শোষিত, মুখের রক্ত-ওঠা শ্রমের অবসান।

না, দুঃখ নয়—অনুপায়, উদ্ভ্রান্ত আতঙ্ক। মরে গেল? শালা বুড়ো মরবার আর সময় পেল না! এখন কবর দেবে তাকে কোথায়? গণ্ডগোলটা জট পাকাবার আগেই রহমৎ-চাচার কবরটা না হয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার? এবার উপায় কী হবে?

সেই অবস্থাতেই ছুটল সিরাজ। পাগলের মতো। মিনিট দুই লাগল পৌঁছুতে। কিন্তু সিরাজের মনে হল এই মুহূর্তের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও লাগেনি যেন ওর। আলিহোসেনের বাড়ির সামনে স্থানীয় মুসলমানদের ভয়-থমথম জটলাটার পিছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল সিরাজ। বোবা সংশয় আর নিথর আতঙ্কে অসাড় হয়ে গেছে যেন জটলাটা। আশ্চর্য ঘরের ভেতর থেকে আলিহোসেনের তিন তিনটে বিবির কারো গলার ক্ষীণতম আওয়াজ পর্যন্ত ভেসে আসছে না। ভেজানো দরজাটার ফাঁক দিয়ে শুধু দেখা যায়, মৃত দেহটার ওপর উপুড় হয়ে থাকা আলিহোসেনের নাতনি ফতিমার নিস্পন্দ দেহটার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। কিন্তু তাও নিঃশব্দে।

ফিরে এল রজ্জাক। না, আসতে পারলেন না মৌলভি সাহেব। অনুগত পেটের কলিকটা আউরে উঠেছে সময়মতো। তবে উপদেশ দিয়েছেন ওলা বিবিতলার ভাগাড়ে মুর্দা দাফন করতে। জানাজা-টানাজার কথা ভুলে যাও এখন। বারুদের মতো তেতে আছে হিন্দুরা। কবরখানার ছায়া মাড়ালে এখুনি দাঙ্গা লেগে যাবে। আর হ্যাঁ, কাফন কেনার জন্যে একটাকা চাঁদাও পাঠিয়েছেন মৌলভি সাহেব।

আর আসতে পারলেন না রাধিকারঞ্জন গড়াই। ত্রেতাযুগের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, রাধিকারঞ্জনের অভাবে নাকি বৃন্দাবন অন্ধকার হত। কিন্তু কলিযুগে দেখা গেল, রাধিকারঞ্জনবাবুর অভাবে রসভঙ্গ হল না আদৌ। তার দেওয়া আশ্চর্য ফর্সা আর কর-করে নোটগুলো কালীমার্কা বোতলের তরল পানীয়ে রূপান্তরিত হয়ে, তীব্র নেশায় বুঁদ করে রাখল হাজার হাত কালীর মন্দিরের চাতালে, অশ্বত্থ গাছের তলায় ডিফেন্স কমিটির সমবেত জটলাটাকে। ....লাগুক, লাগুক তবে দাঙ্গা। ক্ষুধিত শয়তান তার ধারালো নখদন্তে শান দিক। লালাঝরা রক্ত, বিষাক্ত জিভ দিয়ে চেটে দিক গোটা আকাশ। গলগলিয়ে রক্ত ঝরুক আকাশ থেকে। রাত্রি তমিস্রার মতো উষ্ণ রক্ত ফেনিয়ে উঠুক। হত্যার বীভৎস নেশায় আর লুণ্ঠনের দুর্বার লোলুপতায়, ধূ ধূ মরুভূমি সহস্র অশ্বক্ষুরের স্ফুলিঙ্গে ক্ষমাহীন ক্রোধে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক। সব ঝুটা হ্যায় দুনিয়ামে। লাগুক দাঙ্গা।...

সীতাপতি মন্দিরে ঢুকতেই হৈ-হৈ করে উঠল সকলে।

কে বাবা! নন্দী না ভৃঙ্গী? কী খপর বাপধন?

কী খবর! খবর কী ইয়ার?

খবর জোর। জোর খবর। শালারা ওখানে গোর দেবেই আজ আলিহোসেনের। সেই সন্ধ্যে থেকে সলা-পরামর্শ করছে ঘোঁট পাকিয়ে—

কী! কী! একসঙ্গে ছুরি-লাঠি শাবল-টাঙ্গি, সোডার বোতল আর এসিড বাল্বগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করল সকলে। ফুটন্ত কেটলির জলের মতো, টগবগে রক্ত মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওপর-নীচ করতে লাগল। লাফিয়ে উঠে, মেঝের ওপর পদাঘাত করল হরদয়াল। চিৎকার করে বলল, যদি মরদ হও তো এগিয়ে চল ভাইসব। ঘেরাও কর কবর। বল ভাই

জয় মা কালী—

জয় মা কালী করালী, বিকটদশনা, লোলরসনা, মা-মা-মা—। মন্দিরের ভেতর যোগাসন থেকে কমণ্ডলু হাতে উঠে এলেন পুরোহিত কালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য। কয়েক মুহূর্ত টকটকে লাল কাগজের ওপর ছিটকানো দু-ফোঁটা কালীর মতো চোখের তারা দুটোয় কেন্দ্রিত সীমাহীন বিভীষিকা সম্মোহিত করে রাখল আচ্ছন্ন জটলাটাকে। তারপর ভারি গলার আওয়াজটা আছড়ে পড়ল মন্দিরের পাঁজরে পাঁজরে, দাঁড়া, দাঁড়া তোরা। মা কালীর খাঁড়া-ধোওয়া জলের ছিটে নিয়ে যা! এদের শক্তি দাও মা শক্তিরূপিনী, শবাসনা, নৃমুণ্ডমালিনী—মা-মা-মা—

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য করে দিলে ওরা। বাঁধ-ভাঙা বন্যার জলের মতো হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছিল শ-দুই মানুষ। বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

মরা মানুষের মুখের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ঃ উঁচু বাঁধানো সড়কের মোড়ে একটা বাহিত মৃতদেহের পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে গোটা পঞ্চাশ ছায়া। নিঃশব্দে স্তব্ধ সঙ্গোপনতায়।

সারাদিন হৈ-হৈ করে শেষরাতে ঘরে ফিরল হরদয়াল। টকটকে চোখের পাতাদুটো ভারি হয়ে রয়েছে এখনও। একটা আড়ষ্ট আলস্যে কালিয়ে রয়েছে সমস্ত শরীর।

দরমার ঝাঁপটা একটু তুলে ঘরের ভেতরে পা দিল সিরাজ। ঘরের ভিতরে পা তো দিল না, একরাশ ইলেকট্রিকের তারের ওপর পা দিল যেন। নেশা ছুটে গেল মুহূর্তে—একি—একি চেহারা হয়েছে ঘরের! বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। পচ-ধরা খোড়ো চালের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। বৃষ্টি ঝাপটায় ক্ষয়ে যাওয়া গরান কাঠের অক্ষম অবলম্বন থেকে খসে পড়া চাবড়া-চাবড়া মাটির কাদায় প্যাচ-প্যাচ করছে চটা ওঠা সিমেন্টের মেঝেটা। ওপাশে জড়ো করা ভিজে ঘুঁটে, আধা-তৈরি কাগজের ঠোঙা আর চট কাঁথার ওপর একটা কুকুর শুয়ে রয়েছে মুখ গুঁজে। চল আনবার কথা ছিল হরদয়ালের। তাই বোধহয় কাঠ-কুটো জোগাড় করে উনুনে আঁচ দিয়ে, কালি-পড়া মেটে হাঁড়িটায় একটু জল চড়িয়েছিল সর্বাণী। আগুন নিভে গেছে। অসীম করুণায় বৃষ্টিধারার অকৃপণ প্রাচুর্যে হাঁড়িটা উপচে দিয়েছেন দীনদয়াল বিধাতা! সর্বনাশা বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে ঘরের এককোণে সপসপে ছেঁড়া চাটাইটার ওপর, কোলের ছেলে আর লক্ষ্মীর পটটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রয়েছে সর্বাণী। ঘুমিয়ে কী আর পড়েছে। খিদের জ্বালায় মুমূর্ষু হয়ে রয়েছে হয়তো। আর, আর পাষণ্ড ছেলেটা, ঘুমের মধ্যেও চকচক করে লেহন করছে সর্বাণীর শুকিয়ে যাওয়া স্তন দুটো।

মাথার মধ্যে একটা গরম অনুভূতি... গত বছর টাইফয়েডের সময় যেমন হয়েছিল... কী যেন চেপে বসছে মাথার মধ্যে... ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে যেন হরদয়ালের মাথায়... এই মুহূর্তে ফেটে পড়বে।

দুটো ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল জলভর্তি হাঁড়িটার ভেতর থেকে—জলকেলি করছিল বোধহয়। একটা অক্ষম আক্রোশ ধোঁয়া হয়ে উড়ছে মাথার মধ্যে। অস্বস্তিকর... গরম... জ্বালাধরা...

পাথরের মূর্তির মতো কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল হরদয়াল। ডানহাতের আঙুলগুলো অসাড়ে কেঁপে উঠল একবার। ইচ্ছা হল দুর্দমনীয় ইচ্ছা হল—বেশি কিছু নয়—শুধু সর্বাণীর লুটিয়ে-পড়া ভিজে চুলগুলো জলের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পারল না। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিলে এল।

তৈলহীন প্রদীপের শেষ-কম্পনের মতো শুকতারাটাকে ঝড় ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে, ছেঁড়া মেঘের আঁচল দিয়ে ঢেকে ভোরের চাঁদ তখনো অস্ত যায়নি।

ধার-পড়া কাস্তেটা দিয়ে পিরের রওজাটার আগাছা সাফ করছিল সিরাজ। পদশব্দে চমকে পেছন ফিরল, কে কে?

আমি। আমি হরদয়াল।

শেষরাতের আলো-আঁধারে গোরুর দড়িটা বাঁ-হাতে চেপে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হরদয়াল। সে কী গুমোট স্তব্ধতা! ঝড় আসার আগে থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছপালা। একটা পাতা পর্যন্ত নাড়ায় না।

তুমি.... তুমি দোস্ত এখানে.... এই বেয়ানে—। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল সিরাজ।

হাঁ আমি। এগিয়ে এসে সিরাজের একটা হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল হরদয়াল, গোরুটা নিয়ে এলাম সিরাজ। এই জমিতে চাষ করব—তুই আর আমি একসাথ—বীজ কেনার আদ্দেক দাম দেব আমি।

লাঙল দিবি তুই? আমার সাথ? সিরাজের মনে হল মাঠের আবছা ধোঁয়াতে অন্ধকার যেন গাঢ় হয়ে, ঘন হয়ে নেমে আসছে ওর অবিশ্বাসে বিকল আর চেতনাহীনতায় অসার মনের মধ্যে।

তারপর আচমকা গুমোট ভেঙে নিস্পন্দ গাছপালার ঝড়ে মেতে ওঠার মতো অনর্গল অনেক অনেক কথা বলে গেল হরদয়াল। ভাষাহীনতার রুক্ষ বালুচর ভাসিয়ে দিল কথার উন্মাদ বন্যা। এতদিন পরে বুক খুলে কথা বলার মতো মানুষ খুঁজে পেয়েছে যেন।

সিরাজের মনে হল কথা বলা যেন ওর কোনকালে শেষ হবে না।

আবেগে ঠোঁটের প্রান্তদুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল হরদয়ালের, আলবত দোব। কার বাপের কি তাতে শুনি? কার বাপের কি! আর হাঁ, এবার থেকে ওখানেই করব দিবি তোরা। আমার তিন পুরুষ মোড়লি করে আসছে এ-তল্লাটে। সব এককাট্টা করব—দেখি কোন্ শালা আটকায়! তোরা কি মরদ না ভেড়ুয়া? শ্যাল-কুকুরে খাবার জন্যে ভাগাড়ে দিয়ে এলি আলিহোসেনকে? আমার বৌ, আমার মা আলিহোসেনের কাছে থেকে লক্ষ্মী-চরিত্তির, মেয়েদের ব্রেতোকথা কিনে পূজো আচ্চা করেছে। ওর কাছে পেথম ভাগ কিনে বন্নপরিচয় হয়েছে আমাদের—আর ওকেই ভাগাড়ে দিয়ে এলি তোরা? তোরা কি পায়ের ফুটবল—হ্যাঁরা সিরাজ—যে লাথি মারবে আর অমনি পাকিস্থান-হিন্দুস্থানে গড়াগড়ি খাবি তোরা?

এতক্ষণ পরে ভালো কথা জোগাল সিরাজের মুখে, হক কথা, হক কথা বলেছিস হরদয়াল। তাই আমি ভাবছি, আল্লা আমাদের হরার ইকি হল! দেখা হলে কথা কয় না—মুখে ঘুইরে চলে যায়—তা এই বিত্তান্ত! একটু থেমে আচমকা প্রশ্ন করল সিরাজ, পিরের রওজা চইলে গুণা হবে না—কি বলিস হরা?

ক্ষেপে উঠল হরদয়াল, যা-যাঃ, কচু হবে। কিসসু হবে না। ধম্ম! শালা ধম্মের নিকুচি করেছে—ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে ধম্ম আমার? ধম্ম-ধম্ম করলে রুটি মিলবে, রুজি বাড়বে? শালার ধম্মও হল বড়লোকদের সুবিধের জন্যে বুঝলি। আমাদের মতো গরীব-গোরবার জন্যে নয় ওসব। শালা তামাম দেশটা বদলে দিতে পারলে তবে হয়। যা ভাঙতে শুরু করেছে—ধম্মের ঠেকান দিয়ে আর কদ্দিন তাকে রুখবে? শিববাবুরা গোড়ায় বলেছিল ঠিক—বুঝলি সিরাজ, কাচকল বাড়াবার ষড় এসব। ধম্মের জিগির তুলিয়ে

তাতিয়ে দেবে—দাঙ্গা লাগবে—আর সেই তালে কাজ উসুল হয়ে যাবে নিজের। শালা রাধুবাবু—

মুখের স্বাভাবিক রুক্ষতায় বুক-ওপচানো হাসির অভিব্যক্তিটা ধরা পড়ে না ঠিক। কিন্তু দু-চোখ দিয়ে হাসি ঝরে পড়ল সিরাজের। গোরুটায় পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, লাঙল দিয়ে আচ্ছা করে চষে ফেলে, আগুতে দু-একটা আবাদ করেনি—কি বলিস হরা? এই মুগ-মুসুর কি আখ-আলু তারপর জমিটা একটু সরেস হলে তখন বোশেখের গোড়ায়-গোড়ায় শুভদিন থেকে আউস রুয়ে দেওয়া যাবে। নসিবে থাকে তো জবর ফসল হবে। তারপর কথাই তো আছে—চাষ করে সগলে আর ধান ফলে কপালে—

রক্তরঙিন দিগন্তজুড়ে লাল সূর্য উঠছে। এক খাবলা মাটি তুলে সূর্যের তির্যক আলোয় হরদয়ালের মুখের সামনে প্রসারিত দু-হাত মেলে ধরল সিরাজ, দ্যাখ, দ্যাখ হরা—মাটি দ্যাখ মাইরি! শালা দলা-পাকানো মোলায়েম রূপশালির ভাত যেন একমুঠো। নইলে কি আর এত ঝুঁকেছি আমি! দুনো ফসল যদি না হয় তো কুত্তা পুষিস তুই আমার নাম। আরে বাবা, মাটি চিনতে কি আমার ভুল হয়—আমার চোদ্দপুরুষ হলগে চাষা! মাইরি এ মাটিতে চাষ করতে না পারলে জীবনই ব্রেথা। কি বলিস হরা এ্যাঁ?

উদ্বেল ব্যগ্রতায় সিরাজের দু-পায়ের নাড়ায় একরাশ কচুপাতার বুকে-জমা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো, গরীবের কান্নার মতো ঝরে পড়ল টপটপ করে।

প্রভাত হল। ময়ূরের পেখম তোলার মতো রঙচঙে ইন্দ্রজাল রচনা করে মাথা তুলল অহংকারী সূর্য। তেতালার ছাদ থেকে ঘুম-চোখে দূরবীন লাগিয়ে কবরখানাটার একটা মানসিক সার্ভে করছিলেন রাধিকারঞ্জনবাবু। হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেল তাঁর। তাড়াতাড়ি দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে যন্ত্র এবং চর্মচক্ষুর বিবাদভঞ্জন করলেন দি ইন্ডো ব্রিটিশ গ্লাস ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গড়াই। না, কোন ভুল নেই। সেই বিখ্যাত আমেরিকার তৈরি দূরবীনই এটা। আর এ-বিষয়েও কোন ভুল নেই যে লাঙল আর গোরু দুটোর আড়ালে পিরের কবরভূমির জঙ্গল সাফ করছে সিরাজ আর হরদয়াল।

বেলা আরো বাড়ল। একসময় আকাশে নির্মম অগ্নিগোলকটা এল মধ্য গগনে। আগুনের অজস্র ফুলকির মতো প্রখর রোদ্দুর ঝরাতে লাগল আদুড়-গা তল্লাটটার সর্বাঙ্গে। কোথা থেকে এসে গেছে কে জানে। কিন্তু খবরের কাগজের যে পাতাটায় লালাঝরা লোভ, ঘৃণিত মিথ্যা আর কুটিল ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল—সেই পাতাটাই তোলা উনুনটায় গুঁজে দিল জয়নাব। শেষ-সম্বল সবটুকু চালই হাঁড়িতে চাপিয়ে দিয়েছে জয়নাব। বলে গেছে সিরাজ, দুজনের মতো ভাত দিয়ে আসতে হবে মাঠে। মাঠে আজ সারা দিন কাজ করবে কিনা ওরা। কতবার বারণ করেছিল সিরাজ। কিন্তু কোন কথাই শোনেনি হরদয়াল। বলেছে, খেতে পায় না যারা তাদের আবার জাতিবিচার কি। পৃথিবীতে নাকি দুটো জাতই আছে। গরীব আর বড়লোক। কী যে সব খাপছাড়া কথাবার্তা হরদয়ালের। কাগজের পাতাটা উনুনে আরো ঠেলে গুঁজে দিল জয়নাব। একটু একটু করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল পাতার ওপর অন্ধ সাপের মতো কিলবিল করা অক্ষরগুলো।

রসুই ঘরে ভেঙে-যাওয়া টালিটার ফাঁক দিয়ে আসমানের এক টুকরো দেখা যায়। একঝাঁক চিল উড়ছে সেখানে। এক টুকরো আগুনে তাতা নীলচে কাগজের ওপর সারি সারি অস্পষ্ট ঋজু অক্ষরের মতো মনে হয় এখান থেকে।

মিথ্যা আর ষড়যন্ত্রের জীবকীট গর্ভে নিয়ে খবরের কাগজের পাতাটা তো ছাই হয়ে গেছে পুড়ে। কি কথা লেখা আছে ওখানে—ঐ আনীল আকাশ লিপিকায়? শোষণ আর

অসাম্য থেকে মুক্তি পাবার শেষ সংকল্পে, দুনিয়াজোড়া কোটি মানুষের রক্তাক্ত স্বাক্ষর কি জ্বল জ্বল করছে আকাশ ফলকে? কিংবা উৎকীর্ণ রয়েছে আগামী দিনের কথা—প্রসারিত জীবন আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাহিনী।

ওপরে ওই তো আকাশ। যেখানে দিগন্ত জুড়ে আজো ওঠে সূর্য, ওঠে আলো চিক-চিক তারা। আর পায়ের নীচে এত মাটি যেখানে এখনো মানুষের বুকে আছে দুর্মর আশা, অনির্বাণ প্রেম, মনুষ্যত্বের মহিমা। তবে কেন ককিয়ে কাঁদবে পৃথিবী। তবে কেন গড়া যাবে না সেই পৃথিবী যেখানে শোষণের শেষ, অসাম্যের অবসান—যে পৃথিবীতে খুশি-টলটল শিশু, যৌবন আর সুখি দম্পতি?

*নতুন সাহিত্য, ২বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১৯৫১*

## উল্টোরথ

'হেই মাস্টার! ইধর কুছ্ নেই হ্যায়। যো কুছ হ্যায় সব ক্যাম্পকা অন্দরমে। ইধর স্রিফ হুড়ুম-দুড়ুম গুড়ুম হ্যায়। হঠো ভিড় হঠাও। আ যাইয়ে মাস্টার—স্রিফ দো-আনা টিকিস। যাঃ দো-আনা টিকিস। লাও সস্তা কর দিয়া কোম্পানি। লাও দো-দো আনা—'

চোঙাটা নামিয়ে রাখল লোকটা। ফেল্টের টুপিটা চেয়ার থেকে, আলতোভাবে তুলে নিয়ে, কায়দামাফিক বাঁকিয়ে মাথায় লাগাল। কয়েক মুহূর্ত আওয়ারা-ঢঙে গোটান এখানে-ওখানে তাপ্পিমারা টেকনিকলার প্যান্টের পকেটে হস্তচালনা করল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। একটা সিগারেট বার করল। পর মুহূর্তে দুটো আঙুলের অভ্যস্ত টুসকিতে সেটা হাওয়ায় একটুখানি লাফিয়ে উঠেই তার দুটো উৎসুক পুরু ঠোঁটের চাপে ধরা দিল, 'আচ্ছা। তো আভি ম্যায় আপলোগোকো এক ম্যাজিক দেখ লাউঙ্গা।'

বলেই ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাল সিগারেটটা। তাঁবুতে ঢোকবার মুখ মাথার ওপর লালসালুতে বড় বড় হরফে লেখা, 'দি গ্রেট রয়্যাল সার্কাস'। দু-পাশে দুটো টেবিল। একটায় হরেক রঙের টিকিট সাজিয়ে আপাতত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে দুজন হাড়ডিগবিগে পশ্চিমাবুড়ো। অন্যটায় এক লাফে উঠে দাঁড়াল ম্যাজিসিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের ভাড়া করা ব্যান্ড-পার্টি নতুন গৎ ধরল, 'ম্যয় আওয়ারা হ'। ব্যান্ডের সঙ্গে অসমতলে ঘুঙুর-বাঁধা পা ঠুকতে ঠুকতে সস্তা হিন্দি ছবির নায়কের অঙ্গভঙ্গির নির্বোধ অনুকরণে নাচতে শুরু করল লোকটা। দুটো আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা চেপে ধরে ডবল মাত্রা গাঁজার কলকে-ফাটানো দুটো টান—ব্যাস, সিগারেটটা আধখানা হয়ে গেল। এইবার খেলা শুরু হবে। সিগারেট অর্ধদগ্ধ না হলে ম্যাজিকের পক্ষে অসুবিধে হয় কিনা।

খেলা শুরু হল। তাজ্জব খেলা। রুদ্ধশ্বাস, অপলক চোখ জটলাটার। যাদু জানে নাকি লোকটা। সিগারেটটা এ-কান দিয়ে ঢুকিয়ে বের করছে ও-কান দিয়ে। প্যান্টের বেল্টটা ঢিলে করে গলিয়ে দিচ্ছে, বেরুচ্ছে জুতোর তলা থেকে। একবার তো স্তব্ধ জটলাটার আতঙ্কিত চোখের সামনে, একটা লালাটানা গোছের শব্দ করে গপ করে গিলে ফেলল ঠোঁটে-চাপা সিগারেটটা। পেটটা দু-হাতে চেপে ধরে বসে পড়ল। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল বসন্তের দাগে-ভর্তি মুখটা। কী হল, কী হল। বেকায়দায় পড়ল নাকি ওস্তাদ?

পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ঘোড়ার মতো হলুদ, এবড়ো খেবড়ো দু-পাটি দাঁত বার করে, হাসতে হাসতে পেছন থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে ধরল জটলাটার

চোখের সামনে। বোকা বনে-যাওয়ার প্রত্যাশিত পরিণতিতে দম-ফাটা হাসি আর ছুঁড়ে মারা প্রশংসায় ফেটে পড়ল জটলাটা ঃ সাব্বাস ভেইয়া! ওয়াহ্ আ! ওয়াহ্ আ!

ততক্ষণে চোঙাটা তুলে নিয়েছে লোকটা। বিনা-পয়সায় ম্যাজিক-দেখার পরবর্তী মানসিক দুর্বলতাটুকুর সদ্ব্যবহার করে নিতে হবে মোহটুকু কেটে যাবার আগেই, 'লেকিন মাস্টার, ইধর কুছ, নেই হ্যায়। স্রিফ হুড়ুম-দুড়ুম আওর-গুড়ুম! আসলি খেল হ্যায় অন্দরমে। সার্কাস, জিমন্যাষ্টি আওর নাচগানা ভি হ্যায়। যা সস্তা হো গিয়া। লাও দো-আনা টিকিস! লাও দো-দো আনা—'

ইতিমধ্যে লোক জমে গেছে অনেক। কলাকৌশলগুলো কাজ দেয় বৈকি! রঙিন নেশায় চকচক করে লোকগুলোর চোখ। সুড়সুড় করে লাইন দিয়ে ঢোকে তাঁবুর মধ্যে...

উল্টোরথের মেলা বসেছে মাঠ জুড়ে। গত দু-বছর ধরে মেলার প্রধানতম আকর্ষণ এই ক্ষুদে সার্কাস-পার্টি। হরেক রকমের জিনিসপত্রে সাজানো ছোট ছোট হোগলার ছাউনি দেওয়া স্টলে মাঠ ভর্তি অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, রঙবেরঙরে পুতুল, সস্তা জামা-কাপড় আর জুতো, গাছের চারা, রকমারি পাখি, তেলেভাজা, মিঠাই, সোডা-লেমনেড, নাগরদোলা, লটারি—পঞ্চেন্দ্রিয়কে প্রলুব্ধ করতে না পারে এমন কী নেই এই মেলায়? গিজ গিজ করছে লোক। পিঁপড়েরা যেমন বিশেষ দিনে বেরিয়ে পড়ে পিল পিল করে, তেমনি ছোট ছোট জটলায় ভেঙে-পড়া অগুনতি ছেলেবুড়ো আর নারী-পুরুষ!

ওদিকে বড় রাস্তা দিয়ে সার বেঁধে রথ ফিরছে।

কিন্তু মেলার আর কোন জিনিসই 'দি গ্রেট রয়্যাল সার্কাস পার্টি'র মত এত বেশি জনাকর্ষণের দাবি করতে পারে না। এমন কি এই আদি উল্টোরথের মেলার অকৃত্রিম আকর্ষণ 'যমপুরী যাদুঘর'ও না। 'যমপুরী যাদুঘরে'র সব আকর্ষণ যেন লোপ পেয়েছে। তবু বিগতযৌবনা গণিকার নিরলস প্রতীক্ষায় টিকে আছে এখনও—এবছরেও। চোখ ধাঁধান বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল প্রাসাদেও যেমন উৎসবের দিনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য টিকে থাকে বেলোয়ারি ঝাড় লণ্ঠন। 'যমপুরী যাদুঘরে'র সামনে একটা বিভীষিকাময় মুখোশ-পরা, আলখাল্লা-ঢাকা ছোকরা টিনের তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। আর একজন ঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টেনে চলেছে কলে-চলা মেসিনের মতো আর চোঙা ফুঁকে চিৎকার করে চলেছে একটানা, 'ইয়ে খেলকা নাম হ্যায় যমপুরী যাদুঘর। ইসমে এক লেড়কা হ্যায় যিস্‌কা শির হাতিকা হ্যায়, এক হ্যায় যিসকা দো শির-এক সাঁপকা আওর এক গাদ্‌ধেকা। আওর এক লেড়কি ভি হ্যায়—হাঁ! ইয়ে লেড়কিকো—'

ময়লা টিকিটগুলো বাঁ-হাতের মুঠোয় চেপে, বত্রিশ বছরের পুরনো জারুলকাঠের বাক্সটার ওপর ভর দিয়ে 'দরবারি মালের' নেশায় ঢুলতে থাকে মালিক সীতাপতি মশাট। বিড়বিড় করে অভিশাপ দেয় মনে মনে ঃ ওই শালা ম্যাড্রাসের বাচ্চা—রামস্বামী চিদাম্বরম না কি—ওই হারামজাদা রয়্যাল সার্কাসের ম্যাজিসিয়ানটা সর্বনাশ করে ছাড়বে। ব্যবসাপত্তর ডকে তুলবে। আর ওই ব্যাটা বাউন্ডুলে জেঠু সর্দার—বাউন্ডুলে জেঠু সর্দার মাদারি খেলা দেখাচ্ছে। 'যমপুরী যাদুঘরে'র সামনেই তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে গোটাতিরিশ লোক। জেটুর নাটকের শেষ অঙ্ক চলছে। ক্লাইম্যাক্স-পর্ব। বাচ্চাটা নীল চাদরে-ঢাকা ছোট্ট বেতের বাক্সটার মধ্যে ঢুকে কর্পূরের মতো উবে গেছে। জেঠুর বক্তব্য ছেলেটা সামনের ওই ঝাঁকড়া বটগাছটিতে আছে। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর হাত থেকে তার একমাত্র ছেলের প্রাণ-বাঁচানোর দায়িত্ব এখন সমবেত জনতার। তাঁরা যদি অপদেবতার পূজার জন্যে কিছু কিছু দান করে—বলতে বলতে গলার শিরগুলো স্ফীততর

হয়। বাজপাখির মতো ক্ষুদে-ক্ষুদে চোখদুটো একটা অপ্রাকৃত উত্তেজনায় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় কোটর থেকে, 'হ্যায় কোই বাবু, হ্যায় কোই ধরামী, হ্যায় কোই বাচ্চেওয়ালা—দেও—নিকালো পয়সা—'

'ইয়ে খেলকা নাম হ্যায় যমপুরী যাদুঘর—' চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ছেলেটা।

অস্থির হয়ে ওঠে জেঠু। বৃত্তাকারে দাঁড়ান জনতা পাতলা হয়ে আসছে যত, আরো দ্রুত তালে মড়ার খুলিটা নিয়ে ঘুরছে জেঠু। জেঠু আরো একপর্দা চড়ায় তার গলা, 'থোড়াসে দেও।

যাস্তি নেহি মাংতা। মগর দিলসে দেও—'

ছেলেটা আরো জোরে চেঁচায়, 'ইসমে এক লেড়কা হ্যায়—'

'হাঁ। এ বাবু দিয়া। এক আনা! যাস্তি নেই দিয়া।'

'এক হ্যায় যিসকা দো শির—'

'কেয়া এ বাবু গরীব হো গিয়া? কেয়া হাম আমির বন গিয়া?'

'আওর এক লেড়কি ভি হ্যায়। হাঁ, এক লেড়কি ভি!'

মাটির দিকে চেয়ে পাগলের মতো ঘুরছিল জেঠু। বন্দি জানোয়ার যেমন আহত হলে খাঁচার ধারে ধারে ছোটে। ছেলেটার চেঁচানি অসহ্য হয়ে ওঠায়, হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠল সে, 'আরে ভায়ি, উয়ো গাদ্‌ধেকা মুহ্‌মে যরা গোবর ডাল দেও তো!' বলেই ক্রুদ্ধ মুখটা তুলল ঝট করে। তুলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। একি? এ যে অবিশ্বাস্য! একটা লোকও নেই? পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল জেঠু। সাড়াশব্দ নেই দেখে বাক্‌সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বিজ্জু—জেঠুর ছেলে। বেরিয়ে বাপের মুখের দিকে একবার চেয়েই বুঝে নিল ব্যাপারটা। এরকম হামেশা হচ্ছে আজকাল। লোকের পকেটে পয়সা নেই, দেবে কোত্থেকে? বাপের গা ঘেঁষে এল বিজ্জু। তার মনে হল কতকগুলো অশরীরী, অমানুষিক ছায়া যেন চারধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃত্তাকারে। বৃত্তটা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আর শ্বাসরোধ হয়ে আসছে তার। বিজ্জুকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরল জেঠু। সে এই দূষিত বৃত্ত থেকে পালাতে চায়? কিন্তু কোথায় পালাবে? 'ধ্বংস হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে!' জেঠু সর্দারের ওখান থেকে কেটে-পড়া লোকগুলোর দিকে কথা কটা ছুঁড়ে মারে জীবন মাইতি, 'তিন যুগে তিন কুণ্ড হইল পুরণ, দ্বাদশ কুণ্ড আছে কলির কারণ।' দ্বাদশ কুণ্ড! এই দ্বাদশ কুণ্ড থেকে পৃথিবীকে ত্রাণ করবার জন্যে হিমালয় পর্বতে বৃশ্চিক গ্রামে কল্কি অবতার আবির্ভূত হয়েছেন। কল্কি-অবতারের স্বপ্ন প্রদত্ত এই মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ। পিত্ত, অম্লশূল, বাতব্যথা, চর্মরোগ, অজীর্ণ, আমাশয়, সূতিকা, নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক অবসাদে যাঁরা জ্যান্তেমরা হয়ে রয়েছেন—এই কল্কি কবচ ধারণে তাঁরা নতুন জীবন লাভ করবেন। অনেক ধাপ্পাবাজ আপনাদের মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েছে—অনেক ঠকেছেন। কিন্তু এই কল্কি-কবচ একবার পরীক্ষা করে দেখেছেন? আমি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। কথায় বলে, না দেখলে নয়নে, বিশ্বাস না হয় গুরুবচনে। হাজার হাজার প্রমাণ রয়েছে আপনার সামনে। এই পোস্ট কার্ডগুলো শুধু পড়ে দেখবেন একবার—'

মুখস্ত কথাগুলো সামনে জমে-ওঠা জটলাটার মধ্যে উগরে দিয়ে কুকুরের মতো হাঁপায় জীবন মাইতি। গ্যাসলাইটটা জ্বালিয়ে দেয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পড়ন্ত সূর্যের ফিকে হলুদ রঙের শেষ আলোকচিহ্নটুকু মেঘের সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেছে অসহায় আর্তিতে। পশ্চিম দিগন্তে মেঘের ওপর মেঘ জমেছে। রঙের ওপর রঙ। মাঠব্যাপী

বিশৃঙ্খলা আর হাজার কণ্ঠের চিৎকার ছাপিয়ে দূর গঙ্গা থেকে ভেসে আসছে একটানা জাহাজের ভোঁ। এখনও রথ আসছে রাস্তা দিয়ে।

রুক্ষ মুখ, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, ঠেলে-ওঠা চোয়াল আর মেয়েদের মতো দুটো বেমানান আশ্চর্য-কোমল চোখ, সব মিলিয়ে গ্যাসের ফ্যাকাশে আলোয় জীবন মাইতির আকারহীন মুখটা ক্ষয়-ধরা পাথরের মতো দেখায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে জীবন মাইতি। এ তার গুরুর নির্দেশ।

'কিরে, বৌটা তো কোলেরটা হবার পর থেকে সূতিকায় ভুগছে। নোব নাকি একটা?'

'দূর-দূর। শালার সব বুজরুকি।'

আবার লেকচার শুরু করে জীবন মাইতি, 'আজ্ঞে আমার কোন দালাল নেই যে হুট করে এগিয়ে এসে আমার কবচের গুণোকিত্তন করবে। দালালের মুখে আমি পেচ্ছাপ করে দি। আপনাদের কিনতে হবে না। শুধু দামটা জেনে রাখুন ঃ বড় মাদুলি ১০ আনা। ছোট মাদুলি ৫ আনা। যদি এমন কেউ এখানে থাকেন যিনি কল্কি-কবচ ধারণ করে কোন উবগার পাননি, বলুন, এগিয়ে আসুন, তাঁকে এইখানে—এখুনি পয়সা ফেরত দোব—'

'পয়সা ফেরত? মাইরি? ফের ওড়াচ্ছ বাবা? আরো পালক গজাক হে, তারপর ওসব উড়িও, বুঝলে?' ভিড়ের মধ্যে থেকে ঢ্যাঙা ঘাড়টা এগিয়ে একটা ছোকরা মন্তব্য করে তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে যায়। মন্তব্যটা এক কড়া ঘন দুধে একফোঁটা লেবুর রসের মতো কাজ করে। ভিড় পাতলা হয়ে আসে। জীবন মাইতির ব্যঞ্জনাহীন চোখের সামনে।

ঘরে কোলের ছেলেটাকে এখন-যায় তখন-যায় অবস্থায় রেখে এসেছে জীবন মাইতি। ঘাড়ের কাছ থেকে পাক খেয়ে উঠে মাথায় একটা সন্দেহ ছোবল মারে হঠাৎ। এখনও আছে তো ছেলেটা? যত সব অলুক্ষণে চিন্তা! দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে ছেলেটা রক্ত-আমাশয়। ভুগে-ভুগে প্যাঁকাটির মতো সরু আর মোমের মতো সাদা হয়ে গেছে। অভাব-অনটনের সংসার—নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার ওপর এই আকাল। ডাক্তার দেখাতে পারেনি জীবন। ছেলের হাতে বেঁধে দিয়েছিল 'স্বপ্নপ্রদত্ত' কল্কি-কবচ। বৌ পারুলের সংশয়াকুল মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'ঘাবড়িও না। এতেই হবে। এতেই খোকা সেরে উঠবে। তারপর বড় হবে চাকরি-বাকরি করবে। ভগবান আছেন, বুঝলে?'

অবশ্য গোড়ার দিকে সে-সম্পর্কে সন্দেহাতীত ছিল পারুল। কিন্তু খোকা যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই তার ভক্তি আর বিশ্বাসে কোথায় যেন ফাটল ধরতে লাগল। অবশেষে একদিন ঝংকার দিয়ে উঠেছিল, 'কী ডাক্তারবদ্যি দেখাবে না, না? ছেলেটাকে বেঘোরে মেরে ফেলবে নাকি?'

জোর করে হেসেছিল জীবন, 'কী যে বল! কল্কি-কবচের কাছে ডাক্তারবদ্যি—হ্যাঃ!'

হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিল পারুল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, 'কল্কি-কবচ না গুষ্টির পিণ্ডি! ওসব ফক্কিকারিতে কিচ্ছু হবে না। তুমি ডাক্তার নেসো গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!' কিন্তু কথাটা বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সেদিন পারুল। মা হয়ে একি বলল সে? একি কুকথা বলল ঠাকুরদেবতার নামে? খোকার যদি সত্যি সত্যি কিছু হয়? সেদিন সারাটা রাত্তির তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে খোকার জীবন ভিক্ষা করেছিল পারুল। তারপর থেকে আর কোনদিন অন্তত মুখে, হিমালয় পর্বতে বৃশ্চিক গ্রামবাসী কল্কি অবতারের স্বপ্নপ্রদত্ত মাদুলির মহিমা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ সে করেনি।

গত হপ্তায় সাড়ে পাঁচ টাকার মতো মাদুলি বিক্রি হয়েছে। তার কমিশন বাবদ পাওনা দুটো টাকা নিয়ে আজ সকালে রাম ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল জীবন। রুগীর নাড়ি ধরেই

খেঁকিয়ে উঠেছিল রাম ডাক্তার, 'আর ঘণ্টাকতক বাদে একেবারে মড়া পোড়াবার জন্যে ডেকে আনলে হত না, অ্যাঁ?' ঘসঘস করে একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়ে ডিসপেনসারি থেকে সেটা তখুনি আনতে বলে গিয়েছিল ডাক্তার। ডাক্তার চলে যেতেই ওর হাতটা চেপে ধরেছিল পারুল, 'হ্যাঁগা, কী হবে গো?'

'কী আবার হবে। ডাক্তার অমন বলে। শালা কালামুখো। ডাক্তার বড় না ভগবান বড়? ওই মাদুলিতেই সারবে। আমি এই বলে যাচ্ছি খোকা মরতে পারে না। তাহলে আমি মাদুলি-বিক্রি ছেড়ে দোব। তাহলে সব মিথ্যে। ভগবান কি নেই বলতে চাও?'

ওষুধ আনার নাম করে সেই সকালে বেরিয়েছে জীবন, আর ঘরমুখো হয়নি।

ভেবেছিল ঃ গত সপ্তাহে রেশন আসেনি, না আসুক; এ সপ্তাহেও আসবে না, দরকার নেই—কিন্তু আজ ওষুধ কিনে তবে সে বাড়ি ফিরবে, কিন্তু কই, এত বড় মেলাতেও তো আশানুরূপ কিছু বিক্রি হল না!

আকাশ মেঘে মেঘে ঝুলে পড়েছে। তারারা ভয়ে মুখ লুকিয়েছে তার নীচে। ঝড় ঘনাবার নতুন সংকেত। মেলা এখন নিস্তেজ, প্রায় নিস্তব্ধ, উঠে যাচ্ছে দ্রুত। মাঠের ওপাশে গ্যাস লাইটগুলো ঘোরাঘুরি করছে। সেই হিন্দুস্থানি ছেলেটা শুধু এখনো কেঁদে যাচ্ছে একটানা ঃ সমস্ত মাঠটা আজকের জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে ইজারা নিয়েছেন এ-অঞ্চলের বিখ্যাত দাউদ শেঠ সাগরমল ধনরাজ। সারি সারি নির্দিষ্ট স্টল ছাড়াও গোটা মেলা জুড়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে যারা, যে অগুনতি মানুষ, তাদের দেয় টাকার অঙ্কটা অনির্দিষ্ট, সুতরাং তাদের কাছ থেকে জুলুম করে একটা মোটা মুনাফা মারেন শেঠজি। এর ওপর পাইক—সরকারের 'কালী মাইকি চাঁদা' তো আছেই। বিকেল বেলা, মেলা যখন জমজমাট, তখন সাগরমলের দুঁদে আদায়-সরকার বেস্পতি কুণ্ডু চারজন গুণ্ডাশ্রেণীর পাইক নিয়ে এসে হামলা শুরু করেছিল। রোকের মাথায় দাবি মেটাতে অক্ষম ওই ছেলেটার বাদামভাজার টুকরিটা লাথি মেরে উল্টে দিয়ে যায় একজন পাইক। কী আথালিপাথালি কান্না কাঁদছে ছেলেটা সেই থেকে। যেন তার পেটে লাথিটা মেরে গেছে সাগরমলের পাইক।

তাড়াতাড়ি সাইনবোর্ডটা তুলে নেয় জীবন মাইতি, স্যুটকেশের মধ্যে সারসরঞ্জাম পুরতে থাকে। ছেলেটার অবিশ্রাম কান্না মনটাকে বিষাক্ত করে তুলছে। গ্যাস-লাইটের আলোটা ধিক ধিক করে কাঁপছে।

কোঁড়ারবাগান বস্তির ঠিক মুখটাতেই কুঞ্জ বেনের দোকান। জীবন দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতে চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে, ক্ষুদে-ক্ষুদে চোখের মিটমিটে চাউনি একটা বিদ্রুপশীল বিস্ময়ের চিহ্নের মতো কপালের লম্বা খাঁজটা নাচিয়ে, কুঞ্জ বেনে বলল, 'এই যে, এলি বাবা? কল্কিকবচ আজকাল কাটছে কেমন বাজারে? তা তোর ছেলেটার ওতে কিছু হল না বাবা! বিনি চিকিচ্ছেয় মেরি ফেললি ছেলেটাকে। দেখগে, শ্মশানে ছেলেটার এতক্ষণে বোধহয় গোর হয়ে গেল—তোর কবচসুদ্দু। হরিে হে দীনবন্ধু!'

বস্তিতে আর ঢুকল না জীবন। কুঞ্জর দোকানে স্যুটকেশ আর সাইনবোর্ডটা রেখে বেরিয়ে এল।

তারপর প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেল একটা। বৃষ্টিও।

কথাটা শোনার পর থেকে অমনি প্রচণ্ড একটা খ্যাপা ঝড় তোলপাড় করছে দেহের ভিতরটা।

কিন্তু বৃষ্টি? কই সহানুভূতির একফোঁটা বৃষ্টিও তো হল না!

এদিক-সেদিক ঘুরে যখন আবার ফিরল জীবন, তখন রাত হয়েছে। বাস-ড্রাইভার গুরুচরণ মোড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। জীবনকে দেখে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল সে, 'কিরে জেবনা, ছেলেটা তো টেঁসে গেল!' জীবন চুপ করে রইল। একটা বিড়ি এগিয়ে দিল গুরুচরণ, 'নে ধরা। ওই পোস্টারটা পড়ছিলাম মাইরি। ওই যে ছাউনিটার নিচে ঃ আয় বাড়ে না, মজুরি বাড়ে না, চালের দাম বাড়ে কেন? সত্যিই তো, কেন বাড়ে? কথাগুলো যা লেখে না মাইরি, বুকে লেগে যায়।' অমন যে হাবাগোবা গুরুচরণ, বোকার মতো সবসময় যে অর্থহীনভাবে হ্যা-হ্যা করে হাসে, তার মুখটা পর্যন্ত থমথমে হয়ে উঠল কথার শেষের দিকটায়।

দূর থেকে অনেক মানুষের একটা সমবেত কোলাহল এসে আছড়ে পড়ে। অনেক দূরে রাস্তার ওপাশে, জোনাকির মতো ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা আলো। কোলাহলটা আসছে সেখান থেকেই।

'কী ব্যাপার র‍্যা ওদিকে? চ-দিকিন, দেখি।' গুরুচরণ জীবনের হাত ধরে টানে। আচ্ছন্নের মতো এগোয় জীবন।

রাস্তার ওপর দাঁড়াতে স্পষ্ট দেখা যায়। নিচে কাঁচা রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদার মধ্যে একটা বিশাল রথের চাকা বসে গেছে। সকলে মিলে টেনে তোলার চেষ্টা করছে রথটা 'ওতরপাড়ার রথ নাকি? এত দেরি হল যে এবার?' প্রশ্ন দুটোর উত্তর পাবার আশা তো করেনি গুরুচরণ, জীবন যে কোনরকম সাড়া দেবে এতো তার আশাতীত ছিল। কিন্তু আচমকা মট করে মাথাটা তুলেই জীবন অর্থহীন প্রশ্ন করল একটা, 'আজ উল্টোরথ, না?'

'হ্যাঁ। চ-না, একবার দড়িটা পশ্‌শো করে আসি।'

দুজন বড় রাস্তা থেকে নেমে এগিয়ে গেল রথটার সামনে। রথের দড়িটা ধরে প্রাণপনে টানছে জন দশেক মানুষ। কিন্তু রথ অনড়। লম্বা দড়িটার সামনের অংশটা মাটিতে পড়েছিল। প্রথমে গুরুচরণ সেটা স্পর্শ করে প্রণাম করল। জীবন দড়িটা মাটি থেকে তুলে নিল তারপর। কিন্তু দড়িটা ছুঁতেই—একি হল তার! জীবনের মনে হল, দড়ি তো নয়, একটা বিদ্যুৎ প্রবাহিত তার তুলে নিল যেন। বিদ্যুতের তীব্র শকটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছুটে গেল। হঠাৎ এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হল জীবনের। ইচ্ছা হল এতলোকের সঙ্গে হাতমিলিয়ে সেও একবার দড়িটায় টান দেয়। দেখে রথ নড়ে কি না নড়ে! অসুরের বল এল শরীরে। প্রাণপণ জোরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাররে জোয়ান'—'হেই জোর!' দশটা জোরালো গলার গুরুগর্জনে কেঁপে উঠল নৈশ আকাশ। আর, কি আশ্চর্য, রথের চাকাগুলো একরাশ কাদা ছিটিয়ে বোঁ করে এক পাক ঘুরে গেল! তাড়াতাড়ি জীবনের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল গুরুচরণ। সেও হাত দিল দড়িতে। 'আওর থোলা—' জীবন আবার হাঁকল।

'হেই জোর!'

এবার গর্ত থেকে উঠে এল চাকা। তারপর হুড়মুড় করে এগিয়ে চলল উঁচু রাস্তাটার দিকে। সে কী উৎসাহ জীবনের চোখেমুখে, যেন ফেটে পড়বে লোকটা। রথ টানতে টানতে শোকতাপ ভুলে গিয়ে এক ধমক দেয় জীবন গুরুচরণকে, 'এ্যাই ব্যাটা গুরো! ব্যাটা ফাঁকিবাজ নম্বর ওয়ান! টান শালা। আরো জোরে। আজ উল্টোরথ। হাওয়া আজ উল্টোদিকে। টান ব্যাট—টান—টান—' আকাশে চাঁদ উঠেছে। সড়কের একটা নতুন বাঁকে এসে গেছে রথটা। সেখানটা আলোয় আলো সেখান থেকে যতদূর চোখ যায়, শুধু রুপোলি আলোর আলপনা।

*নতুন সাহিত্য, ৪বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৯৫৩*

# যাদুসূর্য

কতজনকে নিয়েই যে আমার গল্প লিখতে ইচ্ছে করে! কলম-কাগজে ছোঁয়াছুয়ি হলেই আমার এমনি হয়। একরাশ মৌমাছি তমনি চাক ছেড়ে পাখা মেলে দেয় মনের মধ্যে। ইচ্ছে হয় সবাইকে নিয়েই একটা করে গল্প লিখি। মা, বাবা, আমার বিধবা দিদি, কাশীদা, সুধীর, মনুদি, পদ্মবৌদি, অঞ্জলিদি... সবাই। কী যে ভাল লাগে আমার চেনা মানুষের ছবি আঁকতে আর রসাপ্লুত হতে! লিখেছিও এদের দু-চার জনকে নিয়ে। যেন তেন প্রকারে এদের কাছে পৌঁছেও দিয়েছি লেখা। মনে আছে এই সেদিন গল্প পড়ে কাশীদা আমার কান মলে দিয়েছিল। কিন্তু আজ লিখতে বসে হঠাৎ এবং এই প্রথম মনে পড়ে গেল নির্মলের কথা। আরে! নির্মলকে নিয়ে গল্প লেখার কথা তো আমার, কই কোনোদিনই মনে পড়েনি। অথচ এই সেদিনও দেখা হয়েছে!

নির্মলের বয়স তখন বার-তের। আমি ওর চেয়ে দুদিনের ছোট ছিলাম। তখন থেকেই নির্মল ম্যাজিক দেখাত। মাসিক, দৈনিকের কিশোর বিভাগে পি. সি. সরকারের প্রবন্ধ পড়ে শিখেছিল। নিজেও বানিয়েছিল অনেক। আমি ছিলাম ওর এ্যাসিস্ট্যান্ট। তখনই রীতিমত 'কল' আসত আমাদের। প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে নির্মল হানা দিত আমাদের বাড়িতে। কেতাদুরস্ত ব্যস্ত সুরে বলত, 'চটপট তৈরি হয়েনে। তিন মিনিট। কলে বেরুতে হবে। এক্ষুনি।'

বাড়িতে কাচা পাৎলুন-পাঞ্জাবি, মাথায় গান্ধি টুপি, গলায় আঁট করে বাঁধা সিল্কের রুমাল, হাতে রঙচঙে ফুলপাতা আঁকা ছোট্ট একটা টিনের স্যুটকেশ—এই ছিল ওর 'কলে' বেরনোর ড্রেস। চাল চলন, ঠাটঠমনটি ছিল পাক্কা ম্যাজিসিয়ানের। সখ করে আবার নাম নিয়েছে যাদুসূর্য নির্মলকুমার। রাস্তায় বেরিয়ে নির্মল বলত, 'লেকচার টেকচারগুলো ঠিকমত তৈরি করে নিয়েছিস তো? না আবার ডায়াসে উঠে ঘাবড়ে যাবি সেদিনের মতো?'

'কল' মানে কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়। হয়ত ওর দিদির শ্বশুর বাড়ির রান্নাঘরে, নয়ত কোনও বন্ধুর বাড়ির সদরে, কিংবা কুঞ্জ চক্রবর্তীর উঠোনে। দর্শকরা বেশিরভাগই গেরস্থ বাড়ির বৌ-ঝি কিংবা কুঁচোকাঁচা। লোক জমত খুব জোর দশ-পনের জন। কিন্তু এরই জন্যে কি প্রাণান্তকর পাবলিসিটিই না করতে হত আমাদের। রাত দুপুরে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের ডাক শুনতে পেলেই খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম আমি। নির্মল গা ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করত, 'লিখেছিস?'

আলতা আর ভূষোকালিতে লেখা একতাড়া খবরের কাগজের পোষ্টার আর আটার বালতি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম দুজনে। পরদিন সকালে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পেত আজ অমুকের বাড়িতে অদ্ভুত যাদুবিদ্যা 'প্রদর্শন করবেন যাদুসূর্য নির্মলকুমার। উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আমি হাসিমুখে এই সমস্ত কষ্ট স্বীকার করতাম। কারণ নির্মলকে জড়িয়ে থাকত এমন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিভার রহস্য, যা আমার সেই ছেলেমানুষ মনকে সম্মোহিত করে রাখত সবসময়। আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে নির্মল একদিন জগতের বিখ্যাত, বিখ্যাততম ম্যাজিসিয়ান হবেই। আমার এহেন ধারণার প্রকাশ ঘটলে নির্মল সবিনয়ে তা সবসময়েই স্বীকার করত এবং আশ্বাস দিত যে সৌভাগ্যের সেই সোনার দিনেও আমার সহকারির পদ

যথারীতি বহাল থাকবে। এর বেশি কিছু আশা আমার সুদূরতম স্বপ্নেও তখন ছিল না।

ডায়াস মানে তক্তপোষ বা জলচৌকি। শাড়ি চাদর টাঙিয়ে কিছুটা পর্দানশীন করার চেষ্টা হত ডায়াসকে। তাও ঘণ্টাখানেক আগে গিয়ে তৈরি করে নিতে হত আমাদেরই। পারিশ্রমিক? ঘোড়ার ডিম। তবে হ্যাঁ, মাসিমা-পিসিমা-বৌদিরা রুটি-তরকারি আর চা খাইয়ে দিতেন আচ্ছাসে পেট ঢাক হয়ে যেত আমাদের।

আমি ছিলাম ওর এ্যাসিস্ট্যান্ট। স্টেজে উঠে ওকে 'স্যর' বলতে হত আমায়। নাম ভূমিকা ছিল ওরই। আমার কাজ ছিল কিছু বকুনি ঝেড়ে তার ভূমিকা তৈরি করা। ম্যাজিকের মধ্যে মধ্যে 'ইণ্টারল্যুড' লেকচারও ছিল। অর্থাৎ কথার কুয়াশা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দর্শকদের দৃষ্টিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রাখা, এই আর কি! হরেকরকম ম্যাজিক দেখাত নির্মল। তাসের খেলা, রুমালের খেলা, অঙ্কের খেলা, বাটির খেলা, জামার হাতের ভেতর থেকে হরদম টিনের চাকতি ফেলা—আরো কত কী! এছাড়া জন্তুজানোয়ারদের স্বর নকল করতেও ও ছিল ওস্তাদ। যেমন ব্যাঙের ডাক, শেয়ালের ডাক, গাধার ডাক, কুকুরের ডাক ইত্যাদি। কুকুরের ডাকের আবার রকমফের আছে। ঘিয়ে-ভাজা, তেলে-ভাজা আর খোলায়-ভাজা এই তিনরকম কুকুরের তিন রকম ডাক!

মধ্যে-মধ্যে এমন উজবুকের মতো ভুল করত নির্মল যে গেরস্থ বৌদের আনাড়ি চোখেও তা ধরা পড়ত। অনেকে ছেলে মানুষ ভেবে ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করত। উচ্চবাচ্য করত না। কিন্তু অনেক জায়গায় অপদস্থও হতে হত বৈকি!

একবার হেসে উঠেছিল সবাই। পদ্মবৌদি সে ম্যাজিকটা দেখতে পারেনি। বাটনা-বাটা শেষ করে, লঙ্কাজ্বলা হাতে ফুঁ দিতে দিতে সবে বৈঠকখানায় ঢুকেছে, পদ্মবৌদি ঢুকেই দেখে নির্মল ষ্টেজের ওপর কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে আর সবাই হেসে লুটোপুটি। আমি তখন সটকে পড়েছি স্টেজের পেছনে, নির্মলের শ্রাদ্ধ করছি আর দর দর করে ঘামছি।

পদ্মবৌদি মুহূর্তে বুঝে নিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তারপরেই এক ধমকে হাসি থামিয়ে দিয়েছিলেন সবার, 'একি হাসছো কেন সবাই। এই লাবি—চুপ! অসভ্য, বেহায়া মেয়ে কোথাকার। ওকি, মাসিমা হাসছেন কেন? এইটুকু টুকু ছেলে—এরা এ যে পারছে; এই তো যথেষ্ট। হাসির কী আছে এত—এ্যাঁ?' সবাই চুপ। এক মুহূর্ত। তারপর পদ্মবৌদি বললেন, 'নেরে নির্মল, ম্যাজিক দেখা। সেই বাটির খেলাটি দেখা না, দেখি। তোদের আজ হালুয়া আর লুচি খাওয়াব, নে শুরু কর।'

বাটির খেলা দেখাতে গিয়ে ন-পিসিমার বাড়িতে সর্বনাশ হয়েছিল একবার।

ছোট্ট ঘর। ঘরভর্তি লোক। জলচৌকির ডায়াস। ঘেরাটোপ দেওয়া। ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত টাঙানো পেটো দড়িতে ঝুলছে দুটো হ্যারিকেন। আর অস্পষ্ট আলোয় নির্বাক নিস্পন্দ দর্শকদের সেই অতি পরিচিত কী-হয় কী-হয় মুখগুলো। আবহাওয়াটা বেশ থমথমে। কারণ এবার শুরু হবে যাদুসূর্য নির্মলকুমারের শ্রেষ্ঠ খেলা। অর্থাৎ বাটির খেলা।

ডায়াসের ওপর পাতা একটা ভাঙা চেয়ারে রাখা হয়েছে এক বাটি দুধ। দুধ আর কোথা পাব, খড়িমাটি গোলা জল। খড়িমাটি বা এই ধরনের আরো অনেক আলতু ফালতু জিনিস আমার গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে কিনতে হত। তা তো হবেই। সেজন্যে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ আমি যে সহকারি। অ্যাপ্রেন্টিস।

কিন্তু দুঃখের কারণ ঘটে ছিল পরে। শুধু দুঃখের নয়—ক্রোধের, ক্ষোভের, আত্মগ্লানির। এবং সেইসঙ্গে গর্বের, আনন্দের আর রোমাঞ্চের।

নির্মল যথারীতি বাটিটায় দুধের অস্তিত্ব সম্পর্কে দর্শকদের নিঃসংশয় করিয়ে নিয়ে, সেটার উপর একটা রেকাবি চাপা দিয়ে চেয়ারের ওপর রাখল। আমি দাঁড়িয়ে আছি

চেয়ারটার হাতল ধরে। নির্মল চেয়ারটাকে যথাসম্ভব আড়াল করে সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। ও আবার নিজে বলতে পারত না। আমি লিখে দিতাম। ও মুখস্থ করে আসত। এবং নির্ভুল অভিনয়ে প্রয়োগ করত কথাগুলো।

খুব টেম্পো তুলছে নির্মল, 'দেখলেন তো আপনারা বাটিটা! কেমন দুধভর্তি, এ্যাঁ? আচ্ছা, এইবার আমি আমার শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাব আপনাদের।'...

শ্রেষ্ঠ খেলা না ঘোড়ার ডিম, কিসসু না। স্রেফ গুলপট্টি। নির্মল যখন চেয়ারটাকে আড়াল করে বক্তৃতা দেবে, সেই ফাঁকে দুধটা চট করে ফেলে দিয়ে আমি করব কি, বাটিটা রেকাবি ঢাকা অবস্থায় যথাস্থানে রেখে দেব। তারপর নির্মল রেকাবি ঢাকা দুধের বাটিটা একটা ছোট ছেলেকে খেতে দেবে। এবং তারপরেই—

হাসি। হুল্লোড়। আর হাততালি।

কিন্তু সেদিন, ন-পিসিমার বাড়িতে খেলা দেখাতে গিয়ে এক বিপর্যয় কাণ্ড হয়েছিল। সুযোগ বুঝে 'দুধটা' জানালার বাইরে ফেলে দিতে গিয়েই আঁৎকে উঠেছিলাম আমি। বুকের রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল আমার।

একি! বাইরে কোথায়? জানালার বাইরে তো আর একখানা ঘর। আর মেঝের ওপর পর পর ঘুমে আচ্ছন্ন সাত আটটি শিশু। ফেললে ওদের গায়ে পড়বে। শীতকাল, কষ্ট হবে ওদের। তাতে আমার ভারি বয়ে গেল, কিন্তু ট্যা-ট্যা করে চেঁচিয়ে উঠবে যে সবকটা। ন-পিসিমা যে ছুটে যাবেন তাহলে পাশের ঘরে। তাহলে যেসব ফাঁস হয়ে যাবে!

এদিকে ডায়াসের পিছনে যে ফেলব, সে উপায়ও নেই। ছোট্ট ঘর। এক বাটি পাথুরে চুন-গোলা জল ডায়াসের পেছনে আটকে-রাখা সাধ্যাতীত।

কী করা যায়। কী করে মুখ রক্ষা হয়। ওদিকে নির্মলের মুখস্থ বক্তৃতা শেষ। আবোল-তাবোল বকে চলেছে ও। ওর পায়ের সঙ্গে বাঁধা সুতো টানতে যত দেরি হচ্ছে আমার, ততই অস্থির আর অধৈর্য হয়ে উঠছে ও, বেশ বুঝতে পারছি। কারণ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে সুতোর টান পড়লে তবেই তো ও বুঝবে কার্যসিদ্ধি, এবং তখনই তো নিঃসংশয় হয়ে ও শূন্য বাটিটা তুলে নেবে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সেদিন বড্ড দেরি হয়েছিল আমার। মিনিট দুই সময় লেগেছিল। অবশেষে হ্যাঁ, সুতোর টান দিয়েছিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে রেকাবি—ঢাকা বাটিটা তুলে নিয়ে ডায়াসের ওপর জুতো মসমস পায়চারি করতে করতে নির্মল শুরু করল এইবার তার শ্রেষ্ঠ ম্যাজিক, এই খেলাটি অমুক জায়গায় দেখান হয়। অমুক জায়গায় অমুক খেলাটি দেখে বলেছিলেন ইত্যাদি।...

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নির্মল, 'একি, খুড়িমা, নাতনিকে খাইয়ে আনেননি? এহেন, দুধের বাচ্চা, এত রাত অবধি—এ্যাঁ? ছি-ছি-ছি, কী কাণ্ড আপনার বলুন তো?'

খুড়িমা অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'ওমা তা হবে। হ্যাঁগা, অ বউমা। বলিহারি আক্কেল বাছা তোমার—'

বধু ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুট স্বরে কী বলল বোঝা গেল না। নির্মল বাটি হাতে ডায়াস থেকে নেমে গেল তরতর করে। বিরক্ত মুখে বলল, 'নিন, আমার এই দুধটুকুই খাইয়ে দিন। আমার ম্যাজিক দেখানোর ওকম্ম আজ হয়ে গেল। যাকগে যাক! না হয় না হবে আমার ম্যাজিক দেখানো। কিন্তু ছোট ছেলেপুলে অভুক্ত থাকবে—না না, এ আমি পারব না। কই, হাঁ কর তো খুকি?'

খুকি হাঁ করল। কিন্তু হা হতোস্মি! দুধ কই? বাটি থেকে উবে গেছে কর্পূরের মতো।

কয়েক মুহূর্ত। তারপর আসল ব্যাপারটা বুঝে ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই হো হো

করে হেসে উঠল। এই সময়টা নির্মল হাসির কারণ কিছু না বুঝতে পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে, এই হচ্ছে নিয়ম। তাহলে দর্শকদের হাসির বেগ আরো বাড়বে। কিন্তু আজ নির্মলও হেসে উঠল হো হো করে। আজ যাদুসূর্য নির্মলকুমারের কৃতিত্বের সে যেন নিজেই একজন সাধারণ দর্শকমাত্র।

এদিকে ডায়াসের পেছনে আমি তখন দু-হাতে নিজের গলা টিপে বসেছি বমির বেগ রোধ করার জন্যে। উপায়ান্তর না দেখে খড়িমাটি গোলা আঠা আঠা একবাটি জল আমাকেই উদরস্থ করতে হয়েছিল সেদিন।

বাইরে বেরিয়ে এসে পর পর কয়েকটা প্রসন্ন ঢেঁকুর তুলে নির্মল বলল, 'বেড়ে খাইয়েছে মাইরি। তুই কিছু খেলি না কেনরে?'

উত্তর দিইনি। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল আমার।

অনেকক্ষণ গুম হয়েছিলাম। তারপর একসময় বললাম সবকথা। বেশ রাগত ভাবেই বললাম। শুনে কোথায় সমবেদনা জানাবে, তা না, ওর স্বভাবসিদ্ধ দরাজ গলায় হো হো করে হেসে উঠল নির্মল। বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বলিস কিরে? বল মাইরি? তোর জন্যেই তাহলে সাকসেসফুল হল আজ ম্যাজিকটা। মাইরি পল্টু, তোকে নিয়ে যে কী করব আমি—'

কী করব ঠিক করতে না পেরে সেদিন সশব্দে আমার গালে একটু চুমু খেয়েছিল নির্মল।

*শারদীয় আগামী, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৪*

# গ্র ন্থ প রি চি তি

১.

বাংলা ভাষায় লেখালিখির জগতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৯৩৩) নিজেকে বলেন 'না-লেখক'। এই মহাসন্দর্ভহীন সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে থাকেন, আজকের লেখকের মাথায় কোনও জ্যোতির্বলয় নেই, অথচ 'বাজার-শাসিত' এই সময়ে সেই জ্যোতির্বলয়ের রিমেক চালু হয়ে যায়, লেখা লিখে ওঠবার আগেই লেখকের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক চুক্তি সাক্ষরিত হয় প্রকাশকের। আর আমরা দেখতে থাকি সন্দীপনের মুখ-কাচুমাচু একটি লাইন, আমি ও আমার লেখা একই। যাঁরা আমার লেখাকে ভালবাসেন, তাঁরা আমাকেও একটু ভালবাসুন।[১] এই মিডিয়া-আগ্রাসনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সত্যিই তাঁকে ভালবাসা দেয় এমন কোনও নিঃশর্ত হাত এগিয়ে আসে না। সবদিক ভেবে, খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, তাবৎ সুবিধা ভোগের বাহ্য বন্দোবস্তের আড়ালে সত্যিই তিনি একজন নিঃসঙ্গ লেখক। এবং টানা পঞ্চাশ বছর লেখালিখির পরও সত্যিই তাঁর সে অর্থে কোনও প্রকাশক নেই।

সন্দীপনের লেখালিখির যে পরিচিতি, 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' অথবা 'বিজনের রক্ত মাংস' নামের সেইসব বিখ্যাত গল্পগুলির আগে আরও একটি এক-দশকীয় গল্পরচনার পর্ব আছে। তখন তিনি রাজনীতি করতেন এবং সেই বামপন্থী-রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকেই মূলত লেখালিখি করতেন।

১৯৫০ সালে হাওড়ায় বসবাসের সময় সি পি আই পার্টিতে যোগ দেন। বনবিহারী চক্রবর্তী নেতা, সন্দীপন স্কুলের ছাত্র। '৫২ সালের নির্বাচনে জ্যোতি বসুর হয়ে বরানগরে কাজ করেছিলেন। তখন কলেজে। প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজ, তারপর প্রেসিডেন্সি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রাজনীতিটা ছেড়ে দেন। কিন্তু এই কয়েক বছরেই বেশ কয়েকটা গল্প লিখেছেন, যেগুলোর সবকটা পাওয়া যায় না। নানা কারণে বিস্মৃত সেগুলো। এই প্রথম সেই পর্বের গল্পগুলোকে যথা সম্ভব চিহ্নিত করে, যতগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোকে আলাদাভাবে একটি পর্বে বিন্যাস্ত করে ছাপা হল। হয়তো পরবর্তীকালে এই পর্বের আরও কিছু গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে। সেইসব একত্রিত করে নিশ্চয় রাজনৈতিক পর্বের একটা আলাদা পাঠ-মূল্যায়ণ করা সম্ভব হবে ভবিষ্যতে। হয়তো পরের পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাবে আগের পর্বের সন্দীপনকে। এবং নিশ্চিতভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই দুই পর্বের যাতায়াত সেতুটিকে। তবে তার আগে চিহ্নিত করা যাক সন্দীপনের সেইসব হারিয়ে যাওয়া, খানিকটা সন্দীপন কর্তৃক হারিয়ে যেতে সুযোগ করে দেওয়া এবং এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করতে ঘোর অনিচ্ছুক গল্পগুলির তালিকা—

১) এক টুকরো পৃথিবী (নতুন সাহিত্য, ২ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৯৫১)

২) উল্টোরথ (নতুন সাহিত্য, '৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৯৫৩)

৩) রাবণের সিঁড়ি (নতুন সাহিত্য)

৪) যাদুসূর্য (আগামী, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৪)

৫) সূর্যমুখী ফুল ও বিকেলের আলো (একতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক)

৬) অগ্নিকোণ (রবিবারের স্বাধীনতা)

৭) অঞ্জলিদি (রবিবারের স্বাধীনতা)

৮) জ্ঞানদাকে যেমন দেখেছি (রবিবারের স্বাধীনতা)

২.

**ক্রীতদাস ক্রীতদাসী**। রচনাকাল ১৯৬০। প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ১৯৬১। প্রকাশক—অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ—'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুহৃদপ্রতিমেষু'। সূচনাপত্রে ছিল: 'গ্রন্থে সঙ্কলিত গল্পগুলির নায়ক বিজন/ বিজন নামে একজন সাম্প্রতিক যুবকের চরিত্র/ভিন্ন ভিন্ন গল্পে উপস্থিত করেছি/ 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পের কবিতাটি/জীবনানন্দ দাশের বোরিস পাস্তেরনাকের/দুটি পঙ্‌ক্তি 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে/নমস্কার'।

দ্বিতীয় প্রকাশ-মে ১৯৭১। প্রকাশক—ভবানী মল্লিক ও দীপিকা রাউত, কলামন্দির, ২৮/১ বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ—রঘুনাথ গোস্বামী। উৎসর্গ—উল্লেখ নেই কিন্তু সাদা পাতার মাঝখানে লেখা আছে "....the life is but a perenial seesaw' autobiography : michel de montaigne.' বইতে ব্যবহৃত ছবি-প্রকাশ কর্মকার। মূল্য-৪ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৫। সূচনাপত্রে লেখা:

'আর মনে পড়ে জন্মক্ষণের সেই শৃঙ্খলিত করজোড়.....

সত্যি আমরা যারা সাধারণ মানুষ এ-ছাড়া কোন্ স্মৃতি আমাদের আছে? আমরা যারা আরও বেশি মাইনে চাই না চাইলে পাওয়া যাবে না ব'লে যারা সুবাতাস ও সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা যারা এইভাবেই বেঁচে থাকতে চাই যতদিন বেঁচে থাকা চলে যারা জানি আমরা ভিটামিনের অভাবে মারা যাব না মারা যাব অতর্কিতে আততায়ী-মৃত্যুর হাতে একদিন সুস্থ শরীরে ঘুম থেকে উঠে আয়নায় দেখব ঠোঁটের কোণে একবিন্দু শ্বেতি যা মৃত্যু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে আমাদের শরীরময় সমস্ত জীবনে....

আমরা যাদের গ্রন্থপ্রীতি নেই যারা গান শুনতে চাইনা জ্যোৎস্না কি বসন্তবাতাসে বসতে চাইনা বাইরে যারা ঘরে থাকতে চাই আমাদের যাদের জ্ঞান নেই জ্ঞান নেই বলে প্রেম নেই বন্ধুতা নেই শ্রদ্ধাভক্তিবিশ্বাস কিছু নেই,

কাফে খালি হয়ে গেলে আমাদের যাদের মাথাও খালি হয়ে যায়
যারা মৃত্যু ছাড়া কোনওকিছুকেই অধীশ্বর বলে মানি না
যারা মৃত্যু ছাড়া কোনওকিছুকেই অধীশ্বর বলে মানি না
যারা মৃত্যুর ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী

আমরা যারা তবু বেঁচে থাকতে চাই আমরা নরনারী যারা পরস্পরকে যৌনপ্রহার করে বেঁচে থাকতে চাই তবু আমাদের অতীত নেই ভবিষ্যৎ মৃত্যু আমাদের বর্তমানের আজ পর্যন্ত কোনও ব্যাখ্যা হয়নি।

নিশ্চয় বা সুপরিষ্কার কোন ব্যাখ্যা

আমাদের কেবলি মনে পড়ে শৈশবের সেই স্বাধীনতাদিবস যখন পতাকা উত্তোলন হ'ত যখন পরাধীন আমরা সেই উড্ডীয়মান পতাকাকে দেখতুম শীতে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলিত করজোড়ে....'

তৃতীয় প্রকাশ —বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক—বীজেশ সাহা, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মন্ডল রোড, কলকাতা-২। প্রচ্ছেদ—সুব্রত চৌধুরী এবং শেষ মলাটে ছাপা লেখকের ছবি তুলেছেন-অমিত ধর। উৎসর্গ—'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুহৃদপ্রতিমেষু'। মূল্য-৫০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন অংশ দুটি পুনর্মুদ্রিত। শেষ মলাটে লেখা—'অন্য লেখকরা যদি সাধারণভাবে জীবনানুগত হন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তবে, মৃত্যু অনুগামী।' 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' থেকে

'স্বর্গের নির্জন উপকূলে' পর্যন্ত যেন এক সম্প্রসারিত এপিটাফ। বাঙ্ময় সমাধিলিপি যেন একেকটি। এই রচনার শরীরে প্রথম স্তরের বাস্তবতা, অন্তরালবর্তী প্রপাতধ্বনিময় সম্ভ্রম, অনুপুঙ্খের প্রতি নিবিড় মনোযোগ আমাদের বিস্মিত করে.... সন্দীপন এখানে যুগপৎ আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, ঘাতক ও শহীদ, হিংস্র ও বেপরোয়া, বিচারক ও দন্ডিত। বর্ণমালায় তত্ত্বাবধানে এ কী বিরাট অগ্নিশিল্পের আয়োজন....' সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৯৬১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলেন: 'আজ থেকে ৩০ কি ৫০ বছর পরে এই কৃশকায় গল্পগ্রন্থটির আর একবার খোঁজ পড়বে।' 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গত ১০০ বছরে প্রকাশিত ১০০টি সেরা গ্রন্থের একটি। সত্যিই অপরাজেয়।' সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে— বিজনের রক্তমাংস, আট বছর পরে একদিন (দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছিল-দশ বছর পরে একদিন), মীরাবাঈ, ক্রীতদাস ক্রীতদাসী।

এই পর্যায়ের গল্পগুলি থেকেই সন্দীপনের প্রকৃত সিদ্ধি ধরা পড়ল। গল্পের ক্ষেত্রে যা কিছু সন্দীপনীয়, তার চিহ্ন নানাভাবে দেখা দিতে শুরু করল 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'-র গল্পে। চারটি গল্পই ১৯৬০ সালে রচিত; তার মধ্যে প্রথম রচনা 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'। সন্দীপন তখন বাড়ি ছেড়ে ২৪বি, নূর মহম্মদ লেনে থাকতেন, সঙ্গী ছিলেন কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। সন্দীপন বলেছেন, 'ওখানে বসেই আমি 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পটা লিখতে শুরু করি। ওখানেই একটা কবিতাও লিখি, যার প্রথম লাইনটা মধুসূদন থেকে ধার করতে হয়েছিল—'দাঁড়াও পথিকবর'। 'এপিটাফ' নাম। সেটা পড়ে প্রণব বলল, 'আরে এত খাঁটি পয়ার! চলুন আপনার সঙ্গে সুনীলের আলাপ করিয়ে দি'[২]—বলে দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে গেল। ওখানেই সুনীলের সঙ্গে প্রথম আলাপ।' দেশবন্ধু পার্ক ছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার আড্ডাস্থল। একটা কবিতার সূত্র ধরে এভাবে সন্দীপন যুক্ত হলেন 'কৃত্তিবাস'-এর দলে, নচেৎ তিনি পুরোপুরি গদ্য লেখক। পরবর্তী কালে আরও কিছু নিজস্ব কবিতা ও বেশ কিছু বিদেশি কবিতার অনুবাদ করলেও তখন তিনি অত্যন্ত ধীরে, অদল-বদল করতে করতে রচনা করেছিলেন 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পটি। সন্দীপন বলেছেন, 'গল্পটা তখন অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছিল' সুনীল কিছুটা পড়েও ছিল। তা, সুনীল নাকি সমীর রায়চৌধুরীকে একটা চিঠি লিখেছিল চাইবাসায়, 'সন্দীপন একটা অসাধারণ গল্প লিখেছে। শেষ হলে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে।'[৩] সেই গল্প শেষ হলে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা একটা গল্প সংখ্যা প্রকাশ করে। পাশাপাশি একই দিনে প্রকাশিত হয় ১৩নং কবিতা সংখ্যাও। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ, শুধু রঙের বদল দুটিকে আলাদা করেছে। শ্রাবণ ১৩৬৭, ইংরাজি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত সেই সংখ্যায় ছিল দুটি গল্প। প্রথমটি কমলকুমার মজুমদারের 'ফৌজ-ই-বন্দুক' আর দ্বিতীয়টি 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'। এই বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে দীপক মজুমদার লিখেছিলেন, 'সন্দীপনের সামনে কোনও বিকল্প ছিল না। টলস্টয়ের নায়ক ইভান যদি ওইভাবে পেঁয়াজের মতো পরতে পরতে মৃত্যুর শান্ত বিশ্বাসে না পৌঁছতো তাহলে সে সন্দীপন হত। অর্থাৎ বিজন হত, যার কোনও সচেতন অভিলাষ নেই, সাহস নেই, সর্বদাই ভয়ে কাঁপছে; যদিও অনেক গভীর ব্যাপার তার জীবনে ঘটেছে যা আরও হাজারটা জীবনে ঘটতে পারে, বস্তুত কোনও কোনও ক্ষেত্রে না ঘটলেও তবু আসলে সে দীনাতিদীন কেন্দ্রাভিগ একটি মানুষ হাঁটু-ছাড়িয়ে নেমে আসে শার্ট গায়ে ফর্সা, রোগা, প্রায় ইম্বেসিল মনে হতে পারে এমন কোনও সুন্দর মুখের কিশোর ভিখিরি শমীমের মতো'[৪]।

'বিজনের রক্তমাংস' প্রথমে ছাপতে দেওয়া হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়। তখন সম্পাদক সত্য গুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে সি পি আই (এম এল) পার্টিতে যোগ দেন।

অমনোনীত গল্পটি তিনি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ফেরত দেন। তারপর জমা দেওয়া হয় 'দেশ' পত্রিকায়। বিমল কর সেখানে গল্প বাছতেন। তিনিও 'দেশ' থেকে ফেরত দেন। তখন তিনি 'ছোটগল্প: নতুনরীতি', নামে একটা আন্দোলন ও বই প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। 'দেশ' থেকে ফেরত দিয়ে তিনি নিজেই 'ছোটগল্প: নতুনরীতি'-তে সেটা ছাপেন। সন্দীপন বলেছেন, 'ভেবে দেখ, 'দেশ' পত্রিকায় গল্প ছাপার সর্বাধিনায়ক বিমল করের দু রকম ভূমিকা। আসলে আমার ধারণা, উনি হয়তো ভেবেছিলেন এমন গল্প যদি 'দেশ'-এ একবার ছাপি তাহলে তো এর আরও গল্প ছাপতে হবে। আর সেটা উনি চাননি। আবার নতুনরীতিতে না-ছেপেও পারলেন না।'[৫] পাশাপাশি পড়ে দেখা যাক বিমল করের অভিমত, যেখানে উনি 'দেশ' পত্রিকার প্রসঙ্গে না গিয়ে কেবলমাত্র নতুনরীতির সূত্রে গল্পটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, 'সন্দীপন একটা গল্প লিখেছিল, 'বিজনের রক্তমাংস'। গল্পটা পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম। সন্দীপনকে বললাম, 'গল্পটা ভাই— আপনি আমাদের দিন। অসাধারণ লিখেছেন।' সন্দীপন গল্পটা আমাদের দিয়ে দিল। 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' গ্রন্থমালার ওটা ছিল অসামান্য গল্প। 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' -র বিক্রিবাটা কতই বা ছিল। খুব বেশি হলেও শ'দুই আড়াই। কলকাতার মধ্যেই যা বিক্রি হত, বাইরে কাগজ পাঠানোর সঙ্গতি আমাদের ছিল না। সত্যি বলতে কি, সন্দীপনের ওই গল্পটি যদি বড় কোনও পত্রিকায়, এমনকি পরিচিত কোনও পত্রিকায় ছাপা হত— একটি মাত্র গল্পেই সন্দীপন বিখ্যাত হয়ে উঠত। এদিক থেকে আমরা তাকে বঞ্চনাই করেছি। গল্পটা আমরা তার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম। একটা পয়সাও সে পায়নি লেখার দরুণ। অবশ্য আমরা কাউকেই টাকা-পয়সা দিতাম না, দেবার সামর্থ্য ছিল না। সন্দীপনের ক্ষতি হয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার গল্প মাঠে মারা যায়নি। তখনকার তরুণ পাঠকমহলে 'বিজনের রক্তমাংস' খুবই সাড়া তুলেছিল। এমনটি আর আমি বড় দেখিনি। আজও সন্দীপনের কথা উঠলে ওই গল্পটার কথা এসে পড়ে।'[৬] এই উচ্ছ্বাসের আড়ালে পড়ে থাকা প্রত্যাখ্যানের কাহিনিটি প্রকৃতঅর্থে কোনও 'বঞ্চনা'-র ঘটনা ঘটিয়েছিল কিনা জানি না, তবে দীপক মজুমদার কথিত 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী সন্দীপন'-কে জীবনের নানা সময়ে নানা সাহিত্যিক-রাজনীতির শিকার হতে হয়েছিল।

সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সন্দীপনের থিম, ভাষা ও ভঙ্গি, যা শুধু পৃথক নয়; অনেক সময়ে এতটাই প্রথাবিরোধী যে প্রায়-কালাপাহাড়ী। ছোট দীক্ষিত পাঠক সমাজের বাইরে তা সুভেদ্য নয়। অনেক সময়ে তা এক ধরনের বিরোধিতার বাতাবরণ তৈরি করে, সংস্কার ও সামাজিকতার মধ্যে ঝামেলা বাঁধিয়ে দেয়। তখন প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে এই যুদ্ধ নির্মাণ করেন সন্দীপন, কীভাবেই বা সামলান তার প্রতিক্রিয়াকে। যোদ্ধা ও যুদ্ধ-শহীদের দ্বি-মাত্রিকতাকে যে নিস্পৃহতায় সামলান তিনি, তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সাক্ষাৎকার থেকে কিছুটা অংশ অনুসরণ-করা যেতে পারে, যেখানে ধরা পড়বে তাঁর প্রথম পর্বের লেখালিখি নিয়ে এক ধরনের 'স্ট্যান্ড'। ১৯৯১ সালে বলা এই সাক্ষাৎকারে হয়তো সেই 'স্ট্যান্ড'-এর অনেকটাই অদল-বদল হয়েছে আবার অনেক কিছুই বদলায়নি; বিশেষত, পরবর্তী অংশে আমরা যা পড়ব তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এই সাক্ষাৎকার থেকে নিশ্চিতভাবেই সেই দু-প্রান্তস্পর্শী সন্দীপনের পরিচয় পাব আমরা।

সাক্ষাৎকারের নির্বচিত অংশ:

*প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রিয় 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'-র 'মীরাবাঈ' দিয়ে শুরু করা যাক। সচরাচর একজন নতুন লেখক প্রথম পর্যায়ে নিজের ভাষা হাতড়ে বেড়ান। অথচ আপনি যেন সেই অভিমন্যু, গর্ভাবস্থাতেই ব্যূহভেদ করতে শিখেছেন। যখন নিজস্ব রণভূমিতে*

*প্রবেশ করলেন, আপনি তখনই টোটালি ইকুইপড্। তো এই যে 'মীরাবাঈ'-এর তৈরি গদ্য, আপনার হাতে বাংলা গদ্যের এই নতুন নির্মানের পূর্ব ইতিহাসটা আমরা জানতে চাই। প্রশ্নটা আমরা ১৯৬১-র সন্দীপনের কাছে জানতে চাই।*

উত্তর ঃ দেখুন, এ ধরনের প্রশ্ন, অন্তত আমার মতো লেখককে করা ভুল। এটা ভুল প্রশ্ন। প্রথমত, লিখি বটে, কিন্তু আমি নিজেকে একজন প্রতিভাবান মানুষ বলে মনে করি না। 'অভিমন্যু', 'গর্ভাবস্থায় ব্যূহভেদ' এসব 'প্রতিভা'-দের ব্যাপার। আমার প্রতিভা নেই। 'লুক, আই হ্যাভ নো হ্যালো'—যা পিকাসো বলতেন। আলট্রা-সোনোগ্রাফে দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় ফিটাস আঙুল চোষে এবং মাতৃজঠরের জলে ভেসে থাকে আর মুভ করে। লেখকের জীবন জুড়ে এই অ্যামবেলিকাল মুভমেন্ট। মুখে বুড়ো আঙুল। এর বাইরে সে যায় না। সে কখনো মোহনায় গিয়ে মাসাধিক মাঝিদের সঙ্গে কাটিয়ে আসে না 'গঙ্গা' লিখবে বলে। ওভাবে রিপোর্টিং হতে পারে। মানিকবাবু আমাকে বলেছিলেন, পদ্মানদীর কেন, কোন নদীর মাঝিদের সঙ্গেই ওঁর ওঠা-বসা ছিল না। দু-একবার বিড়িটিড়ি খেয়েছিলেন, এইমাত্র। তাও ডাঙায় বসে।

*প্রশ্ন ঃ আপনি কি বলতে চান যে সরাসরি অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখার কোনও সম্পর্ক নেই? 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর সঙ্গে লেখকের জলপাইগুড়ি অভিজ্ঞতার কোনও সম্পর্ক নেই?*

উত্তর ঃ ওই বইটির একাংশ 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' আমি পড়েছি। অভিজ্ঞতা নয়, ওটি লেখা হয়েছে অভিজ্ঞান থেকে। হ্যাঁ, সরাসরি সম্পর্ক নেই।

*প্রশ্ন ঃ একটু বুঝিয়ে বলুন।*

উত্তর ঃ এসব বিষয়ে বাখতিন ভালভাবে বুঝিয়ে গেছেন। সস্যুর বুঝিয়েছেন সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েড প্রসঙ্গে। যেমন ধরুন, সিগনিফায়ার মনে করে ৭টা ১৩-র ট্রেন। ভুল। এটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা তথাকথিত অভিজ্ঞতা। কিন্তু ট্রেনটা ছাড়তে তো ৮টা-১৫ ও হয়। ওটাকে ৭টা-১৩-র ট্রেন ভাবা তাই ভুল। নিছক অভিজ্ঞতা থেকে তাই ক্রমাগত ভুল লেখা হয়। আর বলা বাহুল্য ওটা তো ৮টা ১৫-র ট্রেনও নয়। কারণ, অন্যদিন ওটা ৭টা-৫৫য় ছেড়েছিল। কোনদিন, এমন কি, ৭টা-১৩ তেই। 'মাদারির মা' লেখা হয় এরকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও তাই। একেই অভিজ্ঞান বলি।

*প্রশ্ন ঃ ১৯৬১- তে বেরয় 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'। এর অন্তত 'মীরাবাঈ' গল্পটি আমরা মনে করি অভিজ্ঞান থেকে লেখা।*

উত্তর ঃ আপনারা তা মনে করতে পারেন। সেটা আপনাদের ব্যাপার। ১৯৬১-র সন্দীপন সম্পর্কে আমার পক্ষে ১৯৯০-এ কিছু বলা সম্ভব নয়।

*প্রশ্নঃ নয় কেন? আপনি একটু আগে যা বললেন, ট্রেনটি-তো ১৯৯০-তেও ছেড়ে থাকতে পারে।*

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা পরে। ১৯৯০-এর আমি নিশ্চয়ই ১৯৬১-তে ছিলাম। কিছুদিন আগে পিটার গেঁর 'দা বুর্জোয়া এক্সপিরিয়েন্স' বলে একটা বই পড়লাম। পোলেমিক্স-এর ঢঙে লেখা চমৎকার বই। তাতে দেখলাম এক জায়গায় বলছেন, যাই বলুন মেফিস্টোফিলিস বেশ কিছুটা হ্যামলেট! শঙ্খ ঘোষের পঙ্‌ক্তি তুলে বলতে হয়, আপনারা এসেছেন, তাই আপনাদের বলি, 'গ্রহে গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল'....যাই হোক!

*প্রশ্ন ঃ বেশ তো এভাবেই কিছু বলুন 'মীরাবাঈ' প্রসঙ্গে।*

উত্তর ঃ শুনুন। অন্য একটা বলি। এই যে আমাদের মা-ঠাকুমারা বলতেন না, যে, 'তুই

আমার কতা শুনলি না, ভগবান এর বিচার করবেন!' আমরা যখন দু-জনে বা কয়েকজনে মিলে কথা বলি, আমাদের সমস্ত বক্তব্য বা তর্ক বা যুক্তি বা বিচার বা এমন কি বোধ, অনুভব এক তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে জমা হয়। আমাদের সমস্ত মুখের কথায়, যথার্থ মাত্রাই যদি বলি সেটাই হল স্টার্টিং পয়েন্ট। সমস্ত লেখা শুরু ওই তৃতীয় পর্যায় থেকে। লেখক তখন শুধু তাকে অনুসরণ করে যায়। সেখানে মাইলস্টোন নেই। সে যাত্রার কথা লেখক বলতে পারেনা। লেখাতেই সব রয়েছে। 'মীরাবাঈ'-র কথা মীরাবাঈ-ই বলবে। তাছাড়া, আচ্ছা বলুন তো, গল্প কবিতা উপন্যাস এ-সব কি কেউ বাস্তবিক লেখে? এ তো নিজের থেকে হয়। (একটু থেমে) বিজন কি গোরা, যে, আমি তাকে বললুম, 'ওরে গোরা আমার ভাল ভাল কথাগুলো দেশের লোককে শুনিয়ে আয় তো! এতে দেশের ভাল আর আমারও ভাল। আর সে অম্নি মাইক্রোফোন কাঁধে মাজন বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়ল! আমার তো মনে হয় বিজন যাতে 'তার' ভাল হয় সে-রকমই করে গেছে, ভেবে গেছে। আমার কোনও কথা ছিল না। আর থাকলেও একবর্ণ গেরাহ্যি করে নি। কাজেই তার 'মীরাবাঈ'-এর দায়দায়িত্ব আমি নেব কী করে?

*প্রশ্ন ঃ আপনার বলার কিছু নেই?*

উত্তর ঃ না।

*প্রশ্ন ঃ কোনো দায়দায়িত্ব নেই?*

উত্তর ঃ নাঃ। কোনওপ্রকার অভিমন্যু-চেতনা, ব্যূহভেদ, রণভূমির হিরো বা গদ্য-নির্মাণের জন্যে আমি কলম ধরি নি। আমার কোনও কনটেন্ডার নেই। কোনওদিন ছিল না। বাংলা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র উপকার করার বাসনা আমার নেই। বা, ছিল না। কিছু হবার জন্যে বাঁচিনি। লিখিনি। লেখক 'হতে' চাইনি। হইনি।

*প্রশ্ন ঃ 'মীরাবাঈ'-এর পূর্ব-ইতিহাসটা কী?*

উত্তর ঃ 'মীরাবাঈ'-এর পূর্ব ইতিহাস, 'বিজনের রক্তমাংস' নামে আমারই গল্প। তার আগে কিছু নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। কাজেই নেই।

*প্রশ্ন ঃ পড়াশোনা, প্রস্তুতির দিকটা।*

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেটা বলবার মতো। দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও প্রহেলিকা সিরিজের প্রায় সমস্ত বই (কমবেশি দুশো)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়- এর অনেক বই যেমন 'স্বর্ণসীতা', 'উপনিবেশ' (দুই খন্ড)। শেষোক্ত দুই খন্ডের কাছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দুই খন্ডের চেয়ে আমি ঢের বেশি ঋণী। সত্যি কথা এই যে, ঢোঁড়াই এক খন্ড আমি (তিন চারখানা বই লেখার পর) কৌতূহলবশত পড়ে দেখি, তাতে আমার খাবার নেই।

*প্রশ্ন ঃ এই যে বাংলা গদ্যের গতরজব্দ দরদালানের স্থাপত্য আমূল পালটে ফেলার জন্যই লেখা, বাংলা গদ্যের সিনট্যাক্সের প্রবল ভাঙচুরের মধ্যে এই যে নতুন নির্মাণ—এর পিছনের তাগিদ কি আমাদের গদ্যে ভারবহনের অক্ষমতা কাটিয়ে ওঠা, নাকি বাংলা গদ্যের ইনবিল্ট দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠা?*

উত্তর ঃ যাকে গদ্য শৈলীটৈলী বলে—এসব ব্যাপার নিয়ে কোনওদিন কিছু চিন্তাই করি নি। যেটা প্রায়ই আমাকে বলা হয় 'তোমার প্রোজটা ভাল'—এভাবে ব্যাপারটা দেখি নি। এটা টোটাল ইনভলভ্‌মেন্ট। যা নিয়ে লিখতে চাই, সেরকমভাবে গদ্যটা হয়েছে। তবে একটা ব্যাপার, যা আগেও বলেছি, আমাদের গদ্যের ইতিহাস, ধারবাহিকতা বা ঐতিহ্য এ নিয়ে আমার কোনওদিন মাথাব্যাথা ছিল না। বাংলা সাহিত্যের কোনও উপকার করার জন্য আমি লিখি নি। তবে শুধু বাংলা কেন, পড়া না-পড়া যাবতীয় পার্থিব গদ্যের ধারাবাহিকতা তো আমার মধ্যে আছেই। এই যে কথা বলছি, এ-ভাবে, এতেও তো

মানুষের কথা বলার সামাজিক ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক সব ব্যাপারটাই থেকে গেছে। আগে যত মানুষ কথা বলে গেছে, তার রোদ, তার ছায়া এতে লেগে আছে।

*প্রশ্ন ঃ না, আমরা জানতে চাইছিলাম গদ্য ভারবহনক্ষম করে তোলা প্রসঙ্গে—*

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটা বুঝছিলাম ভাবনাগত দিকে থেকে। আমি দেখেছিলাম, আমার আসপাশে পাখির মাথাঅলা পূর্বসুরী সব জীবিত লেখকদের, যারা সাদা-কালো ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় দুটো দুটো করে ছাড়া ভাবতে পারে না। অথচ, জীবন বহুমাত্রায় ছড়িয়ে আছে। এবং তাকে বহন করার উপযুক্ত গদ্য দরকার। কেনই বা তা হবে না? তাছাড়া বরাবর একটা ব্যাপার ভেবেছি যেটা 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী'-র ভূমিকাতেও লিখেছিলাম, খুব ইম্পর্ট্যান্ট থিং। যেটা আগে কেউ লক্ষ্য করে নি। আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম, কবিতা আর গদ্য— এসব আলাদা আলাদা জিনিস নয়। যা গদ্য তাই কবিতা হতে পারে। যেটা আমি ভূমিকায় লিখি যে, জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতাগুলো আমাদের বরাবরই মনে হয়েছিল উপন্যাস এবং 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর চেয়ে বেশি কবিতা হয় না। জীবনানন্দ দাশের '৪৬-৪৭' পড়ে বুঝেছিলাম দাঙ্গার উপর এর চেয়ে মহৎ সৃষ্টি হয় না। তা গল্প না গান, উপন্যাস না পেন্টিং তাতে কী এসে যায়।

*(বোবাযুদ্ধ, ১৯৯১; প্রচেতা ঘোষ ও তাপস ঘোষ গৃহীত সাক্ষাৎকার)*

৩.

**সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য**। প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৬৯। প্রকাশক- কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। অধুনা, ১৭/১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট। কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ—গৌতম রায়। উৎসর্গ— 'তৃণা (৪), বইটি ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফ্যালো'। মূল্য-৩টাকা। সূচনাপত্রে লেখা:

'ছোটগল্প ও কবিতা কাছাকাছি চলে আসছে নাকি? আমি খবর রাখি না। স্টেটস্‌ম্যান পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিজনের রক্তমাংস থেকে আমি কোনও গল্প লিখিনি। অনেকেরই লেখা পড়েছি। কিন্তু আমি কারও, কোনও, কখনো, গল্প পড়িনি। একদিন ভোরবেলা বেসিনে রক্তবমি করছি দেখে ২/১ মাসের মধ্যেই আমি বিজনের রক্তমাংস লিখতে বসে যাই, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী লিখি একটা মেয়েকে নিয়ে, পুরীতেই চেনা হয়েছিল, তার নামও ছিল মায়া। হুবহু ঐ-রকম ঘটেছিল। ঐ ভাষায়। আমার পিসতুতো দাদার নাম ছিল বিশ্বনাথ, মীরাবাঈ-এর বিশেদা, একদিন জালের ধারে ওদের ঐ অবস্থায় দেখেছিলুম। একবার একটা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম, সেই নিয়ে লিখেছিলুম দশ বছর পরে একদিন, বদ্যিবাটিকে শ্রীরামপুর ও শকুন্তলাকে মনিমালা করার অপরাধে ওটা যদি গল্প হয়ে গিয়ে থাকে, মনে করি কিছুটা হয়েছেও, তাহলে ও রকম আর কখনো করব না। উৎপল সম্পর্কে বা চাইবাসা-চাইবাসা গল্পে করিনি।

অতএব, আমার লেখা বা অদৌ গল্প নয়, তা কেন ও কী উপায়ে তার কাছাকাছি চলে যাবে, যার কোনও অস্তিত্ব নেই! যা কবিতা?

তাছাড়া কোনটা গদ্য কোনটা পদ্য, বুঝব কী করে, এ কি সম্ভব নাকি বোঝা কোনটা কী! ছেলেবেলা থেকে রূপনারায়ণের কূলে আমি প্রোজ হিসেবে পড়ে আসছি, জীবনানন্দের সুদীর্ঘ কবিতাগুলো আমাদের সকলেরই মনে হয় উপন্যাস, সমুদ্র ও বাতাসের বিরুদ্ধে লাল বলের ওপর এক-পা তুলে সরু কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বালক টাডজিউ— "এর চেয়ে বেশি কবিতা কখনো পড়িনি", এ-কথা আমাকে এক কবির বাবা বলেছিলেন।'

দ্বিতীয় প্রকাশ—বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক—বীজেশ সাহা, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২। প্রচ্ছদ—সুব্রত চৌধুরী এবং শেষ মলাটে ছাপা লেখকের ছবি তুলেছেন-অমিত ধর। মূল্য-৫০টাকা। উৎসর্গ ও সূচনাপত্রের লেখা যা ছিল তাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬। শেষ মলাটে লেখা- 'ছোটগল্প ও কবিতা কাছাকাছি চলে আসছে নাকি?' ১৯৬৯-এ এ-বইয়ের ভূমিকায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই প্রশ্ন তুলে, স্বভাবসিদ্ধ হাত নেড়ে নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, উনি খবর রাখেন না। 'স্টেটসম্যান পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।' বলেছিলেন আরও, তারপর। তখন ১৯৬৯। এই ডিসকোর্সের উপলক্ষ ছিল সেই সময়ে কবিতা পত্রিকার সঙ্গেই 'কৃত্তিবাস'-এর যে স্বতন্ত্র গল্পসংখ্যা বেরোয় তার বিখ্যাত সম্পাদকীয়, যার প্রথম বাক্য ছিল, গল্প এবং কবিতা আপৎকালীন আত্মীয়স্বজনের মতো কাছাকাছি চলে আসছে। শুধু জীবনানন্দ কেন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যও শুরু থেকে এখনো অব্দি কবিতার অনন্য মুখপাত্র। এবং মনে রাখতে হবে, প্রকাশের দিক থেকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় গদ্যকার জীবনানন্দের পূর্বসূরী। 'গণ-শৌচাগারের দেওয়ালের ভাষা ও ছবিতে প্রেম ও যৌনতার যে রাজনৈতিক মুক্তি— তারই প্রপাতধ্বনি এখানে।'

সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে—সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী, নলিনী শাটার নামিয়ে দেয়, আত্মক্রীড়া, ঐ দিকে, রূপালি পর্দায়, একজন নিরুদ্দিষ্ট ও তিনজন এলেবেলে, ধলভূমগড়ের ব্যানার্জিবাবু, উৎপল সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে, কয়েকটি শিরোনামা-১, পরিচারিকার নাম আশা, কাল দেখা হবে, চাইবাসা চাইবাসা, কয়েকটি শিরোনামা-২, কাউন্টার পয়েন্ট ('পঞ্চাশটি গল্প' বইতে নাম বদল হয়—একটি বিদেহী গল্প), নিদ্রিত রাজমোহন।

নানা ধরনের রচনার প্রতি ইঙ্গিত করে অনিরুদ্ধ লাহিড়ী প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'বইটিকে কি নিছক একটি গল্পগ্রন্থ বা সাদা বাঙলায়, গল্পের বই বলা যায় আদৌ?'[৭]—এ প্রশ্নের পিছনে তথাকথিত গপ্পের সীমা-অতিক্রমী যে ঝোঁক রয়েছে, তাকে নির্দেশ করার চেষ্টা ছিল। আর ছিল সন্দীপনের চরিত্রদের, কর্মকান্ড ও কর্মকান্ডহীনতার অন্দর-বাহিরকে খুঁচিয়ে দেখা, খানিকটা বাজিয়ে দেখাও বলা যায়, যার সমাপণ ঘটিয়ে ছিলেন শ্রীলাহিড়ী মুগ্ধতামুক্ত এক বাঁকা সিদ্ধান্তে। সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীর গল্পগুলিকে আরেকভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য নিশ্চয় সেই সমাপণ-বাক্যগুলিরও প্রয়োজন আছে, 'কালাপাহাড়ি গোঁ নয়, ঠিক বা বেঠিক উদ্যোগের জেদ ও দাপট নয়, সন্দীপন তাহলে মনোযোগ দিচ্ছেন সেইসব নঙর্থক অভিজ্ঞতার দিকে, ব্যক্তিচৈতন্যে যা নিয়ত উৎপাদন করে, আপাদমস্তক, নিরুদ্যমের অবসাদ ও গ্লানি। প্রাচীনেরা এ ব্যধিটি চিনতেন: এদেশে তাঁরা একে অভিহিত করেছেন তমোগুণ বলে; ওদেশে, খ্রিস্টিয় আদি মধ্যযুগে, একে বলা হত অসিডিয়া। যেমন দেখলাম, অভিজ্ঞতার এই বিক্রিয়ার মধ্যেই আমূল নিহিত থাকে অংশু, রাজমোহন বা তাদের আত্মিক ভ্রাতৃবৃন্দ। যতদূর মনে পড়ছে, ইতালো স্তেভোর একটি উপন্যাসের নায়ক বা প্রতিনায়ক, দিনপঞ্জিকায় 'শেষ সিগারেট' শব্দ দুটির আদিবর্ণ দুটি (ইত্যালিয় ভাষায় ইউ, এস) লিখে, আত্মপ্রসাদে স্ফীত, শুতে যেত প্রতিরাতে; পরদিন সকাল থেকে আবার নতুন করে শুরু হত ধূমপান। বাঙ্‌লা সাহিত্যে, এই একই ব্যাধির গ্রাস থেকে কি বাঁচতে পেরেছে জীবনানন্দের নির্বাচিত চরিত্ররা?'[৮]

এই পর্বের গল্প সম্পর্কে খানিকটা সময়বাদী বিচারে ওই নঙর্থক উদ্যোগগুলিকে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'আয়নার বিপরীত প্রতিফলন। ঐ বিস্ফোরণের সময়ই

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশ হয়ে তাদের বিবরে সুখের কোটরে বাঁচাতে চাইছে, নয় ভীত হয়ে পড়ছে। আর সন্দীপন ব্যক্তিকে সমূহের মধ্যে ধরেন না, তাকে বিচ্ছিন্ন করে সময়ের সামনে ও মধ্যে একাকী দাঁড় করান।'[৯] ফলে মধ্যবিত্তের যে বিদ্রোহ বৃহত্তর সামাজিক জীবনে দেখা দিয়েছিল, তারই অন্য একটা দিককে তুলে ধরেন সন্দীপন। এখন ব্যক্তিচৈতন্যের নঙর্থক উৎপাদককে যদি এই বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের মাঝখানে এনে বসানো যায় তাহলে নিশ্চয় 'কনগ্রাচুলেশানস্ রাজমোহন রায়চৌধুরী। সাবাশ!'[১০] বাক্যের উত্তর-ঔপনিবেশিক বহুত্ববাদী জটিলতার সন্ধান পাওয়া যায়, পাওয়া যায় এই বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখা চার বছরের তৃণাকে বইটা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলতে বলা হয়েছিল কেন, তার উত্তর।

৪.

**বিপ্লব ও রাজমোহন** (মিনিবুক-১)। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ১৫, ১৯৬৯। সম্পাদক-সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। ৭১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলকাতা-৩৬, টেলিফোন ৬৬২২১৭। প্রকাশক—সমীর রায়। কেন্দ্রীয় বিক্রেতা-গল্পকবিতা, ১৭/১/ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট। কলকাতা-১২। মুদ্রক—শ্রীসারদা প্রেস, ২/১, বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট, কলকাতা-৬। প্রথম ও চতুর্থ প্রচ্ছদ—গণেশ পাইন। মুদ্রণসংখ্যা-২২০০। উৎসর্গ—'কমলকুমার মজুমদার/বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিংশশতাব্দী/যাঁকে দিয়ে শুরু'। মূল্য-৩০ পয়সা। আকার-সাড়ে তিন ইঞ্চি X সাড়ে চার ইঞ্চি।

দ্বিতীয় প্রকাশ-প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মন্ডল রোড, কলকাতা-২। মূল্য-৪টাকা। শেষ মলাটে লেখা—'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর রচনা কমার্শিয়াল অমনিবাস গুলিতে আজও প্রবেশাধিকার পায়নি, ইনি এত কম লেখেন যে এঁকে লেখক বলা চলে না। ৮বছর ধরে একটি কৃশবই, ক্রীতদাস ক্রীতদাসী, সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য। অথচ কোনও এক অত্যাশ্চার্য উপায়ে ইনি, আজও লেখক।গত এক যুগ ধরে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিতে এঁর সম্পর্কে পুনঃপুনঃ উল্লেখ ও ক্রমাগত আলোচনা চোখে পড়ে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে প্রকাশিত হলেই এঁর যে কোনও রচনা তরুণ লেখক ও নবীন পাঠক মহলে একটা কৌতূহল তথা আগ্রহের সৃষ্টি করে। গল্পের মতোই এ-যাবৎ তাঁর লেখা নিবন্ধগুলিও বিশেষ আকর্ষণীয় হতে পেরেছে। 'বিপ্লবও রাজমোহন' গল্প। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।' নীচে লেখা- 'জন্ম ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৩' এবং আরও নীচে দু লাইনে-'সম্প্রতি একটি সেলাইহীন নবজাত কাগজ এঁকে বলেছেন 'লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রিন্স'।

৪০ পৃষ্ঠার মিনিবুকে ছিল ৩১টি মজাদার মিনি বিজ্ঞাপন। শব্দপ্রতি ১০ পয়সার সেই বিজ্ঞাপনের নমুনা: শীতার্তকে রাতের আশ্রয় দিই: বেলাল, ২০/১ ক্যামাক স্ট্রিট। কলকাতা। পাত্রী চাই। রন্ধনশালার লেখক বাসুদেব দাশগুপ্তের (২৯) জন্য। বি-এ (হন্‌স)। বক্স ০০৪। সদ্য বিবাহিত দম্পতিকে একটি ব্যবহৃত হটপ্লেট দিতে পারি। শ্রীমতী রিনা চট্টোপাধ্যায়। ৭১, কাশীনাথ দত্ত রোড। কলকাতা-৩৬। পড়লেই অনুমান করা যায় এগুলির অধিকাংশের রচয়িতা সন্দীপন। প্রকাশমাত্রই অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সম্ভবত প্রথম মিনিবুক। এই ঘটনার ২৫ বছর পর সন্দীপন 'আজকাল' পত্রিকায় (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪) 'মিনিবুকের গল্প' নামে একটি লেখায় সেদিনের পরিস্থিতিটা উল্লেখ করেছেন— 'বড় নিরুপায়ভাবে বেরিয়েছিল আমার মিনিবুকটি। 'বিপ্লব ও রাজমোহন' নামে একটি গল্প লিখে ফেলেছিলাম তখন, এবং আর কোথাও বা

কোনভাবেই সেটা ছাপাবার উপায় ছিল না বলে। পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে প্রথম মিনিবুক হবার জন্যে নয়। কিন্তু পি টি আই ও অন্য নিউজ এজেন্সির ক্রিড হবার দরুন, পরদিন ভারতবর্ষের সব কাগজ সেরকমই বলল। 'মিনিবুক হ্যাজ হিট দি স্টলস ইন দি সিটি—দু কলম হেডিং করেছিল টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া এবং প্রথম পাতায়। এখানকার কাগজেও মিনিবুকের ছবিসহ লম্বা লম্বা রিপোর্ট বেরুল। ফোটো-কপি ছাপিয়ে লন্ডনের বাঙালি সমাজে বিলি করলেন উৎপলকুমার বসু। বিক্রির টাকা থেকে কিনা জানি না, আমাকে ১৫ পাউন্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রচ্ছদ: গণেশ পাইন। দাম ৩০ পয়সা। চতুর্থ প্রচ্ছদে স্লোগান: চার্মিনার অথবা মিনিবুক। উল্লেখযোগ্য, তখন চারমিনারের দামও ৩০ পয়সা। চারমিনার অবিলম্বে ৩৫ পয়সা হল। তখন স্লোগান পাল্টে হল: চারমিনারের দাম বাড়লেও মিনিবুকের দাম বাড়বে না।'

আলোড়ন-তোলা মিনিবুকের সঙ্গে আলোড়ন তুলেছিল 'বিপ্লব ও রাজমোহন'। বিশেষত তার ৯" X ৯" র‍্যাকে ধরা দশটা বই পোড়ানোর অবিস্মরণীয় বর্ণনা-অংশের জন্য। অ্যালবার্ট ফন শামিনোর 'পিটার শ্লেমিল', উনামুনোর 'দা ট্র্যাজিক সেন্স অফ লাইফ', 'গোরা', 'নষ্টনীড়', 'শ্রেষ্ঠ জার্মান ছোট উপন্যাস', 'নো পাসপোর্ট টু আর্কটিক', 'গীতবিতান'-এর সঙ্গে কি কোনও বঙ্কিমচন্দ্র ছিল! তাহলে একশো বছর আগের বঙ্কিমঅঙ্কিত রাজমোহনকে সন্দীপনের রাজমোহন এসে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল কীভাবে? আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'আসলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার পড়ে না, সন্দীপন তাঁর নাম-চরিত্রকে স্পৃশ্য শারীরিকতা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে শুধুমাত্র একজন বিবেকী সাহিত্য পাঠকে পরিণত করেছেন। এবং সেই সাহিত্য পাঠক তিনি নিজেই। তথাকথিত ধ্রুপদী সাহিত্যের অবান্তর ভিড় থেকে সরে এসে এমন একটি আধুনিক গ্রন্থাগার ও সিলেক্ট বিব্লিওগ্রাফি প্রণয়ন করা তাঁর সাধস্বপ্ন, যার মধ্যে থেকে তাঁর বাঁচা ও লেখার রশদ তিনি সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।'[১১] যদি এই গল্পটিকে জ্ঞানচর্চার বিকল্প সন্ধানের দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে যে রাজনীতি তৈরি হয়, তার সঙ্গে আদ্যন্ত জড়িত সন্দীপন। কারণ, তিনি মনে করেন বাংলাদেশের লেখকরা অধিকাংশই এসেছেন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে, যে মধ্যবিত্তশ্রেণীকে মার্কস আদর করে বলেছেন রেনিগেড, যারা ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা না করে ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকে তা ভেঙে দেয়। তরুণ লেখকরা সেভাবেই ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত; কারণ, তারা জানে 'কুড়ি শতাব্দীর এ-রকম সময়ে একজন লেখকের বড্ড বড় ট্রাজেডি ২টি। ১, তার মাথায় কোনও বৃত্তাকার পরিধি নেই; ২, আজ তার রাজা এসট্যাবলিশমেন্ট, সে সভাকবি মাত্র।' *(সোমেন পালিতের বৈবাহিক, ১৫-১১-১৯৬৯)*

৫.

চোদ্দ বছর বাদে, ১৯৮৩ সালে 'বিপ্লব ও রাজমোহন' অন্তর্ভুক্ত হল সন্দীপনের পরের গল্পগ্রন্থ 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা'-তে। ইতিমধ্যে দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—'একক প্রদর্শনী', (শারদীয় অমৃত ১৩৭৭, ইং ১৯৭০) আর 'এখন আমার কোনও অসুখ নেই' (আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৩, ইং ১৯৭৬)। কয়েকটি পোলেমিক বেরিয়েছে: 'সোমেন পালিতের বৈবাহিক' (১৯৭০), '২৫শে বৈশাখের সূর্য' (১৯৭০), 'খড়ের বাছুর' (১৯৭০), 'বিপ্লব ও জিজ্ঞাসাচিহ্ন' (১৯৭০)। মিনিবুক 'চারজন টারজান' (১৯৮০), যাতে প্রকাশিত হয় গল্প—'ছেলেটা', তখন এটিকে সাক্ষাৎকার বলা হয়েছিল। তারপর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ।

হ্যাঁ, প্রিয়তমা। প্রথম প্রকাশ- ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩। প্রকাশক— প্রসূন বসু, নবপত্র প্রকাশন, ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ-যোগেন চৌধুরী। উৎসর্গ-উল্লেখ নেই, তার জায়গায় লেখা 'Perhaps reality has not appeared before anybody as yet'–Jean Luc Godard. মূল্য-১২ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৪। সূচনাপত্রে লেখা— '১৯৬১ সালে আমার প্রথম বই 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' প্রকাশিত হয়। তখন আমরা ৫০ থেকে কেউ ২৫, কেউ বা ২৮ বছর দূরে। তারপর, গত ২২ বছর ধরে আসপাশ থেকে বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই লেখক বা কবি হতে দেখেছি। আমি তাদের কৃতিত্বে গর্বিত। উল্টোদিকে গত ২২ বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আমিও কিছু হতে পারিনি তা নয়। আমি একজন সফল না-লেখক হতে পেরেছি। শুধু আমি জানি এবং আর কেউ জানে না, এ-জন্যে আমাকে কত চেষ্টা করতে হয়েছে। একজন সফল না-লেখকও পাঠক-পাঠিকার স্নেহ ও প্রশ্রয় পেতে পারে, আমি মনে করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়'।

সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে—বিপ্লব ও রাজমোহন, অংশু সম্পর্কে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি, বড় দুঃসময়, আলমারি, দোলনা, মাঝখানের দরজা, মাতৃস্তোত্র, হ্যাঁ, প্রিয়তমা।

বই প্রকাশের ছ মাসের মধ্যে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় আলোচনা করেন দেবেশ রায়। 'বুড়িয়ে না-যাওয়া গল্প' শিরোনামে ২অগাস্ট ১৯৮৩ সংখ্যায় লেখা সেই আলোচনার টুকরো টুকরো অংশ পড়লে বোঝা যাবে 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা' প্রসঙ্গে শ্রীরায়ের মতামত:

'নিজের লেখাকে এমন অচেনা রেখে দেয়া অনেক লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয় না, সম্ভব হয়নি। আমাদের এই সময়ে নিজের গদ্যকে নিজেরই রেখে দেয়া খুব কঠিন, প্রায় যেন অসম্ভব। এক হতে পারে মৌলিকতায় প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে আত্মরক্ষা। কিন্তু সন্দীপন তাঁর ভাষায় যে চলচ্ছক্তি সঞ্চার করেন তা গত কয়েক বছরে বাংলার জনসংযোগের ভাষাকেও অনেকখানি বদলে দিয়েছে। জনসংযোগ বলতে শুধু খবরের কাগজ বা বিজ্ঞাপনই নয়; সাহিত্য শিল্প চর্চার ছোট কাগজও তার সীমাবদ্ধ পাঠকের সঙ্গে সেতু তৈরির যে ভাষা ব্যবহার করে, তাকে একজন কোনও লেখকের ভাষা যদি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে থাকে তবে তিনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। যে কারণে, সন্দীপনের পক্ষে তার নিজের লেখাকে একান্ত নিজেরই রেখে দেওয়া আরও কঠিন। কিন্তু সন্দীপন তা পেরেছেন। তাঁর কোনও গল্পকেই মনে হয় না—বয়েস হয়ে গেছে বুড়ো হয়ে গেছে। প্রায় তিরিশ বছর আগে লেখা গল্পগুলি আজও যেন প্রথম পাঠকের জন্য তৈরি। আর, আজও তার গল্প নিয়ে প্রায় সেই তিরিশ বছর আগের মতোই তর্ক বাধতে পারে—পক্ষে-বিপক্ষে।

....সন্দীপনের সব গল্পই নাগরিক পরাজয়ের ধারবাহিক কাহিনী—সেই আমাদের নাগরিকজীবন রাজনীতির ওতপ্রোত। সন্দীপনের গল্পগুলিতেও তাই রাজনীতি আসে সেই পরাজয়ের বিবরণের সঙ্গে নানা গোপন জটিল পথে।' ৬৯ থেকে ৭২ সালের মধ্যে লেখা গল্পগুলোর হাত ধরে কীভাবে সময়-রাজনীতির গা-ঘেঁষে হেঁটেও সন্দীপন গা-ঝাড়া দিয়ে নিজের পথ চলতে পারেন তা গল্প ধরে ধরে আলোচনা করে দেখিয়েছেন দেবেশ রায়। অবশেষে একটি তত্ত্বের দিকে নিয়ে এসেছেন পাঠককে, যা বাস্তবতার সঙ্গে একজন আধুনিক লেখকের সংযোগের দিকটি নিয়ে তর্ক তোলে এবং আশির দশকে লেখা পরবর্তী গল্পগুলি সম্পর্কেও সে তর্ক বহাল রাখে। বস্তুত, আশির দশকের শেষপর্বে এসে সন্দীপনের গল্পধারায় বদল ঘটে। সেই পর্বে প্রবেশের আগে পড়ে নিতে হয় দেবেশ রায়ের 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা' গ্রন্থ আলোচনার শেষাংশটুকু:

'কথাসাহিত্যের, গল্প -উপন্যাসের, নির্ভর যে-বাস্তব আর উদ্দেশ্য যা-কল্পনা—এগুলো

তার সমস্ত শর্ত স্বীকার করে বলেই সন্দীপন গদারের এক বচন উদ্ধৃত করে রেখেছেন—'বোধহয় কারও কাছেই বাস্তবতা এখনো ধরা দেয়নি।' তার মানে কি এই যে সব লেখকই তাঁর নিজের মতো করে বাস্তবতাকে দেখেন। কিন্তু এ-কথা জানাবার জন্যে একটা উদ্ধৃতির দরকার হল কেন সন্দীপনের? তা-ও, গদারের? এতে একটু, সন্দেহ হয়—সন্দীপন তাঁর লেখাকে তাঁর লেখাটুকুর ভিতরেই না রেখে, তাকে একটা তত্ত্ব বা মতের ওপর দাঁড় করাতে চান। কথাটি যে শুধু সামান্য এই এক লাইনের উদ্ধৃতির সূত্রেই বলছি, তা-নয়। বাংলা গল্প-কবিতায় এক ধরনের আধুনিকতা কিছুটা আদেখলেপনার সঙ্গে জুড়ে গেছে। সেখানে রচনার চাইতে রচয়িতা প্রধান, শিল্পের চাইতে জীবনাচরণ মুখ্য। এখন তার করুণ দিকটাও ধরা পড়েছে।

....এই লেখাটি শুরু করার সময় ভেবেছিলাম সন্দীপনের বিষয় একটা নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে যায় না কেন, এ নিয়ে কিছু কথা তুলব। কিন্তু, গল্পগুলি আবার পড়ে ফেলে সেই প্রশ্নটিকে বড় অবান্তর লাগছে। সন্দীপনের মতো আর এমন ক-জন লেখকেই বা আছেন আমাদের, যিনি নিজের বিষয়টুকু নিয়েই নিজের মতো করে লিখে যেতে পারেন?'

৬.

১৯৮৩ সালের শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশিত হয় 'সাপের চোখের ভেতর দিয়ে' এবং 'আজকাল' ১৯৮৪ সালের বইমেলায় সেই গল্পটি নিয়ে একটি মিনিবুক প্রকাশ করে। সন্দীপনের লেখালিখিকে ধারাবাহিকভাবে ছাপার ক্ষেত্রে এই দুই পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো একথা বলাই যায়, এতদিনে সন্দীপন বৃহত্তর পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর মতো একটা জায়গা পেলেন। বিশেষভাবে উপন্যাস, আর সেই উপন্যাস নিয়মিত, বই রূপে ছাপার ক্ষেত্রে 'প্রতিক্ষণ' একটা পর্ব পর্যন্ত; তারপর 'আজকাল এ পর্যন্ত সর্বাধিক উদ্যোগ দেখিয়ে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রতিবছর নিয়ম করে উপন্যাস লেখাটা গল্পকার সন্দীপনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই অভিযোগ পুরোটা সত্যি নয়; গল্পগুলির সাল-তারিখের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বছরে তিন-চারটি করে গল্প লেখার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্নই আছে। তিনি যত বেশি পোলেমিক লিখেছেন, কোনওদিনই তত বেশি গল্প লেখেননি।

**সাপের চোখের ভেতর দিয়ে** (মিনিবুক)। প্রথম প্রকাশ-কলকাতা বইমেলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। প্রকাশক—প্রতাপকুমার রায়। আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৬, রাজা রামমোহণ সরণি, কলকাতা-৯। প্রচ্ছেদ—যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২। মূল্য-১টাকা। শেষ মলাটে লেখা—'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বই বেরয় দশকের হিসেবে। তাঁর কোনও লেখাই তাই বড় বেশি চেনা হতে পারে না। নিজের লেখাকে এমন অচেনা রেখে দেওয়া অনেক লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।....সন্দীপন তা পেরেছেন। তাঁর কোনও গল্পকেই মনে হয় না—বয়স হয়ে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছে। প্রায় ২৫বছর আগে লেখা গল্পগুলি আজও যেন প্রথম পাঠকের জন্য তৈরি। আজও তাঁর গল্প নিয়ে প্রায় ২৫বছর আগের মতোই তর্ক বাঁধতে পারে।—দেবেশ রায়।'

দ্বিতীয় প্রকাশ—প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মন্ডল রোড, কলকাতা-২। মূল্য-৩টাকা।

*প্রশ্ন ঃ 'আজকাল'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে আপনি একটা বড় পাঠকদল পান। অনেক পাঠকের কাছে যাওয়াটা একজন লেখককে সেন্সর করতে থাকে কি?*

উত্তর ঃ লেখকের পক্ষে পাঠকের কাছে চলে যাওয়াটা ভাল। কারণ, পাঠকই হচ্ছে আসল জিনিস। পাঠকের ভাল-মন্দের বিচার পরে হবে। আর ধীরে ধীরে লেখক নিজেও তার পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করে নেবেন। পঞ্চাশটা লোক একটা বই পড়লে, আটচল্লিশজন তাকে প্রত্যাখ্যান করবে কিন্তু দুজন পাঠক অন্তত সে পাবে। যে কোনও ভাল লেখক তার পাঠক তৈরি করে নেয়, আগে থেকে কোনও পাঠক থাকে না। জীবনানন্দ দাশের আগে থেকে কোনও পাঠক ছিল না। অত্যন্ত বাজে লেখক যাঁরা, পুরনো লেখকদের অনুকরণ করে যাঁরা লিখে যান, যেমন, ধরা যাক সুবোধ ঘোষের মতো করে যাঁরা পরে লিখেছেন। তাঁদের পাঠক আগে থেকেই আছে; কারণ, সুবোধ ঘোষই তাঁদের পাঠক তৈরি করে গেছেন। এ যেন বাপের টাকা খাওয়ার মতো।[১২]

৭.

দু বছর বাদে প্রকাশিত হয় নতুন ও পুরনো গল্প নিয়ে একটি সংকলন। তারই মধ্যে রচিত হয়েছে দুটো উপন্যাস—'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' (শারদীয় প্রতিক্ষণ ১৩৯১, ইং ১৯৮৪) এবং 'রিক্তের যাত্রায় জাগো' (শারদীয় প্রতিক্ষণ ১৯৯৩, ইং ১৯৮৬)।

**সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প** (আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালার প্রথম বই)। প্রথম প্রকাশ—মহালয়া ১৩৯৩, অক্টোবর ১৯৮৬। প্রকাশক-প্রিয়ব্রত দেব। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৭, জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-১৩। প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ—'শেষ দুজন/পার্থসারথি চৌধুরী ও বরুণ চৌধুরীকে'। মূল্য-১৫ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৬। ভূমিকা রূপে ছাপা হয় 'সোমেন পালিতের বৈবাহিক' রচনার অংশ।

সংকলিত গল্পগুলি ক্রমানুসারে—রুবির সঙ্গে হীরা বন্দরে, বন্‌ধ-এর ১০দিন, সাপের চোখের ভেতর দিয়ে, হ্যাঁ, প্রিয়তমা, মাতৃস্রোত্র, মাঝখানের দরজা, দোলনা, আলমারি, বড় দুঃসময়, চটি, বিপ্লব ও রাজমোহন, নিদ্রিত রাজমোহন, বিজনের রক্তমাংস।

অন্য গল্পগ্রন্থে নেই, এমন গল্পের সংখ্যা তিনটি—চটি, বন্‌ধ-এর ১০দিন, রুবির সঙ্গে হীরা বন্দরে।

'আমাকে যদি কেউ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ১০টি ছোটগল্পর তালিকা প্রস্তুত করতে বলে, তাহলে সন্দীপনের 'চটি' অন্তত ১০ম করব। যদি কেউ চান, এই মুহূর্তে আমি গল্পটা বলি, তা আমি পারব না, কেননা গল্পটি redable এবং audio। গল্পটি pronounce করে পড়ো অথবা সন্দীপনের গলায় শোনো। আমার অনেকানেক সৌভাগ্যের মধ্যে ১টি সৌভাগ্য হল, গল্পটি আমি সন্দীপনের গলায় একদা শুনেছি। আর! এখনো কানে লেগে আছে ওর প্রথম বাক্য: 'সারা-জীবন বিপদগ্রস্ত হতে হতে শেষে যে বিপদ আসে তা হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস।'' *(উদয়ন ঘোষ: সন্দীপনের ম্যাজিক, সন্দীপনের রিয়ালিটি)*[১৩]

৮.

১৯৯৩-তে যখন 'পঞ্চাশটি গল্প' বের হল তখন সন্দীপনের বয়স ষাট। এরকম উল্লেখের কারণ, এরও দু বছর বাদে, ১৯৯৫ সালে এই বইটির জন্যই সন্দীপন বঙ্কিম পুরস্কার পান। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এতদিন ধরে যে লেখক প্রতিষ্ঠানিকতাকে আক্রমণ করেছেন, পুরস্কারকে আক্রমণ করেছেন, শেষপর্যন্ত তিনি পুরস্কার পেয়ে কী বলছেন?

বন্ধু বরুণ চৌধুরী ছোট্ট একটি লেখায় সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, 'পুরস্কারের পরদিন, না, পরসন্ধ্যায় গলায় ছাইপাঁশ ঢালতে ঢালতে সন্দীপন ওর আজন্ম স্মার্টনেস থেকে বলল, 'টিভিতে নামটা শুনেই অনেকে আহারে! কবে! কখন! কী হয়েছিল! এসব ভাবতে শুরু করেছিল। আমার সম্পর্কে তো ভাল খবর কখনও শোনা যায়নি, তাই আর কি! 'সত্যিই তাই।' *(যখন ভিজিবিলিটি নিল্)*[১৪]

সন্দীপন অধিকাংশ সময়, বিশেষভাবে নিজের ক্ষেত্রে যা কিছু গৌরবের, তাকে নঙর্থক করে দেখানোর মধ্যে যে তাচ্ছিল্য থাকে—এক্ষেত্রেও তাই করলেন। তিনি মনে করেন পুরষ্কার দেওয়াটা সরকারি কর্মচারীদের চাকরি করে যাওয়া, যাঁরা এসব দেন তাঁরা চাকরি বাঁচাতেই দেন। এই প্রত্যেকটা কথার মধ্যে যেমন একটা সত্য আছে, আবার একটা মিথ্যা দিকও আছে—সন্দীপনও জানেন এসব। আসলে, পুরস্কার দেওয়ার মধ্যে যে রাজনীতি থাকে, হিসাব থাকে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে, তার প্রেক্ষিতে কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে বাষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। ফলে, পুরস্কার দেওয়াটা সরকারি চাকরি আর 'আমার সম্পর্কে তো ভাল খবর কখনও শোনা যায়নি'-র মধ্যে রয়ে গেছে আপাত স্মার্টনেসের আড়ালে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠান, ও নিজের অবস্থান নিয়ে যে মূল্যায়ন তারই পরিচয়। ওই নঙ্থক প্রতিক্রিয়াগুলিকে যাঁরা মনে করেন চাতুরি তাঁরা আসলে আড়াল করতে চান ক্ষমতাকেন্দ্রের আগ্রাসন-রাজনীতিকে। সন্দীপন যখন পুরস্কার পান তখন তাকে সেই রাজনীতির অন্তর্গত করেই দেখা দরকার। দেখা দরকার, তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশের ছোট্ট একটা প্রদেশের দেড়-দু হাজার পাঠকের একজন লেখকও স্বীকৃতির খেতাবি-রাজনীতিতে এক জটিল অঙ্কের ঘুঁটি। এবং তা কালোনিয়াল-হ্যাঙ্ওভার-লাঞ্ছিত। যেভাবে চলেছে ব্যবস্থাটা, তারই দড়িটানাটানি ও বহুস্তরীয় রাষ্ট্র-কাঠামোর নঙর্থকতার প্রতিচ্ছবি। 'নেই তাই খাচ্ছো' কিংবা থাকলেই দিতে হবে!

১৯৯২ সালের বইমেলায় 'হিরোসিমা, মাই লাভ' উপন্যাসটি যখন বই রূপে প্রকাশিত হয় তখন তার সঙ্গে দুটি গল্পও অন্তর্ভুক্ত হয়—'জুপিটার ও থেটিস' এবং 'শেষ মেট্রো'। তাই প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনের বইটির নাম হয় 'হিরোসিমা, মাই লাভ ও অন্যান্য'। পরের বছর এই গল্পদুটিও 'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনভুক্ত হয়।

৯.

তথাকথিত কাহিনিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। বরং বলা যায়, সারা জীবনে লেখা যাবতীয় গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁর কাহিনি দেড় খানা—এই স্পষ্ট মতটা নানাভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাহিনি বিচারের প্রচলিত ছককে ভেঙে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কাহিনি বলতে হয়। ভঙ্গি আর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। প্রেম, মৃত্যু-অসুস্থতা থেকে গড়ে ওঠা সংশয়বোধ, যাকে অতিক্রমের নিরন্তর চেষ্টা—মায়া ও বাস্তবতায়, মায়াবাস্তবতায় কিংবা এসব কোনও নান্দনিক চ্যালেঞ্জ থেকে নয়, নিছকই বেঁচে থাকার নাগরিক অপরত্ববোধ থেকে, তাকে কেন বলব না তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি—মধ্যবিত্ত-মন ও মননশীলতার বিস্ফোরণ! এই বিস্ফোরণ বহি:প্রকাশে ছত্রাখান নয়, অন্তর্ঘাতে রক্তসিক্ত। খুঁজলে অশ্রু-ঘামও পাওয়া যাবে, তবে তা বিজন থেকে অনেক দূরে, অনেক অন্যভাবে, অন্য রাজনৈতিক ব্যাখায় পরিবর্তিত। সন্দীপনের আশির দশক থেকে রচিত গল্পগুলিকে অনুসরণ করলে সেই বদল-প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই বইতে গৃহীত অগ্রন্থিত গল্পমালা যার অন্যতম সাক্ষী। দু-একটি পুরনো

গল্পকে পাশ কাটিয়ে যদি আশি ও নব্বই দশকের গল্পগুলিতে ঢুকে পড়া যায় তাহলে বোঝা যাবে কীভাবে রচিত হয় 'কুইনী'-র মতো গল্প।

এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে, পঞ্চাশ বছরের উপর গল্প লিখে আজ যখন তিনি নতুন গল্প লেখেন তখন গল্পের গড়ে ওঠা, লেখকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে কী মনে করেন তিনি, তা জেনে নেওয়াটা বাড়তি কোনও মাত্রা যোগ করে কিনা ভাবনা থেকেই পরিশেষ সাক্ষাৎকারটি সংযোজিত হল। এই এক টুকরো সাক্ষাৎকার পড়লেই কি বোঝা যাবে কোথায় তিনি পরিবর্তিত আর কোথায় তিনি অপরিবর্তিত? তার জন্য একটি স্বতন্ত্র অংশ প্রয়োজন। তবু রইল সাক্ষাৎকারটি, পাদটিকার মতোই।

১০.

*প্রঃ কীভাবে গল্প তৈরি হয়? কোনও একটা সূত্র, নাকি বক্তব্য, নাকি চরিত্র, নাকি অন্য কিছু?*

উঃ গল্প সেভাবেই তৈরি হয়, যেভাবে কবিতা তৈরি হয়। একটা সেন্স অফ ওয়েল বিয়িং তৈরি হয়—মনে হয় এখন বেশ সাফসুতরো লাগছে, মনে হয় এখন লিখলে লেখাটা হবে। এটা আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় বোধ,—এই ঝরঝরে মনটা, শরীরটা—এটা আমি বুঝতে পারি। তবে, অনেক সময়েই এই ভাল সময়টা চলে যায়। তাই যত সেন্স অফ ওয়েল-বিয়িং তৈরি হয়, তত লেখা হয় না।

*প্রঃ যখন দেখি একটা চরিত্র—প্রধান গল্প বা উপন্যাস, তখন কি আপনি সেই চরিত্রটাকে গড়ে তোলেন অনেকদিন ধরে?*

উঃ আমি লেখার আগে লেখাটা নিয়ে কোনও কিছুই ভাবি না। লিখতে লিখতেই লেখাটা হয়। আমি লেখাটাকে অনুসরণ করি। আমার মনে হয় একজন কবিও এভাবেই কবিতা লেখেন। বিশেষ কিছু ভাবনা থাকে না, থাকলেও তা অধিকাংশ সময়েই সম্পূর্ণই বদলে যায়।

*প্রঃ লেখার পর পড়ে সংশোধন করা?*

উঃ না, অল্প ভাষা সংশোধন আগে করতাম, তা এখন আর আলাদা করি না। লিখতে লিখতেই যা। বা, যে-টুকু। তবে রাফ এবং ফেয়ার এই দুটো ড্রাফট হয়। তা সে লেখা একটা ছোট্ট পোলেমিক হলেও।

*প্রঃ যখন তাগাদা আসে লেখার?*

উঃ লেখাতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাগাদা থেকেই হয়। তাগাদা না থাকলে কোনও লেখাই হয় না। সেই অর্থে নিজস্ব প্রয়োজনে, লেখক বলে, একটা ভাব এসে গেল আর লিখতে বসলাম, তা হয়ই না। একদম গোড়ার দিকে হয়েছিল, এখন সবটাই তাগাদার লেখা।

*প্রঃ একজন লেখকের প্রফেশনালিজম কতটা দরকার বলে মনে হয়?*

উঃ প্রফেশনালিজম বলতে কী বোঝায় আমি জানিই না!

প্রফেশনাল যারা, আমি তাদের লেখক বলে মনে করি না। মেয়েদের দিকে দেখ—প্রফেশনাল শুধু বেশ্যারা। প্রফেসনাল মা, বৌ, বোন, মেয়ে হয়?

*প্রঃ 'বিজনের রক্তমাংস' পর্বের গল্পগুলো সম্পর্কে শুনেছি—দীর্ঘ সময় ধরে লেখা। একটু একটু লিখে কাউকে পড়াচ্ছেন, মতামত নিচ্ছেন, আবার লিখছেন। আর এখন তো লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নির্দিষ্ট একটা তারিখের মধ্যে লেখা চাওয়া হয়। তৈরি করেও দিতে হয়। এই দুই পরিস্থিতির সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে?*

উঃ শুরুতে তো লেখার সঙ্গে একটা সাধনার ব্যাপার ছিল। তখন তো আমি লেখক কিনা একদমই জানতাম না। এখনও জানি না। তবে এখন কিছু বইটই ছাপা হয়েছে বলে, দেখে মনে হতে পারে আমি বোধহয় লেখক। কিন্তু তখনও লেখা হবে কি হবে না, এ নিয়ে যেমন অনিশ্চয়তা ছিল এখন তা একই রকম আছে। বোধহয় আরও বেড়েছে। ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে এটা।

*প্রঃ আপনি বলেন লেখককে সেন্ট পারসেন্ট সামাজিক হতে হবে, না হলে লেখক হওয়াই সম্ভব নয়। লেখকের এই দায় কেন?*

উঃ মানুষের অস্তিত্ব তো সামাজিক হবেই, এটা তো ঐতিহাসিক ভাবেই সত্য। সেই অর্থে কেউ তো একা নয়—এমন কি কাম্যুর 'আউটসাইডার' ও সেই অর্থে সমাজের বাইরে নয়। সমাজের ভেতরে সে থাকতে পারেনি বলে তার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এবং সেটা যদি বেদনাহীনতা হয়, তাও অবশ্যই সামাজিক। আসলে, সমাজ হল মাতৃগর্ভের মতো। তাকে বাদ দিয়ে কেউ হতেই পারে না। লেখক এবং তার লেখাও। যে কোনও শিল্পকেই আমি সামাজিক কাজ বলে মনে করি। এমন একটা কাজ আমি করছি, যা সমাজের জন্য রেখে যাবো মানুষে পড়বে, মানুষে বুঝবে বলে। যদি সে রকম কোনও অসামাজিক লেখক থেকেও থাকে, তিনিও সমাজের জন্যই লিখছেন। কেউ ছবি আঁকে ছবিটা পুড়িয়ে ফেলবে বলে নয়। লেখাও তাই। বেঁচে থাকাটা তাই মানুষের জন্য! কুকুর-বেড়াল বা গাছ-পালার সঙ্গে আমরা বেঁচে থাকি না। এই গ্রহে মানুষে আছে বলেই এখানে বেঁচে আছি। অন্য গ্রহে নেই।

*প্রঃ কিন্তু যে লিখছে, সে লেখার মধ্যে দিয়ে কোনও সামাজিক বিশ্বাসকে সার্ভ করবে—এ রকম মনে করেন?*

উঃ একদম না। বরং ঠিক উল্টো। একজন লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানীকে আমরা যে কোনও বিশ্বাসকে সার্ভ করার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তিই দিয়েছি। তারা যা ভাল বুঝবে করে যাবে। তাতে যদি কিছু কিছু অসামাজিক কাজ হয়ে যায় তো হয়ে যাবে। যারা চিরাচরিত ধারায় না লেখার চেষ্টা করেছিল, বিপ্লব করার চেষ্টা করেছিল—তাদের কাজ কিছুটা অসামাজিক হয়ে গেলেও তা সমাজের পক্ষে অনেক, বেশি মঙ্গলজনক। এরা যেখান দিয়ে যায় সেটাই রাজপথ।[১৫]

টীকা:

১. 'একক প্রদর্শনী' (১৯৭১) উপন্যাসের ভূমিকা: 'আপনাদের যাঁদের গল্পটা ভাল লাগল তাঁরা অনুগ্রহ করে আমাকেও ভালবাসুন, কেননা, আমি ও আমার গল্প একই।'

২. জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে অদ্রীশ বিশ্বাস গৃহীত সাক্ষাৎকার। 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি'। সম্পাদনা অদ্রীশ বিশ্বাস, প্রবীর চক্রবর্তী, ভূমিকা, জুলাই ১৯৯৬।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. অক্ষমতা ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়: দীপক মজুমদার। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গ্রন্থের আলোচনা।

৫. জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে গৃহীত সাক্ষাৎকার। প্রাগুক্ত বইটি।

৬. আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা: বিমল কর। করুণা প্রকাশনী, আশ্বিন ১৩৯২।

৭. অংশু কী বলছে বেচুকে: পাঠ্যের মফঃস্বল ও সদরে: অনিরুদ্ধ লাহিড়ী। 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' গ্রন্থের আলোচনা। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রাগুক্ত বইটির অন্তর্ভুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. বাংলা গল্পের বাসাবদল: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত বইটি।

১০. নিদ্রিত রাজমোহন: সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য।

১১. কিছু স্মৃতি, কিছু সন্দীপন: আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রাগুক্ত বইটির অন্তর্ভুক্ত।

১২. জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে গৃহীত সাক্ষাৎকার। প্রাগুক্ত বইটি।

১৩. সন্দীপনের ম্যাজিক, সন্দীপনের রিয়ালিটি: উদয়ন ঘোষ। প্রাগুক্ত বইটি।

১৪. যখন ভিজিবিলিটি নিল্: বরুণ চৌধুরী। প্রাগুক্ত বইটি।

১৫. জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে গৃহীত সাক্ষাৎকার। প্রাগুক্ত বইটি।

মিত্র ও ঘোষ